পরিচয়
বর্ষ ৪০। সংখ্যা ৩-৪
আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩৭৭

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ: দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক: দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৪০ । সংখ্যা ৩-৪
আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭৭

শিল্পীর স্বাধীনতা ও দায়

সিদ্ধেশ্বর সেন

কর্মগতিকে, একসময়—প্রায় দেড়যুগ আগে—আমাকে কিছু ঘুরতে হয়েছিল মফঃস্বল আর গ্রামবাঙলায়। সে-সময়, মেদিনীপুরের এক প্রত্যন্ত চাষীপাড়ায়, একতারা-বাজানো এক বাউলের গলায় শুনেছিলাম :

"আমি বৃন্দাবনে ঘুরে বেড়াই,
কারে ডরাই, কারে ডরাই,
আমি স্বাধীনরাজ্যে বসত করি
চলবে না রে ছলচাতুরী।"

তখন ও-অঞ্চলে খাদ্যসঙ্কট লেগেছিল। জায়গাটা এমনিতেই খরা। তায় দুর্বিপাক। লোকজনের অবস্থা আরও কাহিল। তবু, তার মধ্যেও, শ্রোতাদের মাথা নাড়া, গানের সঙ্গে সঙ্গত করা তো দেখেছি!

আশ্চর্য লেগেছিল। কিংবা, আশ্চর্যেরই-বা কতটা আছে!

তার অল্পদিন বাদেই দেশে আসছিল এক সাধারণ নির্বাচন। ওই গ্রাম্য গায়কটির কোনও স্থায়ী ঠিকানা বা ভোট ছিল কিনা জানি না। কিন্তু চাষীদের ছিল। ভোটের বাবুরাও আনাগোনা শুরু করেছিলেন, শুনতে পাই। তাই কি একান্ত মরমী যোগ-বোধ ছাড়াই, বা তা ছাড়াও, পরিস্থিতির কার্যকারণের তাগিদেই সেই গ্রাম্য-শিল্পীর বর্ণনায় এক পুরাণ-অতিকথার "বৃন্দাবনের স্বাধীনরাজের" আশা অতগুলি দুর্দশাগ্রস্ত জাগতিক গেরস্ত-চাষীর মনে পরিবর্তনের কোনও ঈষৎ কল্পনাও জাগিয়ে তুলতে চাইছিল?

কে জানে। তবে "মুক্তি", "স্বাধীনতা"—জনসমাজে এ-দুটি শব্দের আবেদন ও উদ্দীপনের তুলনা মেলা ভার। যে অবস্থাতেই হোক না কেন,

আপেক্ষিক ভাবেই। লেখক-শিল্পীর "সৃষ্টি"র বা "চিন্তার স্বাধীনতা"ও যে কেন এর থেকে একেবারে ভিন্নকোটিতে অবস্থান করবে, তার কোনও যুক্তিবুদ্ধি বর্তমান আলোচকের মতে, নেই। তাই, সব যুগেই সব সৎ সাহিত্যিকই সে-প্রেরণা নিজেদের রচনাকর্মে অঙ্গীকৃত না করে, সচেতনভাবে না হোক বাস্তবতার প্রতিফলনের নিয়মেই বোধহয়, এক পা-ও এগোতে পারেন নি।

লেখক-শিল্পীর সৃষ্টির স্বাধীনতা কথাটা তবু, দুর্ভাগ্যত, আজ উঠেছে যেন নতুন করেই, পশ্চিমীমহল থেকেই বিশেষ ভাবে—এবং আমার মতে, গোটাটাই এক ভুল পরিপ্রেক্ষিতে।

এ-প্রশ্নটির সত্যিকারের সদর্থক ও সার্থক আলোচনা তাই থমকে যায় এক নঙর্থক ঘোরপ্যাচে। যাঁরা তথাকথিত "স্বাধীন" বনতে চান—অদৃষ্টের পরিহাস—তাঁরাই আবার কোনও বিশেষ সামাজিক শ্রেণীর বা মতবাদের অধীন ও অধঃস্তন না হয়ে তা পারেন না, একটির পক্ষে ও অপর একটি "বাদ" বা ভাবাদর্শের বিরোধিতা না করে তা পারেন না। অর্থাৎ "নিরপেক্ষ" "স্বাধীন" বস্তুটি সেই তাঁদের হাত থেকেও ফস্কে কখন তলিয়ে যায়, যেটি পড়ে থাকে—সেটি সেই অদৃষ্টেরই গেরো। পরশ্রমজীবীতন্ত্রে এই সামাজিক বুদ্ধিভ্রান্তিই তাই এই প্রশ্নে বহুতর বুদ্ধিজীবীরই বুদ্ধিনাশের নজির হয়ে থাকে, এদেশে-ওদেশে। কে না জানে, এ-ভ্রান্তিবিলাসের বেসাতি সাজিয়ে আস্ত এক আন্তর্জাতিক সংস্থাই কাজ করে চলেছে, যার নাম 'কালচারল ফ্রিডম'! এই বাঙলাদেশেই যে একদিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল—ঝোপ বুঝে বিশেষ কোপ মারার এক উপযুক্ত পরিস্থিতি পেয়ে, অবশ্যই কিছু মান্য সাহিত্যিককে সঙ্গী জুটিয়ে নিয়ে—এক 'স্বাধীন-সাহিত্য সমাজ', তাও আশা করি আমাদের অনেকেরই আজও স্মরণের বাইরে যায় নি। তবু, অল্পদিনেই আবার "স্বাধীন"ভাবেই আত্মবিলোপের পথ না নিয়ে, এদেশের সমাজ-নৈতিক জলহাওয়ায়, তা-ও কূল পায় নি।

এই "স্বাধীন" শিল্পীদলের মোদ্দা তত্ত্ব হলো সমাজতন্ত্র ও সাম্যতন্ত্রের সঙ্গে সৃষ্টির স্বাধীনতা ব্যাপারটি আদৌ খাপ খেতে পারে না। কারণ, এই "মুক্ত" দুনিয়ার প্রবক্তারা প্রাণপণ বোঝাবার চেষ্টা করে আসছেন যে, একমাত্র পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থাতেই শিল্পী ও স্রষ্টা তাঁর আত্মপ্রকাশের "অবাধ স্বাধীনতা" ভোগ করেন আর সমাজতন্ত্রী দুনিয়াতে নাকি সবকিছুই সৃষ্টিকর্ম চলে "ওপর থেকে ফতোয়া জারী" করে। অবশ্য মাত্র পঞ্চাশাধিক বছরের সমাজতান্ত্রিক

সভ্যতায় শিল্প-সাহিত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিচারে অনেক সময় যে-অবাঞ্ছিত, এমনকি গুরুতর, ভুলত্রুটিও কোনো কোনো পর্বে ঘটে গেছে—বর্তমান আলোচক কিন্তু আদপেই তার স্বপক্ষে ধামাধরার কথা বলছেন না; এরেনবুর্গ, শোলোখভের মতো সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের বরেণ্য সাহিত্যিক নিজেরাই কোনো না কোনো সময়ে তার সমালোচনা করেন। কিন্তু, সেই সব ব্যতিক্রমকে নিয়ম বলে মানতে বর্তমান আলোচক অপারগতা জানায়। শুধু, 'শিল্পীর স্বাধীনতা ও তার দায়'-এর সমস্যাটিই এখানে আলোচ্য ও অনুসন্ধানের বিষয়।

একটি কথা এ-প্রসঙ্গে আগেই বলে রাখা দরকার যে, নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্মাণ যেখানে চলেছে, সেখানে স্বভাবতই শিল্পী-সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গী কিছুটা ইতিবাচক হয়েই গড়ে ওঠে। স্বাভাবিক কারণেই তা ঘটে। অথচ, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে সেই সব শিল্পী ও লেখকই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হন যাঁদের সৃষ্টিকর্মে স্থিত স্বার্থ ও "প্রতিষ্ঠান" বা "এস্ট্যাবলিশমেন্ট" সম্পর্কে থাকে অন্তত সমালোচনাত্মক, বিশ্লেষণমুখী দৃষ্টিভঙ্গী—বাস্তবতা শুধু নয়, ক্রিটিক্যাল বাস্তবতা—একান্ত মৌলিক রূপান্তরধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী যদি না-ও থাকে। কেন এমন হয়, সে-কারণটিও আমাদের বুঝে দেখার কথা। ঐতিহাসিক ও বস্তুবাদী ডায়লেকটিকসের বিচার-প্রণালীই, আমার মতে, এ-অবস্থাটি বোঝার পক্ষে সহায়ক।

পুঁজিতন্ত্র তার সূচনাসময়ে শিল্প-সাহিত্যের বিকাশে, সন্দেহ নেই, এক ইতিবাচক ভূমিকাই নিয়েছিল। কিন্তু, কালক্রমে পুঁজিতন্ত্রে যখন সবকিছুই হয়ে উঠল বিক্রয়যোগ্য ও মুনাফাশিকারী পণ্য, তখন শিল্পী-সাহিত্যিকও সেই বাজারী সম্পর্কের নিয়মের আবর্তে না জড়িয়ে পারেন নি। এর ফলাফল যা হবার হলো। ইতিহাসের সব থেকে এক নিষ্ঠুর একনায়কতন্ত্র—পুঁজির একনায়কতন্ত্রের শিকার হলেন সৃষ্টিশীল লেখক-শিল্পীরাও। সেকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্মেও এ-ট্রাজেডির স্বাক্ষর রয়েছে।

তবু, উদাহরণত, রাজতন্ত্রী বালজাকও যে সমাজতন্ত্রী মার্কস-এঙ্গেলসের অন্যতম প্রিয় লেখক হয়ে ওঠেন, তার কারণও এই যে মহাশিল্পী বালজাক তাঁর বুদ্ধির পক্ষপাত সত্ত্বেও শিল্পসৃষ্টিতে প্রতিফলন ঘটান তৎকালীন সমাজবাস্তবতারই। তলস্তয় প্রসঙ্গে লেনিন যেমন লিখেছিলেন, "আমাদের আলোচ্য শিল্পী যদি প্রকৃতই মহৎ শিল্পী হন, তবে তিনি তাঁর রচনাবলীতে

বিপ্লবের অন্তত কিছু তাৎপর্যপূর্ণ দিকের প্রতিফলন ঘটিয়েছেনই।" এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব-সঙ্গতিতে একটি অগ্রসরমান শিল্প-সাহিত্যধারা গড়ে ওঠে।

পণ্য, মুনাফা ও বাজারীতন্ত্র যে পুঁজিতন্ত্রের গর্ভে অনিবার্যভাবেই বেড়ে উঠেছে, শেক্‌স্‌পীয়রের মহৎ প্রতিভা সে-প্রক্রিয়ারও প্রতিফলন ঘটায়:

"……Commodity, the bias of the world,
The world who of itself is poised well,
Made to run even upon even ground,
Till this advantage, this wide-drawing bias,
This sway of motion, this Commodity
Makes it take head from all its differency,
From all direction, purpose, course, intent……"

পণ্য, পুঁজি ও মুনাফাতন্ত্রী সমাজে, বিশেষভাবে তার সর্বগ্রাসী পর্যায়ে—সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ বা নয়া-উপনিবেশবাদের যুগে—ব্যক্তির বিযুক্তি-বোধ, শোষিত নিপীড়িত ও শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে যেমন প্রধানত সামাজিক-অর্থনৈতিক, লেখক ও শিল্পীর ক্ষেত্রে তেমনি প্রধানত আত্মিক-মানসিক এমন একটা স্তরে পৌছে যায়, যখন তার "স্বাধীনতা"র স্পৃহা পর্যবসিত হয় মাত্র তার "আত্মবিক্রয়েরই স্বাধীনতা"তে।

ভাসা-ভাসা ভাবে দেখতে গেলে মনে হতে পারে যে, তা কেন? বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা তো সকলের জন্যে "অবাধ" সুযোগই উপস্থিত করেছে; আর তাই যে যা খুশী, এমনকি শিল্পের নাম নিয়েও, করে খেতে পারে। সৃষ্টির স্বাধীনতার এমনি এক "নিরঙ্কুশ" "পরম" বিভ্রম তৈরি করলেও, তার পর মুহূর্তেই বাজারী নিয়মেই শিল্পীর সেই মনসিজা কল্প-প্রতিমা অচিরে ধূলিসাৎ করে দিতে পুঁজিতন্ত্রী "অবাধ" ব্যবস্থা কোনোই কার্পণ্য করে না। তাই এই ধনতন্ত্রী পণ্যতন্ত্র ব্যবস্থায় প্রতিটি সৎ শিল্পীই জানেন যে, সৃষ্টির স্বাধীনতা এ-পরিবেশে কতখানি অলীক-কুসুম, এবং শ্বাসরুদ্ধ। আর, তা সত্ত্বেও, যদি প্রতিভাধর সৎশিল্পী এই সমাজেই সৃষ্টিকর্মের স্বাধীনতার অপরাহত মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করে এগিয়ে যেতে পারেন, তার কারণ তাহলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষণবিরোধী শক্তিগুলির জোরালো অবস্থানই সেই শিল্পীর পক্ষে, আপেক্ষিক ভাবে, প্রকৃত স্বাধীন থাকার শর্তগুলি সৃষ্টি করে দেয়।

পুঁজিতন্ত্রী, উপনিবেশী ও আধা-উপনিবেশী সমাজে শ্রমজীবী ও নিপীড়িত মানুষের এই জোরাল মুক্তিআন্দোলনের অস্তিত্বই শিল্পীর স্বাধীনতার আপেক্ষিক অবস্থা নিয়ে আসে। এই মুক্তিআন্দোলন কী পরিমাণে শক্তিশালী —তার ওপরেই নির্ভর করে লেখক-শিল্পীর এই আপেক্ষিক স্বাধীনতাও। নইলে, লেনিন যেমন দেখিয়েছিলেন, "বুর্জোয়া শিল্পী, লেখক, অভিনেতার স্বাধীনতা হলো নিছক মুখোশ ঢাকা (বা ভণ্ডভাবে মুখোশ আঁটা) নির্ভরশীলতা —টাকার থলি, দুর্নীতি ও গণিকাবৃত্তির ওপর।" কেননা, মনোপলি নিয়ন্ত্রণ করে বৃহৎ বাজারী সংবাদপত্র-পত্রিকা, চলচ্চিত্র-শিল্প, বাণিজ্যিক বেতার, টেলিভিশন (যেসব দেশে তার চল আছে), রঙ্গমঞ্চ এবং বাজারী নিয়ম অনুযায়ী, এমন কি তারা শিল্প-সাহিত্যরুচি তৈরি করারও স্পর্ধা দেখায়। সামাজিক সমস্যা থেকে ও তার নিরসনের সংগ্রাম থেকে মানুষ যাতে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে, একমাত্র তেমন সব কাজকেই অবাধ বিকাশের সুযোগ দেওয়া হয়।

জীবনবাদী, প্রগতিধর্মী লেখক-শিল্পীদের রচনা যাতে ব্যাপক পাঠক-সমাজের কাছে না পৌছতে পারে, তার সবরকম ব্যবস্থাই তারা নেয়—উপেক্ষা, অবহেলা বা সাক্ষাৎ বিরোধিতায়। অবশ্য, তাতে মানবতাবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকদের সৃষ্টি থেমে থাকে না। বাঙলা সাহিত্যে এর একটি মহৎ দৃষ্টান্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। খ্যাতির তুঙ্গে থাকাকালেও গণতান্ত্রিক সংগ্রামী মানুষের দিকে তাঁর পক্ষপাতিত্বের কারণে বড় বড় পত্র-পত্রিকার দরজা তাঁর রচনাপ্রকাশের ক্ষেত্রে যে একদিন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, সে-তথ্যও তো আমাদের অজানা থাকার কথা নয়।

তবু, নিজদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সেইহেতু মানবিক মুক্তি ও শ্রমজীবী মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জোরাল বিকাশে অংশীদার হয়ে সুস্থ গণতন্ত্রী মানবতাবাদী শিল্প-সাহিত্যধারার উদ্ভব ও তার ক্রমিক প্রসারও আমাদের যুগের এক লক্ষণীয় বাস্তবতা। এ-অবস্থাটির ওপর আরও বৈপ্লবিক প্রভাব ফেলে বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব ও তার উত্তরোত্তর পরাক্রম, আজকের আফ্রো-এশীয় দুনিয়ার দুর্নিবার্য উত্থানও তারই আরও এক অবশ্যম্ভাবী শর্ত সৃষ্টি করছে। তাই, বিমূর্তভাবে নয়, শিল্পীর স্বাধীনতা ও দায়ের সমস্যাটিকে এই মূর্ত সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই বিচার করে দেখতে হবে।

আজ নয়, সেই স্বদেশীর যুগে, রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য সৃষ্টি' প্রবন্ধে লিখেছিলেন "বর্ষা ঋতুর মতো মানুষের সমাজে এমন এক একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুররূপে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পর বাংলাদেশে সেই অবস্থা আসিয়াছিল।...ফরাসি বিদ্রোহের সময়েও তেমনি মানবপ্রেমের ভাবহিল্লোল আকাশ ভরিয়া তুলিয়াছিল। তাহাই নানা কবির চিত্তে আঘাত পাইয়া কোথায় বা করুণায়, কোথাও বা বিদ্রোহের সুরে আপনাকে নানামূর্তিতে অজস্রভাবে প্রকাশ করিয়াছিল। অতএব কথাটা এই, মানুষের মন যেসকল বহুতর অব্যক্তভাবকে নিরন্তর উচ্ছ্বসিত করিয়া দিতেছে, যাহা অনবরত ক্ষণিক বেদনায়, ক্ষণিক ভাবনায়, ক্ষণিক কথায় বিশ্বমানবের সুবিশাল মনোলোকের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এক-একজন কবির কল্পনা, এক-একটি আকর্ষণ কেন্দ্রের মতো হইয়া তাহাদেরই মধ্যে এক-এক দলকে কল্পনাসূত্রে এক করিয়া মানুষের মনের কাছে স্পষ্ট করিয়া তোলে......।" মহাকবির এ-কথাটি যেন আমরা তলিয়ে ভাবি।

যে-শিল্পী বা মানুষ নিজেই যন্ত্রবৎ বা যান্ত্রিকতারই পূজারী, তার কোনো স্বেচ্ছা-নির্বাচন নেই, নিজের নির্বাচিত পথ নেই—একমাত্র বাইরের অবস্থান্তরের হিসেবের অদলবদলেই তারও অদলবদল। এ-শিল্পীকে, তাই, স্বাধীন বলতে পারি না, কারণ দায়বোধ না থাকলে স্বাধীনতা কিসের? তাই কোনো কাজ ও তার ফলাফলের জন্যে এমন ব্যক্তিকে দায়ী করাও নিরর্থক। তেমনি সমান সত্য হলো প্রকৃত সৃষ্টির স্বাধীনতা অসম্ভব যদি না শিল্পী তাঁর দায় সম্পর্কে পূর্ণভাবে আত্ম-সচেতন থাকতে পারেন। সৃষ্টিকর্মেও সেই ভাবাকাশকেই সমগ্রভাবে মেলে ধরার দায়ও তাই এই প্রকৃতভাবে স্বাধীন শিল্পীর কাঁধেই বিশেষ করে বর্তায়।

৫ই অকটোবর কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তুতি অধিবেশনের সেমিনারে পঠিত।

জাপানের সাহিত্য

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের পূর্বে জাপানে কোনো লিপি প্রচলিত ছিল না। জাপান প্রথমে চৈনিক লিপি পুরোপুরি গ্রহণ করেছিল। কয়েক শতাব্দী পরে চৈনিক চিত্রলিপি ও জাপানের প্রচলিত ভাষার সমন্বয়ে জাপানী লিখিত ভাষার জন্ম হয়। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে জাপানী লিপিপদ্ধতির সরলীকরণ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নতুন নতুন রচনার প্রেরণা দেয়। তারপর থেকে জাপান অবিচ্ছিন্ন সাধনার দ্বারা ভাষার উন্নতি এবং প্রকাশন শিল্পের প্রসার করে চলেছে। বর্তমানে প্রকাশন শিল্পে রাশিয়ার পরেই জাপানের স্থান। জাপান প্রতি বছর গড়ে চার হাজার লোকের জন্য একটি করে বই প্রকাশ করে। ভারত করে প্রায় তেইশ হাজার নাগরিকের জন্য একটি বই।

জাপানী সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন নারা যুগের (৭১০-৭৯৪)। একটি হলো গদ্যে রচিত **কোজিকি**; আর একটি **মানয়োশু**, কাব্য-সঙ্কলন। কোজিকি শিন্টোদের ধর্মগ্রন্থ। আমাদের পুরাণের মতো অনেক কাহিনী আছে। রাজা যে পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি তার সমর্থন আছে এই গ্রন্থে। চৈনিক সভ্যতার প্রভাব এই যুগের রচনায় সুস্পষ্ট। জাপানী পণ্ডিতরা প্রায় সকলেই লিখতেন চীনা ভাষায়। বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের উপর টীকাটিপ্পনী রচনাই ছিল তাঁদের প্রধান কাজ।

মানয়োশু কাব্য-সঙ্কলনে জাপানী কবিতার প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায়। উপন্যাসে জাপানী সাহিত্য যত সমৃদ্ধ, কবিতায় সেরূপ নয়। অথচ কবিতা জনসাধারণের নিকট বড় প্রিয়; সেখানে যে শুধু কবিরাই কবিতা রচনা করবেন, তা নয়। কবি না হলেও সেখানে কাব্যরচনা করবার রীতি আছে। সম্রাট থেকে আরম্ভ করে চাষী-মজুর সকলেই কবিতা লেখেন। জাপানী ছন্দ খুব সহজ। তঙ্কারীতির কবিতায় থাকে ৩১ সিলেবল, আর হাইকু মাত্র ১৭ সিলেবলের কবিতা। কবিতা এত ছোট বলে কোনো জটিল বিষয়ের অবতারণা সম্ভব হয় না। কবিতার বিষয় প্রধানত প্রেম ও প্রকৃতি।

সুতরাং দু-তিনটি বিষয়বস্তুর উপরে ছোট কবিতা রচনা করা কঠিন কাজ নয়। অবশ্য সত্যিকারের ভালো কবিতা লেখা প্রতিভাবান ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়—কবিতার আকার যা-ই হোক না কেন।

তিন-চার লাইনের জাপানী কবিতা সকল দেশের সমালোচকদের নিকটই সমাদর লাভ করেছে। সমাদর পেয়েছে তাদের সঙ্কেতময়তার জন্য। বিখ্যাত কবি বাশো-র (১৬৪৪-৯৪) একটি হাইকুর দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে :

মেঘের শিখর
ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল—
পর্বতের বুকে চাঁদের আলো।

আর একজন কবি, ওনিৎসুরা, লিখেছেন :

আজ আকাশে এমন চাঁদ !
এমন কোনো লোক আছে কি
যার হাতে কলম নেই !

মানয়োশু থেকে একটি তঙ্কার উদাহরণ দেওয়া হলো :

দুষ্ট লোকেরা আমাদের দূরে রেখেছে,
সরিয়ে দিয়েছে তোমাকে আমাকে ;
এসো, প্রিয়তম, এসো !
ওদের অনধিকার চর্চা যেন
স্বপ্নেও শোনোনি, এমনিভাবে এসো।

উপরে দুটি জাপানী কাব্যসঙ্কলনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আরও দুটি বিখ্যাত সঙ্কলন-গ্রন্থ **কোকিন-শিউ** (দশম শতাব্দী) এবং **হিয়াকু-নিন ইস্সু** (ত্রয়োদশ শতাব্দী) প্রাচীন জাপানী কবিতার আকরস্বরূপ।

পাশ্চাত্য প্রভাব জাপানের কথাসাহিত্যে রূপান্তর এনেছে। কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে তেমন কোনো বিপ্লব আসেনি। হাইকু কবিতার এখনো প্রাধান্য চলছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্রেষ্ঠ হাইকু কবি ছিলেন মাৎসুও বাশো ; পরবর্তী শতাব্দীর খ্যাতনামা হাইকু কবি কোবায়াসি ইস্সা। হাইকু এবং ৩১ সিলেবলে রচিত ওয়াকা রীতিতে জাপানী কবিরা এখনো কবিতা লিখছেন।

জাপানী নাটকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য বিদেশী সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জাপানে চারশ্রেণীর নাটক প্রচলিত আছে। নো, কাবুকি, পুতুল দিয়ে অভিনয় করানো পালা এবং পাশ্চাত্যের

প্রেরণায় রচিত নাটক। মুরোমাচি আমল (১৩৩৩-১৬০০) যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকলেও সমগ্র দেশে রাজনৈতিক ঐক্য এসেছিল ঐ সময়। এই সময়েই সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সূত্রপাত হয়। নো নাটক তার মধ্যে অন্যতম।

রাজসভায় নো নাটকের জন্ম। ধর্ম এর মূল কথা। নো-র রচনা-কৌশল একান্ত সহজ সর্বজনবোধ্য। শিল্পকলার সূক্ষ্ম দিকটার উপর জোর দেওয়া হতো না। নো নাটক গদ্যে-পদ্যে মিলিয়ে লেখা। পদ্যাংশ গান করা হয়; গদ্যাংশ করা হয় আবৃত্তি। পাত্র-পাত্রীরা অভিনয় করে কাঠের মুখোশ পরে। শিণ্টো ও বৌদ্ধ উৎসব উপলক্ষেই সাধারণত নো অভিনীত হতো। চতুর্দশ শতাব্দীতে নো নাটক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কানামি কিয়োৎসুগু এবং তাঁর পুত্র জিয়ামি মোতোকিয়ো ঐ শতকের দুজন বিশিষ্ট নো নাট্যকার।

নো নাটকের বিষয়বস্তু বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। সঙ্কেতময়তা নো নাটকের প্রধান ঐশ্বর্য। ইয়েটস এবং ইয়োরোপের আরও কয়েকজন লেখক এই কারণে নো-র প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নো এখনো জাপানে নিয়মিত অভিনীত হয়।

নো বুদ্ধিজীবীদের জন্য। সাধারণ দর্শকদের চাহিদা মেটাবার জন্য সপ্তদশ শতক নাগাদ কাবুকি নাটকের উদ্ভব হয়। কাবুকি নো নাটকেরই রূপান্তর—মান খানিকটা নিচু, সর্বসাধারণের উপযোগী করে লেখা। সাজপোশাকে অভিনয়ে প্রচার সোচ্চার হয়ে ওঠে। অনেকটা আমাদের পুরনো দিনের যাত্রার মতো।

আমাদের দেশেও পুতুলখেলা আছে। রামায়ণ মহাভারত কিংবা অন্য কোনো প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে পুতুলের পালা রচনা করা হয়। জাপানে কিন্তু পুতুলের নাটক একটি সুনির্দিষ্ট পৃথক শিল্পরীতি। এর জন্য পৃথক নাটক লেখা হয়। জাপানের প্রসিদ্ধ নাট্যকার চিকামাৎসু (১৬৫৩-১৭২৫) তাঁর সবগুলি নাটক লিখেছেন পুতুলের পালা হিসেবে। তিনি বাস্তব ও অবাস্তবের সুন্দর মিলন ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন; তাই তাঁর পুতুল-নাটকগুলি খুবই জনপ্রিয় হতে পেরেছিল।

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে জাপানী রঙ্গমঞ্চে পাশ্চাত্য প্রভাব দেখা যায়। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক অনুবাদ করা হয় জাপানী ভাষায়। তবে সমসাময়িক

জাপানী নাটকে ইবসেন ও স্ট্রীণ্ডবার্গের প্রভাব বিশেষরূপে লক্ষণীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইয়োরোপ-আমেরিকার সকল আধুনিক নাট্যকারই জাপানী নাটকের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন।

জাপানী সাহিত্যের সবচেয়ে সমৃদ্ধ শাখা উপন্যাস। আধুনিক জাপানী উপন্যাস বিশ্ব-সাহিত্যে গৌরবের স্থান অধিকার করেছে। এর সূত্রপাত হয় প্রায় হাজার বছর পূর্বে। **দি টেল অব গেন্‌জি** শুধু জাপানের নয়, পৃথিবীরও প্রথম উপন্যাস। অন্তত বর্তমানে উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি সেই অর্থে প্রথম। গেন্‌জির লেখিকা মুরাসাকি শিকিবু আনুমানিক ৯৭৮ থেকে ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। রাজপ্রাসাদের জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে মুরাসাকি তাঁর কাহিনী রচনা করেছেন। আড়াই হাজার পৃষ্ঠার বিরাট উপন্যাস চুয়ান্নটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এর মধ্যে একচল্লিশটি অধ্যায়ে রাজকুমার গেন্‌জির জীবন-কাহিনী বিবৃত করা হয়েছে ; বাকিগুলিতে আছে গেন্‌জির এক ছেলের কথা। মুরাসাকি অনেক অবান্তর কাহিনীর অবতারণা করেছেন, ছোটো ছোটো ঘটনাকে অনাবশ্যক টেনে বড় করেছেন ; কিন্তু সে-যুগে এটা নিন্দনীয় ছিল না। বরং সে-সময়কার মন্থর জীবনের পক্ষে এটা স্বাভাবিকই বলা যায়। জাপানের দশম শতাব্দীর অভিজাত সমাজের জীবন্ত ছবি এঁকেছেন লেখিকা। আর সেই ছবিতে কত বর্ণ কত রৌদ্র-ছায়ার খেলা! ১৯২৩ সালে এই উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ বেরুবার পর পৃথিবীর সর্বত্র সাড়া পড়ে গেল। এতদিন পূর্বে এমন উপন্যাস লেখা হতে পারে সে-ধারণাই কারো ছিল না। সমালোচকরা টেল অব গেন্‌জির তুলনা করলেন ডেকামেরন, ডন কুইকসট, গারগানটুয়া অ্যাণ্ড প্যাণ্টাগ্রুয়েল প্রভৃতির সঙ্গে। কেউ বললেন, মাসেল প্রুস্তের রচনা-রীতির সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে!

মুরাসাকির পরে যিনি শক্তিশালী ঔপন্যাসিক তিনি হলেন ইহারা সাইকাকু (১৬৪২-১৬৯৩)। হাইকু কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। **জীবন, প্রেমের সাধনা**—এই উপন্যাস লিখে তিনি কথাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর উপন্যাসে প্রেমের প্রাধান্য, যৌনতার রঙ বেশ চড়া।

জাপানী ঐতিহ্যের শেষ উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক বাকিন (১৭৬৭-১৮৪৮)। তাঁর কাহিনী দুর্বল। এই দুর্বলতার ক্ষতি তিনি পূরণ করতে চেয়েছেন কাব্যময় ভাষা প্রয়োগ করে। উপন্যাসের নামকরণেও এই কাব্যধর্মী বৈশিষ্ট্য

ধরা পড়ে। তাঁর একটি জনপ্রিয় উপন্যাসের নাম: **বর্ষা রাতের মেঘের ফাঁকে চাঁদের আলো।**

ফুতাবাতেই শিমেই (১৮৬৪-১৯০৯) প্রথম পাশ্চাত্য রীতির সূত্রপাত করেন তাঁর উপন্যাস **ড্রিফটিং ক্লাউড**-এ। কাহিনী ও ভাষার দিক থেকে এটি অভিনব। এর পূর্বে উপন্যাসের ভাষায় ছিল কৃত্রিমতা। দৈনন্দিন জীবনের ভাষার প্রতি ছিল অবজ্ঞা। শিমেই টুর্গেনিভের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষাকে উপন্যাসে প্রয়োগ করেছেন। নাৎসুমে সোসেকি (১৮৬৭-১৯১৬) ইয়োরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণে জাপানী কথাসাহিত্যে ন্যাচারালিজমের প্রবর্তন করেন। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে জাপানী লেখকরা যে সমাজের নানা সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ শিমাজাকি তোসনের **দি ব্রোকন কমাণ্ডমেণ্ট।** এক অস্পৃশ্য যুবকের সামাজিক নিপীড়নের কাহিনী এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। সর্বহারাদের জীবনের উপর আলোকপাত করেছে কোবায়াশি তাকাজির উপন্যাস **দি ক্র্যাব ক্যানিং বোট**-এ। এখানে লেখক সাম্যবাদ যেভাবে প্রচার করতে চেয়েছেন তা মোটেই শিল্পসম্মত হয়নি।

কাফু নাগাই (১৮৭৯-১৯৫৯) একালের একজন শক্তিশালী লেখক। তাঁর লেখা ইংরেজীতে বিশেষ অনুবাদ হয়নি বলে জাপানের বাইরে প্রায় অপরিচিত রয়ে গেছেন। তিনি জোলার মতোই অনেকটা বাস্তববাদী, কিন্তু রোমান্টিসিজমকে অস্বীকার করেননি। তাঁর রচনায় পুরনো ঐতিহ্যের প্রতীক গীশা, অভিনেতা-অভিনেত্রী, গায়ক-গায়িকার (— কালের পরিবর্তন যাদের শহরের কেন্দ্র থেকে ঠেলে দিয়েছে উপকণ্ঠে—) জীবন স্থান পেয়েছে। টোকিও শহরের বিভিন্ন অঞ্চল তাঁর উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

ওগাই মোরি আধুনিক উপন্যাসের একজন পথিকৃৎ। তাঁর **বুনো হাঁস** একটি ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী।

জুনিকিরো তানিজাকির **থিন স্নো** বর্তমান যুগের একটি বিশিষ্ট উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। অনেক জাপানী সমালোচক এই উপন্যাসটিকে তাঁদের সাহিত্যের মাস্টারপীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন। জীবনের বাস্তব ছবি ফুটিয়ে তোলাতেই লেখকের কৃতিত্ব। এক সচ্ছল জাপানী পরিবারের ১৯৩৬-৪১ সালের ইতিহাস এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার পরিসরে পারিবারিক ইতিহাসের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা হুবহু

ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বই পড়া শেষ করে পাঠকের মনে হবে যেন এই পরিবারের সঙ্গে কিছুকাল বাস করে এসেছি, পরিবারের লোকদের জীবনযাত্রা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছি।

তানিজাকির অন্যান্য জনপ্রিয় উপন্যাসের মধ্যে আছে **দি মাকিয়োকা সিস্টারস, দি কী** এবং **সাম প্রিফার নেটল্‌স্**। শেষোক্ত উপন্যাসটির বিষয়বস্তু একালের অসুখী দাম্পত্য জীবন। তাঁর পত্নীর সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘটনা কাহিনীর উপর ছায়া ফেলেছে।

সমারসেট মমের **অব হিউম্যান বণ্ডেজ**-এর ছায়া নিয়ে তানিজাকি লিখেছেন **এ ফুল্‌স্ লাভ**। তাঁর আর একটি কীর্তি হলো **দি টেল অব গেন্‌জি**-কে আধুনিক ভাষায় রূপান্তরিত করা।

তোয়োহিকো কাগাওয়া (১৮৮৮-১৯৬০) কবিতা, প্রবন্ধ ও উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে **এ গ্রেন অব হুইট** এবং **বিফোর দি ডন** উল্লেখযোগ্য। শেষের উপন্যাসটি আত্মজীবনীমূলক।

এইজি য়োশিকাওয়ার **দি হেইকে স্টোরি** বিক্রি হয়েছে দশ লক্ষ কপিরও বেশি। মধ্যযুগে হেইকে ও গেন্‌জি বংশের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী যে-যুদ্ধবিগ্রহ চলেছে, লেখক আধুনিক পাঠকের উপযোগী করে তা পরিবেশন করেছেন। য়োশিকাওয়ার নিজের জীবনও গল্পের মতোই বিচিত্র। সামান্য লেখা-পড়া শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন; জীবিকার্জনের জন্য মজুরের কাজ থেকে সব কিছুই করেছেন। শেষে হলেন সংবাদপত্রের রিপোর্টার। ১৯২৩ সালের ভূমিকম্পে সংবাদপত্রের আপিশ ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর থেকে তিনি লেখাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেন।

গল্প লেখক হিসেবে আকুতাগাওয়া বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করেছেন রশোমন ফিলমটির জন্য। ঐ নামের গল্পের উপর ভিত্তি করে রচিত ফিলমটি ভেনিসের আন্তর্জাতিক মেলায় গ্র্যাণ্ড প্রাইজ পেয়েছে। তাঁর গল্পে বাস্তব জীবনের কথা নেই। অপ্রাকৃত পরিবেশ নিয়ে তাঁর কাহিনী রচিত। গল্পের রস কম। ইঙ্গিতময়তা প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাস্তব জীবনকে লেখক নিজে বেশি দিন সহ্য করতে পারেননি। আত্মহত্যা করে এই জীবন থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

যুদ্ধ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য লেখকরা, বিশেষ করে জার্মানরা, যেমন সচেতন— জাপানী লেখকরা তেমন নন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড সংঘাত এবং

হিরোশিমার ধ্বংসস্তূপ জাপানী লেখকদের যে বিচলিত করেছে, তার প্রমাণ সাহিত্য থেকে তেমন পাওয়া যায় না। শুধু দুটি উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ থেকে আমরা জাপানী সাহিত্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাব দেখতে পাই।

যুদ্ধের সংঘাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে জাপানের অভিজাত শ্রেণীকে। বনেদি পরিবারগুলি ভেঙে পড়েছে। এমনি এক বনেদি পরিবারের ভাঙনের ছবি এঁকেছেন ওসামু দাজাই (১৯০৯-১৯৪৮) তাঁর **দি সেটিং সান**-এ। নায়িকা কাজুকো তাদের পরিবারের পতনের কথা বলছে। পতনের সূত্রপাত হলো বাবার মৃত্যুর পর। আশা ছিল, ছোট ভাই নাওজি জীবনে সাফল্য লাভ করে পরিবারের গৌরব বাড়াবে। কিন্তু তাকে যেতে হলো যুদ্ধে। যুদ্ধ শেষ হলেও নাওজি ফিরে এলো না। কাজুকো তার রুগ্ন মাকে নিয়ে চরম দুর্দশায় পড়ল। কিছুদিন পরে সংবাদ এলো নাওজি জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আত্মহত্যা করেছে। বনেদি পরিবারের বংশধারার সমাপ্তি হলো।

লেখক নিজেও জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

দ্বিতীয় উপন্যাসটির নাম **ফায়ারস অন দি প্লেন**। লেখক শোহেই উকা। উকা ফরাসী সাহিত্যের অধ্যাপক। তিনি যুদ্ধে যোগ দিয়ে আমেরিকানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন।

উপন্যাসের নায়ক তামুরা। জাপানী সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জে। নতুন অপরিচিত জায়গায় পা দিতেই ধরা পড়ল তামুরা যক্ষ্মারোগে ভুগছে। জাপানী বাহিনী প্রতিপক্ষের আক্রমণে উদ্‌ভ্রান্ত। তাই বাহিনীর নায়ক তামুরাকে শিবির থেকে বিদায় দিলেন। তামুরা তারপর থেকে বাঁচার তাগিদে কি ভাবে অচেনা শত্রু অধ্যুষিত দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে, তারই মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন লেখক। ক্ষুধার এমন নগ্ন চিত্র পৃথিবীর সাহিত্যে কমই আছে।

সমকালীন লেখকদের মধ্যে য়ুকিও মিশিমা জনপ্রিয়। তিনি উপন্যাস, কাবুকি নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদিও লিখেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—**দি সাউণ্ড অব ওয়েভস**, জেলে সমাজে প্রথম প্রেমের কাহিনী; **কনফেশানস অব এ মাস্ক**; **আফটার দি বাঙ্কোয়েট**; **দি টেম্পল অব দি গোল্ডেন প্যাভিলিয়ন**, ইত্যাদি।

সর্বপ্রথম একজন জাপানী লেখক নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৬৮

সালে। তিনি ঔপন্যাসিক ও গল্পকার ইয়াস্থনারি কাওয়াবাতা। এখন তাঁর বয়স সত্তর পার হয়েছে। জন্মের কিছুদিন পরেই কাওয়াবাতা মা-বাবাকে হারান। হয়তো সেই কারণেই তাঁর রচনায় নিঃসঙ্গতা ও মৃত্যুর প্রভাব বড় বেশি। শূন্যতা ও রাত্রি ফিরে ফিরে আসে। কখনো কখনো মনে হয় লেখক বড় নির্মম। অথচ পার্থিব জীবনের প্রতি কাওয়াবাতার নায়ক-নায়িকাদের যে আকর্ষণ নেই তা নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রেই যৌনতার আধিক্য নিয়ে অভিযোগ উঠতে পারে। কিন্তু এসব একান্তই বাহ্যিক। যেন মৃতদেহের আচ্ছাদনের ওপর শিল্পীর কারুকার্য। আচ্ছাদন সরালেই বেরিয়ে পড়বে মৃত্যুর বীভৎসতা। কাওয়াবাতা প্রেম আর মৃত্যুকে যুক্ত করে দেখেছেন।

প্রথম জীবনে কাওয়াবাতা ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু স্থির করেন কাব্যধর্মী উপন্যাস লিখে যুগান্তর আনতে হবে। এই সঙ্কল্পের ফল কাওয়াবাতার **দি ইজু ড্যান্সার**। এক তরুণ ছাত্র আর এক কিশোরী নর্তকীর কাহিনী। দুজনেই সরল ও নিষ্পাপ। ইজু উপদ্বীপের পটভূমিকায় কাব্যধর্মী গল্পটি বলেছেন লেখক।

বার্ডস অ্যাণ্ড বীস্ট-এর নায়ক মানুষের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পাখিদের সঙ্গী করল। তাদের যৌবন বার্ধক্য ও মৃত্যু সে প্রতিদিন লক্ষ্য করে। পাখি দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার পুরনো প্রণয়িনীর মুখ। সেই নর্তকী প্রণয়িনীও এই পাখির মতো যৌবন পার হয়ে বার্ধক্যে পৌঁছে যাবে। সে যেন দেখতে পাচ্ছে তার গলিত দেহ। কাহিনীর শেষে দেখা গেল নায়ক নর্তকীর নৃত্য দেখতে গেছে। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নৃত্যরতা প্রিয়তমা হারিয়ে গেল, ভেসে উঠল তার মৃতদেহ।

নোবেল কমিটি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন কাওয়াবাতার **স্নো কাণ্ট্রি** উপন্যাসটির কথা। পর্বতের চূড়া ঢাকা থাকে তুষারে। সেখানকার উষ্ণ প্রস্রবণের আকর্ষণে লোক আসে। এই পটভূমিকায় সুন্দরী গীসা তরুণীর সঙ্গে টোকিওর এক নাগরিকের উন্মত্তের মতো কাটানো কয়েক দিনের কাহিনী। কিন্তু গীসার কথায় নায়ক পর্বতচূড়ার স্বাস্থ্যনিবাস ত্যাগ করে ফিরে গেল টোকিওর কোলাহলে।

থাউজ্যাণ্ড ক্রেইনস বিড়ম্বিত প্রেমের কাহিনী। মধ্যবয়সী বিধবা

গভীরভাবে আকৃষ্ট হলো এক তরুণের প্রতি। এই তরুণের পরলোকগত পিতা ছিল তার যৌবনের প্রেমিক। যুবক কাছে এলেই সেই হারানো যৌবনের কথা মনে পড়ে যায়, মনে হয় বুঝি একে অবলম্বন করে ফিরে পাওয়া যাবে যৌবনের দিনগুলিকে। কিন্তু আশা সফল না হওয়ায় আত্মহত্যা করল সে। এবার যুবক আকৃষ্ট হলো বিধবার যুবতী কন্যার প্রতি। যুবতীর মুখের দিকে তাকালেই মনে পড়ে যায় প্রৌঢ়া রমণীর কথা, যে তাকে অবলম্বন করে নতুন জীবনের স্বাদ পেতে চেয়েছিল। কিন্তু তরুণী অকস্মাৎ কোথায় চলে গেল।

জাপানী সাহিত্যের ইতিহাস দীর্ঘকালের। ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করা চলে। পৃথিবীর দীর্ঘতম আদি উপন্যাস এবং ক্ষুদ্রতম কবিতা জাপানী ভাষায় রচিত হয়েছে! কবিতা ও নাটকের ক্ষেত্রে পুরনো রীতি ও ঐতিহ্য এখনো চলে আসছে সামান্য পরিবর্তিত হয়ে। পাশ্চাত্যের আদর্শে এবং সেখানকার বিখ্যাত নাট্যকারদের অনুকরণে কয়েকটি নাটক অবশ্য লেখা হয়েছে। তবে জাপানী নাটকের অভিনয় দেখে প্রায়ই মনে হয় নাট্যকারের চেয়ে অভিনেতা ও প্রয়োগকর্তা বড়। আধুনিক জাপানী সাহিত্যের সমৃদ্ধতম শাখা উপন্যাস।

জাপানী সাহিত্যে সমাজবোধ প্রবল নয়। গোষ্ঠীর চেয়ে ব্যষ্টি প্রধান। বাস্তবতা অপেক্ষা রোমান্টিকতার প্রতি বেশি ঝোঁক। বাস্তবতা যে নেই, তা নয়। অনেক লেখকই দক্ষতার সঙ্গে বাস্তব জীবনের ছবি উপস্থিত করেছেন। কিন্তু সে-সব ছবি বৃহত্তর সামাজিক পটভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। রোমান্টিকতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে একটা অনির্দেশ্য বেদনাবোধ আচ্ছন্ন করে রেখেছে জাপানী সাহিত্যকে, বিশেষ করে সমকালীন সাহিত্যকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকান সাহিত্য থেকে জাপানী লেখকরা একটি জিনিস গ্রহণ করেছেন। সেটা হলো নিঃসঙ্গতা। জাপানী উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের জীবনে নিঃসঙ্গতার প্রভাব যথেষ্ট।

শতবর্ষের আলোয় দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

*The Civil and Military Gazette*এ প্রকাশিত এক উদ্ধত পত্রে ভারতের স্বদেশপ্রেমিকেরা নির্দেশিত হলেন : "a handful of mis-educated malcontents who could and should be dealt with like ill-disciplined schoolboys." (Benarsidas Chaturbedi and Majorie Sykes : *Charles Freer Andrews*. London 1949)। এ-মতো উৎকট চিত্তবিক্ষেপের জবাব যিনি দিলেন, তিনি ভারতবাসী নন, তবে নিঃসন্দেহে তাঁর 'দ্বিতীয় স্বদেশ' ছিল ভারতবর্ষ। তিনি হলেন মহামতি চার্লস ফ্রিঅ্যর অ্যাণ্ড্রুজ। লর্ড কার্জনের বিধানে বঙ্গচ্ছেদ কার্যকরী হওয়ার পর বাঙলাদেশ তথা ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে যে-উচল উতরোল শুরু হয়েছিল, সেই পটভূমিকায় ভারতপ্রেমিক অ্যাণ্ড্রুজের প্রতিবাদপত্রের (সেপ্টেম্বর ১৯০৬) গুরুত্ব যে কি পরিমাণ—সে-সম্পর্কে সন্দেহের কোনোও অবকাশ নেই। প্রসঙ্গত বলা চলে, এই ঘটনার মাত্র তিন মাসের মধ্যে অ্যাণ্ড্রুজ সাহেব সমগ্র ভারতবর্ষের মহান নেতৃবর্গের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠেন। আর তারপর থেকে আমৃত্যু অ্যাণ্ড্রুজের চৈতন্য উৎসর্গিত হলো ভারতাত্মার মুক্তিসাধনে!

বসন্তের শুরুতে শীতের আমেজমাখা এক সকালে ইংলণ্ডের নিউক্যাসল-অন-টাইনের ধূসর রাস্তাগুলি পার হয়ে ওয়েস্টগেট জেলার একটি শ্রীহীন অফিসে পৌঁছে বলিষ্ঠ যুবা জন এড্রুইন অ্যাণ্ড্রুজ জানালেন—তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের সেই সুখবরটি। পঞ্জিকা-মতে সেদিন ছিল ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারি। অ্যাণ্ড্রুজ তাঁর মা মেরি শার্লটের সুদৃশ্য চোখ দুটির ওয়ারিসই হলেন না; তাঁর দ্বিতীয় নাম 'ফ্রিঅ্যর'-এ তাঁর মাতৃকুলের উত্তরাধিকার সুস্পষ্ট (তাঁর মায়ের মাতামহ ছিলেন স্টাউরব্রিজের উইলিয়ম লিক্রফট ফ্রিঅ্যর)।

ছ-বছর বয়সে চার্লিকে এক গুরুতর ব্যাধির শিকার হতে হয়। মা[illegible] প্রবল পরিচর্যায় পুত্রের প্রাণ রক্ষা পায় শেষাবধি। চার্লির চারিত্রিক

বৈশিষ্ট্যে তাঁর মায়ের প্রভাব প্রকটিত। পরবর্তীকালে আপন স্বভাবে মাতৃসুলভ মানসিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখেছিলেন (২৭ জানুআরি ১৯১৪): "My life seems only able to blossom into flower when I can pour out my affection upon others as my mother did upon me." চার্লির অসুস্থতার অল্পকাল পরেই অ্যাণ্ড্রুজ পরিবার নিউক্যাসল থেকে বারমিংহ্যামে বাসস্থান স্থানান্তরিত করলেন। ৬ কি হিল্ ড্রাইভের শান্ত কানাগলিতেই প্রথম চার্লির মধ্যে বহির্বিশ্ব সংক্রমিত হয়। তারপর পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কি হিল্ স্ট্রিট থেকে তাঁরা বাসস্থান পুনরায় পরিবর্তন করেন হ্যাণ্ডসওয়ার্থের সীমান্তবর্তী ১ সাউথ রোডে। চার্লি এখানে ডিকিনের পাঠশালায় ভর্তি হলেন। সর্বোপরি সহৃদয় পিতার সতত সাহচর্য তথা শিক্ষণ চার্লিকে যথার্থই প্রাণিত করে। একদা বাবার বইয়ের আলমারির পিছনে শস্তা কাগজে অযত্নে ছাপা ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাস ও কবিতার এক সম্পূর্ণ সেট আবিষ্কারে চার্লি উৎফুল্ল হলেন: "a golden store of wealth that could neither be diminished nor exhausted." আর তারপর শারীরিক স্বাস্থ্য কিঞ্চিৎ দৃঢ়তর হতে থাকলে স্নেহবৎসল পিতা তাঁর পুত্রকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলেন—সবুজ প্রান্তর থেকে নগরকেন্দ্রাভিমুখে; নিছক ভ্রমণই নয়, চার্লি তাঁর আদর্শ শিক্ষক পিতার মুখে শুনতে পেলেন ইতিহাস রাজনীতি ও ধর্মতত্ত্বের কথা। যদিচ চার্লির পিতার প্রবল প্রত্যয় ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমাহীন মহত্ত্বে; তৎসত্ত্বেও শুধুমাত্র সচিত্র *Deeds that won the Empire* গ্রন্থটি ছেলেকে পড়তে দিয়েই তিনি তাঁর দায়িত্ব চুকিয়ে ফেললেন না—ইতিহাসের রোমাঞ্চিত সব কাহিনী সমানে শুনিয়ে চললেন চার্লিকে যাতে ১৮৫৭-র ভারতীয় মহাবিদ্রোহের বিবরণীও বাদ পড়ল না! এইসব বৃত্তান্ত চার্লির চিন্তনকে উদ্দীপ্ত তথা উচ্চকিত করতে নিঃসন্দেহে সহায়ক হয়। একটি ঘটনা এইপ্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। একদিন বাড়ি ফিরে ব্যগ্রচিত্তে চার্লি তার মাকে জানায়: "I want a bit of rice to eat with my dinner everyday—please! You see, I'm going to India when I grow up, and father says everyone eats rice there."

১৮৮৫-র খ্রীস্টমাসে, পনেরো বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই, সুবিখ্যাত King Edward VI High School থেকে চার্লি *Classical III*-এ

প্রথম স্থান অধিকার করেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, এই সুপ্রাচীন বিদ্যালয়ের সুদক্ষ প্রধান-শিক্ষক রেভারেণ্ড এ. আর. ভ্যার্ডীর সংস্পর্শে এসে চার্লির শিক্ষাজীবন সম্ভাবিত হয়। বিদ্যালয়ের লোভনীয় পুরস্কারগুলি সহজেই চার্লি লাভ করতে সমর্থ হলেন। সর্বোপরি ১৮৮৯-এর Speech Day-তে তাঁর এক কনিষ্ঠ সহোদর গর্বভরে লক্ষ্য করেছিলেন—চার্লি বিদ্যালয়-কর্তৃবর্গকে অভ্যর্থনা জানালেন গ্রীক কবিতায়। আর নিছক বিদ্যাচর্চাই নয়, বিতর্কসভা থেকে নাট্যাভিনয় পর্যন্ত—বহুধাবিচিত্র অনুসন্ধিৎসায় অব্যাহত ছিল চার্লির মননচর্যা। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে স্কুল-জীবনের শেষপর্বে (term) সোফোক্লেসের 'ফিলোক্‌তেতেস্' নাটকের নৈঃসঙ্গ্য তথা মর্মন্তুদ চিত্রকে চার্লি এক আশ্চর্য নৈপুণ্যে মূর্ত করেছিলেন। তারপর Open Classical Scholarship-এ মনোনীত (মার্চ ১৮৯০) হয়ে চার্লি কেমব্রিজের পেমব্রুক কলেজে যোগদান করলেন। ডার্‍্যামের বিশপ ওয়েস্টকট এবং অক্সফোর্ডের তরুণ ভাবুক চার্লস গ্যর্-এর (যিনি হ্যারোতে একদা ওয়েস্টকটের ছাত্র ছিলেন) উপদেশে আস্থাবান হওয়ায় অ্যাণ্ড্রুজের মানসিক ভিত্তি দৃঢ়তর ও সুসংবদ্ধ হতে থাকে। অত্যাশ্চর্য আন্তরিকতায় অ্যাণ্ড্রুজ Christian Social Union-এর (কেমব্রিজ শাখা) কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, বলা বাহুল্য এজন্যে তাঁকে আদৌ কোনো মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতে হয়নি। ওয়েস্ট-কটের নিপীড়িত ও শোষিত শ্রমিকসংসক্তি সংক্রমিত হলো অ্যাণ্ড্রুজের চেতনায়। ক্যামডেন স্ট্রিটের বস্তি তথা কেমব্রিজের অসংখ্য আর্ত পরিবারের দুঃখদুর্দশার শরিক হলেন তিনি। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্ল্যাসিক্যাল ট্রাইপস্ প্রথম ভাগে অ্যাণ্ড্রুজ প্রথমশ্রেণীতে (অবশ্য তৃতীয় বিভাগে) উত্তীর্ণ হন। দু-বছর পরে (১৮৯৫) থিয়লজিক্যাল ট্রাইপস্ প্রথম ভাগেও তিনি কৃতিত্ব দেখান উপর্যুপরি। বিশ্ববিদ্যালয়গত সাফল্য সত্ত্বেও জীবনচর্যার বৈচিত্র্যে তাঁর ঔৎসুক্য ছিল অপার। অভিযানপ্রেমিক প্রাকস্নাতক ছাত্রদের সঙ্গে সমানে তিনি অনেক রাত্তির অবধি অধ্যাপক এডওয়ার্ড গ্র্যানভিল ব্রাউনের ঘরে (পেমব্রুকের আইভি কোর্টে) বসে তাঁর পারস্যভ্রমণ তথা ইসলামী ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা শুনতেন। পেমব্রুক কলেজ মিশনে কর্মরত থাকাকালীন কেম্‌ব্রিজের তিনটি কলেজের ফেলোশিপ প্রত্যাখ্যান করেন অ্যাণ্ড্রুজ! যদিও শেষাবধি তাঁকে ফিরে আসতে হয় কেমব্রিজে—পেমব্রুক কলেজের ফেলো নির্বাচিত হয়ে (নভেম্বর ১৮৯৯)।

কেমব্রিজে কিছুকাল কাটানোর পর অ্যাণ্ড্রুজের কৈশোরের স্বপ্ন সফল হলো। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০ মার্চ তিনি বোম্বাইয়ে এসে পৌঁছলেন। দিল্লীর সেণ্ট ষ্টিফেনজ কলেজে অ্যাণ্ড্রুজের অধ্যাপক হিসেবে যোগদানকালীন অধ্যক্ষ ছিলেন হিব্যর্ট ওয়েস্ত। কেমব্রিজে অ্যাণ্ড্রুজের সমসাময়িক হলেন এই হিব্যর্ট সাহেব। তৎসত্ত্বেও তিনি এখানে যে-মানুষটির ব্যক্তিত্বে বিমুগ্ধ হন তিনি স্বনামখ্যাত সুশীলকুমার রুদ্র (উক্ত কলেজের উপাধ্যক্ষ)। ওয়েস্টকট-এর পরম সুহৃৎ রুদ্রমশায়ের মানবিক বোধই অ্যাণ্ড্রুজকে আমৃত্যু তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বজায় রাখতে সাহায্য করে: "I owe to Susil Rudra what I owe to no one else in all the world," ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে (অধ্যক্ষপদ থেকে) রুদ্রমশায়ের অবসর গ্রহণের সময় সপ্রশংস প্রশস্তিতে অ্যাণ্ড্রুজ লেখেন, "a friendship which has made India from the first not a strange land but a familiar country।" পরবর্তীকালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি: "সেণ্ট ষ্টিফেনস কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গত সুশীলকুমার রুদ্র দীনবন্ধুর অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। উভয়ে যেন আধ্যাত্মিক অভিন্নহৃদয় ছিলেন। রুদ্র মহাশয়ের একটি নাতনীর যখন জন্ম হয়, তখন অ্যাণ্ড্রুজ আমাকে স্পর্দ্ধার সহিত লিখিয়াছিলেন, 'এখন আমিও ঠাকুরদাদা হয়েছি!'—কারণ তিনি বোধ হয় মনে করিতেন, আমার অনেকগুলি নাতনী আছে বলিয়া আমি অহঙ্কৃত।" (প্রবাসী। বৈশাখ ১৩৪৭)। রুদ্রমশায়ের প্রভাবই ভারতবর্ষ সম্পর্কে অ্যাণ্ড্রুজের অন্তর্দৃষ্টিলাভের সহায়ক হয়। অর্থবিজ্ঞানী রুদ্রমশায়ই তাঁর মনে এক স্থির প্রত্যয় জাগান যে ব্রিটিশ শাসনের দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে গোপালকৃষ্ণ গোখলের অভিযোগ: "a fearful impoverishment of the people" (সভাপতির অভিভাষণ: ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯০৫) সর্বত সত্য। সর্বোপরি অচিরে এক ইংরেজ সহকর্মীর উৎকট মনোভাবেই যেকালে তাঁর সঙ্গে অধ্যক্ষের বাঙলোয় রুদ্রমশায়ের অবস্থান অসম্ভব হয়ে ওঠে তখন তাঁর কাছে আমলাতন্ত্রের যথার্থ স্বরূপটি স্পষ্টতর হয়।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত Congress of the Universities of the Empire-এ যোগদান করার জন্যে অ্যাণ্ড্রুজ কেমব্রিজ থেকে রওনা হলেন। লণ্ডনে লেখক ও সাংবাদিক হেনরি উড নেভিনসনের (যিনি দিল্লীতে অ্যাণ্ড্রুজের অতিথি ছিলেন) মুখে উইলিয়ম রোটেনস্টাইনের

বাসস্থানে (হ্যামপষ্টিডে) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগমনের কথা শুনলেন। আর তারপর সেই রবিবারের ঐতিহাসিক সন্ধ্যায় উইলিয়ম ব্যটলর য়েটসের মুখে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ (ইংরেজি তরজমায়) এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সৌহৃদ্য অ্যাণ্ড্রুজকে নতুনতর এক চিন্তনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে এ-সম্পর্কে জানা যায়ঃ "তখন আমি লণ্ডনে ছিলুম। কলাবিশারদ রোটেনস্টাইনের বাড়িতে সেদিন ইংরেজ সাহিত্যিকদের ছিল নিমন্ত্রণ। কবি ইয়েট্স আমার গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ থেকে কয়েকটি কবিতা তাঁদের আবৃত্তি ক'রে শুনিয়েছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে এক কোণে ছিলেন এণ্ড্রুজ। পাঠ শেষ হ'লে আমি ফিরে যাচ্ছি আমার বাসায়। কাছেই ছিল সে-বাসা। হ্যাম্পস্টেড হীথের ঢালু মাঠ পেরিয়ে চলেছিলুম ধীরে ধীরে। সে-রাত্রি ছিল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। এণ্ড্রুজ আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন। নিস্তব্ধ রাত্রে তাঁর মন পূর্ণ ছিল গীতাঞ্জলির ভাবে। ঈশ্বরপ্রেমের পথে তাঁর মন এগিয়ে এসেছিল আমার প্রতি প্রেমে। এই মিলনের ধারা যে আমার জীবনের সঙ্গে এক হয়ে নানা গভীর আলাপে ও কর্মের নানা সহযোগিতায় তাঁর জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে চলবে সেদিন তা মনেও করতে পারি নি।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭)

১৯১২-র নভেম্বরে অ্যাণ্ড্রুজ দিল্লীতে ফিরে আসেন এবং শিক্ষাদানকেই মিশনারী কর্মকাণ্ডের মৌল উপকরণ ঠওরান : "My own hope lies more and more in education," এক চিঠিতে (২০ ডিসেম্বর ১৯১২) তিনি মার্কিন মুলুকে রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন, "My own missionary work would be impossible in any other sphere, but along this line I feel I can fulfil my highest Christian instincts and fulfil also the highest service to India।" উপর্যুক্ত পত্রের আর একটি মূল্যবান অংশ প্রণিধানযোগ্য : "My thoughts turn more and more to an India that shall be really independent. And yet one knows that this can hardly be at present. Only how to get out of this vicious circle of subjection leading to demoralisation (both of rulers and ruled) and demoralisation leading to further subjection ?"

ইতিমধ্যে মার্চ মাসের গোড়ার দিকে অ্যাণ্ড্রুজের শান্তিনিকেতন দর্শনের

প্রথম পর্ব চুকেছে। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ-সহোদর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখ গুণীজনেরা তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানান। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাণ্ড্রুজ শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিলেন। "সবল চারিত্রশক্তির গুণ এই যে কেবল ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসের দ্বারা সে আপনাকে নিঃশেষ করে না, সে আপনাকে সার্থক করে দুঃসাধ্য ত্যাগের দ্বারা। কখনো তিনি অর্থ সঞ্চয় করেন নি, তিনি ছিলেন অকিঞ্চন। কিন্তু কতবার এই আশ্রমের অভাব জেনে কোথা থেকে তিনি যে একে যথেষ্ট অর্থ দান করেছেন তা জানতেও পারি নি।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭)। যদিচ বিশ্বভারতীর এক ভূতপূর্ব ছাত্রের লেখা থেকে জানা যায়: "এণ্ড্রুজ এবং পিয়ার্সন যে সরকারী স্পাই বা গুপ্তচর নন এই বিশ্রী ধারণাকে মন থেকে মুছে ফেলতে আমাদের বেশ সময় নিয়েছিল। এই ধারণাকে অনেকদিন পর্যন্ত আমাদের অনেকের মধ্যে অল্প-বিস্তর থাকার জন্য, আমাদের অনেক রকম ভাল কাজের মধ্যে তাঁদের সহযোগিতাকে আমরা স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করতে পারিনি। ...অবশেষে মহাত্মা গান্ধী তাঁকে (এণ্ড্রুজকে) স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি অর্থাৎ এণ্ড্রুজ আমাদের যতটা আপন জন বলে মনে করেন প্রকৃত পক্ষে আমরা অনেকেই তাঁকে আপন জন বলে অন্তরে মেনে নিইনি।" (সুধাকান্ত রায়চৌধুরী: বিশ্বভারতী ও ৺ সি. এফ. এণ্ড্রুজ। সপ্তর্ষি, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯)

শান্তিনিকেতনের নির্দিষ্ট কোনো কাজে দীর্ঘকাল অ্যাণ্ড্রুজকে "বেঁধে রাখা অসম্ভব ছিল।" কেননা "নিখিল মানবসমাজের নিদারুণ যন্ত্রণার" বিরুদ্ধে ছিল তার আমরণ অভিযান। "দেখেছি তাঁর অশেষ করুণা এ-দেশের অন্ত্যজদের প্রতি ... তাদের কোনো দুঃখ বা অসম্মান যখনি তাঁকে আহ্বান করেছে তখনি নিজের অসুবিধা বা অস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না রেখে সকল কাজ ফেলে ছুটে গিয়েছেন তাদের মধ্যে।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ। প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭)। অবশ্য অ্যাণ্ড্রুজের অসামান্য আত্মোৎসর্গ আদৌ ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমারেখায় শান্ত হয়নি, সুদূর দক্ষিণআফ্রিকার "কাফ্রি অধিবাসীদের সম্বন্ধে"ও সমানে তাঁর উৎকণ্ঠা দেখা গেছে।

আর অ্যাণ্ড্রুজ ভারতবর্ষের সঙ্গে আপন নাড়ির যোগ অনুভব করে এদেশের মানুষকে যে-কালে পরম স্বজন ঠাওরালেন—সেই সন্ধিক্ষণটি যে কিরূপ সঙ্কটাপন্ন ছিল তা বলাই বাহুল্য। প্রচণ্ড রাষ্ট্রীয় উত্তেজনা ও সংঘাত সত্ত্বেও

আপন আত্মিক শক্তির জোরেই তিনি "এ-দেশীয়দের মধ্যে আপন সৌহৃদ্যের আসন" লাভে সমর্থ হন। "যখন মহাত্মাজী ও রবীন্দ্রনাথের কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হয়েছে তখন কত এদেশীয় লোক তো ছিলেন কেউ সেই ভেদকে মিটিয়ে দেবার কথাও মনে করেন নি, মহামতি এণ্ড্রুজ সাহেবের তখন দিবারাত্রি চেষ্টা ছিল কিসে এই দুইজন মহাপুরুষের ভেদ মেটে। সবারমতি ও শান্তিনিকেতনের মধ্যে তিনি ছিলেন নিত্যযোগসেতু।" (ক্ষিতিমোহন সেন : মহামতি এণ্ড্রুজ। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭)

ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের নানাবিধ দুঃখ-দুর্দশা সাধ্যমতো প্রাণপণে মেটাতে চেষ্টা করেছেন অ্যাণ্ড্রুজ। আপন অস্তিত্বকে তিলে তিলে তিনি বিলিয়ে দিলেন মানবকল্যাণে। মৃত্যুর মাত্র মাসকয়েক আগেও ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা তাঁর লেখায় সমানে উচ্চারিত : "Every year that now passes in India, without the removal of the foreign yoke, is undoubtedly an evil. It is likely to undo any benefit that may have been derived before. This was my main thesis in a series of articles which I wrote in 1921, called, 'The Immediate Need of Independence,' where I emphasised the word 'immediate' ; and I hold fast to every word which I then wrote. Nearly twenty years have passed since that date and hope deferred has made the heart sick. Things in India *have* deteriorated, as Prof Seely prophesied, and the evil is rapidly increasing. This agony of Subjection is eating like iron into the soul, and the strain must be relieved at once." (*The Modern Review*, February 1940)

কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেনর‍্যাল হাসপাতালে দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচারের পর অ্যাণ্ড্রুজ আর চেতনা ফিরে পেলেন না। তারপর ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ এপ্রিল শুক্রবার ব্রাহ্মমুহূর্তে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের মেহনতী মানুষের সঙ্গে দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজের এতকালের স্বাস্থ্যপ্রদ সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গেল !

পরিশেষে তাই পূর্ণ মনুষ্যত্বের যথার্থ সংজ্ঞা কি সেই জটিল তত্ত্বের চুলচেরা বিচারে কালক্ষেপ না করে একাধারে পরম হৃদয়বান ও প্রতিভাবান এই মানুষটির স্মৃতির প্রতি আমাদের সানুরাগ শ্রদ্ধা জানাই। কার্যত কিকেরো কথিত সেই স্মরণই আমাদের অবধেয় যা সমস্ত বস্তুর শুভসাধক, অমূল্য অবলম্বন : *Memoria est thesaurus omnium rerum et custos*

রক্ত

সুবিমল মিশ্র

ডোবার ধার দিয়ে যে-অব্যবহৃত পথরেখাটি বেঁকেছে—সেখানে আসস্যাওড়ার জঙ্গল, সে-জঙ্গল বাড়ির বারান্দা পর্যন্ত বিস্তৃত, সমস্ত অঞ্চলটায় ইতস্তত পুরনো ইট দালানের ভাঙা থাম ও তার অংশ ছড়ানো, যা দেখলে বাড়িটিকে অতি সহজে পোড়ো বাড়ি বলে মনে হয় এবং তাই পারতপক্ষে লোকে সাপখোপ আর এই ধরনের নানারকম উপদ্রবের ভয়ে এ-অঞ্চলে পা দেয় না। সঞ্জয়দা বললেন 'এই ধরনের পরিবেশ আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে, নয়তো যে-কোনো সময় লোকজন আমাদের দেখে ফেলত, আর তাহলে দলের কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়াও মোটেই সহজ হতো না।' সঞ্জয়দা পা ছড়িয়ে বসে সিগারেট ধরিয়েছেন। নৃপেন রাজিব দেয়ালে পিঠ, মাথা সামনের দিকে ঈষৎ হেলানো, বসে আছে। রবিনকে এখনো উত্তেজিত দেখাচ্ছে, শিরদাঁড়া সোজা, বুকের ওপর হাতদুটো আড়াআড়ি রেখে পায়চারি করছে। ঘরের ভেতর মোম জ্বলছে। সঞ্জয়দা সিগারেটে দুটো টান দিয়ে ঘাড় কাত করে রবিনকে দেখলেন, তারপর বললেন 'রবিন, তোমাকে এখনো বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছে, ওটা ভালো না এই সব কাজে।' রবিন এই কথায় ক্ষণমাত্র থমকে দাঁড়িয়ে আবার পায়চারি শুরু করল, কিছু একটা বলবে ভেবেও বলল না। তারপর একপাক ঘুরে এসে স্বপ্নের মতো স্বরে বলল 'লোকটা পড়ে গিয়ে দু-হাতে মাটি আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছিল।' সঞ্জয়দা সিগারেটে আরো দুটো টান দিলেন। অদূরে আসস্যাওড়ার জঙ্গলের ধারে শেয়াল ডাকল। শব্দ থেমে গেলে সমস্ত চুপচাপ। রবিন পায়চারি করছিল, কেবল সেই শব্দ। সমস্ত নিস্তব্ধতার ভেতর সেই শব্দ বাজছিল, হৃৎপিণ্ড চারটিতে বাজছিল। রবিন বাঁহাত দিয়ে মাথার চুলগুলো মুঠো করে ধরল। তারপর ছেড়ে দিল। তারপর আবার ধরল, ছেড়ে দিল। তার মুখ দিয়ে আবার সেই স্বপ্নের মতো স্বর বেরুল 'লোকটা কিন্তু পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তেও আমার উদ্দেশ্যটা ধরতে পারেনি।' সঞ্জয়দার মুখ নিচু, নতুন করে সিগারেট ধরাচ্ছিলেন, মুখ তুললেন না।

দেশলাইয়ের কাঠির ক্ষণিক আলোকে তাঁর মুখ লালচে দেখাল। আবার নিস্তব্ধতা। আবার পায়চারির শব্দ। সেই শব্দ চারটে হৃৎপিণ্ডের ভেতর গিয়ে থপথপ করে বাজছিল। মোমটা পুড়ে শেষ হয়ে এসেছে, সঞ্জয়দা একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে দেখলেন। এরপর অন্ধকারেই বসে থাকতে হবে—চিন্তিত হলেন। একসময় নৃপেনের শরীর নড়ল, ঘাড়ে গুঁজে রাখা মাথাটা উঁচু হলো, দেখল মোম পুড়ে যাচ্ছে, তার ধোঁয়া কিছুটা উপরে উঠে অন্ধকারের সঙ্গে একাকার হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে তার মনে হলো—এখন সময় কত? সে সঞ্জয়দার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে মারল 'এখন সময় কত সঞ্জয়দা?' সঞ্জয়দা একটু কাশলেন, গলা পরিষ্কার করলেন 'বারোটা বেজে গেছে মনে হয়।' 'কিন্তু লাস্ট ট্রেন যায়নি!' 'তাহলে এখনো যায়নি মনে হয়।' আবার সবাই চুপচাপ। বলার মতো কথা ফুরিয়ে যাওয়ার মতো। মোমটার শেষাংশ জ্বলছিল। ধোঁয়া উঠছিল। রবিন পায়চারি করছিল। শব্দ উঠছিল। নৃপেন এইসব দেখল, শুনল। শুনে স্বাভাবিক হবার, কথা বলার চেষ্টা করছিল। 'বারোটার ভেতরই তো আসার কথা।' 'সেই তো শুনেছিলাম।' 'তবু আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।' 'আচ্ছা, কলকাতা থেকে আসছেন?' 'ঠিক জানি না।' 'এখানে আসবেন?' 'আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে।' নৃপেন চুপ করে গেল, আবার ঘাড়ে মাথা গুঁজে ফেলল, ফেলার আগে মোমটা জ্বলছে, তার মাথায় ধোঁয়া, সেই ধোঁয়া অন্ধকারে মিশছে দেখে নিল। সঞ্জয়দা সিগারেটের শেষটা ঘরের কোণায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অন্ধকারের ভেতর আগুনের লাল দেখা যেতে লাগল। সঞ্জয়দা তাকিয়ে থাকলেন। সেই লাল একসময় নিভলে সেই ফুটকি মতন জায়গাটা অন্ধকারে ভরে গেল দেখলেন। মোম দেখলেন। মোমের শিখা লাল নয় সাদাটে ভাবলেন। এই আলো আর বেশিক্ষণ ধরে রাখা যাবে না ভাবলেন। ভেবে ওদের দিকে তাকালেন। রবিন পায়চারি করে যাচ্ছে। রবিন সবচেয়ে ছেলেমানুষ। প্রথম দায়িত্বটা ভালোভাবেই করেছে, তবুও ছেলেমানুষ। ওকে এইভাবে চুপচাপ থাকতে দেওয়া অস্বস্তিকর। তিনি ওর মুখ দেখার চেষ্টা করলেন, দেখা যায় না, গেলেও চেনা যায় না, গেলেও ঠিকঠিক ধরা যায় না। তিনি কথা বলবেন ঠিক করলেন, বললেন 'রবিন কি ভাবছ?' রবিন পায়চারি একটু শ্লথ করল, সঞ্জয়দার মুখের দিকে দেখল, বলল 'সঞ্জয়দা একটা জিনিস দেবেন?' 'কি?' 'একটা চার্মিনার।' 'তুমি তো সিগারেট

খেতে না।' 'এখন খেতে ইচ্ছে করছে।' সঞ্জয়দা প্যাকেট থেকে বার করে দিলেন, নিজে নিলেন, তারপর আগুন জ্বালালেন। রবিন অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে টানতে গিয়ে কেশে ফেলল। 'চার্মিনার খুব কড়া সিগারেট, সকলে খেতে পারে না।' রবিন কিছু বলল না। আবার টান দিল। আবার কাশল। কাশতে কাশতে মোমের দিকে দেখল। 'সঞ্জয়দা, মোমটা তো পুড়ে এল, তারপর?' 'তারপর অন্ধকার।' 'আমাদের এইভাবে অপেক্ষা করতে হবে?' 'তাই বলা হয়েছে।' 'সঞ্জয়দা, আমি ভয়ানক ক্লান্ত।' রবিন বলার সময় সিগারেটটা ঘরের কোণায় ছুঁড়ে দিল। মাথার চুল মুঠি করে ধরল। সঞ্জয়দা কিছু বললেন না। সিগারেটে টান দিলেন। 'সঞ্জয়দা, ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে।' সঞ্জয়দা সিগারেটে একটা বড় টান দিলেন। 'সঞ্জয়দা, সমস্তটা অন্ধকারে ভরে যাবে একসময়।' সঞ্জয়দা এবার মুখ তুললেন। 'প্রথম প্রথম এরকম মনে হয়, ও কিছু না।' সঞ্জয়দা আর কিছু বললেন না। রবিন পায়চারি বন্ধ করে দিয়েছে, দিয়ে মোমের শিখার দিকে তাকিয়ে আছে। সব নিস্তব্ধ এখন। নৃপেন রাজিব মাথা গুঁজে আছে। সঞ্জয়দা সিগারেট ফেলে দিয়েছেন। এই নির্জনতায় রবিন আলোকশিখার ভেতরে দেখছিল। দেখতে দেখতে সে এক গ্রামের ছেলেকে নদীর ধারে জঙ্গলে গুলতি দিয়ে পাখি মারতে দেখল। বলল 'লোকটার বুক ফুটো হয়ে গেছিল, হু হু করে রক্ত বেরিয়ে জামাটা আর নিচের হৃৎপিণ্ডটা ভিজিয়ে দিচ্ছিল। আমি এক মুহূর্তের জন্য, ছুটে পালিয়ে আসার আগের মুহূর্তে, দেখেছি।' সঞ্জয়দার ছায়া দেয়ালে পড়ে আছে, কুঁজো হয়ে থাকা দুটো মানুষের ছায়া তাদের দেহের সঙ্গে লেপটে আছে। মোম জ্বলছে, রবিন সেই আলোর ভেতর তাকিয়ে আছে। 'জানেন সঞ্জয়দা, ছোটবেলায় আমি কবি হতে চেয়েছিলাম।' রবিন থামে, তারপর 'কবি হওয়া আমার হয়নি।' সঞ্জয়দা নড়লেন, জামার পকেটে হাত ঢোকালেন, প্যাকেট বার করে সিগারেট নিলেন, ধরালেন, তারপর ধোঁয়া ছাড়লেন আর বললেন 'তুমি এখনো বড়ো সেন্টিমেন্টাল।' রবিন সঙ্গে সঙ্গে বলল 'মোটেই না। তা হলে মানুষ মেরে আসতে পারতাম না।' 'তার জন্য আমি তারিফ করছি। কিন্তু তুমি সেন্টিমেন্টাল।' 'কবিতা লিখতাম বলে?' 'তাও বটে।' 'ওই বয়েসে তো বাঙলাদেশের সব ছেলেই কবিতা লেখার কথা ভাবে।' 'না—সবছেলে না, আমি ভাবিনি।' 'আপনি একসেপশান সঞ্জয়দা।' সঞ্জয়দা উত্তরে কিছু না

বলে সিগারেটে টান দিলেন এবং ধোঁয়া ছাড়লেন। আবার সব চুপচাপ। এবার মোমের শিখাটা শেষবারের মতো দপদপ করে উঠল আর নিভে গেল। সবাই, সেই চারজন, আলো মরে যেতে দেখল। নৃপেন একটু নড়েচড়ে বলল 'এবার অন্ধকার হয়ে গেল। এখানে আমাদের থাকতে হবে।' সঙ্গে কেউ কোনো কথা যোগ করল না। খুব কাছেই আবার শেয়াল ডাকল। নৃপেন ভাববার চেষ্টা করল রাত কত হবে। ভাববার চেষ্টা করল রাতের শেষ ট্রেন নিশ্চয় চলে গেছে, আমরা শুনতে পাইনি। ভাববার চেষ্টা করল এই নির্জন পোড়ো বাড়ি, জনমানবহীন, এখানে কোনো শব্দই এসে পৌঁছবে না। সে কোনো শব্দ না-ভাববার চেষ্টা করল। এখানে, এমনিভাবে, এই অন্ধকারে, আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। যতক্ষণ না তিনি আসেন। হয়তো সারা রাত্তির। হয়তো সকাল পর্যন্ত। হয়তো অনন্তকাল। তিনি আসবেন, অথচ তিনি কোথা থেকে আসবেন আমাদের জানানো হয়নি। তিনি কি করবেন আমাদের জানানো হয়নি। একটা জিনিস তিনি আমাদের দিয়ে যাবেন, খুব জরুরি জিনিস, সেটি নিয়ে আমাদের যথাস্থানে পৌঁছে দিতে হবে। আর রবিন তাঁর সঙ্গে চলে যাবে। এখন রবিনের পক্ষে এ-অঞ্চলে থাকা নিরাপদ নয়। নৃপেন অন্ধকারে বুকের ওপর হাত রাখল। রেখে আবার নামিয়ে নিল। রাজিব নড়েনড়ে উঠছে। বলল 'বড় মশা। একটু ঘুমুতে দিচ্চে না।' রাজিব দুহাতে তালি দিয়ে মশা মারল, তার শব্দ হলো। বলল 'মেরেছি।' রবিন অন্ধকারের ভেতর থেকে বলে উঠল 'ঠিক?' রাজিব 'নিশ্চয়ই, আমার টিপ ফসকায় না।' রবিন 'সঞ্জয়দা, দেশলাইটা দিন তো, রাজিবের হাতে মশার রক্তের ছোপটা দেখব।' রাজিব 'মশার রক্ত নয়।' রবিন 'কার?' রাজিব 'তোমার রক্ত। মশারা খেয়ে গেছে।' রবিন (সেই স্বপ্নের মতো স্বরে) 'সত্যিই আমাদের রক্ত।' সঞ্জয়দা কথা আরম্ভ করলেন 'তুমি বড় সেন্টিমেণ্টাল কথা বলছ রবিন।' রবিন প্রতিবাদ করল 'মোটেই না। আমার অনেক সাহস আছে।'

এরপর আর কেউ কিছু বলছিল না। অন্ধকারের ভেতর সেই চারটি প্রাণী বসে থাকতে লাগল। ভাবতে লাগল। অন্ধকারে মশারা বাড়ছিল। মশাদের ওড়ার শব্দ। নিশ্চুপে বসে থাকার শব্দ। নৃপেন নিজের হৃৎপিণ্ডের ওপর হাত রাখল। রাজিব আবার মশা মারল। কিছুতে একটু ঘুমুতে

দিলে না। আর এই অন্ধকার। অন্ধকার হলেই মশা হয়। আর মশারা বড় জ্বালায়। 'এই অবস্থায় তোমার ঘুম আসছে' নৃপেন বলে। 'কেন, ঘুমোবার পক্ষে তো অন্ধকার প্রশস্ত' রাজিব বলে। আবার সব চুপচাপ। নৃপেন আর থাকতে পারছে না 'রাত এখন কত হবে সঞ্জয়দা?' 'যতই হোক, আমাদের এইভাবে এইখানে অপেক্ষা করতে হবে।' রবিন হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর থেকে বলল 'লোকটা যখন মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল ওর বুক থেকে এক থাবলা রক্ত তুলে নিয়ে দেখি, পরীক্ষা করি—মানুষের রক্ত কিরকম, কেমন তার গন্ধ।' 'তাহলে তুমি মরতে—নির্ঘাত ধরা পড়তে—' রাজিব বলল। সঞ্জয়দা নৃপেন কিছু বলল না। কিছুক্ষণ চুপচাপ। বুকের শব্দ মশার শব্দ। সত্যিই তারা অন্ধকারেরও একরকম শব্দ শুনছিল। শুনতে শুনতে হাঁফিয়ে উঠছিল। কিছু কথা বলা দরকার। এই কথার শব্দ এখন তাদের কাছে বড় স্বস্তিকর। এই সময় তারা তাদের চারদিকে কিছু যেন উড়ে বেড়াতে শুনতে পেল। চামচিকে। সেই শব্দ সারা ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। রাজিব বলল 'এদিকে মশা ওদিকে চামচিকে। উপায় থাকলে সব কটাকে মেরে ফেলতাম।' 'মেরে কি করবে, চামচিকের গায়ে রক্ত নেই'—নৃপেন। রবিন আগ্রহ নিয়ে বলল 'সত্যি নাকি সঞ্জয়দা? চামচিকের গায়ে রক্ত নেই?' সঞ্জয়দার স্বরে বিরক্তি বেরুল 'আমি জানি না।' আবার সবাই চুপ হয়ে গেল। কেবল চামচিকে ওড়ার শব্দ, কেবল নিজের নিজের ফুসফুসের শব্দ। তার ভেতর একসময় সবাই শুনল সেই স্বপ্নের মতো স্বরে রবিন বলছে 'আমি কিন্তু জানি চামচিকের রক্ত আছে। কারণ রক্ত না থাকলে কোনো প্রাণী বাঁচে না।' সেই সময় শেয়াল ডাকল আবার। রাজিব মশা মারল। অস্পষ্ট শব্দে গজগজ করতে থাকল। সঞ্জয়দা খস করে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালেন, সকলে সেই মুহূর্তে আলো দেখল। মুহূর্তের আলোতে সঞ্জয়দা দেখলেন রবিন বড উসখুস করছে, তিনি চিন্তা করলেন করতে থাকলেন। রাত নিশ্চয়ই তিনটে বেজে গেছে। এখনো তিনি, যাঁর আসার কথা, এলেন না। রবিনকে নিয়ে এখন কি করা যায় ভাবতে লাগলেন। সিগারেটের লালচে শিখার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হলো রবিনকে কিছুটা প্রবোধ দেওয়া দরকার। তিনি প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট বার করলেন, আর একটু ভেবে নিলেন, তারপর আরম্ভ করলেন 'রবিন, আর

একটা সিগারেট খাবে ?' রবিন প্রথমে অস্পষ্টভাবে না বলল, তারপর বলল 'হাঁ দিন।' সঞ্জয়দা যত্ন করে তার মুখে আগুন ধরিয়ে দিলেন 'ধীরে ধীরে টানো, তেতো লাগলেও খারাপ লাগবে না।' রবিন টানতে লাগল, সঞ্জয়দা অন্ধকারেই তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর ধীরে ধীরে শুরু করলেন 'এক-আধটা মানুষ মারার কথা, ছোটোখাটো সেন্টিমেন্টের কথা, আমাদের এখন ভাবলে চলবে না। চিন্তা করে দেখো তো সারা পৃথিবীর অবস্থাটা কি—।' সঞ্জয়দা থামলেন, দেখলেন রবিন জোরে জোরে দুবার সিগারেটে টান দিল। তিনি স্থিরভাবে কথা চালিয়ে যাবেন মনস্থ করলেন, কিন্তু তাঁর কথা শুরু হওয়ার আগেই রবিন বলতে লাগল 'তোমার সেই গানটা জানা আছে সঞ্জয়দা, চমৎকার সুর সেই গানটার—একবার বিদায় দে মা ফিরে আ-া-া সি। তার পরের লাইনটা কি সঞ্জয়দা ?' সঞ্জয়দা বাধা পাওয়াতে সম্ভবত কিছু বিরক্ত হলেন, তারপর বললেন 'আমি ঠিক জানি না।' 'হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী—বোধহয় এই লাইনটা। আচ্ছা সঞ্জয়দা ? তখন মানুষ ক্ষুদিরামকে যে-চোখে দেখত, এখনকার মানুষ কি আমাদের সেই চোখে দেখে ?' সঞ্জয়দা বিরক্ত হচ্ছিলেন, তিনি জোরে জোরে সিগারেট টানলেন। রবিন সিগারেট ফেলে দিয়েছে। চামচিকে উড়ছে। মশা উড়ছে। কান পাতলে অন্ধকারের শব্দও আছে। এই নির্জনতা বড় বিরক্তিকর। অস্বস্তিকর। সবাই বুক দিয়ে তা বুঝছিল। অনুভব করছিল। কিন্তু কোথাও যাওয়ার নেই। কিছু করার নেই। তিনি আসবেন, শুধু তাঁর জন্য অপেক্ষা। সারারাত ধরে। সমস্তক্ষণ ধরে। হয়তো অনন্তকাল ধরে। রবিন অন্ধকারে গুনগুন করে গাইল 'হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে জগৎবাসী', পরে শুদ্ধ করে নিল, 'ভারতবাসী।' রাজিব আবার ছটফট করল 'এই অন্ধকারে তোমার গান বেরোয় রবিন ?' 'তোমার তো বেশ ঘুম হচ্ছে।' 'হচ্ছে আর কোথায়। মশা।' 'আর চামচিকে—' রবিন বলল। তারপর সেই স্বপ্নের মতো স্বরে যোগ করল 'এই মশা আর চামচিকে যদি একযোগে আমাদের ঘিরে ফেলে তাহলে আর আমরা বেরুতে পারব না। আমাদের রক্ত শুষে খেয়ে একদম ঠাণ্ডা করে দেবে।' 'তা যা বলেছ, মশারা চামচিকেরা বড় ভয়ানক জীব এই অন্ধকারে। আমাদের সব কটার রক্ত অনায়াসে শুষে নিতে পারে।' আর কেউ কিছু বলল না। সঞ্জয়দার সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল, ফেলে দিয়েছেন। রবিন আর গান গাইছে না। দুটো হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজে

বসে আছে। দেখছে—সেই ছেলেটা তার কবিতার খাতার এক-একটা পাতা ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে। জলে স্বল্প ঢেউ, সেই ঢেউতে পাতাগুলো এলোমেলো, দূরে ভেসে গেল। ছেলেটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল সেই সময়। নৃপেন আবার উসখুস করছে। অন্ধকারের ভেতর বলল 'রাত্তির বোধহয় আর বেশি নেই সঞ্জয়দা।' সঞ্জয়দা কিছু বললেন না। উৎসাহ, উত্তর না পেয়ে নৃপেন চুপ করে গেল। আবার স্তব্ধতা গড়িয়ে যাচ্ছিল সেই ঘরে। কেবল মশার শব্দ, চামচিকের শব্দ, অন্ধকারের শব্দ। সেই শব্দগুলো বুকে বুকে বেজে গেল। প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষা প্রতিটি বুকে ঘণ্টা বাজায়। বসে থাকতে থাকতে সেই চারজন সেই নির্জন ঘণ্টাধ্বনি শোনে। শুনতে শুনতে নিজের মধ্যে ডুবে যায়। সঞ্জয়দা ভাবে আমাকে এভাবেই বসে থাকতে হবে। পার্টির নির্দেশ আমি অমান্য করতে পারি না। অনন্তকালের জন্য হলেও আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ধৈর্য হারালে চলবে না। তিনি নতুন করে আবার সিগারেট ধরান। গুনে দেখার চেষ্টা করেন আর কয়টা বাকি রইল। আর কতক্ষণ থাকবে। দেশলাই জ্বালান সঞ্জয়দা, অন্ধকারের বুকে আলোর শব্দ হয়, জ্যোতি ছড়ায়, তারপর আবার সেই অন্ধকার। প্রতীক্ষা, অন্ধকার। বাইরে আবার শেয়াল ডাকে। বুনো পাখির পাখা ঝাপটানির শব্দ হয়। নৃপেন ভাবে আর কতকাল এই অপেক্ষা, আর কতকালের জন্য আমাদের এভাবে বসে থাকতে হবে। নিশ্চল হয়ে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। নিশ্চয়ই সকাল হয়ে আসছে। এবার পাখি ডাকবে। বাইরে গেলে হয়তো দেখা যাবে পূবদিক ফর্সা হয়ে এসেছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। তিনি বোধহয় আর এলেন না। অথচ তাঁর আসার কথা ছিল। না হলে এই এত সময় ধরে নির্বোধের মতো প্রতীক্ষা করার কোনো মানে হয় না। একবার বুকে হাত দেয় নৃপেন, একবার গালে হাত দেয়, একবার মাথা গুঁজে বসে ঘরের মধ্যে। এই প্রতীক্ষা বড় অস্বস্তিকর, বড় একঘেয়ে। নৃপেন ভাবতে ভাবতে একসময় আর কিছু ভাবতে পারে না। বলে 'সঞ্জয়দা, একবার বাইরে থেকে ঘুরে আসব?' 'সেটা আমাদের পক্ষে খুব নিরাপদ নয়'—সঞ্জয়দা বলেন। রাজিব আবার মশা মারে। ভাবে আমার হাতটা মশার রক্তে লাল হয়ে গেছে বোধহয়। অন্ধকারে রক্তের রঙ কালোই দেখাবে। হাত দুটো নাকের কাছে নিয়ে মশার গন্ধ, রক্তের গন্ধ শুঁকে দেখার চেষ্টা করে। ওরা তো বলেছে রক্তটা মশার নয় আমাদের। রাজিব ভাবে—আমি যে রক্তের গন্ধ নিচ্ছি, তা আমার শরীরের রক্তও হতে

পারে। রাজিব তখন বিরক্ত হয় 'ধ্যুৎ, এভাবে অনন্তকাল অপেক্ষা করার কোনো মানে হয় না।' সারারাত কেটে গেল, তিনি এলেন না। অথচ আমরা অপেক্ষা করে আছি। রাজিব ভেবে যায়। এর থেকে ঘুমোলে ভালো হতো। কিন্তু মশাদের জ্বালায় কি ঘুমোবার জো আছে। রবিন তেমনি হাঁটু মুড়ে মাথা তার মধ্যে গুঁজে রেখে বসে থাকতে থাকতে সেই ছেলেটিকে গুলতি নিয়ে পাখি মারতে দেখতে পায়। ছেলেটা পাখি খুঁজতে খুঁজতে গুলতি হাতে নদীর পাড়ে চলে গিয়েছে। মাথা থেকে একটা যন্ত্রণা উঠে ধীরে ধীরে তার সারা শরীরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। দু-হাতে রবিন মাথা চেপে রাখে। পার্টিতে আসার আগে কে যেন বলেছিল, অনেক কষ্ট তোমাকে সহ্য করতে হবে, পারবে তো? 'যে কবিতা লেখা ছাড়তে পারে সে সবকিছু করতে পারে।' গুলি করার আগে লোকটার মুখ দেখেছিল রবিন—ঠিক তার জেঠুর মতো। কেউ তাকে ধরতে পারেনি, নিরাপদে কাজ উদ্ধার করে সে চলে এসেছে, পার্টির সবাই বাহবা দিয়েছে। জেঠু পূজো করতেন। তাঁর ঘরে অনেক দেবদেবীর ছবি ছিল। দুর্গার ছবি, কালীর ছবি, শিবের ছবি—দরজার একদিকে এতবড় একটা নরকের ছবি। ভিন্ন ধরনের পাপের ভিন্নভিন্ন শাস্তি —পরদার গমনের, ভ্রূণহত্যার, গরুহত্যার, নরহত্যার। ছবিগুলো মনে আনার চেষ্টা করল রবিন। শুধু অন্ধকার। মশার শব্দ। চামচিকের শব্দ। বুকের ভেতর অন্ধকার সেঁধিয়ে গেছে, তার শব্দ। প্রতীক্ষা, অনন্তকাল ধরে প্রতীক্ষা। তিনি আসবেন। তাঁর সঙ্গে তাকে যেতে হবে। বাইরে বোধহয় পাখি ডাকল। সমস্ত কিছু অসহ্য লাগছে। মাথা টনটন করছে। সঞ্জয়দা সিগারেট ধরালেন। ক্ষণিকের জন্য সঞ্জয়দার মুখে, দুই হাতের ঘেরাটোপে, আলো ঠিকরে গেল। 'সঞ্জয়দা, আর একটা সিগারেট দিন তো।' সঞ্জয়দা দিলেন। রবিন আগুন ধরিয়ে নিল সঞ্জয়দার আগুন থেকে। সমস্ত কিছু অসহ্য ঠেকছে এ-সময়। এই প্রতীক্ষা এই খুন এই অন্ধকার। এ-সবের শেষ নেই। একহাতে মাথা টিপে ধরল রবিন। স্বস্তি হচ্ছে না। সিগারেটের আগুনের দিকে তাকাল। সমস্ত অন্ধকারটার ভেতরে এই এক টুকরো আলোর বিন্দু। রক্তের সঙ্গে আগুনের রঙের এত সামঞ্জস্য আছে রবিনের আর কোনোদিন মনে হয়নি। সে ডান হাত দিয়ে সিগারেটের মাথাটা মুঠো করে ধরল। হাত কি পুড়ছে? আমি তো কিছুই টের পাচ্ছি না। সেই মুহূর্তে একটুকরো আলোর জন্য রবিন ছটফট করে উঠল। তার জানা দরকার—হাতের চেটোটা পুড়ে কালো হয়ে গেছে, না, রক্তে লাল হয়ে গেছে সমস্তটা!

বরফের আগের দিন

রাজশেখর দত্ত

আমরা যে বরফ দেখেছিলাম তার কথা ভাবছিলাম। আমি বলেছিলাম, বরফের মধ্যেই তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, কাঠের বারান্দায় কেউ দাঁড়িয়ে নেই। একদিকে রেলিঙটা ঢাকা পড়ে গেছে নতুন লাল কম্বলে, আর, অন্যদিকটায় বারান্দার ফাঁকগুলোয় রোদ ঢুকে সমান্তরাল ছায়া ফেলেছে।

চ্যারিটেবল হসপিটাল পার হয়ে যেতে যেতে দেখলাম ইংরাজিতে লেখা আছে—টেলিফোনটা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য। টেলিফোন করা উচিত। না উচিত না, তাতে কাজ হবে না। পাকদণ্ডী ভাঙতে গিয়ে ঝোপ ভর্তি গুচ্ছ গুচ্ছ জাফরানী রঙের বুনো ফলগুলো আমাকে ফিরিয়ে আনল সমস্ত কিছুর কাছে। অল্পক্ষণ পরেই আবার অন্তঃকরণ বিরক্তিতে ভরে গেল। মোজার মধ্যে ঢুকল পাইনের কাঁটা।

অর্ধকিলোমিটার কি আধফার্লং জুড়ে, প্রায় কার্ট রোড পর্যন্ত, সিঁড়িভাঙা ইঁটের লালচে থাকগুলো মনে করিয়ে দিল টুকটুকে ইংরেজনীদের কথা। আর সেকালের গোলাপ ঝোপের কথা। ইংরেজরা একটা দোকানদারের জাত ছিল। বিশেষ কোনো জাত বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিষাক্ত ভাব রাখা হয়তো ঠিক না। কিন্তু ঘৃণা বা অশ্রদ্ধাও ভালোবাসার মতো একটা মানবিক বৃত্তি। কে ডাকল, পিছন থেকে কাকে কে ডাকল দুবার "···বাবু।" ডানদিকে ফিরে তাকালাম, "না, আপনাকে না", হাত জোড় করে দোকানী মার্জনা চাইল। আমি উপরে উঠে গেলাম। কার্ট রোড দিয়ে নিজেকে ঘুরিয়ে নিয়ে পোস্টঅফিসে ঢুকে বেরিয়ে এলাম।

চেম্বার থেকে বেরিয়ে মাথার সঙ্গে ভুঁড়ির উপর স্টেথোস্কোপটা দুলিয়ে বাঙালি ডাক্তার অভিবাদন জানাল। বাঙালিরা সর্বত্রই আছে। হ্যাঁ, সন্ধ্যায় আমি তাঁর সঙ্গে অবশ্যই দেখা করব। আজ সন্ধ্যায়ই। আমি ভীষণ ব্যস্ত। না, এখন না। দরকারী কাজ আছে।

গাড়োয়ালীদের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, সূর্য তখন আকাশের কেন্দ্রের কাছাকাছি ঘুরছিল। ওরা দুজন। একজন পূর্ণ পরিণত পুরুষ আর অন্যজন কিশোর। মুখে বিলাতী পশমের মতো মসৃণ গোঁফের অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে। কিশোরটা সঙ্গে ছিল। আমি পুলের যে-পাশে বসেছিলাম, তার উল্টোদিকে লোকটা বোঝা নামিয়ে দম নিচ্ছিল। সম্ভবত লোকটা দূর থেকে আসছে, অথবা বোঝাটা খুব ভারী।

লোকটা নিরাসক্তভাবে উত্তর দিল, "ক্যা মালুম?" ছেলেটি উৎসাহী। পাখিটা সে আগেও দেখেছে। ও-রকম পাখি সে আরো অনেক দেখেছে। শিকারীরা ও-পাখির জন্য বন্দুক নিয়ে খুব ছোটাছুটি করে বা ও-রকম একটা কিছু। প্রায় একশ বা দুশ ফুট নিচে যেখানে বড় বড় পাথরগুলোর মধ্যে দিয়ে মৃদু স্বরে জল নিস্সৃত হচ্ছিল, পাখিটা সেখানে একটা পাথরের উপর পড়েছিল। বেশ বিরাটাকার পাখি, কিন্তু মৃত। ঘাড় তার রঙ করা সোনালী রেশমের মতো উজ্জ্বল হলদে, কিন্তু কয়েক জায়গায় জড়িয়ে গিয়ে মিইয়ে গেছে। গাড়োয়ালীরা চলে গেলে নির্জনতা এবং পাহাড়ের শব্দ অনেকক্ষণ শুনলাম। তারপর উঠে এলাম।

বিকালে বাতাসের বেশ জোর ছিল। রেলিঙের থাম ধরে বিস্ময়ে সে লক্ষ্য করছিল। বাতাসের তরঙ্গগুলো পাইনের মাথার উপর দিয়ে কিভাবে এগিয়ে আসছে। একসময় আমিও লক্ষ্য করলাম পাশের বাড়ির বাগানে বাচ্চা তিনটে কিভাবে ছুটে ছুটে তাদের জননীকে খড়কুটো এগিয়ে দিচ্ছে। খুরপি দিয়ে নিড়িয়ে একটা আয়ত জায়গাতে পাখিদের হাত থেকে অথবা সূর্য কি তুষারের হাত থেকে একটা কিছু রক্ষা করার সমবেত চেষ্টা চলছে। "হয়তো গোলাপ হবে" বলে আবার আমি বইর মধ্যে আত্মগোপন করলাম। সে তখন চিরুনীর মোটা দিকটা দিয়ে সরু একগুচ্ছ চুলকে ক্রমাগত প্রহার করছে।

—কাজ আছে, জরুরি কাজ আছে

—কেন, কেন একটু বিশ্রাম নিতে পারো না

—মাংস তোমার ভালো লাগে না? মাংস কিন্তু লিভারের পক্ষে ভালো।

—আমার ইচ্ছা করছে কিছু চিংড়ি মাছ, বরফের তাও ভালো, আর শুঁটকি মাছ খেতে।

—ওরকম কখনো কখনো হয়।

—সকালে তুমি যখন বেরিয়ে গেলে না…

—হ্যাঁ ?

—না, কিছু না।

—কেন, কিছু না কেন ?

—আমার মনে হলো তুমি চলেই যাচ্ছ, মানে একেবারেই···

—ওটা একটা উৎকণ্ঠ অবস্থা, অনেক সময় হয় ও-রকম, বিকালে আজ একটা

—হ্যাঁ বললে না

—না, কিছু না, কিন্তু তুমি ওরকম ভাবো কেন ?

—আমি জানি না, ও-রকম চিন্তা আমি করতে চাই না, কিন্তু চিন্তাটা কি করে এসে গেল।

আমি তাকিয়ে দেখলাম, চোখের কোণে তার সামান্য একটু উৎকণ্ঠার চিহ্ন আছে। প্রকৃতির একটা চমৎকার সৃষ্টি। কিছুতেই কিছু বোঝা যায় না। একটা গোলমাল শেষ অবধি থেকে যায়।

—আচ্ছা, ধরে নাও আমি তোমাকে এখানে ছেড়ে গেলাম। ঠিক এই অবস্থায়। তুমি কি করবে ?

—আমি জানি না, ঠিক ঠিক বলতে পারব না।

—কেন পারবে না পরিষ্কারভাবে চিন্তা করো।

—আমি পারব না।

—কেন পারবে না, পারবে না কেন, তাহলে ও-রকম চিন্তা করতে গেলে কেন ?

—ঠিক জানি না

—জানো

—না, জানি না

—আমরা যে বিয়ে করেছি তাতে তুমি সন্তুষ্ট না ?

—কেন, অসন্তুষ্ট কেন হব ?

—রেজিস্ট্রেশন অনেক নিরাপদ এবং সুস্থ।

—তা ঠিক

—তবুও, গান, আলো, লোকজন, হৈ চৈ, এ-সমস্ত মেয়েরা বিয়ের সঙ্গে এক করে দেখে। তুমিও দেখ

—না, আমি দেখি না

৩

তার চুল আঁচড়ানো হয়ে গেছে, আমি যাব, তাই কালো জুতোজোড়া সে অন্যমনস্কভাবে বুরুশ করছে. তার হাত চলছে দ্রুত। উত্তেজনার মতো। আমি তাকে বহুবার বারণ করেছি। তবু সে বোঝে না, শোনে না। তার চাপা ঠোঁটেও যেন বিরক্তি আছে। আমি অস্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করলাম—তাহলে অমনটা ভাবতে গেলে কেন?

—আমি জানি না।

—আমরা ইচ্ছা করলে অপেক্ষা করতে পারতাম।

—তা পারতাম

—আরো অপেক্ষা করতে পারতাম

—অপেক্ষা তো করেছিলাম

—আমরা সবাইকে বাধ্য করতে পারতাম

—আর পারছি না, চেষ্টা তো সবরকম করেছিলাম, তুমি ভুলে যাচ্ছ এখন।

—না, ভুলিনি, এফেকটিভলি কিছু করতে পারতে, ভয় দেখাতে পারতে, বলতে পারতে গলায় দড়ি দেবে

—এ-আলোচনা বন্ধ করো. আমি ভয় দেখিয়েছিলাম, তুমি বিশ্বাস করো, ব্যাপারটা সত্যিসত্যি আমি ভেবেওছিলাম. চিন্তা করেছিলাম, সাহস হয়নি, পারিনি।

আমি লক্ষ্য করে দেখলাম আমার জুতোর উপর দু-তিন ফোঁটা চোখের জল পড়েছে। মেয়েরা এত সহজে কেন ভেঙে পড়ে। ভয় দেখানো এক কথা, আর সিরিয়াসলি ভাবা! তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে কেন এতখানি মানসিকতা। রাগ হলো।

—তুমি এ-সমস্ত আগে বলোনি কেন আমায়?

—তোমার জন্যই তো ভয় বেশি ছিল, তুমি যদি একটা কিছু, মাথা ভুল করে ভুল একটা কিছু করে বসতে। এ-আলোচনা এবার বন্ধ করো, ভালো কিছু বলো।

—তাহলে তুমি ভাবলে কেন ও-সমস্ত?

—আমি জানি না, জানি না, কতবার বললাম তোমায়

—আচ্ছা, তুমি সব বাড়িতে খুলে বলেছিলে

—হ্যাঁ, বলেছিলাম।

—সমস্ত কিছু বলেছিলে ?

—কী ? না। তা বলিনি, সেতো তোমাকেও বলিনি, তাতে কি হতো ? উল্টোটা হতো, খুন করে ফেলত, তুমি জানো না।

—খুন করে ফেলত ? না, না। এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন ? এ-জায়গাটা তোমার ভালো লাগছে না। অস্বস্তি লাগছে বোধহয়।

—না।

—এখান থেকে অন্যকোথাও গেলে হয়তো ভালো লাগবে, তাই না ?

—জানি না।

যাবার সময় সিঁড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বললাম।

—আবোল-তাবোল ভাবলে আমার মাথা গরম হয়ে যায়

—তাড়াতাড়ি এসো।

—আমার যে অনেক কাজ আছে।

—তাডাতাডি সেরে নিও। অন্ধকারের আগেই ফিরে এসো।

পথগুলোয় তখন বিকালের ছায়া নেমে আসছে। মাথার উপর একটি বানর পরিবারে হয়তো কর্তৃত্বের প্রশ্নে তুমুল বিতর্ক চলছে। শব্দের মাত্রায় মনে হলো মহিলারাও মতামত ব্যক্ত করছেন। কী করে দীর্ঘদিন ধরে একটি পুরুষ এতগুলো গৃহিণীর যৌথ পরিবারকে একত্র রাখে এটা একটা গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত। হলদে কাগজের ঠোঙায় দোকানী চামচে দিয়ে ভরতি করছে বনস্পতি। নিচ্ছে বাদামী বেণী-ঝোলানো ছোট্ট একটা শিখ বালক। বালিকাও হতে পারে।

ইটের সিঁড়ি করা পথটা দূর থেকে মনে হয়, লম্বা লম্বা ঝোলানো অনেকগুলো পাঁজরার মাংসের মতো। চারদিক থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে পাকদণ্ডীগুলো নেমে গেছে নিচের দিকে, অনেক নিচে, কোথাও একটা শেষ নিশ্চয়ই আছে। সেখানে কিছু থাকবেই। গুহা-গহ্বর, নদী, গরু-বাছুর, কয়েকটা কুঁড়ে ঘর—এ-সমস্ত থাকবেই। টিনের হোক, খড়ের হোক, কাঠের হোক, চাল থেকে ধোঁয়া উঠবে। ঝাউগাছের ধোঁয়া। আবার ঝাউগাছের ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে যাবে অনেক দূর অবধি।

ঘড়িতে দেখলাম তিনটে বেজে গেছে। রঙ মেলানো পোষাকে এক ঝাঁক মেয়ে কোথা থেকে নিজেদের ছড়িয়ে দিতে লাগল চারদিকে। তাদের

কিচির মিচির ক্ষীণ হয়ে আসতেই কানে এল শৃঙ্খলিত কণ্ঠস্বর। একটা জাঠা আসছে।

এগিয়ে গেলাম। কার্ট রোড ধরে তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও কিছুটা গেলাম। পিছিয়ে পড়া একজনকে মিছিলের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলাম। রিকশাচালক, ওরা মজুরী বাড়াতে চায়। রাস্তায় প্রফেসর মালহোত্রাও মিছিল দেখছিলেন, তাঁকে ঘাড় হেঁট করে অভিবাদন করে হাত তুলে জানালাম, সন্ধ্যায় দেখা হবে। তরুণ শোভাযাত্রী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তার হিসাবে একটু রদবদল করে নিল। উত্তরগুলো একটু সপ্রতিভ হলো। হ্যাঁ, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় একটা রিকশাচালক একটা রিকশা কিনে ফেলতে পারে। কিন্তু সমস্যাটা একই থাকবে। রিকশা টানার জন্য এখন তার লোক লাগবে। ওখানে একটা রিকশার জন্য গ্রীষ্মকালে দুটো "মজদুর" এবং শীতকালে চারটে "মজদুর" লাগে। তার উপর রিকশাটা দুটো শিফটে খাটালে আটটা লোক লাগবে। উচ্চতর মাইনে দিতে হলেও তার সঙ্গে শ্রমিকদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব হবে না। মাইনে তো সে তার পকেট থেকে দেবে না। "সাহেব" এবং "মেমসাহেব"রা বেশি ভাড়া দেবেন, সে বেশি মাইনে দেবে এবং সেই অনুপাতে বেশি লাভ করবে।

তাকে তারিফ করলাম যে সে অর্থনীতির নিয়মগুলো জানে। তখন সে লজ্জিতভাবে মাথা হেঁট করে জানাল, সে ঠিক রিকশাচালক নয়, ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, লাল ঝাণ্ডার লোক। এটা প্রত্যাশিত ছিল না, তার পোশাক-পরিচ্ছদ, মুখশ্রী···সবই একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। এতক্ষণে পোস্ট অফিসের সামনে এসে গেছি।

—দুঃখিত স্যার, কিছুই আসেনি।

—একটু দেখে বলুন, ভালো করে একটু দেখুন।

—আমি খুব ভালোভাবেই চেক করেছি।

ছেলেটা দাড়িও কামায়নি। চামড়ার বেল্টের নিচে নেমে গেছে খাকি প্যান্টালুন। ভাঁজ পড়া সবুজ শার্টে কালি লেগেছে, কোমরের কাছে। আমার উপর সে কিছুটা বোধহয় অনুরক্ত ছিল। তাই আবার আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সব জিনিসগুলো খুঁজে দেখল। এ, বি, সি, ডি, যে, যে, যে, যে। কিছুই পেল না। তার দৃষ্টি পিছনে চলে গেল। সেখানে টেবিলের উপর অন্য কয়েকজন মিলে বস্তা উপুড় করে জিনিসপত্র ঢালছে

এবং বাছাই করে সাজিয়ে নিয়ে খোপে ঢোকাচ্ছে। সে আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলল।

পিছনে হাত দিয়ে পায়চারী করলাম। তারপর জানালায় আবার ফিরে এসে যে-খামটা পেলাম, তার কোণার ছোট্ট ছোট লেখাগুলো দেখে বুঝলাম এটা সেটা না। তবুও খুললাম। খারাপ কিছু না, অন্য প্রকাশকের চিঠি। খারাপ না। মেজাজটা একটু প্রসন্ন হতেই দেখলাম ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে।

আমি তাকে ধন্যবাদ দিলাম। মুখ দেখে মনে হলো ও-জিনিসটা সে বড় একটা পায় না। চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তারপর সে দাঁড়াল, কী একটা মনে পড়েছে।

—তাই তো আপনি তো শ্রী···একটা মানি অর্ডার আছে।

—আছে? কোথায়?

—কিন্তু পোস্টম্যান তো নেই, আপনাকে কাল সকালে আসতে হবে। মানি অর্ডারের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ কিছুটা অশোভন, বিশেষত বিদেশে। তাই কিছুটা নিরাসক্তভাবে বলার চেষ্টা করলাম।

—যদি দরকার হয় তো আমি অপেক্ষা করতে পারি।

—না, পোস্টম্যান তো বাড়ি চলে গেছে, তার বাড়ি নাভা ছাড়িয়ে তিন কিলোমিটার। অপেক্ষা করার কী দরকার?

—না, তার দরকার নেই।

—তার উপর "মাস্টার সাব"ও চলে গেছেন, মানে যাননি এখানো।

উত্তরে হিমবাহ নিশ্চয়ই গলে যাচ্ছে। কাঠের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম সূর্যাস্ত হচ্ছে মন্থরভাবে। পাইনের পাতাগুলোর ভিতর দিয়ে অগ্নিকোণে রশ্মিগুলি এক জায়গায় ভিবজিওরে ভেঙে গেল। সে হঠাৎ ঘুরে ঘাড়টা বেঁকিয়ে দিল ফিকে লাল সূর্যের দিকে, মুখটা ঘুরে এল আমার দিকে। আমি দেখলাম না।

—কী সুন্দর, তুমি সূর্যাস্তের আগেই ফিরেছ।

তার চুলের মধ্যে দিয়ে আলো এল, গালের উপর নরম একটা আলোর প্রলেপ লাগল। মনে হলো, আমিও সেন্টিমেণ্টাল হয়ে যাচ্ছি। তবু কথাগুলো খুব সংযত করতে পারলাম না।

—সূর্য-রশ্মিগুলি রঙ পালটাচ্ছে, জোলো হাওয়া, তাই না?

—যদি বরফ পড়ে সমস্তদিন আমরা বাড়িতে থাকব।

—বরফ পড়তে পারে।

—তোমার হয়তো ভালো লাগবে না।

—বাধ্য হওয়াটা আমার ভালো লাগে না। বরফ যদি পড়ে···তুমি স্পেশাল একটা কিছু করবে। আমিও পারি। কিছু ভাজা করব। ভাজাটা সহজ। ডাক্তারের কাছে যাওনি?

—তুমি না করলে যে

—লোকটা চমৎকার, গলগণ্ডের উপর লোকটা কী যেন গবেষণা করছে।

—ডাক্তার তো! দেখে খুব বুদ্ধিমান মনে হয়।

—গাধা। বিকেলে একটা মিছিল দেখলাম, তাতে একটা কম্যুনিস্টও ছিল, কিন্তু পোশাক তার একেবারে কুলিদের মতো।

—এখানে কম্যুনিস্টও আছে নাকি? চলো কোথাও যাই।

—এ-জায়গাটা বুঝি ভালো লাগছে না!

—ভালো, অন্য জায়গা থেকে ভালো!

—আমরা মানালি যেতে পারি, কিন্তু দু-এক দিনের মধ্যে বরফ পড়বে।

—তাহলে এখানেই থাকব।

—মানালিতেও বরফ পড়বে।

—তাই নাকি? কিন্তু বাসে যেতে হবে···

—ডিলুক্স বাস।

সে চুপ করে গেল, মুখ তুলে দেখল আমার মুখের দিকে। আমার মুখেও বোধহয় সূর্যাস্তের আলো পড়েছিল। সন্ধ্যায়ই হোক অথবা অন্য কোনো জটিল কারণে তার মুখে তখন অন্ধকার। অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করল।

—কী বলছিলে?

—পশ্চিমের পাহাড়ের নিচে, অনেক নিচে, পাথরে যেখানে নাম লিখেছিলে, পুলটা মনে আছে? শাদা আর কালোতে রঙ করা···

—দেখেছিলাম।

—নিচে, চার-পাঁচশ ফুট নিচে, জল যাচ্ছে ঝির-ঝির করে···

—মনে পড়ছে।

—সেখানে গেছিলাম, দুটো মেয়ে দেখলাম, খুব সুন্দর পাহাড়ী মেয়ে।

—তুমি কি করলে?

—তাদের ভাষা তো জানি না, তোমার হিংসে হচ্ছে না তো ?

—একটুও না।

—মেয়ে দুটো মুচকি হেসেছিল, টগবগ গাল হাসিতে ফুলে উঠেছিল, ইচ্ছা করছিল দুজনকেই চুমু খেয়ে দিতে। কিন্তু জামাকাপড় একেবারে অপরিষ্কার, গাড়োয়ালী মেয়ে।

—তারপর ?

—তারা যখন চলে যাচ্ছিল আমি হাত নেড়ে দূর থেকে সম্ভাষণ করলাম। আমি একলা, তারা দুজন, মাথা নাড়ল, না, না···আর দুজনেই হেসে খুন হচ্ছিল। তখনি তোমার কথা মনে হলো।

—কী মনে হলো ?

—মনে হলো তারা অন্য লোক, আর তুমি শুধু তুমি।

—আর কী ?

—আর তুমি আমারি, এবং তুমি আরো সুন্দর, তোমাকে আমি জানি।

—এখন সব বানাচ্ছ, এ-সব ভাবনি তুমি, এ-সব বানাচ্ছ তুমি নিশ্চয়ই।

আমি তাকিয়ে দেখলাম কপট প্রতিবাদের আনন্দে আমার বালিকাটির চোখে, মুখে, গালে, ঠোঁটে রক্তপ্রবাহ বা অন্য কোনো শারীরিক কিছু ফুলে ফুলে উঠছে।

—বানাচ্ছি না, একটুও বানাচ্ছি না, তারপরেই দেখলাম পাখিটা নিচে, আহত হয়েছে, পাথরে ডানা ঝাপটাচ্ছে, তার বোধহয় জল চাই।

—কোন পাখিটা ?

—সেই যেটা বললাম, সেই বিরাট পাখিটা··· যার গলার রঙ আকাশের মতো নীল।

—নাম কি পাখিটার ?

—নাম জানি না, মেয়ে দুটোও জানে না, কেউই জানে না!

—তারপর ?

—তারপর আমি যখন পাহাড়টা পার হয়ে এলাম, তখন দেখি আকাশে সে তার নীল ডানা ঝাপটাচ্ছে।

—সেই পাখিটাই ?

—সেইটাই। তারপর তোমার কাছে চলে এলাম।

—চলো, এখন একটু হেঁটে আসি, কালকে বরফ পড়বে।

কলকাতার দাসব্যবসা

পঞ্চানন সাহা

উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার বাবুসমাজের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তথ্যের অপ্রতুলতা নেই। শুনতে একটু আশ্চর্য লাগলেও, ক্রীতদাস রাখাটাও কলকাতার সমাজব্যবস্থার একটি অঙ্গ ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এমন কোনো উচ্চবিত্ত পরিবার ছিল না যাঁরা নিজগৃহে এক বা একাধিক ক্রীতদাস রাখতেন না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দাস বিক্রির বিজ্ঞাপন কলকাতার বিভিন্ন ইংরেজী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৩০ থেকে ১৮৪০-এর মধ্যে বাঙলাদেশ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে দাসব্যবসা সম্পর্কে অন্ততপক্ষে ছটি পুস্তিকা ও পার্লামেণ্টারি পেপারে আলোচনা হয়েছে।

১৭৮০ সালে কলকাতার একটি পত্রিকায় প্রকাশিত দাস বিক্রির তিনটি বিজ্ঞাপনের নমুনা থেকে এ-বিষয়ে কিছুটা আলোকপাত হবে।

"*Wanted*—Two Coffrees who can play very well on the French Horn and are otherwise handy and useful about a house, relative to the the business of a consumer or that of a cook ; they must not be fond of liquor."

"*To be sold* : Two French Hornmen, who dress hair and shave, and wait at table."

"*To* be *sold* : A fine Coffree boy that understands the business of a butler, kitmutgar and cooking. Price four hundred sicca rupees. Any gentleman wanting such a servant may see him and be informed of further particulars by applying to the printer."

উপরোক্ত বিজ্ঞাপনগুলিতে বোঝা যায় যে কলকাতার ইংরেজ অধিবাসীদের মধ্যে আফ্রিকার কাফ্রি দাসদের যথেষ্ট প্রচলন ছিল এবং তাদের মূল্যও নেহাত কম ছিল না।

দেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে দাসপ্রথা সম্পর্কে ১৮২৬ সালে কোলব্রুক নামের এক সরকারী কর্মচারী তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন : "দেখা যাচ্ছে যে হিন্দু এবং মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সাংসারিক কাজের জন্য দাস নিয়োগ একটা খুবই সাধারণ ব্যাপার। প্রত্যেক স্বচ্ছল ব্যক্তিই সাংসারিক কাজের জন্য দাস নিয়োগ করে এবং ক্রীতদাসীদেরই মধ্য থেকে হিন্দু-মুসলমান উভয়েই রক্ষিতা সংগ্রহ করে।"

কলকাতার এই শ্রেণীর দাসদের অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোনস ১৭৮৫ সালে প্রধান জুরির (Grand Jury) উদ্দেশে বলেছিলেন : "আমাদের ক্ষমতার মধ্যে দাসদের অবস্থার কল্পনাতীতভাবে শোচনীয় এবং তাদের উপর নিষ্ঠুরতা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। অল্পবয়সী ছেলে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে তা আরও ভয়ানক।"

এই ধরনের ক্রীতদাস রাখার ব্যাপকতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে স্যার জোনস ক্ষোভের সঙ্গে অনুযোগ করেছেন : "এই জনবহুল শহরের কোনো প্রান্তে এমন কোনো স্ত্রী বা পুরুষ নেই যারা নামমাত্র মূল্যে একটি অল্পবয়সী দাস রাখেনি।"

এই ক্রীতদাস সংগ্রহের প্রথা ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর। "কলকাতার বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রির জন্য এরকম শিশুদের বোঝাই বিরাট বিরাট নৌকা গঙ্গাপথে কলকাতায় আসত। ঐ সমস্ত শিশুদের অধিকাংশই ছিল দুঃসময়ে পিতামাতার কাছ থেকে সামান্য চালের বিনিময়ে সংগৃহীত বা চুরি করে আনা।"

কর্নেল ওয়েলশ নামক আর একজন ইংরেজ রাজকর্মচারী এই দাস সংগ্রহের প্রথাকে ব্যাখ্যা করে লিখেছেন : "Great numbers used formerly to be kidnapped from a distance, and sold by dealers for both domestic and agrestic purposes. Many have been, and still are, sold in infancy by parents and relations, particularly in times of famines, and scarcity, to any one who will purchase them".

শুধু বাঙলাদেশের অভ্যন্তর থেকেই নয়, ভারতবর্ষের বাইরের বহু দেশ থেকে, বিশেষ করে পারস্যসাগর অঞ্চল থেকে, কলকাতার বাজারে দাস আনা হতো। কলকাতার বিভিন্ন সংবাদপত্র এই দাসব্যবসা সম্পর্কে নিঃশ্চুপ থাকেনি। ১৮২৩ সালে 'Calcutta Journal' লিখেছিল : "এই বিশাল রাজধানী একাধারে প্রাচ্যের বাণিজ্য ও সম্পদের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে যেমন পশুবিক্রি হয় তেমনি বন্দী আফ্রিকান ক্রীতদাসদের খোলা বাজারে সর্বোচ্চ মূল্য-প্রদানকারীর কাছে বিক্রি করা হয়। আমরা সংবাদ পেয়েছি যে এ-বছর

ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানীতে দাসরূপে বিক্রির জন্য আরব জাহাজে ১৫০ জন খোজাকে আনা হয়েছে। আমরা এও জানতে পেরেছি যে এ-সমস্ত আরব জাহাজ আবার কাফ্রি দাসদের বিনিময়ে এদেশ থেকে স্থানীয় দাস, বিশেষ করে মেয়েদের, আরব দেশে বিক্রির জন্য নিয়ে যায়।"

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৮০৭ সালে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে দাসব্যবসা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বৃটিশ সরকারের নাকের ডগায় এ-ধরনের দাসব্যবসা হামেশাই চলছিল।

১৮৩০ সালের জুন মাসে 'India Gazette'-এ একটা খবর বেরোল যে অযোধ্যার নবাব একদল নতুন আমদানীকরা আবিসিনিয়ান দাসের পরিবর্তে চার লক্ষ টাকা মূল্যের হীরা-জহরত কলকাতার এক মনিকারকে বিক্রির জন্য দেন। 'India Gazette'-এর এই অভিযোগের কোনো অনুসন্ধান হয়নি। ইতিমধ্যে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে দাসপ্রথা উচ্ছেদ করে আইন গৃহীত হয়। কলকাতার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট ১৮৩৪ সালের জুন মাসে সরকারকে কলকাতায় দাসব্যবসা বন্ধ করার জন্য কড়া নির্দেশ জারী করেন।

কলকাতার বাইরে বাঙলাদেশের অন্যান্য স্থানেও এ-দাসপ্রথার অস্তিত্ব ছিল। ১৮০৪ সালে কোলব্রুক তাঁর 'Remarks on the husbandry and internal commerce of Bengal'-এ লিখেছেন যে "বাঙলাদেশে দাস-প্রথা অজানা নয়। বাঙলাদেশের কতগুলি জেলাতে কৃষিকাজ প্রধানত দাসদেরই সাহায্যে হয়ে থাকে", ১৮২৬ সালে একটি সরকারী রিপোর্টে তিনি আরও পরিষ্কারভাবে লিখেছেন যে: "we find domestic slavery very general among both Hindus and Musalmans."

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে বাঙলাদেশ বলতে তিনি Bengal Presidency অর্থাৎ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার এবং উত্তরপ্রদেশের নব সংযুক্ত অঞ্চল (১৮১৮ সালের) বোঝাচ্ছেন। তিনি তাঁর রিপোর্টে আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে এই প্রদেশের নিম্নাঞ্চলে অর্থাৎ প্রকৃত বাঙলা-দেশে কৃষিকাজে দাস নিয়োগ মোটেই ব্যাপক নয় তবে তা একেবারেই যে নেই তাও নয়। শুধু পশ্চিম-বিহার থেকে বারাণসী পর্যন্ত অঞ্চলে কৃষিকাজ দাসদের সাহায্যেই অনুষ্ঠিত হয়। বাঙলাদেশে দাসদের সংখ্যা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি পরিষ্কারভাবে লিখেছেন: "Slaves are neither so few (in Bengal) to be of no consideration, nor so numerous as to constitute a notable portion of the mass of the population."

তবে এ-কথা ঠিক পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ক্রীতদাসদের সঙ্গে তুলনায় বাঙলাদেশের দাসদের অবস্থা নানা ঐতিহাসিক কারণে অনেক পৃথক।

১৮৩৪ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যে আইনত দাসপ্রথা উচ্ছেদ হলেও কার্যত বহুস্থানে তার অস্তিত্ব বজায় ছিল। ১৮৪১ সালের ৪ঠা মে British and Foreign Anti- Slavery Societyর দ্বিতীয় রিপোর্টে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের দাসদের সংখ্যা বর্ণিত আছে। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে "All the Jagheerdars, Deshwars, Zemindars, principal Brahmins and Sahookdars retain slaves in their domestic establishments." বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন জেলার দাসদের সংখ্যা সরকারী তথ্য থেকে সংগ্রহ করে রিপোর্টে বলা হয়েছে, সবচেয়ে বেশি দাস (গৃহদাস বাদে) হলো বিহার ও পাটনাতে ১৩১,২৮০ জন, তারপর যথাক্রমে শ্রীহট্ট-বাখরগঞ্জে ৮০,০০০ ; পূর্ণিয়ায় ২৪,৫৬০ ; সাহাবাদে ২১,৩৪০ ; ভাগলপুরে ১৭,৭৩৬ ; ত্রিহুতে ১১,০৬১। অবশ্য ঐ সংখ্যা দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের তুলনায় যথেষ্ট কম। একমাত্র মাদ্রাজের তিন্নেভেলি অঞ্চলেই ৩২৪,০০০ দাস ছিল। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে তামিল দেশে অচ্ছুৎ পারিয়ারা ছিল জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ এবং তার অধিকাংশই ছিল দাস। ১৮৩৪ সালের বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টারি পেপারে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণভাগের জনসংখ্যা অন্তত পক্ষে দেড় কোটি এবং "The Parias, therefore, would amount to 3 million, all of whom, the same accurate writer (Buchanan Hamilton), on the authority of Dr. Francis Buchanan, states to be slaves."

দক্ষিণ-ভারতের দাসদের উপর যে-ধরনের অত্যাচার করা হতো তা অবর্ণনীয়। এ-সম্পর্কে বিভিন্ন ইংরেজ কর্মচারী যা বলেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বাবের নামক একজন ইংরেজ কর্মচারী বলেছেন দাসদের তুলনায় "Nothing can be more abject and wretched" ; ওয়েলশ বলেছেন "Slaves can be and are sold at pleasure" ; ক্যাম্পবেল লিখেছেন "the sale of agrestic slaves is common."

সে-তুলনায় বাঙলাদেশের বা কলকাতার দাসদের অবস্থা নেহাত মন্দ ছিল না।

এই প্রবন্ধে যেসব বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

1. Slavery and the Slave Trade in British. India, London, 1841. Pp-3, 29, 30, 33 -34
2. Pegg—East India Slavery, London. Pp-24, 31
3. Bengal Past and Present, Vol II, 1908
4. Parliamentary Papers : No : 138, 1839 pp-311
5. Ibid No : 128, 1834 Vol II Pp-6, 179

উত্তরবঙ্গের ছড়া ও ধাঁধা

স্মরজিৎ চক্রবর্তী

উত্তরের গ্রাম-বাঙলার শিশুদের ছড়া বাঙলার শিশুসাহিত্যে স্থান পায়নি, লোকসাহিত্যের উপাদান হিসেবেও এগুলির স্বীকৃতি খুব একটা নেই। তাই বলে লোকসংস্কৃতির এই সম্পদগুলির মূল্যকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। কারণ, ছড়াগুলির বাক্যবিন্যাস ও ভাষাগত বৈচিত্র্য ছাড়া পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য এগুলিকে এক নতুন রূপ দিয়েছে।

ছড়া শিশুমনকে নাড়া দেয়। সর্বকালের সর্বদেশের শিশুদের মতো উত্তর বাঙলার (কুচবিহার, রঙপুর ও জলপাইগুড়ি) শিশুরাও তাই 'আবোল তাবোল' অনেক ছড়ার প্রতি আকৃষ্ট হবে—এটাই স্বাভাবিক শিশু-মনস্তত্ত্ব। সুর এবং ছন্দ রয়েছে ওদের সকালের অ, আ, ১, ২ পাঠের ভেতরে, দুপুরের খেলাঘরে, বিকেলের হাডুডু, চাম্‌ছি, ঠুস কিংবা ডাংগুলি খেলায় এবং রাত্রের শয্যায়। এরা ক, খ মনে রাখার জন্য এমনি করে পড়ে :

হাটুভ্যাঙা দ,
কানমুচুরি ধ,
নাইরকোলের ঝোপা শ,
প্যাটকাটা ষ, ইত্যাদি।

এগুলি ছড়া নয়। কিন্তু এতেও সুর আছে। যেমন আছে নামতা বলায়, কিংবা একের পিঠে এক এগারো পাঠের ভেতরে।

খেলাঘরের রান্নায় ছড়া মন্ত্রের কাজ করে। ভাত রান্না তাড়াতাড়ি করার জন্য ওরা বিড়বিড় করে :

গোদোর গোদোর মানার পাত্
পানি আইনতে হইল ভাত। ইত্যাদি।

শুধু ভাত নয়, আরও অনেক কিছু রান্না করে ওরা। মাটি চাল, কচুর ডাঁটা মাছ, কাঁঠালের পাতা কলাপাত হিসেবে খেলাঘরে ওরা ব্যবহার করে।

দিয়ারী বা ভাড় 'আন্‌জা' রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। ওদের রান্নার অনেক 'আইটেম'। যেমন :

অ্যাতর ব্যাতর কইতোর ভাজা,
দাইরকা মাচের নরম খাজা,
পুটি মাচ আইসালো,
সরপোত্‌ খাইতে দিন গেলো।

পায়রা ভাজা, দাইরকা মাছের নরম খাজা, পুটি মাছ ছাড়াও গরমের জন্য ঠাণ্ডা পানীয়র ব্যবস্থা রয়েছে।

খেলাঘরে শুধু রান্না নয়। স্বামী-স্ত্রীর অভিনয় আছে। নানাধরনের খেলা আছে। নানা প্রকারের ছড়াও :

ইচন বিচন ধাপরি বিচন,
তার তলোত্‌ হইল মোগল পাটা,
মোগল পাটা খান নড়ে চড়ে,
কাউয়ার ব্যাটা ঠোকোর মারে,
আয় গুবুরী ভাত খাই,
দুদু মাকা ভাত খাই,
না খাই তোর হাতে —
গুবুরী গুবুরী গোন্‌দায় হাত,
অ্যালপাত ব্যালপাত—
ছিড়ি আংটি তোল হাত।

উপরের ছড়াটির মতো আরও অনেক ছড়া—যাকে বলে 'ননসেনস রাইমস" —এদের মধ্যে আছে। ক্রন্দনরত ছেলে বা মেয়েকে সামলাবার জন্য শায়িত অবস্থায় দুই হাঁটুর উপর তুলে মা কিংবা বাবা ওদের দুলিয়ে দুলিয়ে বলেন :

হুরকুর নাটুয়া,
মইষের খটুয়া,
তাপ্তি জলে,
নিবুক ত্যাল,
গাং সরিষা পাকা ব্যাল,
ভ্যাবারু রে ভ্যাবারু—
আম কনটা পালু,

কিসোত বসিয়া খালু,
ভাঙ্গা ডুলির মাঝে,
কে কে তোর সাক্ষী,
দল কুমারীর দাসী—
তোর ব্যাটার নাম কি—
আপপাল গোপাল।
তোর বেটির নাম কি—
খলিসামুটি।
ঝিলালো রে ঝিলালো।

এই ঝিলালো রে ঝিলালো বলে দুই হাঁটু উপরে তুলে দিলে "ছিঁচ্ কাঁদুনে মিচ্কে"রা হেসে দেয়।

এ ছাড়া আছে গোদার ছড়া। ছড়াটি নিম্নরূপ:

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে নদীত্ হইল ভীর—
যত গোদা যুক্তি করি কাটিল বরষির ছিল।
কেহ নিল সুতা বরষি কেহ নিল চ্যারা
নদীর পাড়ে পড়িয়া থাকা কন্টিকারীর মূড়া
ওরে মাচো না পাইল টাচো না পাইল ফিরিয়া আসিল বাড়ি,
আকার পাড়োত্ বসিয়া গোদা গপ্প দিল ছাড়ি—
দুইটা টোপও খাইছে—
একটা হুকৃসি গেইচে।
এই কথা শুনি গুদুনি রাগে হইল টং—
ভাত ঘাটা নাকৃরী দিয়া মাতায় মাইরলো ডাং,
গোদা বাইরে গেল।

কিছুদিন আগেও বিহার প্রদেশের মেহনতি মানুষেরা শীত কেটে গেলে এই অঞ্চলে কাজের জন্য আসতেন। মাটিকাটা এবং জঙ্গল ছাপ, কাঠ চেরাই করে অর্থ উপার্জনের পর আবার ঘরে ফিরে যেতেন। এদেরকে এঁরা 'পশ্চিমা' বলেন। এদের নিয়ে একটি ছড়া এখানে কিশোরদের মুখে শোনা যেত:

পশ্চিমাভূত—
জঙ্গোল বাড়িত শুত,
জঙ্গোল বাড়িত্ আগুন নাগে ছাং—
ধরপরেয়া উঠ্।

এটা একান্তই 'মজাক' করার জন্য। অন্য প্রদেশের মানুষের প্রতি অবজ্ঞাসূচক উক্তি নয়।

ছেলে বা মেয়েদের আনন্দ দান, ভোলানো এবং ঘুমপাড়ানোর জন্য অনেক ছড়া আছে এই অঞ্চলের মায়েদের মুখে মুখে। ঘুমের মাসি-পিসিরা ঘুম দিয়ে না গেলে এদের ঘুম আসে না। আহ্বান করেন নিদ্রা দেবীকে :

আয় নিন্দ আয়, নিন্দ দিয়া যা।

কিংবা :

নিন্দোবালি আয়,
নিন্দ যাবার চায়।

কিন্তু অনেক চেষ্টার পরেও দুষ্টু ছেলেটির ঘুম না এলে মা তাকে ভয় দেখান :

আয় ঘুম বায় ঘুম—
পাইকোড়ের পাক্,
কানকাটা কুকুর আইস্‌চে,
ঝিত্ করিয়া থাক।

অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত এবং আলোকপ্রাপ্ত মায়েরা সুর করে আবৃত্তি করেন :

আইল পুত্রের ঘুম—
পুত্র রাখি বুকে,
ধীরে ধীরে করাঘাত—
এই কতা মুকে।

শিশু এক-পা দু-পা করে হাঁটতে শেখার সময় তাদের উৎসাহ দেবার জন্যও এদের ছড়া জানা আছে :

হাটে সোনা হাটে—
হাটিয়া যায় সোনা খুটিয়া খায়,
হাটের মোলামুড়ি কিনিয়া খায়,

হাঁটতে শিখলেই সে হাট যেতে পারবে। হাটে গিয়ে মোয়া-মুড়ি কিনে খেতে পারবে। এর চাইতে বড় প্রলোভন আর কি হতে পারে? শুধু হাঁটার জন্য উৎসাহদান নয়, এদের আনন্দ দেবার জন্যও কিছু ছড়া এই অঞ্চলে আছে। যেমন :

হাত ঘুরাইলে নাড়ু দেবো,
নইলে নাড়ু কোথায় পাবো,
সোনার নাড়ু গরেয়া দেবো।

অথবা :

ঢুল ঢুল ঢুলে—
ঢুল কদমের তলে,
হাতির পিটিত্ চড়ে—
হাতি মাইরলে লাত্তি,
কুড়িয়া পাইলে ধুতি—
সেও ধুতি রাঙা,
মোর সোনাটা ঢাঙা।

অনেক মেয়েদের ছড়াও এই অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। সেগুলি এইরূপ :

১

উলুউলু মানদারের ফুল,
কইনার বাড়ি কত দূর,
কইনা আসিল ঘামিয়া—
ছাতি ধর টানিয়া।
ছাতির উপর গামছা,
তিন বইনে তামাসা।

২

পাত্রী ধুমুরী বিয়ার পাত্র ধুমুরা,
একটা পইসার ইচিলা মাচ তিনটা কুমড়া
বিয়ার পাক পরশ রে।
বাইজ আইনচে ধ্যারো ধ্যারো
আর ত্যারো ত্যারো সানাই,
কারো সুর না মিলে।

৩

ভাল করিয়া বাজান রে ঢাকুয়ার—
সুন্দরী কমলা নাচে,
সুন্দরী কমলার পেন্দনের শাড়ী
রৈদে ঝিলমিল করে

এ বাড়ি হইতে ও বাড়ি যাইতে—
ঘাটাত্ ছিপছিপ পানি,
বরের ভিজিল জামা রে জোড়া
কইনার ভিজিল শাড়ী।

শুধু ছড়াই নয় ধাঁধাগুলির গ্রন্থনাতেও ঠিক একই মৌলিকতা এবং বুদ্ধি-দীপ্তির পরিচয় মেলে। এগুলির বিষয়বস্তু ব্যাপক। চিন্তার 'রেঞ্জ'ও খুব ছোট নয়। এগুলি নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলের মানুষের সৃষ্টিপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। কতকগুলি ধাঁধা নিচে উদ্ধৃত করা হলো :

পিপিপি—
নেটু দিয়া জল খায় তার নাম কি ? — ল্যাম্প.

ইনকিচি বিনকিচি
নাই চোচা নাই বিচি। — লবণ

খ্যাড় বাড়ি হাতে বিরাইল টিয়া—
সোনার টুপি মাথাত্ দিয়া। — মোচা

চুটুত্ পাকড়া—
মথোত্ ভ্যাকড়া,
খই—
কয়য়া দিবার নই। — খই

এই ধাঁধাটি চাবির ইংরেজী 'কি ?' অথবা সীতার অপর নাম 'জানকী' ধরনের।

এক গচে এক ফল, পাকি আচে টলমল। — আনারস

আকাশ থাকি পইল ভ্যাট্—
ভ্যাট্ কয় মোর প্যাট কাট। — গুয়া (সুপারী)

অ্যাখান কাইমত্ দুখান চাল। — কলার পাতা

ঢাল্লে ছাই — টাইনলে পাই। — তামাক

এক ছাওয়াতে বুড়ি। — কলাগাছ

ইত্তি গেনু উত্তি গেনু গেনু চিলকির হাট—
একনা বুড়ির দেখি আসনু ১৪ কোনা দাঁত। — ব্যাদা

ইত্তি গেনু উত্তি গেনু গেনু চিলকির হাট—
একনা বুড়ির দেখি আসনু ১৬ কোনা দাঁত। — ১ ছড়া কলা

সর্বশরীরে শিং — পড়ি আছে ডিং ডিং। — কাঁঠাল

একটা গরুর তিনটা শিং। — উটকন (বাঁশের তৈরি
এই জিনিষটি দিয়ে গরুর দড়ি পাকানো হয়।)

হাত নাই পাও নাই সলসলেয়া যায়,
পিটিত্ চামরা নাই সর্বলোকে খায়। — জল

ওপারে পোনাগুলা থুকুর বুকুর করে,
এ পারের চেংরাকোনা টিকাত্ চাপর মারে। — ভাত

আকাশ থাকি পইল, চ্যাপগা নাগি রইল। — গোবর

আকাশ হাতে পইল টেম্‌কি টেম্‌কি আগুন জলে,
ছাওয়ার হাতোত্ দিলে তাঁয় কিচির মিচির করে। — জোনাকি

আগালোত ঝিকিমিকি গোড়োত্ বাদা—
এই শোলোক ভাঙি না দিলে গুষ্টি সুদ্দায় গাধা। — আদা

মন্থনদীত্ ফেলাইলোং ছাই, ভাসি উঠিল কালা গাই! — জোঁক

দেখিতে সুন্দর যেমন উজান বয়সের বেলা—
কোন বিধির বিড়ম্বনা মুক করিচে কালা,
রসতে পরিপূর্ণ জাম্‌রি তো নোয়ায়,
ভাবিয়া দেখ এখন হয় কি ওয়ায়। — স্তন

খ্যাড় বাড়ী খান পোড়া গেইল—
ভুসকুরা টা চায়য়া রইল। — উই-এর ঢিপি

একটা গচ ঝাপুর ঝুপুর
তাত চইড়চে কালা কুকুর — উকুন

হার দিয়া পাত রাধিচং ছাল পারি ত্যাং বইস
তিনটা কতার উত্তর দিয়া ভাত খাবার বইস। — পাটগাছ

আগাল ঝাটাং পাটাং গোর ভেরুয়া—
এই শোলোক ভাঙি না দিলে গুষ্টি সুদ্দায় জারুয়া। — ঝাঁটা

উটিতে ঝাটাং পাটাং বসিতে পাহাড়—
লক্ষ লক্ষ জীব মারে না করে আহার। — মাছ ধরা জাল

মনে করি কড়ি করি—
হয় কিন্তু হয় না। — হাতি কেনার ইচ্ছে কিন্তু ঘোড়াই হয় না

আইলে আইলে যায়—
ভুল্‌কি মারি চায়। — বিন্দি (সূঁচ)

একনা বুড়ি — নিন হাতে উঠি মাথাত্‌ গুড়ি। — গরুর খুঁট

একনা বুড়ি—কোনা মুতুরি।
—ছ্যাকার খাস্‌সি (ক্ষার-জলের ছোট ঝুড়ি)

ইত্তি গেনু উত্তি গেনু গেনু বলাইর হাট—
একটা চেংরাক দেখি আসনু প্যাটের উপরা দাঁত। — বদনা

ইত্তি গেনু উত্তি গেনু গেনু চিলকীর হাট—
একনা বুড়ীর দেখি আসনু খিসখিসা দাত। — কুমড়া

প্যাট খোল খোল পিটি টান—
কোন জন্তুর চাইরটা কান। — ঘর

এক ভাই সাগোরোত্‌,
এক ভাই নগোরোত্‌,
এক ভাই গচের আগালোত্‌। — গুয়া, পান, চুন

তিনকানি মধ্য খাল—
ঘাড় ধরি ঠ্যালা মারির ভাল,

কেক্‌রিয়া চড়ুত তোলে—
তলপাকের নাল পানি টুপুস টুপুস পরে। যাকই বাঁশের তৈরী।
ছোট খাল বিলে মাছ ধরার জন্য ব্যবহার করা হয়।

আগাল খান ঝাটাং পাটাং—
গোড়খান হইল আচ্চা,

মুখ দিয়া প্রসবিল ডিম্ব—
পুকৃটি দিয়া হইল বাচ্চা। — কলাগাছ

ঘাটায় ঘাটায় দাড়ায়,
মানুষ দেখিলে ঠারায়,
কোকরা নাগি ধরে,
অক্ত বির করি ছারে। — চিনাজোঁক

চিকমিকাটায় খোরে মাটি—
দশ ঠ্যাং তিন পুকৃটি। — চাষী ও হাল

চকর চাল চকর চাল—
গোড় ঝাউপসা মাতা নাল। — আনারস

আট ঠ্যাং ষোল হাটু,
মাচ ধরিতে গেল লাটু,
শুক্নো ভূমে পেতে জাল,
মাছ ধরে চিরকাল। — মাকড়সার জাল

অডিম পকী অফুলা শাক—
কোন জন্তুর আটারো নাক।—গড়াই মাছ

টিকা শুক্কা মাতা ফ্যার—
ধান ধরে আঠারো স্থার। — প্যাচা

ধুম ঘড় এক পই,
ছাতার ডারি কবার নই। — ছাতা

চার পায় খচে—
দুই পায় মোচে—
তার সংগে কি তোমার খাওয়া দাওয়া আছে? — মাছি

উপর হলদিয়া ভিতর সাদা—
পণ্ডিতের ঘর বোজে আদামাদা,
মূর্খের ঘর বোজে কলা। — কলা

আকাশে ঘর—
পাতালে দুয়োর,
এই শোলোক যাঁয় না
ভাঙি দিবে তার বাপ শুয়োর। — পাখির বাসা

পাতা খসখস ড্যারা খসখস ধরে নোদা নোদা—
এই শোল্লোক ভাঙি না
দিলে তার গুষ্টি সুদ্দায় ভোদা। — মিষ্টি কুমড়া

এক বাটা সুপারী — গনির না পায় ব্যাপারী। — তারকা

জঙ্গল বাড়ি থাকি বিড়াইল হাতি—
সোনায় ঝলমল রূপার ছাতি। — সূর্য

গৃহস্থের প্রতি ঘরে—
দেখা যায় ব্যবহারে,
মেয়েলোকে নারে চারে,
পাওয়া যায় না হাটবাজারে,
দিনে আছে রাইতে নাই,
এই শোল্লকটার মানে চাই। — রোদ

ঠকঠক বগুলা—
চারি মাথা বার ঠ্যাং কোথায় দেখিলা ?
—গাই, বাছুর, ধরাইয়া, ছ্যাকাইয়া।

চাইর চৌদোল মুই কর্তা বামন মোর ভারি,
মাইয়া হইল ঠাকুরাণীমাও মুই হনু তার ভাণ্ডারি — বিয়ের বর।

ভারতে মুক্তি-আন্দোলন ও সেনাবাহিনীর ভূমিকা

শান্তিময় রায়

রাষ্ট্র যে-তিনটি প্রধান স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকে তার মধ্যে সশস্ত্র-বাহিনী অন্যতম; অন্য দুটি হচ্ছে আমলাতন্ত্র ও সামাজিক সম্পর্ক। এই সেনাবাহিনীর ভূমিকা সমাজ ও রাষ্ট্র-বিপ্লবের প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ। এই ভূমিকা সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয়তই হতে পারে। কারণ সশস্ত্রবাহিনীর নিরপেক্ষ বা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা বিপ্লবের অন্যান্য সংগ্রামোদ্যত শক্তিগুলিকে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণে সাহায্য করে। আবার অনেক সময় নিরপেক্ষ থাকার অপরাধে যখন বিশ্বস্ত সশস্ত্রবাহিনীর নিকট থেকে আক্রমণ আসে তখন আত্মরক্ষার অঙ্গ হিসেবে তাদের বিদ্রোহ করতে হয় এবং এই বিদ্রোহ বিপ্লব ডেকে আনে।

সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ মানুষ সাধারণ সমাজ থেকেই আসে, তাই বিভিন্ন আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াও তাদের ওপর পড়তে বাধ্য। কারণ তারা সমাজের মধ্যেই প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা প্রভাবান্বিত।[১]

আধুনিককালে যে-সমস্ত জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে, ১৬৭৪ সালে ডাচ নাবিকদের (তাদের নৌবহর নিয়ে) স্পেনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম তার মধ্যে সর্বপ্রথম। ইংলিশ বিদ্রোহ বা পিউরিটান বিদ্রোহে সেনাবাহিনীর এক বিশিষ্ট অংশ ক্রমওয়েল, উইনস্টেন্‌টলী ও কিলবার্নের নেতৃত্বে বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করে বিপ্লবকে বিজয়ের পথে নিয়ে যায়।[২]

১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লব শুরু হয় রাজকীয় রক্ষীবাহিনীর নিরপেক্ষ

১। Cholo-regh : Army and the revolution.

২। Christopher Hill : English Civil War.

ভূমিকার মধ্যে। রাজা ষোড়শ লুই-এর আদেশ অমান্য করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে তারা অস্বীকার করে। এই অবস্থার মধ্যেই ষোড়শ লুই প্যারিসের জনতার দাবি মেনে নেন এবং স্টেটস জেনারেল আহ্বান করার কথা ঘোষণা করেন।

রুশিয়ার জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৮২৭ সালেই, প্রথম নিকোলাসের সময় সেনাবাহিনীর মধ্যে এক বিপ্লবী চক্র গড়ে ওঠে। তাঁরাই প্রথম বিদ্রোহী, যাদের বলা হয় ডিসেমব্রিস্ট।[৩] বেশিরভাগ বিদ্রোহীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু তাঁদের উত্তরসূরীরা আবার সেনাবাহিনীর মধ্যে গোপন বিপ্লবী চক্র গড়ে তোলেন। এবং এই বিপ্লবী চক্রের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন উলিয়ানভ লেনিন ও তাঁর সহকর্মীরা। ১৯০৫ সালের বিপ্লবেও কৃষ্ণ-সাগরের পোটেমকিন যুদ্ধজাহাজের বিদ্রোহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নৌবিদ্রোহ দিয়েই রুশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের শুরু। তার আগে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধেও প্রথম বিদ্রোহ শুরু হয় সেনাবাহিনীর মধ্যে। তার নির্মাতা বা সংগঠক ছিলেন লেনিন ও বলশেভিক পার্টি।[৪]

অতি আধুনিক যুগে আলজেরিয়া ও কিউবা, ইরাক ও ঈজিপ্ট সেনা-বাহিনীর প্রগতিশীল ভূমিকার অন্যতম দৃষ্টান্ত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁরা ছিলেন বিপ্লবী গণতন্ত্রকামী জনতার পাশে এবং বিপ্লবের সমান অংশীদার।

ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা কি ছিল, এই প্রশ্ন এখনও তেমন বড় হয়ে দেখা দেয়নি। কিন্তু বিপ্লবের মহাযজ্ঞে কার কতখানি অবদান, সে ছোট হোক বড় হোক তার মূল্যায়ন হওয়া উচিত। আগামী দিনের গবেষকরা নিশ্চয়ই এই দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্যানুসন্ধান করবেন। আমি আমার এই নিবন্ধে তাঁদের সম্মুখে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য তথ্য উপস্থিত করছি।

প্রথমত স্বাধীনতার অর্থ যদি বৃটিশ শাসক থেকে ভারতবর্ষের মুক্তি এই হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে ওহাবি সংগ্রামের উদ্যোগপর্ব ভারতের মুক্তি সংগ্রামের শুরু ধরা যেতে পারে। কারণ ওহাবিদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং সংগঠিত প্রয়াসের মধ্যে যে-কথাটি সবচেয়ে পরিষ্কার, সেটা হচ্ছে

৩। History of the U. S. S. R., Vol. II.

৪। History of the U. S. S. R. Vol. III.

বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বা ধর্মযুদ্ধ এবং এই যুদ্ধ জয়লাভের জন্যে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিপ্লবী চক্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। "Their ultimate object had been the overthrow of British Power in India and that with this view they had been endeouvaring to make converts among the native army."[৫] ওহাবী নায়ক সৈয়দ আহমেদ নিজে প্রথম থেকেই এইদিকে নজর দেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৮৩৯ সালে হায়দারাবাদ, মাদ্রাজ, ভেলোর ; ১৮৪৫ সালে পাটনা ও ১৮৫২ সালে রাওলপিণ্ডি প্রভৃতি যেসব ষড়যন্ত্র মামলার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়, তার মধ্যে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংযোগসাধনের বিভিন্ন কলাকৌশলের তথ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাধারণত পণ্ডিত ও মোল্লাদের সাহায্যে সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হতো। তারপর দেওয়া হতো ওহাবীদের কাগজ-পত্র যার মধ্যে ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য বৃটিশদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের কথা বারবার বলা হতো।

১৮৩০ সাল থেকে ওহাবীদের সংগ্রাম চট্টগ্রাম থেকে পেশবার, মাদ্রাজ থেকে কাশ্মীর সীমান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মধ্যে যা-কিছু সামান্য সাংগঠনিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, প্রায় সবটাই এসেছিল ওহাবী মুক্তিযোদ্ধাদের তরফ থেকে। রাণী লক্ষ্মীবাই, নানাফারনবিশ, কনোয়ার সিং ও মঙ্গল পাঁড়ের প্রচেষ্টার মধ্যে ভারতের মুক্তিযুদ্ধের পরিষ্কার ঘোষণা বা সাংগঠনিক কুশলতার কোনো নজির প্রায় দুর্লভ।[৬] শারিয়াতুল্লার ফরাজী আন্দোলন ছিল প্রধানত গরিব অত্যাচারিত কৃষকদের প্রতিবাদ। বারাসতের নিসার আলি (তিতুমির) ও ফরিদপুরের মহম্মদ মুসলিমের (দুদুমিঞা) বিদ্রোহ ভারতের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম আবাহন সঙ্গীত। উত্তরকালে হায়দরাবাদের মুবারিজুদ্দৌলা (১৮৩৯) বেঙ্গল আর্মির মধ্যে বিদ্রোহী চক্র গড়ে তোলেন।

সম্পর্কে ফ্রেজার ও ম্যলকমের নেতৃত্বে একটি তথ্যানুসন্ধানী দল লিখিত মন্তব্য করেন— "...That Mubariz had not only enter-

৫। G. Ahmed, Wahabi movement, N. C. Chawdhury's monograph : the Wahabi conspiracy in Hydrabad 1839-40.

৬। Revolt of Hindusthan.

tained treasonable designs against his sovereign (the Nizam) but also had hostile intention more specifically directed against the British Government as manifested by the extra ordinary pains he and agents had taken to tamper with the allegiance of Native infantry especially at Secundrabad and Nagpur".[৭]

মুবারিজকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় (১৮৪০)। ১৮৫৪ সালে গোলকুণ্ডা দুর্গে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

১৮৩৯ সালে ভেলোরের ভারপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারী মাদ্রাজ সরকারকে এক চিঠিতে জানান যে কবুদা মিঞা (Cowda-Mian) নামে একজন লোক সৈনিকদের সঙ্গে দাবা খেলে বন্ধুত্ব করতে চেষ্টা করছিলেন। তিনি নিয়মিত রাজদ্রোহাত্মক প্রচারপত্র বিলি করে চলেছিলেন।

বিহারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে, এখানেও সেনা-বাহিনীর লোকেরা সহজেই ওহাবীদের প্রভাবের মধ্যে এসে পড়ে।

১৮৪৫ সালের সরকারী রিপোর্টে জানা যায় যে, চারদিকে এক ব্যাপক ষড়যন্ত্র চলেছে — "to tamper with the allegiance of the native officers and sepoys in Dinapur." পিরবকস (Ist Regiment N I) ও রাহাত আলীর মধ্যে সংযোগ হয়। ওহাবী নেতা সইফ আলী ছিলেন ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা! একজন পণ্ডিতের সাহায্যে তিনি সৈন্যদের মধ্যে রাজদ্রোহ প্রচার করেন। সৈইফ আলীকে ধরা সম্ভব হয়নি। তিনি ভারতের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এক বিস্ময়।

১৮৫২ সালে রাওলপিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলায় 'চতুর্থ দেশীয় পদাতিক বাহিনী'র (4th Native Infantry) মুন্সী মহম্মদালী কৃত অনেকগুলি চিঠিপত্র থেকে জানা যায় যে, সিতানার আক্রামুল্লা, পাটনার হুসেন আলিখাঁনের সঙ্গে একযোগে এঁরা সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটাবার প্রচেষ্টায় ছিলেন। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মীরাটের কাজী মহম্মদ ও লুধিয়ানার আব্বাস আলী। ওহাবীদের এই মহৎ প্রচেষ্টা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ডাঃ কোয়ামুদ্দীন আহমেদ লিখেছেন—"It is to the credit of the Wahabi

৭। G. Ahmed, Wahabi movement
Hunter, The Indian Mussalman.

leaders that they realised very early in their struggle with the English that the Indian Army occupied a key position in it. This was the main instrument of the power of the English and if this could somehow be 'neutralised' half the battle would be won. It was this realisation which made the Wahabi agents repeatedly bring home to the Indian Sepoys the full extent of the immense power wielded by them and of the dependence of the English on them…" "ওহাবীরা সাটলেজ থেকে কলকাতা পর্যন্ত প্রত্যেকটি সামরিক ঘাঁটিতে সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংযোগ সাধন করার চেষ্টা করেন।"[৮]

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মধ্যে বিভিন্ন বিদ্রোহের স্রোতোধারা এক উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করে। নিঃসন্দেহে ওহাবী মুক্তিকামীরাই ছিলেন সবচেয়ে বেগবান প্রবাহ। দুঃখের বিষয় ওহাবী মুক্তিসংগ্রাম অভিজাত ইতিহাসের আসরে আজও অপাংক্তেয়। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ফলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংগঠন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করা হয়। সাঁজোয়াবাহিনী, ভারী-কামান-বাহিনীতে সম্পূর্ণভাবে ইংরেজ কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৯] তাছাড়া সামরিকবাহিনীর মধ্যে গুপ্তচর বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। রাজদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য।" সেনাবাহিনীর মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণের ভিত্তিতে ইংরেজ ও দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে দুটো সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়।[১০] ১৮৫৭ সালের পর ওহাবীদের কার্যকলাপ স্তিমিত হতে থাকে। ১৮৬৩ সালে ওহাবীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ভারতে মুক্তি-সংগ্রামের এই প্রথম অধ্যায়ের যবনিকা পড়ে।

এরপর আরম্ভ হয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষের যুগে মুক্তিসংগ্রাম। ১৮৫৭ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত নবীন রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। ভারতসভা ও সর্বজনিকসভার গোড়াপত্তন হয়। আলিগড় শিক্ষা আন্দোলন ও জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হলো। ১৮৮৫ সাল

৮। G. Ahmed, Wahabi movement.

৯। Dr. R. C. Mazumder, British Paramountcy & Bengal Renaissance, Vol I.

১০। Dr. R. C. Mazumder, The Revolt of 1857.

থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত সারা দেশে এক বিপুল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে।

পাবনায় কৃষক-বিদ্রোহ, দাক্ষিণাত্য দুর্ভিক্ষ, হিউমের ভারতের অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্টে আসন্ন বিদ্রোহের চিত্র, ইংরেজ শাসন সম্পর্কে রমেশ দত্ত, গোখলে, দাদাভাই নৌরজী প্রভৃতি মডারেট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের তীব্র সমালোচনা ও ব্যর্থ আবেদন-নিবেদনের আন্দোলন ধীরেধীরে নিঃশেষ হয়ে জন্ম দিল সশস্ত্রবিদ্রোহের অগ্নিযুগ।[১১]

১৮৯৮ সালে মহারাষ্ট্রে এই বিপ্লবীপন্থার প্রথম অনুশীলন আরম্ভ হয়। পুণার নিকট এক দেশীয় রাজ্যের দেওয়ান বাবা ঠাকুর সাহেব ভারতে গুপ্ত সমিতির প্রথম উদ্ভাবক। প্রায় একই সময়ে লণ্ডনে গঠিত ('Lotus and Dagger Society') 'লোটাস ও ডেগার সমিতি' বিদেশের প্রথম সংগঠিত গুপ্ত সমিতি। এই গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের নাম জড়িত।[১২] এঁরা দুইজনেই অন্যান্য কর্মোদ্যোগের সঙ্গে সেনাবাহিনীর মধ্যে গুপ্তচক্র গড়ে তোলার কথা অন্যতম প্রধান কাজ বলে বিবেচনা করেছিলেন। ঠাকুর সাহেব এইদিক থেকে দেশীয় রাজ্যের মধ্যে সহানুভূতি সম্পন্ন সৈন্যদের নিয়ে গুপ্ত দল গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন (১৮৯৮)। এক বছরের মধ্যেই অরবিন্দ ঘোষ বরোদা কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাঙলাদেশ থেকে নিয়ে এসে বরোদার মহারাজার দেহরক্ষীবাহিনীতে ভর্তি করিয়ে দেন।[১৩] কিছুদিন কাজ করার পর যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলাদেশে চলে এসে বিপ্লবী গুপ্তসমিতি চক্র গড়ে তোলার কাজে বারীন ঘোষের সহকর্মী হন। পশ্চিম ভারতে 'অভিনব ভারতী' ও 'মিত্রমেলা' নামক গুপ্তসমিতিগুলি যে প্রথম থেকে দেশীয় রাজ্যের সেনাবাহিনীদের মধ্যে সংযোগের চেষ্টা করেছিল তা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে।[১৪] ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে অরবিন্দের যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল

১১। ডাঃ যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিকথা। Rajani Palme Dutt, India today.

১২। শ্রী অরবিন্দ ও স্বদেশী সমাজ, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী। (চিন্মোহন সেহানবীশের সৌজন্যে)।

১৩। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৬৪।

১৪। রাওলাট কমিটির রিপোর্ট ; Bombay Freedom Movement Paper, Vol 1.

তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।[১৫] অরবিন্দ তাঁর আত্মজীবনীতে এক জায়গায় লিখেছেন[১৬]—"The Thakur was 'a noble of the Udaipur State' and happened to be the head of a secret society that had been silently working in Bombay. ···His foresight made him realise that unless there be a considerable section in the Army to help the cause of the revolution, the movement could not have the same strength as was essential for this occassion. On this assumption he directed his secret efforts towards this end and succeeded in winning over two or three regiments of the Indian Army."[১৭]

অরবিন্দ ঘোষ পরবর্তীকালে ১৯০৭ সালে ১২ই আগস্ট 'যুগান্তর' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এক জায়গায় লিখেছিলেন—"The foreign goverment has to recruit most of the soldiers from among the people. There fore if the revolutionists secretly announce the message of independence to there native soldiers, a noble work will be done. When at least they have to encounter the imperial power the revolutionists not only gain the well trained native soldiers, but also get the benefit of the arms and ammunition which the imperial power gave the soldiers." রাওলাট কমিটির রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়, যে-কয়টি গ্রন্থ আদিপর্বে বিপ্লবী দলগুলিকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে তার একটি গ্রন্থ হচ্ছে 'মুক্তি কোন পথে' ও দ্বিতীয়টি 'বর্তমান রণনীতি'। 'মুক্তি কোন পথে'-এর এক জায়গায় আছে—"The assistance of Indian soldiers must be obtained. They should be made to realize the misery and wretchedness of the country"[১৮] অন্য এক জায়গায়—'Although these soldiers

---

১৫। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম, পৃষ্ঠা.৬৪।

১৬। Arbinda on himself and on mother, পৃষ্ঠা ২৮।

১৭। K. C. Ghosh, Roll of Honour, Pp. 67.

১৮। Sedition Commission Report.

for the sake of their stomach accept service in the Government of the ruling foreigners. Still they were nothing but men made of flesh and blood. They possessed the power of original thinking. Therefore when the revolutionaries had explained to them the woes and miseries of the country they in proper time, would swell the ranks of the revolutionaries with arms and weapons given to them by the rulers. As it was possible to persuade the soldiers in this way, the modern English Raj of India did not allow the cunning Bengalies to enter into the ranks of the Army. ······Aid in the shape of arms might be secretly obtained by securing the help of the foreign ruling powers."[১৯]

স্বভাবতই সে-যুগে বিভিন্ন সংবাদপত্রে অগ্নিবর্ষী প্রবন্ধগুলি সশস্ত্রবাহিনীর লোকেদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। যথা—পুণাবৈভব (১৮৯৭), মদভৃত্য (১৮৯৭), কেশরী, কাল (১৮৯৪), বিহারী। বন্দেমাতরম (১৯০৬), যুগান্তর, সন্ধ্যা, নবশক্তি, কর্মযোগিন (১৯০৬), প্রতোদ (বম্বে), সহায়ক (লাহোর), পোশোয়াল (লাহোর), হুঙ্কার, স্বরাজ, দেশসেবক, জমিন্দার (লাহোর)।[২০]

১৯০৭-৮ সালে পাঞ্জাবে কলোনাইজেশন বিল নিয়ে বিরাট আন্দোলন হয়। অজিত সিং, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি এই আন্দোলনে ধৃত হন। এই সময়ে গোটা পাঞ্জাব গর্জে ওঠে। "ব্যারাকে ব্যারাকে শিখ সৈনিকেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।" লর্ড কিচেনার অবশ্য বিক্ষোভ বেশি দূর গড়াতে দেননি।[২১]

বিদেশে তখন শ্যামজী কৃষ্ণভার্মা, হরদয়াল, সাভারকার 'The Indian sociologist' কাগজখানার মাধ্যমে রাজদ্রোহ প্রচার করতে থাকেন। এই সময়ে তাঁরা ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের অমর শহীদ স্মরণে এক সভার আয়োজন করেন। এরপর থেকে মহাবিদ্রোহের অমর কাহিনী সেনানিবাস-গুলিতে প্রচারের ব্যবস্থা হয়।[২২]

১৯। Sedetion Commission Report.

২০। K. C. Ghosh, Roll of Honour, Pp. 134.

২১। Rowlat Commision Report.

২২। —do—

১৯০৯ সালে বিপ্লবী যতীন মুখার্জি, আদি অনুশীলন বা কলকাতার অনুশীলন দল (যুগান্তর) সহ বাঙলাদেশের অনেকগুলি দলকে এক নেতৃত্বাধীনে নিয়ে আসেন। অরবিন্দ ঘোষের পর তিনি আবার সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শিবপুরের নরেন চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে একজন শিখ সৈনিকের সঙ্গে প্রথম সংযোগ করা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে যখন ব্রিটেন ও জার্মানির যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল, তখন ভারতবর্ষে বিশেষ করে উত্তর ভারতে যতীন মুখার্জি ও ডাঃ রাসবিহারী বসু মিলিতভাবে সেনানিবাসগুলিতে সংযোগ আরম্ভ করেন। বিদেশে জার্মান সরকার সমর্থিত বিখ্যাত 'বার্লিন কমিটি' রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ. মৌলানা বরকতুল্লা, ওবিদুল্লা সিন্ধী, ডাঃ ভূপেন দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য, মাদাম কামা, বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নেতৃত্বে বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করা হয়।

রাওলাট কমিশন এ-সম্পর্কে এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন—"It was supported by efforts to evolve a system to affiliate all those behind the movement into an efficient working unit the principal aim of which would be to cause mutiny among native troops in British India and in different centres engaged in war."

"One of the prominent Indian revolutionaries was given charge to direct a campaign to win Indian prisoners of war caytured by the Germans from tne British ranks from their allegiance."

কলকাতার ফোর্ট-উইলিয়ামে তখন ১০ নম্বর জাঠ রেজিমেণ্টের সঙ্গে যে সংযোগ সাধন করা হয়, সে-ব্যাপারে অনুশীলন ও যুগান্তর দুই দলেরই দাবি আছে। তবে যতীন মুখার্জি যে এই প্রধান উদ্যোগের সংগঠক ছিলেন তা অনস্বীকার্য।

১৯১৫ সালের বিপ্লবীদের এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী তাঁর 'জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৭২) নিম্নলিখিত, মন্তব্য করেছেন (১৯১৫ সাল)—"এদিকে দেশে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ, বোমা তৈরির ও ভারতীয় সৈন্যদিগকে হাত করার চেষ্টা চলিতে থাকে। ···শুধু বাঙলাদেশে ১২ শত বিপ্লবী ধৃত হইয়া জেলে আবদ্ধ হইল। বিপ্লব চেষ্টা তবু চলিতে লাগিল। শ্রীরাসবিহারী বসু, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, গিরিজা দত্ত, অনুকূল চক্রবর্তী

অমৃত সরকার, পণ্ডিত পরমানন্দ, পৃথ্বি সিং আজাদ, জোয়াল সিং, মোহন সিং, পণ্ডিত জগৎরাম, বিষ্ণু গনেশ পিংলে, বিনায়ক রাও কামলে প্রভৃতি অনুশীলন সমিতির নেতারা ও কর্মীগণ লাহোর হইতে ঢাকা পর্যন্ত এবং মধ্যপ্রদেশে সৈন্যদল হাত করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সৈন্য সংগ্রহের জন্য শ্রীরাসবিহারী বসু ও শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, শ্রীদামোদর স্বরূপকে এলাহাবাদে, দিলা সিংকে কাশীতে, বিশ্বনাথ পাঁড়ে ও মঙ্গল পাঁড়েকে রামগড়ে, জব্বলপুরে কর্তার সিং ও পৃথ্বি সিংকে লাহোর আম্বালা, ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি, বিষ্ণু গণেশ পিংলেকে মীরাট, পণ্ডিত জগৎরামকে পেশোয়ার, পণ্ডিত পরমানন্দকে ঝাঁসী, কানপুর প্রভৃতি স্থানে পাঠাইলেন। সর্দ্দার মদন সিং ও সর্দ্দার হাজরা সিং ২৬ নম্বর শিখ রেজিমেণ্টের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। সর্দ্দার হরনাম সিং মিয়ানওয়ালী ছাউনীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন।”

মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে ইংরেজদের উপর্যুপরি পরাজয়ের ফলে বৃটিশ সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়ে। এই সময়ে ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচারের ফলে সৈনিকদের মনে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগে। “তাহারা বিদেশী সরকারের জন্য প্রাণ বিসর্জন অপেক্ষা স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন করাই শ্রেয় বলিয়া মনে করিল। রাসবিহারীর সংস্পর্শে ভারতীয় সৈনিকদের আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া আসিল. তাহারা দেখিল ভারতের স্বাধীনতা তাহাদেরই হাতের মুঠার মধ্যে। ঐ সময় ভারতে মাত্র ১২ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য ছিল। ভারতীয় সৈন্যগণ স্থির করিলেন, তাহারা হঠাৎ ব্রিটিশ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া, পরাজিত ও বন্দী করিয়া, প্রকাশ্য ঘোষণা দ্বারা জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিবেন। ঐ সময় তাহাদের বন্দুক নিজেদের নিকট রাখিতে পারিত এবং ফোর্টের ভিতর তাহাদের আত্মীয় যাইতে পারিত। রাসবিহারী বোস-এর নামে যখন বহু সহস্র টাকা পুরস্কার ঘোষণা ছিল, তখন তিনি সৈনিকদের আত্মীয় সাজিয়া ফোর্টের ভিতর গিয়া সৈন্যদের সহিত ভাবী বিপ্লব সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিতেন। ফোর্টের গেটে রাসবিহারীর বিশ্বস্ত ভক্ত পাহারা দিত। এইসব ঘটনা যখন প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন হইতে আর সিপাহীদিগের নিকট বন্দুক রাখিতে দেওয়া হয় না, প্রত্যহ কুচকাওয়াজের পর বন্দুক মেগাজিনে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং ফোর্টের ভিতর বাহিরের কোন লোক যাইতে পারে না।”[২৩]

২৩। মহারাজের মন্তব্য, পৃষ্ঠা ৭২-৭৩।

যুগান্তর, অনুশীলন সমিতির সঙ্গে আরো দুটি প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। আমেরিকার গদর পার্টি ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবে অংশগ্রহণের অভিপ্রায়ে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে সচেষ্ট হয়। বাবা মোহন সিং ছিলেন এদের সভাপতি। সেনাবাহিনীর মধ্যে তাঁদের যথেষ্ট সংযোগ ছিল। পাঞ্জাবী সেনারাই শৌর্য-বীর্যের অধিকারী, সুতরাং গদর দল কামাগাটামারু নামক জাহাজে কলকাতার বজবজে পৌছাবার পর এক ঐতিহাসিক সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এর আগে "এই দলের স্টকহলমে (১৯১৪) এক সম্মেলনে স্থির হয় ভারতে বিপ্লবী দলের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে এবং ভারতের বাহিরে ভারতীয় সৈনিকদের সহিত যোগা-যোগ স্থাপন করিতে হইবে।"[২৪] এই সংঘর্ষ এড়িয়ে অনেক শিখ পাঞ্জাবি উপস্থিত হতে সক্ষম হন। শত শত শিখ এইবার সৈন্যদের মধ্যে কাজে নেমে যান।

অপর প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত 'প্যান ঐস্লামিক বিপ্লবী দল' দেওবন্ধ মহাবিদ্যালয় থেকে যেসব প্রগতিশীল মুসলিম যুবক মধ্যপ্রাচ্যের দিকে অধ্যয়নের জন্য গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই বিপ্লবী দিকটি গড়ে তোলেন। ব্রিটিশ-দের তাড়িয়ে ভারত স্বাধীন করার ব্রত তাঁরাও গ্রহণ করেন। ওবিদুল্লা সিন্ধি ছিলেন এঁদের নেতা। তুর্কীর আনোয়ার পাশা ও মিশরের বিপ্লবীরা এঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমস্ত মধ্য প্রাচ্য, উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধু, পাঞ্জাব কাশ্মীর, ইরাক, ইরান, হেজাজ, আরব প্রভৃতি দেশে এঁদের কেন্দ্র ছিল। সৈন্যদের মধ্যে ও ভারতের বাইরে বসরা, মালয়, সিঙ্গাপুর, জাভা, সাংহাই প্রভৃতি সেনানিবাসে এঁরা প্রচারপত্র বিলি করতেন। (রাওলাট কমিশন)। কথা ছিল ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯১৫ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হবে। কিন্তু কৃপাল সিং নামে একজন সৈনিকের বিশ্বাসঘাতকতায় অভ্যুত্থানের পূর্বেই ব্রিটিশ সরকার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক খানাতল্লাসী ও ধরপাকড় শুরু করে। পণ্ডিত জগৎরাম পেশোয়ারে ধৃত হন। পিংলে বোমা-পিস্তল সহ মীরাট কেণ্টনমেণ্টে দ্বাদশ অশ্বারোহী বাহিনীর লাইনে ধৃত হলেন। নবম ভূপাল পদাতিকবাহিনীর শিখ হাবিলদার সর্দ্দার হরনাম সিং ফৈজাবাদে ধৃত হন। সর্দ্দার নারায়ণ সিংহ ও সর্দ্দার মোহনলাল পিস্তল সহ ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মেইমোতে ধৃত হন। গভর্নমেণ্ট ভারতীয় সৈন্যদের বিভিন্ন স্থানে ছত্রভঙ্গ করে দিল। আম্বালা, ফিরোজ প্রভৃতি স্থানে যেসব ভারতীয় সিপাহী বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন

২৪। রাওলাট কমিশন। গদর—১৯১৫।

কোর্টমার্শাল বিচারে তাদের গুলি করে হত্যা করা হলো। (মহারাজের মন্তব্য)। এই সময় বসরাতে প্রায় দুইশত বিদ্রোহী সৈন্যকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

রাওলাট কমিশনে ও ডেভিড পেট্রির 'দূরপ্রাচ্যে রাজদ্রোহাত্মক কার্যাবলী সংক্রান্ত রিপোর্ট'-এ মন্তব্য করা হয়েছে—"The revolutionaries were to go through China, Japan, Borneo and Siam into Burma. In the west it was planned to seize Suez Canal to go through Persia and Afganisthan and thence to the west coast of India.

"The scheme which depended on Moslem disaffection was directed against the north west frontier.

"But the other scheme relied upon the Ghadar party of Sanfrancisco and the Bengali revolutionaries."[২৫]

"১৯১৫ সালে হেরম্ব গুপ্ত, ওবিদুল্লা সিন্ধি, মৌলানা বরকৎউল্লা প্রভৃতি কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবী বার্লিন কমিটির প্রতিনিধিরূপে কনস্টান্টিনোপল-এ উপনীত হন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল মেসোপোটেমিয়ায় অবস্থিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রচার পুস্তিকা বিতরণ করে তাদের বিদ্রোহের পথে নিয়ে আসা।" সম্ভবত এঁদের প্রচেষ্টাতেই বসরাতে বিদ্রোহ হয় এবং সে-বিদ্রোহ হেজাজের মেয়র মহম্মদ শরীফের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যর্থ হয়। এঁদের কিছু অংশ পারস্যের দিকে অগ্রসর হয়ে ধৃত হন এবং সবাইকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই নিয়ে যে-মামলা দায়ের করা হয় তার নাম 'রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র মামলা'। পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্যূন প্রায় ৩০ জন মুসলিম ছাত্র-বিপ্লবীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। বাকি সবাইকে দীর্ঘদিনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[২৬]

১৯১৫ সালে দূর প্রাচ্যে সিঙ্গাপুরে অবস্থিত 6th Native Light Infantry ও ভারতীয় সৈন্যগণ ১৫ই ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতা ঘোষণা করে বিদ্রোহ করেন। ভারতীয় সৈন্যগণ ইংরেজ সৈন্যদের বন্দী করে দু-সপ্তাহ পর্যন্ত সিঙ্গাপুর শহর দখল করে রাখেন। অবশেষে ব্রিটিশের মিত্র জাপ-রণতরীর সাহায্যে বিদ্রোহ দমন সম্ভব হয়।

২৫। Rowlat Commission Report.

২৬। Do

এই বিদ্রোহে চারজন ইংরেজ সেনাও যোগ দেন। কাশিম ইসমাইল মনসুর ও মোহনলাল ছিলেন এই বিদ্রোহের প্রধান নায়ক। ৮ই মার্চ রসুলাহ ইমতিয়াজ আলি, রঘনুদ্দিনকে ; ১৩ই মার্চ হাবিলদার বান্দ সলেইমান, নায়েক মুন্সী খান, নায়েক জাফর আলি খান ও আবদুর রেজা খানকে চরম দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

সেই সঙ্গে ভগৎ সিং, আতর সিং, তন্নর সিং, রুলা সিং, হাজরা সিং, তামার সিং ও বীর সিংকে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়। এ-ছাড়া ৬৫ জন বিদ্রোহী সৈনিক প্রাণ হারান।[২৭] এইসঙ্গে মালয় রাজ্যেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। এঁরা ছিলেন মালয় স্টেট গাইডের অন্তর্ভুক্ত। এই বিদ্রোহীদের মধ্যে সুবেদার দাণ্ডে খাঁন, জমাদার চিস্তি খাঁন, হাবিলদার রহমত আলি খাঁন, সিপাহী হাকিম আলি ও হাবিলদার আব্দুল গনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯১৫ সালের ২৩শে মার্চ তাঁদের কোর্ট মার্শাল করা হয়। দূর প্রাচ্যে বিদ্রোহগুলি দমন করার পর দুইটি ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। মান্দালয় ও বার্মা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী মোহনলালকে সরকারের সেনানিবাসে বিদ্রোহ সংঘটিত করার অপরাধে ১৯১৬ সালের জানুয়ারি মাসে মান্দালয় জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়।

মৃত্যুর পূর্বে লাটসাহেব জেলে গিয়ে মোহনলালকে বলেছিলেন—"ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহার প্রাণদণ্ড রহিত হইবে।"

উত্তরে মোহনলাল বলেছিলেন—"যদি প্রার্থনা করিতে হয় তবে ইংরেজ জাতিই ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, এ-দেশে তাহাদের কোন অধিকার নাই।" বিদ্রোহী[২৮] ১৩০ নম্বর বেলুচ রেজিমেণ্টের প্রায় দুশ সৈনিক বিভিন্ন দণ্ডে এবং মোস্তাফা হুসেনও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে ফাঁসির রজ্জু বরণ করেন।

"এই ষড়যন্ত্র মামলায় লালা হরদয়াল, রাসবিহারী বসু, বরকতুল্লা প্রভৃতির নাম প্রকাশ পায়। রাজসাক্ষী বলিয়াছিলেন, লাল রঙ হিন্দুর, নীল রঙ মুসলমানের, সবুজ রঙ শিখদিগের। এই মামলায় মোহনলাল কৃপারাম, হরনাম সিং, কালা সিং, বাসুদেব সিং-এর ফাঁসি হয়। চৈৎরাম কাপুর সিং, হরজিৎ সিং, বদন সিং, গুজর সিং রামরক্ষা প্রভৃতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়।[২৯]

২৭। Rowlat Commission Report.

২৮। মহারাজের মন্তব্য

২৯। ঐ

উত্তর-ভারতে বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর "বিভিন্ন কেণ্টনমেণ্টের বিপ্লবী সৈন্যদিগকে হত্যা করিয়া অবশিষ্ট যাহারা ছিলেন তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র" এই অভিযোগে বিখ্যাত "লাহোর ষড়যন্ত্র" মামলা দায়ের করা হয় (১৯:৫)।" এই মামলার তিন-দফায় ২০ জনের ফাঁসির হুকুম হয় এবং ৮০০ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশ হয়।

এই মামলার রাজসাক্ষীদের জবানবন্দী থেকে জানা যায় যে "বিপ্লবীরা মিরাট, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ, বেনারস, ফিরোজপুর, আম্বালা প্রভৃতি সেনানিবাসে গিয়া সৈনিকদের হাত করিয়াছিলেন।"[৩০]

"যাহাদের ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে ছিলেন শ্রী গণেশ বিষ্ণু পিংলে, সর্দার জগৎ সিং, সর্দার সুরণ সিং, সর্দার হরণাম সিং।"[৩১]

যাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়েছিল তাদের মধ্যে (১) বলবন্ত সিং (২) হরনাম সিং তুন্দ্রা (৩) কেদার সিং (৪) খুসল সিং (৫) নন্দ সিং (৬) পৃথ্বি সিং (৭) রুলা সিং (৮) সেওয়ান সিং (৯) মোহন সিং (১০) ওয়াসন সিং (১১) ভাই পরমানন্দ (১২) পণ্ডিত পরমানন্দ (১৩) হির্দেরাম (১৪) রামশরণ দাস (১৫) জত্রিৎ রাও (১৬) গুরুমুখ সিং (১৭) জোয়ালা সিং (১৮) শের সিং (১৯) পণ্ডিত জগৎরাম (২০) নিধান সিং (২১) কেশর সিং (২২) বিশাখা সিং (২৩) রুবসিং (২৪) ভাল সিং (২৫) কেহের সিং (২৬) উদম সিং (২৭) পিয়ারা সিং (২৮) কৃপাল সিং (২৯) ইন্দ্র সিং (৩০) লাল সিং (৩১) কালা সিং (৩২) নাথা সিং (৩৩) শিব সিং (৩৪) সজ্জন সিং প্রভৃতি ছিলেন।[৩২]

"১৯১৫ সালে বেনারস ষড়যন্ত্র মামলার রায়েও বিচারকগণ আসামীদিগের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেন তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল—নানাস্থানে সৈন্য ব্যারাকে বিক্ষোভ সৃষ্টি করা ও বিদ্রোহে উত্তেজিত করার জন্য নানাবিধ রাজদ্রোহ মূলক পুস্তকাদি প্রচার করা।" এই মামলারই অন্যতম আসামী ছিলেন রাসবিহারীর সহকর্মী বিপ্লবী নায়ক শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং তাঁর

৩০। মহারাজের মন্তব্য

৩১। ঐ

৩২। রাওলাট কমিশন রিপোর্ট।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীদামোদর স্বরূপ, গণেশলাল, নলিনী মুখার্জি, কালীপদ, জিতেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রভৃতি।[৩৩]

প্রথম মহাযুদ্ধের ১৯১৪-১৬ সালের মধ্যেই সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় বিদ্রোহ ও বিপ্লব সংঘটিত করার মহৎ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।· এই ব্যাপক প্রচেষ্টার ব্যর্থতার মূলে একটি বড় কারণ ছিল। সাম্প্রদায়িক ঐক্য, অসামান্য বীরত্ব ও আত্মত্যাগের জ্বলন্ত নিদর্শন সত্বেও এই বিদ্রোহগুলির ব্যর্থতার পশ্চাতে ব্যাপক গণচেতনার একান্ত অভাবই সেই কারণ। সমস্ত পরিকল্পনাগুলি ছিল জার্মানির জয়-পরাজয়কে কেন্দ্র করে। জার্মানির পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহের প্রধান প্রেরণার সূত্রও নিঃশেষ হয়।

দ্বিতীয়ত, বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ দেশবাসীকে তাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র সম্পর্কে কোনো আভাস না দিতে পারার ফলে গণচেতনার দৃঢ় ভিত্তির উপর এই বিপ্লব প্রচেষ্টা রচিত হলো না। এমন কি ইতালি বা আয়ার্ল্যাণ্ডের বিদ্রোহের মতো গণভিত্তিও রচনা করা হয়নি। ডিসেম্ব্রিস্টরাও ১৮২৮ সালে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের ছবি দিতে পেরেছিলেন।[৩৪]

তৃতীয়ত, বিদেশ থেকে যাঁরা এই বিপ্লবের পরিকল্পনা ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের অনেকের দেশপ্রেম সম্পর্কে সন্দেহ করার মতো সঙ্গত কারণ আছে। টাকা-পয়সা নিয়ে কাড়াকাড়ি, পারস্পরিক হিংসা, হীনমন্যতা ও আত্মসর্বস্ব সঙ্কীর্ণ মনোভাব জাতীয় বিপ্লবের অগ্রগতির পক্ষে প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৩৫] অথচ যাঁরা তাঁদের নির্দেশে বিদ্রোহে প্রাণ দিলেন তাঁরা তাঁদের নেতাদের চেয়েও মহান। ইতিহাসে এঁদের কোনো স্থান হয়নি। এঁদের সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন আছে। কারণ এঁদের গৌরবময় ঐতিহ্য আমাদের সৈনিকদের মনে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আনবে।

১৯১৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভূমিকার বিষয়ে পরবর্তী কোনো সংখ্যায় আলোচনার আশা রইল।

৩৩। রাওলাট কমিশন রিপোর্ট। মহারাজের মন্তব্য।

৩৪। ডাঃ ভূপেন দত্ত, অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড।

৩৫। German Micro Film documental record of German Foreign office. ডাঃ ভূপেন দত্ত, অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড। ডাঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য, ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা। M. N. Roy, Autobiography.

নিজের মুখোমুখি আমরা

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

কেউ কেউ না খেয়ে রাত কাটায়, দীর্ঘদিন···
কেউ কেউ ভাঙা-গালে হাত দিয়ে বসে থাকে,
কেউ বা,
অকারণে রাস্তায় নিহত হয়।
কেউ কেউ জন্মেছে বলেই অপরাধী,
কারুর
চোখ তুলে তাকাবার অধিকার নেই।
এ সবই আমরা শুনেছি, ভুলেছি, শুনেছি
কতবার···
শুনি, ভুলি, শুনি, প্রতিদিন
উঠতে বসতে, রাস্তায় রেস্তোঁরায়
চা খেতে-খেতে, কাগজ-হাতে, অন্যমনস্ক
গল্পের ফাঁকে ফাঁকে,—দেখি, ভুলি, দেখি,—
কতবার—।
হঠাৎ সেই ম্রিয়মান ছায়াগুলি
কি করে অশ্বারোহণে ছুটে আসে!
চিরপলাতক শিখাগুলি—
প্রকাণ্ড কালো ঘোড়ার মতো। নাসারন্ধ্রে আগুন
স্ফুরিত নাসারন্ধ্রে
বিদ্যুৎ ক্ষুরধ্বনিতে ; কঠিন ক্ষুরধ্বনিতে
বিদ্যুৎ—
আমরা অবাক!
এই সব রক্তমুখী বিশাল বর্শাগুলি,
কি করে এতকাল চোরকাঁটার মতো লুকিয়েছিল।
আয়নায় নিজের মুখ আর চিনতে পারি না
পরস্পরকে কি নামে ডাকব জানি না।

আর পরস্পরকে··· ।
নতুন চোখে দেখতে গিয়ে চোখ বুঁজি
কি বলব আমরা ? কি ভাবব ?
আমরা
জীবন্ত অস্বস্তি হয়ে জেগে থাকি ॥

বুলেট

প্রভাকর মাঝি

সেয়ানা সংসারে থেকে বেধড়ক খাচ্ছিল ও মার,
শেখে নি বাঁচার বিদ্যে। এবং শতাব্দী নয় সতী।
ঘা দিয়ে, চিৎকার করে, যে যার আদায় করে দাবি,
মৃত্তিকায় মুখ থুবড়ে ও ভাবছিল : নিয়তি, নিয়তি।

আদ্যিকালের ভোঁতা চিন্তাগুলো চটকাতো কেবল,
জানতো না কালে কালে মত পথ জীবন বদলায়।
চকচকে তলোয়ার—বুদ্ধি নিয়ে দক্ষ খেলোয়াড়
নির্বোধ গাড়োলটার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায়।

কেঁচোর মতন এই কুঁকড়ে-বেঁচে-থাকা কোনোক্রমে
নিবতে গিয়ে জ্বলে উঠতে ইচ্ছে নেই দাউ দাউ করে ?
আসলে, নিজের ঘরে নিজেই ও ছিল পরবাসী—
জিরো আওয়ারের ঘণ্টি বেজে উঠলো একদা অন্তরে।

ধাক্কা খেতে খেতে, ঝেঁকে উঠলো মাথা—যা হচ্ছিল হেঁট
রুখে উঠতে দেখা গেল—কেঁচো নয়, ও আস্ত বুলেট।

'কুয়ো ভাডিস'

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

জীবন-অনীহা একি, মর্ষকাম ভাঙনে সোচ্চার ?
নাকি কোন ফ্রয়ডিয় আদিপাপ-অপরাধ বোধ
ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে আত্মঘাতী, কুরুক্ষেত্রে পদসঞ্চার ?
নাকি শুধু সর্ত্তাধীন পরাবর্ত্তে আশ্রিত, নির্বোধ.
শ্বাপদ. মনুষ্যেতর নখদন্ত বিকাশের ছল ?
জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরাজিত মানব সন্তান
জীবনের কামনায় অনীহাকে করেছে সম্বল,

কার্য ও কারণ তার, মূল্যমান. কে করে সন্ধান ?
তবু জানি. মানবজাতির প্রতি চরম বিশ্বাস
রবীন্দ্রনাথের কাছে সহজাত উত্তরাধিকার,
যা পেয়েছে সারা দেশ, সে বায়ুতে প্রাণের নিঃশ্বাস,
সে দীপ্তিতে আছে আলো, দূর হবে যাতে অন্ধকার ।
সেই আলো, সেই হাওয়া, জীবনের সেই সার্থকতা
রয়েছে সমুখে, তবু তাকে ফেলে চলেছি এ কোথা ?

স্বপ্ন-তোরণ

পরিমল চক্রবর্তী

তারপরেও অনেকক্ষণ তোমার স্মৃতি আমাকে ঘিরে
থাকলো···ছায়ার মতো···মায়ার মতো। আমি ভয়ে
ভয়ে পা বাড়ালাম হৃদয়ের সবুজ প্রান্তরের ওপর
দিয়ে পায়ে-হাঁটা সেই পথে, যে-পথটা থেকে থেকে
এঁকেবেঁকে মনের অরণ্যে এসে হারিয়ে গিয়েছে ॥

কান্নার যে-খেইটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম একেবারে
কৈশোরের প্রান্তিক প্রহরে, সে-খেইটা আবার ফিরে
পেলাম যৌবনের ত্রিসীমায় পৌঁছেই ; অথচ, আশ্চর্য,
তার স্বরূপ বদলে গেলো ঋতুবদলের মতো। তবু, তবু
শেষ বিস্মরণের আগে, তোমার কথাই আবার মনে পড়লো
একবার···বারবার······বহুবার ॥

তখন আমি একা একা স্বপ্ন-তোরণে দাঁড়িয়ে ॥

কালের নায়ক

সরিৎ শর্মা

১

আমি অনেকবার শীর্ষবিন্দু দেখতে চেয়েছি
পাহাড়ের পাদদেশে শুয়ে—
অভ্রংলিহ কিনা···

অনেকবার দিগন্তের সীমান্ত দেখতে চেয়েছি
সৈকতে সমান্তরাল শুয়ে—
সমুদ্র দিগ্‌বলয়ান্ত কিনা···

আমি অনেকবার শব্দের তরঙ্গ ছুঁতে চেয়েছি
নৈঃশব্দের দেওয়ালে কান পেতে—
শব্দও অপার কিনা···

অনেকবার সময়কে মাপতে চেয়েছি
দিনপঞ্জি, ঘড়ির কাঁটায়—
অনাদ্যন্ত কিনা···

শূন্যতায়
অস্তিত্বের খণ্ডিত চেতনায়
চেতনায় বিচ্ছিন্ন ব্যর্থতায়
ব্যর্থতায় নিরস্ত ক্ষুদ্রতায়
ক্ষুদ্রতায় একান্ত দর্পণে
শূন্যতায়
স্ফুটমান পট তুমি মানুষের
সংহত অভিজ্ঞ ক্রম···সমগ্র অস্তিত্ব ক্রম···
　　পাহাড়ের চূড়োয় পাহাড়
　　সমুদ্রের পারে সমুদ্র
　　শব্দের ওপারে শব্দ
　　সময়ের অমিত সময়

২

অথচ সময় তুমি নির্যাতিত মৃত্যুর
　　সময় যুদ্ধ বিপ্লবের
সময় তুমি সুখ-শান্তির
সময় মানবিক মহা সৃষ্টির
　　মহা প্রেম, নবজাতকের···

৩

প্রেম ··
আমার　　প্রতি মুহূর্তের পতনে তুমি
　　অংকুশ—　　প্রেমের মতন···
　　প্রতি মুহূর্তের মহিমায় তুমি
　　সূর্য—প্রেমের মতন···
যন্ত্রণার ব্যাখ্যা ·　প্রিয়　আনন্দের দিশারী
হৃৎপিণ্ডের শব্দ　প্রিয়　ভালোবাসার অভীপ্সা
　　তুমি　　প্রেম···

৪

হে আমার নিকট সুদূর
হে আমার অদেখা প্রত্যক্ষ
হে আমার অজানা বিজ্ঞান···
আমার সকল পথেই তোমার পদচিহ্ন ভবিষ্যৎ
পথের মোড়ে তোরণ দ্বারে তোমারই ছবি ভবিষ্যৎ
নিহত আমার রক্তে লেখা তোমারই শপথ ভবিষ্যৎ
সকল নামের অন্তরালে তোমারই নাম ভবিষ্যৎ
হে আমার বিরোধের কেন্দ্র
হে আমার মিলনের সমাধান
স্বদেশে বিদেশে সেতুবন্ধ···

৫

শোষণের ধ্রুব মৃত্যু ভ্রান্তির রাহুমুক্তি
শান্তির স্থির বিশ্বাস লক্ষ্যের শুভ যুক্তি
যুগজীবনের নিঃশ্বাস মহা বেদনার শুক্তি
মহা মানবতা নির্যাস চির দুর্মর আশা
তোমারই নাম বলব আগুন ও ভালোবাসা
পাহাড়ের চূড়োয় পাহাড়
সমুদ্রের···
কালের নায়ক তুমি
মানুষের
তুমি চিরদিন···
তোমারই উপমা তুমি
কমরেড লেনিন।

আজ যখন বাড়ি ফিরে আসতে চাই

কালীকৃষ্ণ গুহ

দীর্ঘদিন আমি পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি, আজ যখন
বাড়ি ফিরে আসতে চাই
তখনই সমস্ত কথা মনে পড়ে, সমস্ত বিস্তীর্ণ পথ মনে পড়ে।

দীর্ঘদিন পথে পথে ঘুরে আমি একজন পাগলকে ঝুলি নামিয়ে
সারাক্ষণ খেলা করতে দেখেছি।

আমি যখনই তাকে বুঝতে চেষ্টা করেছি কাছে গিয়ে, খুব কাছে গিয়ে
তখনই সে কাঁধে ঝুলি নিয়ে কার্জন পার্কের উপর দিয়ে
হেঁটে গেছে।

আমি পথে পথে ঘুরে একজন নারীকে প্রার্থনা করতে দেখেছি
মধ্যরাত্রে, সূর্যোদয়ের কিছু আগে।
তার মুখে অন্ধকার, সূর্যোদয়ের আভা লেগে ছিলো।

আজ যখনই আমি বাড়ি ফিরে আসতে চাই, সেই পাগল
ঝুলিটা নামিয়ে রেখে গভীর ঘুমের মধ্যে ঢলে পড়ে

সেই নারী সন্তানের পাশে শুয়ে গভীর অঘোরে নিদ্রা যায়।

মায়ের কাছে, কবি

শঙ্করনাথ নাহা

নুন দিয়ে কি খাস তুই মা চিবোস কি চোখ বুঁজে
বুকের খিলে সুর আছে তোর ?   বয়স মাপার ফিতে ?
ঢেউ তোলে কি তোর জমিনে সোনার ধানের গোছা
উজান জোয়ার সে বীজ রোয়ার মুখ ফেরে কোন ভিতে ?

তোর স্নেহ মা ঘুমোয়, কাঁঠাল পাতায় ঢাকা মুখ—
অন্তঃশীলায় জ্বর, প্রলয়ের বাতাস বস্তি সাজে,
খায় কুরে হায় মৃত্যুকীটে ছেলেমেয়ের বুক
তবু শ্যামল ঘাসের জিহ্বা জ্বলে সবুজ আঁচে।

ফাটা মাঠের আলে ঘুড়ি ওড়ায় ন্যাংটো খোকা
স্বপ্নসুতোয় সুর বেঁধে সুখ অসুখে কাঁধ মেলে
সতীন শোনায় গল্প, মৃত্যুদূত যেন ঘুণপোকা
আউল বাউল বাতাস উদোম মাঠের ধুলো খেলে।

বছর বছর কার্ত্তিকমাস, বেহুলা আঁতুড় ঘরে
হায়না হানায় আমন মাঠে রক্তচোঁয়া ফাঁসি
সিদুঁর বিকেল, নিকোনো দাওয়া, সিদুঁর মোছা সতী
জোৎস্না যেন রায়বাহাদুর-পাকাগোঁফের হাসি।

ক্রমশ দ্বন্দ্বের হাতে

অলককুমার চৌধুরী

ক্রমশ দ্বন্দ্বের হাতে নিজেকে অর্পণ কোরে
নিরুপায় আমি,—
বলিষ্ঠ লাঙল কাঁধে আত্মস্থ কৃষক
নির্বিকার মেঠো হাওয়া—
দেয়ালের ছবি ;
ক্রমাগত ভিতর বাহির আর বাহির ভিতর
বারংবার আত্মপর আবার উদার ;
ঘটনার অমোঘ চক্রান্তে—
স্থিতপ্রজ্ঞ প্রসন্ন নাবিক
জলের মতন জল—
স্বপ্নিল বিভ্রম !

নীলনদীর প্রতি

[ইউসুফ আল্ সেবাই-কে]

জঁ। ব্রিয়েররি (সেনেগাল)

রজস্বলা, তোমার বিপুল হরিৎ রজঃস্রাবে
ক্রমশ কঠিন কাদা গ্রানিট-ব্যাসল্ট-ঝামাপাথরে পাথরে
গড়ে তোলে প্রকাণ্ড সবল ইমারত।
দ্বিলিঙ্গ হার্‌মাক্রোদিতে—আক্রোদিতে সন্তান যার—
তোমার বিশাল গর্ভ গর্ভাধান ও প্রজননের
উপযোগী,
দেবতা আর মানুষের বাসন্তিক বিবাহ
আর বদ্বীপ-ভূমির উপর দিয়ে বয়ে গেল ঢেউয়ের পর ঢেউ
এক জাতিপ্রবাহ : বস্তুকে স্বপ্নের আয়তন দিতে,
নগণ্য বালুকণায় খোদাই করতে
মহাজগতের প্রপঞ্চময় ছন্দ
হিসাব মেলায় যে,
অটুট রাখতে গণিত-সংখ্যার
পবিত্র আদি শব্দার্থ, জালি-কাজ আর সূক্ষ্মাগ্র খিলানের
পুষ্পময় প্রতীক তাদের।
সমুদ্র-দেবতার হাতে প্রথম দাঁড় তুলে দিলে তুমিই
কবরের দেশে-দেশে শোনাতে তোমার কীর্তিকথা।
আস্‌ওয়ান-গিরিগুহার মুখ দিলে খুলে।
খনি থেকে কেটে তুলল পাথর
তোমার ঢেউ, গড়ে তুলল
অ্যাকেশিয়া সিক্যামর আর তালীবনে
মৃদু হাতে নিপুণ পালিশ-করা অকলঙ্ক সব সৌধ।
কী-সব সৌধ !
আহ্, আকাশে মাথা তুলে ওরা হলো প্রেমের প্রহরী, মৃত্যুত্তীর্ণ,

একা প্রত্যয়ের উত্তাপে জোড় মিলিয়ে
ভিত্তি আর চূড়ার মধ্যে রচনা করল সূক্ষ্ম সমন্বয়।
খাঅপ্‌স, খাফ্রা, মাইসেরিনাস—
নাম, নাম, এরা সব ঘোষণা করে তোমার মহত্ত্ব।
ওই ঊর্মিমালা থেকে লহরে লহর তুলে জন্ম নিল এই জাতি,
মৃত্যুকে কবর দিতে ইথিওপিয়া থেকে মর্মর-ফলক বয়ে আনল
যে মানুষ-পিঁপড়ে,
যন্ত্রণার পূতিগন্ধ থেকে মুক্তি দিতে আত্মাকে
আকাশ আর অনন্তের অভিমুখ এক তীর্থপথের ধারে ধারে
শুভ্র সঙ্কেতের চিহ্ন রাখল উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে ;
যেদিন থেকে আছ তুমি, সেদিন থেকে মৃত্যু নেই এই জাতির।
নামহারা এই জনতা
যার কথা বলে না কেউ,
সৈন্যদল যার
সযত্নরক্ষিত, আরকে-ভেজানো নয়,
মরুদেশে বিস্মৃতির বালুতলে শুয়ে,
ওরা আজ ফিরে এল তোমার সকাশে—
হে মাতা, হে প্রজ্ঞা-পারঙ্গমা,
অগ্নির হে পালয়িত্রী,
অগণ্য দেবতা আর ভাস্করের জন্মদাত্রী মাতা,
পরিচ্ছন্ন গর্ভ তোমার স্নেহার্দ্র আলিঙ্গন।
দৃঢ় ও সুস্থির
মাটির উপরিতলে এখন তোমার শয্যাসুখ।
আগ্রাসনের পিছনেই আছে তোমার ফলফুলদান।
জলদান কর তুমি পিরামিডের পাথুরে শিকড়ে
আদিম রসধারার অন্তহীন আস্রবণে
যেন অব্যাহত রাখতে পারে পিরামিড-সারি, অটুট
বাতাসের সঙ্গে, বালু আর নক্ষত্রের সঙ্গে
অচলিত বিশ্বাসের সৌন্দর্যচিহ্নিত তাদের
সহস্র বৎসরের কথোপকথন।

তুমি-যে একই সঙ্গে সাগর আর ভেলা
জীবন আর মৃত্যু।
মাস্‌তাবাস স্ফিংকস আর পিরামিড-সারি
তোমার সবুজ দৃষ্টিপথেই ওরা অমর মনোহারি
জলে তোমার ছায়া ফেলে উৎরে যায় মহত্ত্বের সীমানায়—
কারণ তুমিই কেবল চিরস্থায়ী
আদিঅন্তহীন তুমি।
মানবতার কোনো আস্ফালন
সমকক্ষ নয় তোমার।
যেদিন থেকে দেখেছি তোমার বহতা জলধারা
আকাশ আর স্মারক প্রস্তরসৌধ প্রক্ষালন করে চলেছে,
আগের চেয়ে অনেক অনেক তীব্র প্রবল অবজ্ঞায়
ততদিন অভিভূত আমি ঘৃণার অনুভব রাখি ঠোঁটে—
যারা তোমায় লুণ্ঠন করল
তোমার প্রস্তরদৈত্যের মুখমণ্ডল করে দিল বিক্ষত
মমিদের অন্ত্র টেনে বের করল, অপবিত্র করল তোমার মন্দির
তাদের প্রতি—
যাদের তুমি বাধা দিচ্ছ প্রতিদিন বালুঝড়-তোলা বাতাসে
তোমার খনিজ নৈঃশব্দ্য নিয়ে, অতলস্পর্শ-দৃষ্টি নিয়ে স্ফিংক্সের।

অনুবাদ—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

গান্ধী-রম্যাঁ রলাঁর দৃষ্টিতে। রম্যা রলাঁ। অনুবাদক লোকনাথ ভট্টাচার্য। সাহিত্য অকাদেমী। মূল্য আট টাকা

গান্ধী-জন্মশতবার্ষিকীর বৎসরে সাহিত্য অকাদেমী প্রকাশিত রম্যাঁ রলাঁর গান্ধী-সম্বন্ধীয় এই বইখানি গান্ধী-সাহিত্যে একখানি উল্লেখযোগ্য অবদান। বইখানি বিশিষ্ট আরও এ-কারণে যে, এটি ইংরেজী ভাষার হাত-ফেরতা হয়ে বাঙলা ভাষায় আসেনি, যা অধিকাংশ তথাকথিত কঁতিনেতাঁল বইয়েরই বাঙলা তর্জমার বেলায় ঘটে থাকে; এ সরাসরি মূল ফরাসী ভাষা থেকে বাঙলায় অনূদিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন ডক্টর লোকনাথ ভট্টাচার্য, যাঁর কবিখ্যাতির উপরেও ফরাসী ভাষায় অধিকার সুবিদিত। ডক্টর ভট্টাচার্য রম্যাঁ রলাঁর গান্ধী-বিষয়ক চিন্তাধারাকে বাঙলা ভাষাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করে তাঁদের গান্ধী-চিন্তার দিগন্তকে বিস্তৃততর করতে সহায়তা করেছেন। এজন্য তিনি এবং তাঁর বইয়ের প্রকাশক সাহিত্য অকাদেমী সবিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

বিশ্ববিশ্রুত লেখক রম্যাঁ রলাঁর ভারত-অনুরাগ দুটি ধারায় প্রবাহিত দেখতে পাই। এর একদিকে আছে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শিবানন্দ প্রমুখ অধ্যাত্ম সাধকদের সাধনার আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, অন্যদিকে রয়েছে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে চালিত ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের অহিংস সত্যাগ্রহের কলাকৌশলের প্রতি নিবিড় অনুরাগ। এবং এই দুই প্রান্তীয় অনুরাগের মধ্যবর্তী স্তরে রয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী কাব্যাদর্শের প্রতি একজন মুখ্যত মানবতাবাদী লেখকরূপে রলাঁর সমপ্রাণতার অনুভূতি।

কিন্তু রলাঁর এই ভারত-দর্শনের কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, যা সচরাচর আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। সেটি হচ্ছে, রলাঁর ভারত-সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা বিবর্তনের চিহ্নাক্রান্ত, তা পূর্বাপর এক জায়গায় স্থাণুবৎ অচল ছিল না। উল্লিখিত দিকপাল ভারত-পুরুষদের মধ্যে যাঁরা তাঁর সময়ে জীবিত ছিলেন তাঁদের সম্পর্কে রলাঁর সশ্রদ্ধ মনোভাব অবস্থান্তর অনুযায়ী বর্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে,

যদিও মূল শ্রদ্ধার অনুভূতিতে কখনও চিড় ধরেনি। রলাঁর চিন্তার এই বিবর্তনমুখী প্রবণতা যদি আমরা ভুলে যাই এবং তাঁকে একজন নিঃসর্ত ভারতপ্রেমিক এবং 'তিনি আমাদেরই একজন' মনে করে তাঁকে বগলদাবা করবার আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠি, তাহলে রলাঁর প্রতি সুস্পষ্ট অবিচার করব।

রমাঁ্যা রলাঁ একজন আশ্চর্য মানসিকতার মানুষ। একদিকে তিনি আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতি গভীর প্রত্যয়শীল, অন্যদিকে তিনি বিশ্বের নিপীড়িত ও শোষিত মানুষদের প্রকৃত বন্ধু। আধ্যাত্মিকতা ও সাম্যবাদের মধ্যে সমন্বয় অতি কঠিন স্তরের সাধনা, এমন সাধনার দৃষ্টান্ত এদেশে বা বিদেশে কোথাও তেমন দেখা যায় না; সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভেরই একটি বিরল উদাহরণ হলেন রমাঁ্যা রলাঁ।

অন্য ভারত-মনীষীদের প্রসঙ্গ এখন থাকুক, গান্ধীজি সম্পর্কে রলাঁর ভাবনা চিন্তার মূল্যায়নের বেলাতেও আমাদের উপরের পটভূমিটি সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য। আমরা যখন গান্ধীজির অহিংস অসহযোগের কার্যক্রমের মাহাত্ম্য কীর্তনকারী রলাঁর ভূমিকা স্মরণ করব, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এ-কথাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে এই রলাঁই বাস্তিল কারাগারের পতনের ঘটনার ভিত্তির উপরে রচিত '১৪ই জুলাই' নামক অবিস্মরণীয় নাটকের স্রষ্টা; সাম্যবাদী প্রত্যয়ের প্রতি আনুগত্যের দলিল রূপে পরিগণিত 'আই উইল নট রেস্ট' বইয়ের লেখক; সোভিয়েট বিপ্লবের উদ্‌গাতার ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের সুহৃৎ; অপিচ শিল্পী-সাহিত্যিককুলের ভিতর ফ্যাসীবাদের সবচেয়ে বলিষ্ঠ আর সবচেয়ে নির্মম সমালোচক। রলাঁকে আমরা গেরুয়া পরিয়ে যতোই কেন-না ভারতবন্ধু সাজাই আর তা থেকে আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করি, এ-সত্য বিস্মৃত হলে আমরা খণ্ডদৃষ্টির দোষে দোষী হব যে, রলাঁ আসলে ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের মানস-সন্তান, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী শিল্প-ঐতিহ্যে লালিত, সর্বস্তরের অন্যায় ও অবিচারের আপসহীন প্রতিবাদী, কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাবাহনকারী শাসকশ্রেণীর অকৃত্রিম শত্রু। রলাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'জাঁ-ক্রিসতফ' কখনই রচিত হতে পারত না, যদি-না তাঁর শিল্পী-মানসে এইসকল বিভিন্ন ভাবের উপাদান সমন্বিত হতো।

তবে কি গান্ধীজির অহিংসাকে রলাঁ যখন প্রশস্তি করেছেন, তিনি নিজের প্রতি অসত্যাচরণ করেছেন? মোটেই তা নয়। বর্তমান গ্রন্থের ডায়েরী

অংশের পাতা উল্টোলেই দেখা যাবে, রলাঁ একাধিক জায়গায় অহিংসাকে মানুষের মুক্তি অর্জনের বিকল্প দুটি পথের ভিতর অন্যতর পথরূপে অভিহিত করেছেন কিন্তু একমাত্র পথ কোথাও বলেননি। এ-বিষয়টি নিয়ে পরে আরও আলোচনা করার অবকাশ হবে, সুতরাং আপাতত বিষয়ান্তরে যাই।

সমালোচ্য গ্রন্থখানির দুটি অংশ: এক, 'মহাত্মা গান্ধী' নামক রলাঁর ১৯২৪ সালে প্রকাশিত নাতিক্ষুদ্র প্রসিদ্ধ গ্রন্থ; দুই, ১৯৩১ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে লিখিত রলাঁর ডায়েরীর গান্ধী-সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলির সঙ্কলন। প্রথম গ্রন্থখানি বহুল পঠিত। মূল ফরাসী থেকে ক্যাথারিন দ্য গ্রথ ইংরেজিতে এর অনুবাদ করেন। তার শ্রীঋষি দাস কৃত বাঙলা তর্জমা অনেক দিন যাবৎ বাঙলাদেশে প্রচলিত। কিন্তু অন্য অংশটি অর্থাৎ 'ডায়েরী' অংশটি একেবারেই নতুন, এটি রলাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'আঁদ' (Ind) নামক ভারত-সম্বন্ধীয় জার্নালধর্মী গ্রন্থের অঙ্গবিশেষ যা কেবলমাত্র গান্ধীর কথায় পূর্ণ। বলা আবশ্যক, 'আঁদ'-এর এখন পর্যন্ত ইংরেজি তর্জমা হয়নি, এবং বাঙলাতে এর গান্ধী-সম্বন্ধীয় অংশের এই প্রথম তর্জমা। ইতঃপূর্বে শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত এর কিছু কিছু অংশের বাঙলা তর্জমা করেছেন বটে, কিন্তু তা এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয়নি।

রলাঁর 'মহাত্মা গান্ধী' বইটি ছেচল্লিশ বৎসর যাবৎ বর্তমান এবং তা এত ব্যাপকভাবে পঠিত ও আলোচিত যে, আমরা বর্তমান আলোচনার পরিসর থেকে তার প্রসঙ্গ বাদ দেব। আমাদের মনোযোগ শুদ্ধমাত্র 'ডায়েরী' অংশেই কেন্দ্রভূত হবে। যে চিন্তার বিবর্তন রলাঁর মানস-বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছি, তার ছাপ ডায়েরীর পাতায় পাতায়। 'মহাত্মা গান্ধী' বইতেও যে প্রশ্নের তর্জনী উদ্যত হয়ে নেই এমন নয় কিন্তু 'ডায়েরী'তেই যেন সমালোচনা তীক্ষ্ণ আর গান্ধী-আদর্শকে নতুন করে মূল্যায়নের প্রয়োজন খরতর হয়ে উঠেছে। বিশের দশকে রলাঁর গান্ধী-মনস্কতা যেখানে ছিল, তিরিশের দশকের প্রথম চার বছরে তা যেন সেখান থেকে বেশ কিছু দূরে সরে এসেছে এবং ইতোমধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীরও যেন স্পষ্ট বদল হয়েছে। আমরা দেখতে পাই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সত্তাকে পেছনে ফেলে রেখে রলাঁর জনদরদী সত্তা ও নির্যাতিত শ্রেণীর প্রতি সমবেদনা ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে এবং তাঁকে সমাজতন্ত্রী মানবতাবাদ অথবা মানবতন্ত্রী সমাজবাদ—যে নামেই এই আদর্শের বর্ণনা করি-না-কেন তার দিকে তাঁকে সুনিশ্চিতভাবে

ঠেলে দিচ্ছে। গ্রন্থের 'ডায়েরী' অংশ সেই ঝোঁক-বদলেরই একটি অসংশয় দলিল।

দলিলটি এখানেই সম্পূর্ণ নয়, তার আরও অনুচ্ছেদ আছে, যেগুলি পরবর্তী বৎসরগুলির রোজ-নামচার অন্তর্গত। সেখানে অহিংসা সম্পর্কে মোহভঙ্গ প্রায় সম্পূর্ণ বললে চলে (শ্রীপ্রমোদ সেনগুপ্ত এ-রকম কিছু কিছু অংশের অনুবাদ করেছেন এবং যতদূর আমার স্মরণ হয়, ডঃ লোকনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ও এইরকম একটি-কি-দুটি অংশের অনুবাদ প্রকাশ করেছেন), কিন্তু বোধগম্য কারণেই সেই সকল অনুচ্ছেদ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। এই গ্রন্থ গান্ধী-শতাব্দী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত শ্রদ্ধার অঞ্জলি। যতটা সমালোচনা এই গ্রন্থের পরিসরের মধ্যে আছে তা-ই নিরপেক্ষ বিচারণার পক্ষে যথেষ্ট, বইয়ের ওপরে আরও বেশি সমালোচনার ভর সওয়াতে গেলে সমালোচনা তেতো হয়ে যেত এবং শ্রদ্ধার অভিষেকের নামে মহাত্মাজির পুণ্যস্মৃতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হতো। তা অনুবাদক বা প্রকাশক করতে পারেন না। আর, তা-ই ডায়েরী-র নিরপেক্ষ গান্ধী-ভাষ্য 'দাস ফার অ্যাণ্ড নো ফার্দার'-এর সীমানায় এসে ঠেকেছে। অনুবাদক ও প্রকাশকের এই আত্ম-আরোপিত সংযম সুসংগত হয়েছে।

গান্ধীজির অহিংসা, অছিবাদ, ধনিকশ্রেণীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি সম্পর্কে উত্তরোত্তর বর্ধমান সপ্রশ্ন মনোভাব সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধীর যেটা বিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব—মতামতের ভিন্নতা ও সাময়িক আচরণাদির বৈসাদৃশ্যের দ্বারা যা মলিন নয়—তার প্রতি রলাঁর সম্ভ্রম যে কত গভীর ছিল, এই ডায়েরীর একাধিক জায়গায় তার অকুণ্ঠ অভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসে জেনিভায় মিসেস এইচ. এস. কাজিনস্ এবং রেভারেণ্ড সি. এফ. এণ্ড্রুজের উদ্যোগে গান্ধীজি প্রবর্তিত ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাফল্য কামনা করে যে 'আন্তর্জাতিক দিবস' পালিত হয় তাতে রলাঁ যে-বাণী পাঠান তার একাংশ নিম্নরূপ :

"ভারতের যীশুখৃষ্ট···অহিংসার মহাত্মা, সত্যাগ্রহের ঋষি ও বীর গান্ধী। জগতের এক নিকৃষ্ট যুগে তাঁর আবির্ভাব। এলেন এমন এক সময় যখন যা-কিছু নীতি এতদিন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল, তা নষ্ট হয়েছে। ইউরোপের পা আজ টলমল করছে, পাশবিক হিংসার চিরাচরিত বৃত্তিতে আজ তা আত্মসমর্পণ করেছে, উন্নত বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত

মারণাস্ত্রে সে ধ্বংসমুখি হয়েছে। আজ যখন চার বছরের এক ভয়ানক যুদ্ধ সবে সমাপ্ত এবং আগামীকালে সম্ভাবনা একটা নয়, দশটা সম্মিলিত যুদ্ধের—যার ফলে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র আর একটিও টিকে থাকবে না—এই দুই ভয়াবহ সত্যের মধ্যিখানে ভারতের দুর্বলশরীর ঋষি এসে হাজির, বসেছেন তিনি দ্বিতীয় বুদ্ধের মতো। সর্বব্যাপী মানবতাগ্রাসী কোন লোহিত সমুদ্রের দুটি মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ স্থানে যেন তিনি রয়েছেন। তিনি একাকী, তাঁর গ্রহণ না করার নীতিতে আমরণ দৃঢ় ও প্রশান্ত—পাশবিক শক্তিকে তিনি বাধ্য করেছেন তাঁকে সমীহ করতে। এই যুদ্ধের আমরণ অনশনের প্রতিজ্ঞার (তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ র্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের ঘোষিত 'কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ড' বা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার উদ্দেশ্যে গান্ধীজি যারবেদা জেলে যে ঐতিহাসিক অনশন করেন, সেই অনশন) দৃপ্ততম সাম্রাজ্যও ভয়ে নতজানু—বহু বছরের যুদ্ধ যে-জয়ে সফল হয়নি, এই একটিমাত্র অনশনে তা অর্জিত।···এই প্রথমবার ইউরোপের সামনে দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন সেই নতুন সেণ্ট টমাস যাঁর একমাত্র বিশ্বাস শুধু অর্জনেই, এবং যে গৌরবজনক দৃষ্টান্তটির নামকরণ গান্ধী নিজেই করলেন 'আত্মত্যাগের তরবারি।' ইত্যাদি (পৃষ্ঠা ২৩৬-৩৭)

ওই 'আন্তর্জাতিক দিবস' পালন উপলক্ষ্যেই ডক্টর এ্যালবার্ট শভাইটজারকে লেখা এক চিঠিতে রঁলা লিখছেন – "গান্ধী নিয়ে প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন ভারত নিয়েও নয়। কিন্তু যে উদ্দেশ্য গান্ধী নিজের মধ্যে মূর্ত করেছেন ও যার জয় বা ধ্বংসের উপর ইউরোপের নিয়তি আগামী এক শতাব্দী বা তারও বেশি কাল ধরে নির্ভর করবে, প্রশ্ন সেই অহিংসাকে নিয়ে।··· জানি ইহুদী এক বিচারকর্তার দ্বারা অনুপ্রেরিত এই-যে বীরত্বপূর্ণ ও ধৈর্যসম্পন্ন পরীক্ষাটি চালিয়েছে গোটা একটা জাত, একমাত্র সেইটেই এতদিনের সঞ্চিত প্রকাণ্ড হিংসাশক্তিকে ঠেকানোর এমন এক শেষ বাঁধ যার জুড়ি নেই। কারণ একমাত্র সেই কার্যকরী অস্ত্রেরই শক্তি আছে ঘৃণা ব্যতীত সামাজিক রূপান্তর সাধনের, অথবা আরো ভালো এমন এক হঠাৎ পরিবর্তন আনার যা যেমন জরুরী তেমনি ভয়ঙ্কর। গান্ধী না থাকলে হিংসার বন্যায় সারা জগৎ প্লাবিত হবে" (পৃষ্ঠা ২৩৪)।

এই গেল শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের অভিব্যক্তির সাক্ষ্য, আবার এর পিঠে সমালোচনার সুর ও স্পষ্ট শ্রুতিগম্য। সমীহ আর সমীহহীনতায় আন্দোলিত ও মথিত রলাঁর অন্তরটি কী নির্ভুলভাবেই না ধরা পড়েছে নিচের লাইন কটিতে—"পাঁচটা

বাজতে না বাজতেই গান্ধী এসে হাজির হলেন আমার কাছে। কিন্তু আমি একটু ক্লান্ত বোধ করছিলাম, এবং এটাও স্বীকার করব, সেদিন আমার মনে হচ্ছিল গান্ধীর পথ নানান ব্যাপারে আমার থেকে এত ভিন্ন এবং সে-পথ ইাতমধ্যে এত পরিষ্কারভাবে তিনি তৈরি করে রেখেছেন যে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার কিছু হয়তো নেই আমার। দুজনেই জানি যে ঠিক কোথায় যাচ্ছি—এবং গান্ধীর পথ নির্ভুল যেমন তাঁর পক্ষে, তেমনি তাঁর অনুসরণ-কারীদের পক্ষে, আর সেটা তাই থাক, আমিও তা চাই। তাঁকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। কিন্তু আমরা পরস্পর পরস্পরকে কী বলতে পারি, ইত্যাদি।" (পৃষ্ঠা ১৬৪-৬৫)

ডায়েরীর অন্য একটি অংশে সেলার এ্যাডিসন নামক জনৈক ইংরেজ ভারতপ্রেমীকে লেখা রলাঁর চিঠির একাংশ এইরূপ "···ভারতের সত্যাগ্রহের পরীক্ষা এক শেষ সুযোগ নিয়ে এসেছে। একমাত্র এই পরীক্ষাতেই হিংসা ব্যতীত মনুষ্যসমাজের রূপান্তর সম্ভব। এ-পরীক্ষা যদি ব্যর্থ হয়, যদি তাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হিংসা একদিন ধ্বংস করে অথবা ভারত যদি নিজেই তাকে গ্রহণ করতে সমর্থ না হয়, তাহলে হিংসা ব্যতীত মানুষের ইতিহাসে আর কোনো সমাধানই থাকবে না, এবং একমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই তখন সে-হিংসার পথ নির্ধারিত করে দেবে। **হয় গান্ধী, নয় লেনিন—যাই ঘটুক না কেন, সামাজিক ন্যায়কে জয়যুক্ত করতেই হবে।**" (পৃষ্ঠা ২১২-১৩)

এছাড়া, ডায়েরীর ১৯৩৪ সালের এপ্রিলের একটি ভুক্তি (entry) এইরূপ : ফাদার সেরেজোল-এর হাত দিয়ে গান্ধীজিকে লেখা একখানা চিঠিতে রলাঁ লিখছেন—"সত্যাগ্রহের যে-মহান পরীক্ষা আপনি করছেন, ও যার ফলাফল আজো অনিশ্চিত, আশা করি ভারতের পক্ষে তার জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। কিন্তু বর্তমান ইউরোপে তার সফল হওয়ার এতটুকু আশাও নেই।··· অহিংস যারা, নিক তারা অহিংসার অস্ত্র—অন্যেরা নিক সশস্ত্র যুদ্ধের পথ। কিছুতেই নিষ্ক্রিয় থাকা চলবে না। পাপকে গ্রহণ করা বা তাতে অভ্যস্ত হওয়া, তা সম্ভব নয়, না আপনার পক্ষে, না আমার পক্ষে। আপনি যুদ্ধ চালান সত্যাগ্রহের মাধ্যমে, প্রোলেটেরিয়ান বিপ্লবের রয়েছে অন্য অস্ত্র। কিন্তু যুদ্ধটা একই যদিও তার কর্মক্ষেত্র দুটি আলাদা।" (পৃষ্ঠা ২৪৬, ২৪৯)

অন্য একটি ভুক্তির বয়ান এইরূপ : "যদি অপর্যাপ্ত ও নঙর্থক ফল সত্ত্বেও তিনি (গান্ধী) সেই নীতি (অহিংসা নীতি) একগুঁয়ের মত ধরে বসে থাকেন,

অথবা যদি বিশেষ করে মূলধন ও শ্রমের অনিবার্য সংঘাতে তিনি বিনাশর্তে ও স্বতপ্রণোদিতভাবে শ্রমের পক্ষ না নেন তো তাঁর বিরুদ্ধে যেতে-হয়-তো হোক, আমি শ্রমের পক্ষই নেব। এ-কথা আমি কোনোদিন গোপন করিনি।" (পৃষ্ঠা ২৫৮)

১৯৩৫ সালের এপ্রিলে সুভাষচন্দ্র রলাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের মধ্যে যে-আলোচনা হয় তার একটা প্রতিলিপি তৈরি করে সুভাষচন্দ্র রলাঁর কাছে সেটি অনুমোদনের জন্য পাঠান। ওই সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে রলাঁ ডায়েরীতে লিখছেন—"দুর্ভাগ্যক্রমে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব যদি হয়ই একদিন, যার ফলে গান্ধী (অথবা অন্য কোনো পার্টি) শ্রমিক-মজদুরদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যান, বিরোধিতা করেন তাদের সমাজবাদী আন্দোলনের প্রয়োজনীয় বিবর্তনের, অথবা যদি তখন গান্ধী (বা অন্য কোনো পার্টি) তাদের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে দূরে সরে যান তো তা সত্ত্বেও আমি চিরকালই থাকব শ্রমশক্তির পক্ষে, যুক্ত থাকব তাদের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার সঙ্গে: কারণ তাদের দিকেই রয়েছে সত্যকারের ন্যায়, মনুষ্য সমাজের আবশ্যক অগ্রগতির ন্যায়সঙ্গত রীতিও তাদের স্বপক্ষে···**অহিংসা অনেক পথের একটিমাত্র, বহু প্রস্তাবের একটি, ও আজও তা পরীক্ষাধীন**।" (পৃষ্ঠা ২৬১-৬২)

রলাঁর ডায়েরীর উদ্ধৃতিসমূহ একটু বিশদভাবেই এখানে দেখালাম পাঠকের কাছে তাঁর চিন্তার বিবর্তনের ছাঁচটি স্পষ্ট তুলে ধরবার জন্য। হিংসা ও অহিংসার প্রশ্নটি বিপ্লবীদের কাছে একটি মৌল প্রশ্ন, এই প্রশ্নে রলাঁর চিন্তাধারা কোন্ পথ বেয়ে অগ্রসর হয়েছে তা আশা করি উদ্ধৃতিগুলিতে সুপরিস্ফুট হয়েছে। রলাঁর গান্ধী-অনুরাগ গভীর কিন্তু নিঃশর্ত নয়। ধনিক ও শ্রমিকের স্বার্থ-সংঘাতের প্রশ্নে রলাঁর সহানুভূতি স্পষ্টতই শ্রমিকশ্রেণীর দিকে।

১৯৩১ সালে বিলেতে গোলটেবিল বৈঠক সেরে গান্ধীজি সুইজারল্যাণ্ডের ভিল-নভে রলাঁর সঙ্গে দেখা করে ইতালী হয়ে ভারতে ফেরেন। গান্ধীজির ইতালী সফর ও তদুপলক্ষ্যে মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী প্রদত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ডায়েরীতে সঙ্কলিত আছে। এখানে সে-সব বৃত্তান্তের আভাস দেওয়ার প্রয়োজন নেই, শুধু একটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। সেটি এই যে, গান্ধীজি যাতে আতিথেয়তায় বিমুগ্ধ হয়ে মুসোলিনীর সযত্নরচিত প্রচারের ফাঁদে পা না দেন তার জন্য রলাঁর অন্তহীন ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে ডায়েরীর অংশটিতে। কী অপরিসীম ধৈর্যেই না তিনি এই

সংক্রান্ত তাবৎ খুঁটিনাটি রোজনামচার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তুচ্ছতম ঘটনার বা বস্তুটির প্রতিও রমাঁ রলাঁর কী সুতীক্ষ্ণ মনোযোগ! আমাদের দেশের কোনো ডায়েরীকার হলে এমনতরো ঘটনাদি লিপিবদ্ধ করবার ক্ষেত্রে অর্ধপথে এলিয়ে পড়তেন। একেই বলে ফরাসী খুঁটিনাটিপরায়ণতা, একেই বলে জার্মান thoroughness, দুই-দেশের যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের সমন্বয় রলাঁর লেখক-ব্যক্তিত্বের ভিতর বিধিমত সাধিত হয়েছিল।

মুসোলিনীর ফাঁদে পা দেওয়ার বিপদ সম্পর্কে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ রলাঁর এই প্রথম নয়। ইতঃপূর্বে রবীন্দ্রনাথের ইতালী ভ্রমণের সূত্রেও তাঁর একই প্রকার আকুলতা আমরা লক্ষ্য করেছি। এবং আমরা সেই সময় দেখেছি, রলাঁর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে উদ্বেগ ভিত্তিহীন ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ফাসিস্ত শাসনের স্বরূপ ও মুসোলিনীর দুরভিসন্ধি প্রথমটা ধরতে পারেননি, রলাঁই কবির চোখ ফুটিয়ে দেন। কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এইখানে বলি, যে ইতালী সফরের ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ ও রলাঁর মধ্যে প্রাথমিক যে দৃষ্টি-ভিন্নতা দেখা দিয়েছিল সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বিশ্বভারতীর জনৈক অধ্যাপক-লেখক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাম্প্রতিক ধারাবাহিক নিবন্ধে একতরফা রবীন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থন ও রলাঁর কটূক্তি করেছেন। আমরা বলি কি; এ-সব জটিল রাজনৈতিক বিতর্কের পক্ষাপক্ষ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীর বেতনভুক অধ্যাপকটির মতো একতরফা ঢালাও রায় দেওয়া মোটেই নিরাপদ কাজ নয়। 'যাঁর নুন খাই তাঁর গুণ গাই'—এই নীতিটি আমাদের এই কর্তাভজা দেশে খুব চালু নীতি বটে, কিন্তু ওর দ্বারা সত্যনির্ণয়ে কোনো সহায়তা হয় না, সেটা সংশ্লিষ্ট সকলেরই জানা ও বোঝা আবশ্যক। অধ্যাপক-লেখক মহাশয় যদি মনে করে থাকেন যে তিনি রলাঁর বিরুদ্ধে কটুবাক্য প্রয়োগ করে রবীন্দ্রনাথের মহিমাবৃদ্ধির সহায়তা করেছেন তবে তিনি মস্ত ভুল করেছেন।

ডায়েরীর আর একটি চিত্তাকর্ষক অংশ হলো প্রিভা-দম্পতির ভারত-সফরের বিবরণ যা ডায়েরীতে গ্রথিত হয়েছে, সেখানেও আমরা গান্ধীজি, তাঁর সহকর্মিবৃন্দ ও সবরমতী আশ্রম সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য জানতে পারি।

পরিশেষে, এই বইয়ের অনুবাদ সম্পর্কে একটি কথা। ফরাসী গদ্যের উৎকর্ষের যা প্রধান লক্ষণ—যাথাযথ্য (Precision), ডক্টর লোকনাথ

ভট্টাচার্য মহাশয়ের অনুবাদে তা যথাসম্ভব রক্ষা করবার চেষ্টা করা হয়েছে বাঙলা গদ্যের সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে। তবে শব্দ-ব্যবহার কোথাও-কোথাও একটু বেশি কথ্যরীতির ধার ঘেঁষে গেছে। এই সামান্য বিচ্যুতি বাদ দিলে, আশ্চর্য প্রাঞ্জল অনুবাদের গদ্য। বোধহয় প্রাঞ্জলতার খাতিরেই কথ্যভঙ্গীর প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব।

বইয়ের ছাপা বাঁধাই সজ্জা চমৎকার। কিন্তু পাঠে ছাপার ভুল একাধিক। সাহিত্য অকাদেমীর মতো সম্ভ্রান্ত সংস্থার বইয়ে ছাপা ভুল না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

নারায়ণ চৌধুরী

মহাকাশ পরিচয়। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রকাশিত (১৯৬৯)। মূল্য পাঁচ টাকা।

সাম্প্রতিক কালে মহাকাশ-রহস্য বৈজ্ঞানিকদের নিকট ক্রমশ উদ্‌ঘাটিত হওয়ার ফলে শিক্ষিত জনসাধারণ মহাকাশ সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহী হচ্ছেন। ইংরেজি ভাষায় এই বিষয়ে সাধারণের জন্য লিখিত বইয়ের সংখ্যা অনেক হলেও বাঙলা ভাষায় এই সম্পর্কিত বই প্রায় নেই বললেও চলে। শ্রীজিতেন্দ্র কুমার গুহ প্রণীত 'মহাকাশ পরিচয়' বাঙলা ভাষায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিবিধ জটিল তথ্য লেখক সামগ্রিক ও ধারাবাহিকভাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বিবৃত করেছেন। বইটি মোট একবিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত। 'পৃথিবী' অধ্যায়ে পৃথিবীর গঠন, আবহমণ্ডল ও ঋতু পরিবর্তনের কারণের কথা লেখক যেমন বলেছেন, তেমন পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের বিন্যাস, মেরুজ্যোতি, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে সূর্যনিঃসৃত তড়িতাহিত কণার আবদ্ধীকরণ ও তার ফলে ভ্যান অ্যালেন বলয়ের উৎপত্তির কথা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলেছেন। সূর্য, সৌরকলঙ্ক ও সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ সম্পর্কে লেখকের বিবরণ বহুবিধ তথ্য সম্বলিত। সৌরজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন আধুনিক মতবাদও লেখক সাধারণের বোধ্য ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে পদার্থবিদ্যার যে-সমস্ত তত্ত্বের সাহায্য নেওয়া হয়, বইটিতে

সেগুলি সরলভাবে বিবৃত করা হয়েছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্র, বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র, ডপলার তত্ত্ব ও তার প্রয়োগ, নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয়, রেডার, বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি বিষয়ের মূলসূত্র লেখক গাণিতিক সঙ্কেত ব্যতিরেকেই বর্ণনা করেছেন।

নক্ষত্রজগৎ সম্পর্কিত অধ্যায়গুলি যথেষ্ট আধুনিক তথ্য সম্বলিত। ফ্রেড হয়েল ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতবাদ অনুসারে নক্ষত্রের জন্মকাহিনী লেখক খুবই মনোজ্ঞভাবে উপস্থাপিত করেছেন। মহাকাশে মহাজাগতিক ধূলিকণার গ্যাস ঘনীভূত হয় এবং একসঙ্গে অসংখ্য নক্ষত্রের উৎপত্তি হয়। বিরাট গ্যাস পুঞ্জ থেকে পরমাণুর মুক্তিবেগ বা প্রস্থানবেগ গ্যাসপুঞ্জের ভরের উপর নির্ভরশীল। এর সাহায্যে লেখক ফ্রেড হয়েলের মতবাদের যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। নক্ষত্রের তাপ ও ঔজ্জ্বল্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়কারী চিত্র—রাসেল হ্যারৎজ্‌স্প্রুং ছক সপ্তদশ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই চিত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্পন্দনশীল সেফাইড তারার স্পন্দনকাল ও আপাত ঔজ্জ্বল্য পর্যবেক্ষণ করে সেফাইড তারার দূরত্ব নির্ণয় করা হয়ে থাকে। লেখক এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন অষ্টাদশ অধ্যায়ে। এ-ছাড়া লেখক 'লাল দানব' (Red Giant) 'শ্বেত বামন' (White Dwarf) 'নব তারা' (Novae) 'অতি নবতারা' (Super novae) প্রভৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে আলোচনা করেছেন। রাশিচক্র, সায়ন ও নিরয়ন রাশিচক্র প্রভৃতিও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

রেডিও অ্যাস্ট্রোনমির বাঙলা করা হয়েছে বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান। বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত অথচ বহু তথ্য সমন্বিত আলোচনা ঊনবিংশ অধ্যায়ে করা হয়েছে।

বিংশ অধ্যায়ে কসমোলজি বা ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। ১৯২৭ সালে দুই জ্যোতির্বিদ হাব্‌ল্ এবং হুমাসন নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাক্সীর দূরত্ব এবং তাদের পারস্পরিক অপসারণ বেগের সমানুপাতের সূত্রটি আবিষ্কার করেন। এর সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ সম্পর্কিত মতবাদটি স্থাপিত হয়। গ্যালাক্সী যে দূরত্বে থাকলে তার অপসারণ বেগ আলোকের গতিবেগের সমান হয়, তাই হল ব্রহ্মাণ্ডের হাব্‌ল্ ব্যাসার্ধ। এই হাব্‌ল্ ব্যাসার্ধ আমাদের পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সীমা। এসব তথ্য যথাযথভাবেই আলোচিত হয়েছে।

একবিংশ অধ্যায়ে রকেটের সাহায্যে মহাকাশ সমীক্ষা ও মানুষের মহাকাশ

অভিযান বর্ণিত হয়েছে, লেখক রকেটের মূল কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করার পর রাশিয়া ও আমেরিকা কর্তৃক বিভিন্ন উপগ্রহ-স্থাপন ও রকেট অভিযানের কথা বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীর আহ্নিকগতির সমান পরিক্রমণকাল বিশিষ্ট কোনো উপগ্রহ মহাকাশে স্থাপিত হলে তা পৃথিবীর একই স্থানের উপর স্থির থেকে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে আবর্তিত হবে। এতে দূরপাল্লার টেলিভিসন ও বেতার বার্তা প্রেরণ সহজসাধ্য হবে। এসব উপগ্রহগুলিকে সিন্‌ক্রোনাস উপগ্রহ বলে। এসব তথ্য বিস্তৃতভাবে লেখক বর্ণনা করেছেন। সর্বশেষে অমিত শক্তিশালী স্যাটার্ণ-৫ রকেটের সাহায্যে মানুষের চন্দ্র অভিযানের বিস্ময়কর কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

পুস্তকটি যথেষ্ট চিত্র সমন্বিত হওয়ায় এর উপযোগিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বহু রেখাচিত্রের সাহায্যে মূল বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে; নীহারিকা, নক্ষত্রপুঞ্জ প্রভৃতির অনেক হাফটোন চিত্রও বইটিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

গ্রন্থটিতে দু-একটি সামান্য ত্রুটি আছে। সেফাইড তারার আপাত ঔজ্জ্বল্য ও দূরত্বের মধ্যে সম্পর্ক প্রথম আবিষ্কার করেন হার্ভার্ড কলেজ অবজারভেটরীর এক মহিলা বিজ্ঞানী শ্রীমতী হেনরিয়েটা লিয়াভিট ১৯৬২ সালে। লেখক এই তথ্যটির উল্লেখ করলে ভালোই করতেন। এ-ছাড়া নক্ষত্রের আভ্যন্তরিক শক্তি সৃষ্টি সম্পর্কে বিজ্ঞানী হান্‌স বেথের কার্বন চক্রের কথা ব্যাখ্যা করলে নক্ষত্র সম্পর্কিত আলোচনাটি পূর্ণতর হতো। লেখক মহাকর্ষের সমার্থবোধক দুটি শব্দের কথা উল্লেখ করেছেন অভিকর্ষ ও মাধ্যাকর্ষণ। বস্তুতপক্ষে বাঙলায় গ্র্যাভিটিকে অভিকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ ও গ্র্যাভিটেশনকে মহাকর্ষ বলা হয়। পরিভাষায় একটি নিয়ম মেনে চলাই সম্ভবত বাঞ্ছনীয়। দু-একটি মুদ্রণ প্রমাদ রয়েছে। সূচিপত্রে বিদ্যুৎ চৌম্বক শক্তিকে বেতার চৌম্বক শক্তি বলা হয়েছে—এটি সম্ভবত মুদ্রণ প্রমাদ। লেখক বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ (constellation) সম্পর্কিত একটি বর্ণনা দিলে খুবই ভালো করতেন। পরিভাষার একটি তালিকা পরিশিষ্টে থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এ-সমস্ত বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও বইটি বিজ্ঞানের সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বস্তুত বইটিতে প্রাঞ্জল ভাষায় এত বহুবিধ তথ্য বর্ণনা করা হয়েছে যে এখানে তার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা ছাড়া প্রায় সর্বস্তরের পাঠকই এই পুস্তক পাঠে নতুন তথ্যের সন্ধান পাবেন।

বাঙলা ভাষায় এই পুস্তক প্রণয়ন করে শ্রীজিতেন্দ্র কুমার গুহ অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। তিনি নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ।

বইটির ছাপা পরিচ্ছন্ন ও প্রচ্ছদপট মনোরম।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বহুকাল থেকেই বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানের পুস্তকাদি প্রকাশ করে বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার পথ সুগম করছেন এবং বিজ্ঞানের আধুনিক তথ্যাদি বাঙলা ভাষাভাষী জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করছেন। এরূপ প্রশংসনীয় উদ্যম সকলের সক্রিয় সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করতে পারে।

ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত

প্রতিবেশিনীর কাছে। চিত্ত ভট্টাচার্য। ইণ্ডিয়া বুক কনসার্ন। চার টাকা।

এই যুগের চারিত্র্য সকলের চোখে সমান নয়। কারো চোখে জগৎ মানে একটা নিরবয়ব শূন্যতা—যার অনিবার্য পরিণাম একরাশ অন্ধকার কিংবা আদিগন্ত বিষণ্ণতা। আর এই রকম একটা উপলব্ধির উদ্ভব নিছক অনুষঙ্গের অভাব থেকে—বিচ্ছিন্নতার চেতনায় তা কোথাও অনুচ্চারিত, কোথাও বা বিভাবিত। আবার কারো দৃষ্টিতে খোলা চোখের সরস স্বাস্থ্য আস্তিক্যবোধের আলো—তাই জগৎ আজও তাদের কাছে অর্থবহ—'জল তেল খাদ্য' এবং 'পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীর'-এর আশ্বাস নিয়ে।

চিত্ত ভট্টাচার্য কোনো তাত্ত্বিক বিশ্বাসে সমর্পিতপ্রাণ কিনা জানি না। কিন্তু এই গ্রন্থে তাঁর আশাবাদী পুরুষার্থ অবলম্বন পেয়েছে কোনো নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক ছকে নয়, নিতান্তই ইতিহাসমুখী শিক্ষিত মনের বিচিত্র কৌতূহলে। তাঁর মনের বাস্তুভিটার কোনো স্থিরিকৃত ভূগোল এখানে পাওয়া যায় না, যদিও তিনি স্পষ্টত মানুষেরই সপক্ষে, অতিমানবিকতা বা অমানবিকতার বিপক্ষে। এবং সেটাই তাঁর সাহিত্যিক সততার চাবিকাঠি। সেই সততা নিয়ে তিনি এখানে দেখেছেন জগৎসংসারকে—কোথাও বিস্ময়কর সরল চোখে, কোথাও বা উলট পুরাণের ভঙ্গিতে। ভঙ্গি যাই হোক, তার ফল একই। তাঁর চোখে পারিপার্শ্বিকতাসহ মানুষই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো শিল্পকর্ম।

'প্রতিবেশিনীর কাছে' লঘুগুরু প্রবন্ধের সঙ্কলন। লঘু প্রবন্ধ চারটি—তালা, ধার করার সপক্ষে, উলট পুরাণ, মুদ্রাদোষ। সাহিত্যবিষয়ক গুরু প্রবন্ধ

ছয়টি—শার্ল বদ্‌লেয়র, আধুনিক বাঙলা কবিতা, নতুন গল্পরীতি, চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, 'অচলায়তন' প্রসঙ্গে ও শিবু মাঝির গান। ভ্রমণস্মৃতিমূলক রচনা চারটি—প্রতিবেশিনীর কাছে, স্মৃতিতীর্থ চিল্কা, দেউল পরিচিতি, কোণারক। লঘু প্রবন্ধগুলির অবলম্বন সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত মানুষের চিন্তা ও স্বভাবের কোনো না-কোনো অসঙ্গতি। লেখকের সরস চেতনার সঙ্গে এসে মিশেছে ঈষৎ কৌতুক বা ব্যঙ্গের দৃষ্টি। রচনাগুলির ভঙ্গি হালকা, কিন্তু বক্তব্য ঠিক হালকা নয়। এই জাতীয় লেখায় চিত্তবাবুর মুন্সীয়ানার পরিচয় আছে। সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে লেখকের নানামুখি চিন্তার স্বাক্ষর পাওয়া যায়। সে চিন্তা কোথাও পূর্ণাঙ্গ, কোথাও আংশিক, কোথাও বা ইঙ্গিতসর্বস্ব। তাঁর সঙ্গে পাঠক সর্বাংশে একমত হবেন এমন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তাতে ক্ষতি কী? যদি আর কিছু না হোক কিছু বাক-বিতণ্ডা প্রবন্ধগুলি সৃষ্টি করতে পারে তবে তার ভেতর থেকেও শেষ পর্যন্ত সত্যের সন্ধান মিলতে পারে। চিত্তবাবু কতকগুলি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নতুন চিন্তার আগুন জ্বালতে পেরেছেন এটাই বড়ো কথা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক আশ্চর্য সহমর্মিতা তাঁর চিন্তার সহগ; যেমন বদলেয়র প্রসঙ্গে—'আমরাও আর সেই ঝলমলে পোষাক পরা কবিকে চোখের সামনে দেখব মনে করলেও দেখতে পাব না; যাকে দেখা যাবে স্মরণের পর্দায় তিনি তো মাতাল এক কবি—সারা জীবন মাতালের মতো যিনি টলমল করেছেন ভাবের ঘোরে সূক্ষ্ম চৈতন্যের অধীশ্বর—যিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থার তথাকথিত স্থূল ঐশ্বর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘৃণায় লম্বা চুরোট মুখে পথ চলতে চলতে দাঁড়িয়ে যেতেন। সর্বোপরি বদলেয়র মাতাল ছিলেন। এই তাঁর পরিচয় হোক।' স্মৃতিমূলক প্রবন্ধগুলিতে ছড়িয়ে আছে চিত্তবাবুর বুদ্ধি ও অনুভবের সৌরভ। তিনি শুধু চোখ দিয়ে দেখেন না, হৃদয় দিয়েও দেখেন। ত্রুটি হিসাবে চিল্কাপ্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করতে পারি। রচনাটি আর একটু বস্তুনিষ্ঠ হলে ভালো হতো।

ভিন্নরুচির পাঠকরা কী বলবেন জানিনা। সব মিলিয়ে বইটি আমার ভালো লেগেছে। বাহাদুরি বা চমক কোথাও নেই, কিন্তু বোধ ও বুদ্ধির স্বচ্ছতা আছে। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা সুরুচি সম্মত। প্রুফ দেখায় প্রকাশকের আরও যত্নবান হওয়া উচিত ছিল।

জীবেন্দ্র সিংহরায়

শ্রমিক আন্দোলনের হাতেখড়ি। অনিল মুখার্জি। কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশনী। দু-টাকা।

সারাভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পঞ্চাশ বছর বয়স হলো এ-বছর। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় শ্রমজীবী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এই সংগঠনের ইতিহাস বড়ই বৈচিত্র্যময়। বহু বাঁক-বাধা বহু বিভেদ উত্তীর্ণ হয়ে তার ক্রমবর্ধমান শক্তি, সামর্থ ও প্রভাব ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সাবালক হয়ে ওঠার পরিচয় বহন করে। সহস্র সহস্র আত্মনিবেদিত কর্মী ভারতের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন নানা সময়ে। শ্রীঅনিল মুখার্জি তাঁদেরই একজন। ১৯৫১ সালে পাকিস্থান সরকারের বন্দী থাকার সময় এই বইটির একটি পাঠ রচিত হয়। "সে সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে অভিজ্ঞ কোন শ্রমিক নেতা বা কর্মীই জেলের বাইরে ছিলেন না। নানা ধরণের প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী, ভাগ্যান্বেষী এবং কারখানামালিক ও সরকারের লোভী দালালরা মজুর আন্দোলনে নানা রকমের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে শ্রমিক আন্দোলনকে বিপথগামী করার অপচেষ্টায় মত্ত হয়েছিল।" লেখক তাঁর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি জেলের বাইরে গোপনে পাঠাবার পর হাত বদলাতে বদলাতে এক সময় হারিয়ে যায়। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে অনিলবাবু তাঁর শ্রমিক আন্দোলন সংগঠনের অভিজ্ঞতা আবার লিপিবদ্ধ করেছেন। লেখক ও প্রকাশকের কাছে এই অমূল্য অভিজ্ঞতা পাঠকদের হাতে পৌঁছে দেবার জন্য কৃতজ্ঞতা না জানানো ছাড়া রাস্তা নাই।

পুঁজিবাদ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর যেমন সংখ্যা বাড়ে, তাদের সংগঠনও রূপ পরিগ্রহণ করে। শ্রমিকদের নানা সমস্যা নিরাকরণের প্রয়োজনে গড়ে ওঠে ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংঘ। শ্রমঘণ্টা কমানো বা মজুরি বৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম, ছাঁটাই, লে-অফ, ক্লোজার-লক আউট প্রভৃতির বিরুদ্ধে লড়াই ; সামাজিক সুবিচার, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রভৃতির দাবিতে আন্দোলন—এসবই শ্রমিক সংঘের প্রথাসিদ্ধ কাজ। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী যে ধনবাদী ব্যবস্থায় সবচেয়ে শোষিত শ্রেণী এবং শ্রমিক শ্রেণীই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চূর্ণ করে মানুষের হাতে মানুষের শোষণ চিরকালের মতো অবসান ঘটিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করে —এ কথা সুবিধাবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা গোপন রাখে। এই নেতারা মালিক শ্রেণীর সঙ্গে গোপন ও প্রকাশ্য সম্পর্ক রচনা ক'রে মালিক শ্রেণীর মুনাফা

অব্যাহত রাখে, এবং শ্রমিক শ্রেণীকে নানা সংস্কারবাদী চিন্তার দিকে ঠেলে দিয়ে পথভ্রষ্ট করে। এমন কি শাসন-শোষণের তুঙ্গ স্তরে জাত্যন্ধ ফাসিবাদী ব্যবস্থার শিকলে বেঁধে রাখতে তৎপরতাও দেখায়। যেহেতু শ্রমিকশ্রেণী অভিজ্ঞতার তাৎপর্যে শোষণব্যবস্থাকে চিনে ফেলে, সে জন্য নানা রঙের সমাজতন্ত্রের কথা মালিকশ্রেণীই তাদের শোনায় এবং পথভ্রষ্ট করার প্রচেষ্টা চালায়। সাম্রাজ্যবাদ আবার যে দেশে উপনিবেশ তৈরী করেছে, সেখানে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা আরো ঘোরালো। সামাজিক প্রতিষ্ঠাতো দূরের কথা, অতি দীন হীন তাদের জীবন। নানা অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক চাপ তাদের উপর। তাছাড়া তাদের পশ্চাদ-পদতার সুযোগ নিয়ে তাদের সংগ্রামী চেতনা ধ্বংস করার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা সাম্প্রদায়িকতা, ভাষাবৈরীতা, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি নানা বিভেদের কীলক প্রবেশ করিয়ে দেয়। বহুক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় বুর্জোয়ারাও শোষণ ব্যবস্থা চালু রাখতে স্বাধীনতা আন্দোলনকারীর নামাবলীর তলায় শ্রমিকবিভেদের ছুরি শানিয়ে রাখে। অন্যদিকে শ্রমিকশ্রেণীকে সত্যকারের রাজনীতিতে টেনে আনা, শ্রমিক শ্রেণীই যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফ্রন্টের সবচেয়ে শক্ত খুঁটি এমন চেতনা গড়ে তোলা, বা শ্রমিক শ্রেণীই যে নতুন যুগের পথিকৃৎ এই রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করার কাজে বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের শ্রমের ও আত্মত্যাগের সীমা থাকে না। কোনো কোনো বিপ্লবী কর্মী মনে করেন ব্যক্তি জীবনে শৃঙ্খলারহিত, আধানৈরাজ্যবাদী ভাবে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কাজ করলে, তাদের সহানুভূতি পাওয়া যায়। শ্রমিকদের মতো হয়ে যাওয়া বা ডি ক্লাসড্ হওয়া যে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার পশ্চাদপদতার সামিল হওয়া নয়, বরং শ্রমিক শ্রেণীর যা হওয়া উচিত সেই পথ দেখানো—একথা এঁরা ভুলে যান। আর ব্যক্তিগত সন্ত্রাস নয়, শ্রেণীগত ঐক্য এবং সংঘবদ্ধ ম্যাস অ্যাকসনেই শ্রমজীবী মানুষের চেতনা, সংগঠন ও ঐক্য এগিয়ে যায়, এটাও মনে রাখার কথা। অনিলবাবুর 'শ্রমিক আন্দোলনের হাতেগড়ি' পড়তে পড়তে নিজের অজানাতে এ-সব শিক্ষা পাঠকের হবে। অনিলবাবু শ্রমিক আন্দোলনের কোনো তত্ত্ব গ্রন্থ লেখেননি। ছোটবেলায় দেশপ্রেমিকদের কাহিনী শুনতে শুনতে তাঁর দেশপ্রেমের উন্মেষ। বাল্যে আসামের চা-বাগানের শ্রমিক ধর্মঘট ও কর্মত্যাগের সমর্থনে, বিলাতী মালিকের শোষণের প্রতিবাদে রেল আর জাহাজ শ্রমিকের ধর্মঘটের ঘটনা দেখে তাঁর মধ্যে শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কে শ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি হয়। নির্যাতিত ও গরীবদের সংগ্রামের প্রতি কমিউনিস্টদের আদর্শবোধ, লেখকের সাম্প্রদায়িকতা ও

ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে মনোভাব, সোভিয়েত বিপ্লব সম্পর্কে গ্রন্থপাঠ, এমনকি গোর্কির 'মা' ও জোলার 'জার্মিনার্ল' পাঠ তাঁকে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করে। ১৯৩৮ সালে আট বছর কারাবাসের পর তিনি দমদম জেল থেকে বেরিয়ে-দেখা করলেন মুজফফ্‌র আহমদ ও সোমনাথ লাহিড়ির সঙ্গে। তাঁরা অনিলবাবুকে তাঁর স্বজেলার নারায়ণগঞ্জের সুতাকল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে উৎসাহ দেন। অনিলবাবু নারায়ণগঞ্জে এলেন। এবং শুরু হলো তাঁর শ্রমিক আন্দোলনের হাতে খড়ি।

'শ্রমিক আন্দোলনের হাতে খড়ি' একটি আশ্চর্য বই। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যায়। বানানো কাহিনী নয়, জীবনের অভিজ্ঞতার উজ্জ্বল চিত্রগুলি আমাদের সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। এর যে কোন একটি কাহিনী নিয়ে কোনো উপন্যাসের প্রস্তাবনা হতে পারে। আটত্রিশ থেকে ছেচল্লিশ—এই ন বছরের নারায়ণগঞ্জের বীর সুতাকল-মজুরদের সংগঠিত সংগ্রামের কাহিনী বইটিতে আছে। হাতে খড়ি শব্দটি পড়ে প্রথমে ভেবেছিলাম, বইখানি গুরুগম্ভীর চালে, ট্রেড ইউনিয়ন কি, তার কি কি কাজ—এবং ইত্যাদি—নানা ব্যাপারে ভারাক্রান্ত হবে হয়তো। কিন্তু বইটি একটি সুখপাঠ্য কাহিনী-সঙ্কলনও বটে। পরবর্তী সংস্করণে মুদ্রনপ্রমাদগুলি বাদ দিলে আরো ভালো হবে। এ বই প্রতিটি কমিউনিস্টেরই নয়, প্রতিটি প্রগতিশীল সাহিত্যপিপাসু মানুষের অবশ্য পাঠ্য বলে মনে করি।

তরুণ সান্যাল

ছিন্নমস্তা রাজনীতি, পুলিশী সন্ত্রাস ও বিভ্রান্ত যৌবন

কিছুকাল ধরে পশ্চিমবঙ্গে নৈরাজ্যের তাণ্ডব নৃত্য চলেছে। রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্যে হানাহানি, রাতারাতি সমাজবিরোধীদেরও রাজনৈতিক গুপ্তহত্যার আয়োজন ও প্রয়োজনে পঙ্‌ক্তিভোজনে সম্মানিত আসন প্রদান, ঘনঘন দম্ভী নেতাদের অন্য রাজনৈতিক দলের কর্মীদের নিকেশ করে দেবার জন্য কর্মীসমাবেশে ঘোষণা, স্কুল-কলেজের সম্পত্তি বিনষ্টি, শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ ও সমাজ-কর্মীদের মর্মরমূর্তি চূর্ণিকরণ ইত্যাদি চলেছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক আসরে রাজ্যপালের আমলাদের 'নিরমশৃঙ্খলা ও গণতন্ত্রে'র রক্ষা-কর্তার ভূমিকায় অবতরণ, চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থীদের রণহুঙ্কার, এবং সর্বোপরি পুলিশের নরঘাতী রূপ—সমস্ত অবস্থাকে বিষাক্ত, ঘোরালো এবং দিশেহারা করে তুলেছে। হত্যা, ধ্বংস এবং অনিশ্চয়তা আজ পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষভাবে কলকাতার নিত্যসঙ্গী। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গণতন্ত্রঘাতী বিনাবিচারে বিনাপরোয়ানায় বন্দী রাখার আইন।

কিন্তু কেন এমনটা হলো? পশ্চিমবঙ্গ নাকি সারা ভারতের গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র! অথচ এখানেই এত অনিশ্চয়তা কেন? নানা মুনির নানা মত আছে। আমাদেরও কিছু কিছু বলার আছে। এবং নিরাকরণের ব্যাপারে আমাদেরও কিছু কিছু মতামত থাকার কথা।

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া একই বৃন্তের যথাক্রমে সরস ও নষ্ট ফল। বৈপ্লবিক ক্রিয়া যত বাড়ে, মানুষের মধ্যে রূপান্তরণের স্পৃহা, আবেগ ও সংগঠন যত শক্তিশালী হয়, প্রতিক্রিয়াও সেগুলি প্রতিরোধের জন্য হন্যে হয়ে ওঠে। আর সেই প্রগতির সামান্য পদস্খলনেরও সুযোগ নিয়ে প্রতিক্রিয়া করাল মূর্তি ধারণ করে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সদ্যসদ্য প্রমাণ রয়েছে ইন্দোনেশিয়ায়। আমলা-তন্ত্রীরা এ রাজ্যে আজ রক্ষকের ভূমিকায়। পুলিশও রাজনৈতিক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। এবং বাছা বাছা প্রতিক্রিয়াশীলরা এ-রাজ্যে ও-রাজ্যে পশ্চিমবাঙলাকে গলা টিপে মারবার জন্য নানা দমনমূলক আইন চাপিয়ে দেবার সুপারিশ করছে।

এমন-কি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বহু ব্যক্তি ও দল দমনমূলক আইনকে ন্যায়পন্থা বলে মনে করছেন। প্রগতি ও গণতন্ত্রের শিবিরেও আজ বিভ্রান্তি ও অসহায়তা। এ-সুযোগে সরকারকে দক্ষিণপন্থীরা বাধ্য করছে রাষ্ট্রযন্ত্রের হাত দিয়ে চরম প্রতিক্রিয়ার ও গণতন্ত্রঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করতে। গড়ে উঠছে প্রতিক্রিয়ার সরকারী-বেসরকারী পিটুনিবাহিনী। অথচ সাধারণ মানুষ বিব্রত, হতচকিত। প্রবল বোমাবৃষ্টির মধ্যে সে সন্ত্রস্ত, পুলিশের দমনপীড়নের সম্মুখে সে অসহায়। রাজনৈতিক গুপ্তহত্যার সে নীরব সাক্ষী। অনেকে সন্ত্রাসের রাজনৈতিক চাপে প্রতিবাদেও অক্ষম। অথচ কথা ছিল অন্য রকম কিছু হবার।

বড়ো রাজনীতির কথা মনে করা যাক। বিভক্ত ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হলো, পড়ে রইল 'লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনা'। দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করছিল বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা। একদিকে ভারতের লোলুপ একচেটিয়াপতিরা দেশটাকে পুঁজিবাদী বিকাশের পথে ঠেলে দিয়ে দারিদ্র্যের অসহায়তার শ্মশানে তাণ্ডব নৃত্য করছিল, অন্যদিকে তাদের হাত ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করছিল। দেশের সাংস্কৃতিক উত্থানের মঞ্চে প্রবেশ করছিল সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমী সভ্যতার নোংরা নর্দমার কৃমিকীট। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে মার্কিনী গোয়েন্দা দপ্তরের কাল কেউটে ফণা তুলছিল, আর্থনীতিক বিকাশের সিসিফাসীয় পণ্ডশ্রমকে ধীরে ধীরে পাপচক্রে ঘিরে ধরছিল সাম্রাজ্যবাদ একচেটিয়াবাদ ও সামন্তবাদী-অবশেষের ত্রি-শির হাইড্রার নাগপাশ। আর এই অধঃপতনের প্রতিরোধে আসমুদ্র-হিমাচল বারবার ফেটে পড়েছে। পরিমাণমূলকভাবে তিলে তিলে গণতান্ত্রিক শক্তি বল সংগ্রহ করেছে। দক্ষিণপন্থীরাতো এই উত্থানকে সাবভার্টই করতে চেয়েছে। অন্যদিকে মানুষ লড়াই করেছে, মরেছে, আর তাদের মৃত্যু ও আত্মত্যাগের উপরে বনিয়াদ রচিত হয়েছে সাচ্চা গণতান্ত্রিক ও বামপন্থার পাশাপাশি সুবিধাবাদী তথাকথিত বামপন্থার। স্বদেশী পরিস্থিতির ও আন্তর্জাতিক সমস্যার মূল্যায়নের বিভ্রান্তিতে গড়ে উঠেছে নেতিবাগীশ বামমার্গের কোনো কোনো দল। পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীতে এদের জন্ম, পা রয়েছে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের পাদপীঠে কিন্তু মাথা বন্ধক দেওয়া আছে বুর্জোয়া চিন্তা-চৈতন্যের সিন্ধুকে। অতিদ্রুত ক্ষমতা লাভের লোভ এদের মত্ত করে। কোনো রকম অসৎ কর্মই এদের কাছে পরিত্যজ্য বলে বোধ হয় না। যেন তাদের হাতের আপাত-সাফল্যের আমলকীর

কাছে সমস্ত পন্থাই মূল্যবান, অভিপ্রেত ও কার্যকর। যেন হাতের মুঠোয় স্বর্গ, অর্থাৎ মন্ত্রীত্ব। ঠোঁট আর পেয়ালার মধ্যেকার সম্ভাব্য স্খলনের ভীতিতে এই নেতৃত্ব অমানবিক, ঘৃণ্য, নারকীয় পন্থা ব্যবহারে ও মিথ্যা প্রচারে ফ্যাসিবাদীদের হার মানাতে পারে। নামে বাম, কাজে চূড়ান্ত দক্ষিণের বাঁকটাই এঁরা দ্রুত আহ্বান করে আনেন।

অথচ দেশের স্বাধীনতা রক্ষা, প্রসারণ ও স্বনির্ভরতার জন্য প্রয়োজন ছিল ব্যাপক ঐক্যের। শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রীভিত্তিক ব্যাপক ঐক্যে টেনে আনার কথা ছিল মধ্যশ্রেণী ও জাতীয় বুর্জোয়াদের। এক ব্যাপক গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে নওজোয়ানদের সামিল করার কথা ছিল। কিন্তু ঘটলো কি? ১৯৬৭ সালে নির্বাচনের ফলাফল ভারত জুড়ে চিহ্নিত করলো কংগ্রেসী-দলের পুঁজিবাদী আর্থনীতিক বিকাশের প্রতিবাদে গণজাগরণ—যে-জাগরণকে কেবলমাত্র কংগ্রেসবিরোধিতার রাজনীতির মোড়কে ঢেকে চূড়ান্ত দক্ষিণ পন্থীরাও কার্যসিদ্ধি করতে চেয়েছে। অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির যারা বড়াই করেন সেই সব তা-বড় তা-বড় নেতাদের প্রয়োজন ছিল চোখের মণির মতো বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যকে রক্ষা করা। বরং দেখা গেল, ১৯৬৯-এ যুক্তফ্রন্ট জয়ী হলেও বিভেদের রাজনীতি ঘৃণার রাস্তায় বাঁক নিচ্ছে। প্রতিক্রিয়াকে চূড়ান্ত আঘাত দেবার জন্য উত্থিত প্রগতির বজ্রবাহু প্রস্তরবৎ হলো, এবং তা পাষাণ খণ্ড হয়ে মূলত বিভ্রান্ত দুটি দলের তথাকথিত বিপ্লবী তরুণের হাত দিয়ে নেমে এলো স্বজন-পরিজনের মাথায়। যে-পশ্চিমবঙ্গে গোটা ভারতের পুঁজিবাদী মূলধনের প্রায় অর্ধাংশ খাটে, যে-রাজ্যে প্রতিক্রিয়া প্রত্যাঘাতের সুযোগ খুঁজছিল, সেখানে অনৈক্যের সুযোগে নেমে এলো চরম দণ্ডের প্রগতিঘাতী খড়্গ। এই ছিন্নমস্তা রাজনীতির মুষল পর্বের নায়কেরা এখনও বুঝছেন না, স্বজনবৈরিতা গোটা ভারতকে রসাতলে পাঠাচ্ছে। শেখবার ব্যাপার যখন ছিল নতুন পরিস্থিতিতে তৃতীয় বিশ্বের সিংহল বা চিলির কাছ থেকে তখন গোটা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে ঘনিয়ে তোলা হচ্ছে ঘনঘটা। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্য ভারতকে পথ দেখাতে পারত, ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়া-লাওসের সংগ্রামকে দিতে পারত নৈতিক শক্তি, উল্টে আজ দেখা যাচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলদের উল্লাস। কে-না জানে প্রতিক্রিয়ার হাতের মুঠো শক্ত করে গণতন্ত্রঘাতী সাবভার্সনের শক্তিগুলি। উগ্র বামপন্থাও সেই দক্ষিণপন্থারই সহোদর।

আমাদের দেশের বিভ্রান্ত তরুণদের দোষ দিয়ে পালাবার পথ নেই। একসময় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সুস্পষ্ট ও প্রচলিত নীতির বাইরে চীনদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে অন্তর্ঘাত তৈরি করে। যাঁরা পাল্টা পার্টি বানালেন, তাঁরা দ্রুত বিপ্লবের নামে তরুণকুলকে সত্যমিথ্যায় নানা রণধ্বনি তুলে ডাক দিলেন। ১৯৬৭ সালে 'দিনবদলের পালা'য় রাজনীতির নামে খেউড় আমদানীর কথা বোধহয় এত সহজেই কেউ ভুলে যাননি। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা গেল, যাদের শোধনবাদী বলে ধ্বংস করার ডাক দেওয়া হয়েছিল, এমন-কি যাদের বলা হয়েছিল প্রাতক্রিয়াশীল, তাদের সঙ্গেই মন্ত্রিত্ব করতে হলো। চীনা বেতার পাল্টা পার্টিকে নয়া শোধনবাদী আখ্যা দিল। যাদের কাছে চীনা কমিউনিস্ট পার্টিকে অভ্রান্ত বলে আহ্বান জানানো হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে সেই অন্ধ রাজনীতির প্রতি নিষ্ঠাবান সৎ নেতা ও কর্মীরা পার্টি ছেড়ে গেলেন। তবুও কি কিছু করার ছিল না?

১৯৬৯ সালে আবার যখন যুক্তফ্রন্ট হলো, পশ্চিমবঙ্গের অবৈজ্ঞানিক ও মান্ধাতা আমলের এবং ঔপনিবেশিক ধাঁচের শিক্ষাবিধি ও পরীক্ষাব্যবস্থা বদলে নতুন কিছুই করা হলো না। কেবল কলেজ-স্কুলের প্রশাসনে দলের লোকজন বসানো হলো। ভূমি আন্দোলনের জন্য আগ্রহী চাষীদের 'শ্রেণীসংগ্রামের' অদ্ভুত ব্যাখ্যার নামে তাঁরা লেলিয়ে দিলেন অন্য কৃষকের দিকে। গ্রামের জোতদারের হাতে রইল ষাট হাজার বন্দুক। ফ্রন্টিয়ার রাইফেল গেল তথাকথিত উগ্রপন্থীদের দমনে। কোনো মন্ত্রী হাঁক দিলেন, উগ্রপন্থীদের দমন করার জন্য দলীয় ছাত্রদের হাতে রাইফেল তুলে দেওয়া হবে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে চলল দলীয় ক্যাডারদের আধাসামরিক কুচকাওয়াজ। চলল শ্রেণীভিত্তিক ফ্রন্টের নামে গুণ্ডাবাজী, হত্যা, পীড়ন। ঐ পার্টির অফিসগুলির সঙ্গে অন্তঃগ্রথিত হলো পুলিশী প্রশাসন। পুলিশও এই বিভেদের অন্ধ রাজনীতির সঙ্গী হয়ে উঠল। রাজনীতির আসরে অন্যতম সাথী হলো পুলিশ। বিচারপতি মুল্লা যাদের বলেছিলেন, 'সংগঠিত গুণ্ডাবাহিনী' তারা এবং পাড়াতুতো সমাজবিরোধী ও গুণ্ডাদের এক অশুভ আঁতাত গড়ে উঠল বিশেষ এক রাজনীতির সঙ্গে; দুর্ভাগ্যের ষোলো কলা পূর্ণ হলো।

গণতান্ত্রিক বামপন্থী ও বিশেষভাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী রাজনীতিতে অদীক্ষিত, পেটি-বুর্জোয়াশ্রেণীর শিক্ষিত বেকার ও অর্ধশিক্ষিত তরুণদের সামনে

উগ্র রাজনীতির নেশা লাগল। আমরা এর আগেই বলেছি, সুস্থ স্বদেশপ্রেমী রাজনীতির কথা এদের কাছে শোনাবার কথা ছিল। কিন্তু তা হলো না। প্রয়োজন ছিল বামপন্থী উচ্চ নৈতিকতার আদর্শে এদের উদ্বুদ্ধ করা কিন্তু দলীয়তা ও পার্টি হেজিমনির বলদর্পিতার নীতিহীন নৈরাজ্যে এদের বলী দেওয়া হলো উগ্রপন্থা ও হঠকারিতার পথে। দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে বৃহৎ দলীয় নেতারা লড়াইয়ে নামলেন। শুরু হলো হত্যা, বীভৎসতা, মৃত্যু ও অরাজকতা। পশ্চিমবঙ্গে আজ চলেছে সেই হত্যা-প্রতিহত্যা, আঘাত-প্রত্যাঘাতের পালা। বিপ্লব আকাঙ্ক্ষা ক'রে সর্বত্যাগী হতে যে তরুণ প্রস্তুত, সে যে-বামপন্থী বিপ্লবী দলেরই অনুগামী হোক-না-কেন, তাকে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে অন্য রাজনৈতিক দলের অনুগামীর বিরুদ্ধে। আর একদিকে দম্ভী রাজনৈতিক নেতারা তথাকথিত উগ্রপন্থীদের মোকাবেলা করার জন্য যুবকর্মীদের সশস্ত্র হতে ডাক দিচ্ছেন। স্কুল থেকে ছাত্র টেনে বের করে হত্যা করা হয়। এ-ধরনের ছাত্র-হত্যার প্রতিবাদে কোনও বিজ্ঞপ্তি তাঁরা প্রচার করেন না। অবধারিতভাবে ছাত্র-হত্যার পরবর্তী অধ্যায়ে শিক্ষয়িত্রীর উপরে আক্রমণ হলে হরতাল হয়, পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তর হয়। কলেজের স্বদলীয় ছাত্র নিহত হলে সারা কলকাতায় ছাত্র ধর্মঘট হয়। স্বদলের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য সত্যমিথ্যা কোনো পন্থাই পরিত্যজ্য নয়। অন্য পথের পথিক সমস্ত দলের বিরুদ্ধে কালিমা লেপন ও আক্রমণ—এবং প্রতিক্রিয়ায় প্রতিআক্রমণ—বরফের উপরে বরফের বল গড়ানোর মতো ক্রমোস্ফীত বীভৎসা ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি ঘটিয়েছে। বিভ্রান্ত যুব-ছাত্ররা ভ্রান্ত রাজনীতিক বিশ্লেষণে পুলিশ হত্যায় তৎপর। ব্যবসায়ী পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের প্রতিও তাদের নাকি আক্রোশ দেখা দিয়েছে। পুলিশও জঘন্য প্রতিআক্রমণে প্রতিশোধ নিচ্ছে। হত্যা আর হত্যা নয়! এক কুৎসিত বীভৎসা আসর জমিয়েছে। পুলিশ এখন গোদের উপরে বিষফোঁড়া। উচ্চাভিলাষী প্রবীণ নেতাদেরও মনে রাখা দরকার, সাম্রাজ্যবাদী চক্রীশক্তি নানা বিপ্লবী বুলির আড়ালে প্রতিক্রিয়ার উদ্দেশ্য সাধনে এমন সুবর্ণসুযোগ বিবিধ কায়দায় ব্যবহার করবেই। দেখা যাচ্ছে, বলদর্পী দলীয়তা. উগ্রপন্থা ও পুলিশ এই ত্র্যহস্পর্শে দেশের গণতান্ত্রিক-আন্দোলনের মূলোচ্ছেদের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হতে চলেছে।

এ-সত্ত্বেও উজ্জ্বল রূপালী রেখা আছে এই দুর্ভাগ্যের ঘনমেঘাড়ম্বরেও। কৃষক যেখানে জমি, ফসল ও অধিকারের জন্য লড়ছে, শ্রমিক যেখানে বেকারী,

লকআউট, ক্লোজার, শোষণ ও পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, সেখানে এই বীভৎসার রাজনীতি বর্তমানে বহুলাংশে অনুপস্থিত। যেখানে পেটি-বুর্জোয়া নেতৃত্ব আছে, সেখানেই এই সন্ত্রাস।

যে তরুণবৃন্দ আজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ভাঙছেন, তাদের মধ্যে কতজন আদর্শপবিত্র, কতজন-বা সুযোগসন্ধানী আর কতজনই-বা প্রতিবাদ জানাবার জন্য তথাকথিত যুববিক্ষোভসাপেক্ষ হাতিয়ার পেয়েছেন! কৃষি-বিপ্লব বা এ-ধরনের ধ্বনির আর্থনীতিক ও রাজনীতিক তাৎপর্য এঁরা অনেকে সামান্যও বোঝেন না। কিন্তু স্বদেশের তরুণকুলের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যে প্রাণধারণের গ্লানিসঞ্জাত শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, অনন্বয়ের নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে মানসিক বাতাবরণে, সে নিম্নচাপ সাইক্লোনই ডেকে আনে। শিল্পবিকাশের অসংলগ্নতা ও একচেটিয়ার চাপ, অসমাপ্ত ভূমি-বিপ্লব, সম্পদ ও দারিদ্র্যের অহেতুক সহাবস্থান, মধ্যযুগীয় ভূ-সমান্তর চিরাচরিত প্রাকৃতিক অর্থনীতি ও সমাজবোধ থেকে জেগে উঠে—ক্ষুধিত গরুড়ের মতো প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি, উদ্বাস্তু জীবনের মূলশূন্যতা, সামাজিক সুবিচারের অভাব, নগর কেন্দ্রিকতা অথচ ব্যাপক বেকারী, বর্তমান শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতির পরিমণ্ডলে অন্তঃসারশূন্যতা ও ভারসাম্যহীনতা, এমন-কি সাম্প্রতিক বিজ্ঞান ও কৃৎকৌশলের বিপ্লব ও তাদের সঙ্গে সম্পর্করহিত ব্যবস্থা সপ্রশ্ন তরুণকুলকে ঝড়ের কেন্দ্রের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এক ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী বিচ্যুতি, অনন্বয় বা এ্যালিয়েনেশন তাদের ভায়োলেণ্ট করে তুলেছে। এ কেবল মধ্যশ্রেণীজাত তরুণের মধ্যেই দেখা দিচ্ছে না, শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেও পুঁজিবাদী বিকাশের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ছটফট করছে এ্যালিয়েনেশনজাত দ্বন্দ্ব। তরুণের এই চূড়ান্ত মানসিক দোলাচলের মধ্যে ইন্ধন পড়ছে উগ্ররাজনীতির বিভ্রান্ত নেতাদের বাক-স্ফুলিংগ। যা কিছু অস্তিত্বকে ধরে আছে, সব কিছুর বিরুদ্ধেই জেহাদ ফুঁসে উঠছে। ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা তাদের ঠেলে দিচ্ছে মূর্তি ভাঙা থেকে, বিদ্যায়তন ভাঙা, পরীক্ষা ভণ্ডুল করা, এমন কি হত্যার দিকেও। বাকুনিনপন্থার ভূত ঘাড়ে চেপেছে। সজীব ও সুস্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তা ও সংস্কৃতিপ্রস্থান এদের পথ দেখাতে পারত—ঐতিহ্যকে বর্জন নয়, তার মধ্য থেকে মহৎ ব্যাপারগুলির পরিপোষণ ও বিভাসন। কথা ছিল, সংগ্রামী সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির পথে তরুণকুলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, শ্রমজীবী মানুষের সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে সামিল করা। তাদের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন

ছিল — কেনই-বা স্খলন থাকা সত্ত্বেও তলস্তই লেনিনের চোখে মহৎ ছিলেন, কেনই-বা লেনিন প্রলেটকাল্টের ঐতিহ্য ও অন্যান্য প্রভাবনিরপেক্ষ তথাকথিত সর্বহারা সংস্কৃতির সমর্থক ছিলেন না, কেনই-বা হার্ৎসেন, পিসারেভ, চেরনিশেভস্কি, বেলিনস্কি, ডব্রুলবভ প্রভৃতিকে তিনি শ্রদ্ধার পাত্র বলে গণ্য করেছিলেন। কেনই-বা লেনিন রুশ দেশের মুক্তির ইতিহাসকে ১৮২৫ থেকে ১৮৬১, ১৮৬১ থেকে ১৮৯৫ এবং ১৮৯৫ সালের পরবর্তী এই তিন স্তরে ভাগ করে, শ্রমজীবীদের নেতৃত্বের সংগ্রামকে পূর্ববর্তী দুটি স্তরের ক্রমপরম্পরা বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। কা কস্য পরিবেদনা।

একদা যুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির দলভাঙা নায়কেরা রাজনীতি না দিয়ে তরুণকুলকে ডাক দিয়েছিলেন, সশস্ত্র বিপ্লবকে অ্যাজেনডায় রেখে। বিপ্লবও যে দিনক্ষণ দেখে, তারিখ ঠিক করে একটা হঠাৎ ঝড় তোলা নয়—এটাও তাঁরা বুঝিয়ে বলেন নি। বুঝিয়েছেন রাতারাতি হঠাৎ সশস্ত্র ভাবে কিছু ঘটানোর নামই বৈপ্লবিক কাজ, বা বিপ্লব। বিপ্লব যে একটি পরম্পরা, একটি পদ্ধতি — পরিমাণমূলক শক্তি সামর্থ্য অর্জনের চূড়ান্ত স্তরে গুণগত পরিবর্তনের জন্য লাফ দেওয়ায়ই যে বিপ্লব — এটা তাঁরা বোঝান নি। এমন-কি একটা বিদেশী বেতারে কান পেতে, এ দেশে ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতার জন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জয়গানও গেয়েছেন। ফলে জন্মেছে ডক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের হাতে গড়া সেই দৈত্য। এবার স্রষ্টারই তারা কেবল গলা টিপে ধরছে না, প্রচণ্ড আবেগের তাড়নায় যা মন চায় তেমনি কিছু তারা করছে। একদা যেমন হিটলারের মুখে শুনেছি, 'হ্যাঁ, আমরা বর্বর, আমরা বর্বরতাই করব'। এরাও বলছে, 'হ্যাঁ। আমরা সমাজবিরোধী, কেননা আমরা এ-সমাজ মানিনা' অর্থাৎ বামপন্থার যজ্ঞস্থলিতে সত্যকেই আহুতি দেওয়া হয়েছে, জন্ম নিয়েছে এক ছিন্নমস্তা কবন্ধ। এমনটি তো হবার কথা ছিল না। সমাজতন্ত্রী সংস্কৃতি মানুষকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বা ইনডিভিডুয়ালিটিতে নিয়ে যায় না, তাকে অভিষিক্ত করে পার্সোনালিটিতে। ব্যক্তির স্বার্থ যেখানে মুখ্য সেখানেই ইনডিভিডুয়াল। সমাজস্বার্থের জন্য প্রগতির সারাৎসার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ধারণ ক'রে, জীবনে তা প্রয়োগের মধ্যে গড়ে ওঠে পার্সোনালিটি। তরুণকর্মীদের কাছে এটাই প্রার্থিত ছিল। সময় বয়ে যায় নি, লোনা সমুদ্রের এই উজান ঠেলে এখনও আমরা সেখানে পৌছতে পারি। এজন্য তরুণ-কুলের সামনে যথার্থ দেশপ্রেমিক বামপন্থা ও সমাজবাদের দীক্ষা পৌছে দেবার

জন্য কোমর বেঁধে নামতে হবে। অযথা বৈরিতা নয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সুস্থতার আদর্শ তুলে ধরেই তাকে শিক্ষিত করতে হবে। এরা আমাদেরই সন্তান, আমাদেরই ভাই। এদের ভবিষ্যতের মধ্যেই দেশের ও জাতির ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে। এদের কালাপাহাড়ী কাজকে যেমন নিন্দা করতে হবে, কিন্তু কেন নিন্দা করছি তার যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক কারণ দেখাতে হবে। আবেগ নয়—যুক্তি, সহানুভূতি ও সমবেদনা এদের বিভ্রান্তির ঘূর্ণি থেকে মুক্ত করতে পারে। শ্রমজীবীমানুষের সর্বকলুষহর গণতান্ত্রিক সংগ্রামের গঙ্গাস্নানেই এদের গ্লানিমুক্তি হতে পারে। জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অসমাপ্ত বিপ্লব সমাপ্ত করার কাজে এদের টেনে আনতে হবে। সেই সংগ্রামের মুক্তধারায় অবগাহন করেই হবে আমাদের সবারই প্রায়শ্চিত্ত।

হয়ত এখনও সময় আছে। বিপ্লবী বুলি, ব্যক্তিসন্ত্রাস ও পুলিশি তাণ্ডবের ঘোলা জলে মৎস্যশিকার নয়, সুস্থ গণতান্ত্রিক আদর্শ ফিরিয়ে আনবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে আবার কোমর বেঁধে লড়তে হবে। সারা ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে রুখে দাঁড়াতেই হবে। বারাসতের অদূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আটটি তরুণের শবদেহ, বীভৎসা কতদূর পৌঁছেছে তারই দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করছে। ইতিমধ্যে দেরীতে হলেও কিছু কিছু কাজ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেশের লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে আসছেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও বলব দেশের শ্রমজীবী মানুষের সজীব আন্দোলনই এই আত্মহত্যার পথ থেকে দেশের বিভ্রান্ত তরুণ শক্তিকে ফেরাতে পারে। আমরা তারই প্রতীক্ষায় আছি। আমরাও সে লড়াইয়ে সামিল হব। সম্প্রতি দেশের বুদ্ধিজীবীদের ১১ই নভেম্বর ভারতসভা হলে অনুষ্ঠিত এক কনভেনশনে নিম্নলিখিত ইশ্‌তাহার প্রচার করা হয়েছে। একটি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে-তোলার কাজে তাঁরা হাত লাগিয়েছেন। ঘনমেঘের মধ্যে আশার ঝলক চোখে পড়ছে।

"একদিকে সীমাহীন পুলিশী জুলুম অপর দিকে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ব্যক্তিগত হত্যাকাণ্ড দুইয়ে মিলে সমগ্র পশ্চিম বাঙলায় আজ এমন এক সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে যা আমাদের সমগ্র দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে একরকম বিপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে।

মাত্র গত দু'এক মাসের মধ্যে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার একাধিক রাজনৈতিক

কর্মী পুলিশ হেফাজতেই অথবা পুলিশের সঙ্গে তথাকথিত 'গুলি বিনিময়ের' ফলে প্রাণ হারালেন। ২০ সেপ্টেম্বর ভবানী দত্ত লেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের হত্যাকাণ্ড এর নগ্নতম প্রকাশ।

আবার তারই পাশাপাশি এক রাজনৈতিক দলের কর্মী অপর দলের কর্মী বা সমর্থকদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হচ্ছেন। এবং এই ভ্রাতৃঘাতী হত্যা অভিযান বন্ধ হবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কোথাও আবার 'প্রতিশোধ' হিসাবে সাধারণ পুলিশ বা পুলিশ অফিসারদের অতর্কিতে আক্রমণ করে হত্যা করা হচ্ছে এবং এর সংখ্যাও বাড়ছে।

দেশের গণতন্ত্রের পথে বিপজ্জনক সম্ভাবনাপূর্ণ আরও কয়েকটি ঘটনাও আজ অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব নিয়ে আমাদের সামনে আসছে। ১৯৩২ সালের কুখ্যাত এণ্ডারসনী আমলের সন্ত্রাসবাদ দমন আইন চালু করা হচ্ছে, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তারের জন্য সহস্র সহস্র টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হচ্ছে, এবং সর্বোপরি গ্রেপ্তার অবস্থায় রাজনৈতিক কর্মী বিশেষতঃ ছাত্র ও যুবকদের উপর নিষ্ঠুর দৈহিক নির্যাতন করা হচ্ছে। সমীর ভট্টাচার্যের ঘটনাকে হত্যাকাণ্ড বলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

অন্তরের সমগ্র অনুভূতি ও আবেগ নিয়ে আজ আমরা দেশের প্রতিটি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, প্রতিটি দায়িত্বশীল সংস্থার নেতৃবৃন্দের কাছে আবেদন জানাচ্ছি — সমস্ত শক্তি দিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে ঘটনার এই অশুভ গতির মোড় ফেরান।"

বিবৃতিতে বলা হয়েছে "ভারতবর্ষের গণতন্ত্র রক্ষা করতে হলে কিছুতেই আমরা পশ্চিমবঙ্গে পুলিশী রাষ্ট্র প্রবর্তিত হতে দিতে পারি না। কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা — পুলিশ বাহিনীর এই প্রতিহিংসাপরায়ণ নরহত্যার অভিযানকে রোধ করতেই হবে। আমাদের তরুণ সম্প্রদায়ের একাংশ বিভ্রান্ত হতে পারেন কিন্তু এদের নির্বিচারে হত্যা করার, চরম দৈহিক নির্যাতন করার কোনো অধিকার পুলিশ বাহিনীর নেই। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কাছে আমরা দাবি করছি অবিলম্বে এই পুলিশী সন্ত্রাস বন্ধ করুন।

আবার সমান জোর দিয়েই আমরা বলছি বর্তমানে রাজনৈতিক মতপার্থক্য রাজনৈতিকভাবে সমাধান না করে হিংসা ও ব্যক্তিগত হত্যার মাধ্যমে সমাধানের যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ করতেই হবে। মনে রাখতে হবে যে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম তা অন্যদলের রাজনৈতিক কর্মীর

বিরুদ্ধেই হোক বা কোনো সাধারণ পুলিশ কনষ্টেবল বা অফিসারের বিরুদ্ধেই হোক গণতান্ত্রিক অগ্রগতি বা সমাজ-বিপ্লব কোনো কিছুরই সহায়ক হতে পারে না।

সমাজ-বিপ্লবের পথ জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নয়। কোনো রাজনৈতিক দলের বা মতের সন্ত্রাসের সাহায্যে জবরদস্ত কণ্ঠরোধ নয়, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মত প্রচারের পূর্ণ স্বাধীনতা; রাজনৈতিক বিতর্কের মীমাংসা ব্যক্তিগত হত্যাকাণ্ডে নয়, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমেই নীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা — এই হোক সকলের সঙ্ঘবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার মূল দৃষ্টিভঙ্গী।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ঘটনার ধারা যে বিপরীত বিপজ্জনক পথে চলেছে তাকে রোধ করতে না পারলে তার ফল হবে সর্বনাশা। কারণ একবার যদি গণতান্ত্রিক জীবন ও আন্দোলনের ধারা সন্ত্রাস পাল্টা সন্ত্রাসের আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে যায় তার পরিণতি হবে চরম প্রতিক্রিয়ার অভ্যুত্থান।

দল ও মত নির্বিশেষে সবাইকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার সাহায্যে এই বিপজ্জনক সম্ভাবনাকে প্রতিহত করুন, জাতীয় জীবনে সুস্থতা ফিরিয়ে আনুন, জাতির অগ্রগতিকে নিশ্চিন্ত করুন।"

ইকবাল ইমাম

পূর্ববঙ্গের দিকে তাকান

পূর্ব বাঙলার মানুষ যখন গণতন্ত্রের স্বাদ পাবে বলে নির্বাচনী সংগ্রামের জন্য তৈরি, সমস্ত বিপত্তি দূর করে যখন জাতীয়তা অর্জনের লড়াইয়ে সামিল, ঠিক তখনই আমাদের চোদ্দো লক্ষ ভাই বোনকে লুঠ করে নিয়ে গেল সমুদ্রের লোনা জলের পর্বতপ্রমাণ উঁচু জোয়ার-কোটালের বান। এমন দুর্দৈব মানুষের ইতিহাসে কতবার ঘটেছে জানা নেই। মানুষ চাঁদে যায়, পরমাণু বিদারণ করে, অথচ প্রকৃতির অন্য অন্ধ শক্তিগুলির সম্পর্কে জ্ঞান তার এখনও সম্যক হয়নি। যদি হতো তবে আমাদের লক্ষ লক্ষ ভাই বোন বাঁচতো। তাহলে চৌদ্দো লক্ষ মহাব্রহ্মাণ্ড অকালে নামহীন কবরে পশু ও সরীসৃপের সঙ্গে জড়াজড়ি করে চিরশয্যায় শায়িত হতো না। ভেসে যেত না সাধের সংসার, সোনার ধান, হাসি কান্না ভালোবাসা মমতা। মানুষের পরাজয় হয়েছে

প্রকৃতির অন্ধ দাপটের কাছে। এ পরাজয় থেকে শিক্ষা নেবার আছে। মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা নয়. জীয়নকাঠি গড়ে তোলবার জন্যই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা কাজে লাগুক। অর্ধোন্নত দেশকে উন্নতদেশের স্তরে তুলে নেবার জন্য আন্তর্জাতিক নিঃস্বার্থ শ্রম, সেবা ও সহায়তা আসুক।

পূর্ববঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল জনশূন্য হয়েছে। অন্যান্য রাষ্ট্র এ দুঃখে সমবেদনা জানাতে পারে। কিন্তু আমাদের কথা অন্য। আমাদেরই পরমাত্মীয়রা ভেসে গেছে। জীবিতরা হিরোসিমায় পারমানবিক আক্রমণের পরবর্তী অবস্থার সঙ্গে তুলনীয় দুর্দৈবের মধ্যে অসহায়, দীর্ণ, অনাথ। এইতো ভাইকে বুকে টানার সময়। এইতো ভারত-পাকিস্তানের মানুষের মৈত্রীকে মানবতার মর্যাদায় অভিষিক্ত করার সময়। পশ্চিমবঙ্গের লাখো তরুণকে পূর্ববঙ্গের এই বেদনার দিনে সেবাব্রতী হতে আহ্বান জানাই। পশ্চিমবঙ্গের ঘরে ঘরে বলি, সমস্ত সামর্থ্য দিয়ে জীবিতকে প্রাণ দাও, জীবনে বিশ্বাস দাও, জীবনের প্রতি আবার সে মমতা নিয়ে তাকাক। প্রকৃতির রুদ্ররোষের সম্মুখে এক সঙ্গে দুঃখকে ভাগ করে নেবার মধ্যেই হবে মৈত্রীবন্ধন সার্থক। দাবি জানাই, ভারত সরকারের কাছে এই ভয়াবহ দুর্যোগে-আপ্রাণ সহায়তা দিতে। আবেদন করি, দুই বাঙলার মধ্যেকার কৃত্রিম বেড়া অন্ততপক্ষে এবারকার মতো খুলে যাক। পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষকে বলি, অযথা বাধা-নিষেধ দিয়ে সাহায্য ও সমবেদনা জানাবার মধ্যে ভেদপ্রাচীর তুলবেন না। চরম দুঃখের দিনে ভাই চায় ভাইয়ের বুকের আশ্বাস, সহমর্মিতা।

শুভব্রত রায়

প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯ খ্রী) জন্মের পর এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হলো। এই স্বল্পায়ু প্রতিভাধর পুরুষের নাম আজ বাঙলা দেশে প্রায় অপরিচিত ; অবশ্য তাঁর আরব্ধ কাজগুলির ওপর অকালে যবনিকাপাতই এজন্য প্রধানত দায়ী।

প্রতিভার স্ফুরণের সঙ্গে প্রথাগত শিক্ষার সম্পর্ক যে অত্যন্ত শিথিল, বলেন্দ্রনাথ তার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েই তাঁর প্রথাগত শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে ; কিন্তু তাঁর মননশক্তির,

স্বচ্ছ চিন্তাধারার এবং সংস্কৃত ও বাঙলা সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, চারুকলা, সামাজিক আচার প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও অধিকারের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর কর্মজীবনের বিভিন্ন কার্যধারায়।

বাল্যকাল থেকেই বলক্ষয়কর রোগে তিনি পীড়িত ছিলেন, একথা তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৮২১ শক) এবং তাঁর মা প্রফুল্লময়ী দেবীর স্মৃতিকথা ('আমাদের কথা' প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৭) থেকে জানতে পারা যায় ; এর ওপর তাঁর বাবা বীরেন্দ্রনাথ তাঁর জন্মের আগে থেকেই মানসিক রোগে পীড়িত ছিলেন। এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বলেন্দ্রনাথ তাঁর মাত্র ২৯ বছরের জীবনে বহুমুখী কর্মশক্তি ও অভিনব সংগঠনী চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর কাজের ধারাকে প্রধানত তিনটি ভাগে বিবেচনা করা যায়—স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যের আন্দোলন, আর্য-সমাজ ও ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে মিলনের প্রয়াস এবং বাঙলা সাহিত্যের সেবা।

উনবিংশ শতকের শেষদিকে স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের যে আন্দোলনটি বাঙলা দেশে রূপগ্রহণ করেছিল, বলেন্দ্রনাথ তার এক উল্লেখ্য যোদ্ধা ছিলেন। শিল্পবাণিজ্যে অনগ্রসর দেশের অর্থনীতি যে দীর্ঘকাল বিদেশীর কুক্ষিগত থাকতে বাধ্য, সে বিষয়ে অল্পবয়সেই তিনি অবহিত হয়েছিলেন। বাঙলা দেশে প্রথম স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপনে তিনি এক মুখ্য অংশ নিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় তিনি স্বদেশী কাপড়ের ব্যবসায়েরও সূচনা করেন ; বলেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথের শ্রম ও উদ্যমেই এসব স্বদেশী বাণিজ্যচেষ্টা আরম্ভ হয় এবং পরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কিছু পরিমাণে এই প্রচেষ্টার সঙ্গে সম্পর্কিত হন। ব্যবসায় হিসেবে এসব প্রয়াস সাফল্যলাভ না করলেও এদেশে স্বদেশী আন্দোলনের বিকাশে অবশ্যই এগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র হিসাবে বাল্যকাল থেকেই বলেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের নানা কাজের সঙ্গে তাঁর অল্পাধিক সম্পর্ক ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, জীবনের শেষদিকে আদি ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজের মধ্যে মিলন সাধনে তিনি প্রয়াসী হয়েছিলেন। আর্যসমাজের স্বামী দয়ানন্দের 'সত্যার্থপ্রকাশ', 'বেদভাষ্যভূমিকা' ইত্যাদি গ্রন্থ এবং নানা পুস্তিকা ও প্রবন্ধ পাঠ করে বলেন্দ্রনাথ আর্যসমাজের উদ্দেশ্য ও কার্যধারা সম্বন্ধে অবহিত হন ; পাঞ্জাব আর্যসমাজের

সীতারাম শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতরা কলকাতায় এলে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বলেন্দ্রনাথ একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠায় আর্যসমাজীদের সংকল্প এবং বেদোক্ত শিক্ষায় তাঁদের আস্থা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে আর্যসমাজের পণ্ডিতদের ধর্মালোচনার সময়েও বলেন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২১ মে ও ৩১ মে তারিখে যথাক্রমে লাহোরের 'আর্যপত্রিকা' ও 'আর্য মেসেঞ্জার' পত্রিকার সম্পাদককে লেখা দুটি চিঠিতে বলেন্দ্রনাথ আর্য-সমাজের মতবাদ ও পন্থা সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ব্যক্তিদের মতামত ব্যাখ্যা করে উভয় সমাজের মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন ; চিঠি দুটিতে একদিকে স্বামী দয়ানন্দের আদর্শ ও বক্তব্য সম্বন্ধে এবং অন্যদিকে ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য, শিক্ষা ও প্রচার পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আষাঢ় ১৮২০ শকাব্দ, পৃ, ৪২-৪৭)। স্বয়ংবর প্রথা, শুদ্ধির সাহায্যে ধর্মান্তরিত ও বিধর্মীদের হিন্দুধর্মে গ্রহণ, বিদেশযাত্রা, 'চৌকা' প্রথা বর্জন, ব্রহ্মচর্যাশ্রম ইত্যাদি সম্বন্ধে দয়ানন্দের প্রস্তাবিত কার্যধারা পাঞ্জাবে কতদূর কার্যকরী করা সম্ভব হয়েছিল, সে সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথ 'আর্যপত্রিকা'র সম্পাদককে অপর একটি চিঠিতে কয়েকটি প্রশ্ন করেন (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, শ্রাবণ ১৮২০ শকাব্দ, পৃ. ৬৩-৬৪); প্রশ্নগুলি পড়লেই বোঝা যায়, হিন্দুধর্মের রক্ষণশীল পুরাতন সংস্কার ও প্রথার নিগড় থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করার চিন্তায় বলেন্দ্রনাথ কতদূর উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বস্তুত বাঙলা দেশের ব্রাহ্মসমাজ এবং পাঞ্জাবের আর্যসমাজের মধ্যে একতাবিধানে তাঁর এই প্রয়াসের পিছনে নিছক ধর্মীয় আন্দোলনই নয়, পরন্তু নানা প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক প্রথা লোপের এবং বাঙলা ও পাঞ্জাবের চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে ঐক্যস্থাপন ও মত বিনিময়ের প্রচেষ্টাও উপলব্ধি করা যায়।

অচিরেই বলেন্দ্রনাথের প্রয়াস ফলপ্রসূ হতে থাকে। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে রাঁচি-আর্যসমাজের বার্ষিক উৎসবে বলেন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হন এবং সেখানে তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আর্যসমাজীরা তাঁর সঙ্গে রাঁচি ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দেন। এরপর ঐ বছর নভেম্বর মাসে লাহোর আর্যসমাজের ২১শ বার্ষিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে বলেন্দ্রনাথ লাহোরে পৌছালে তাঁকে স্টেশনেই স্বাগত জানান লালা লাজপত রায়, লালা হংসরাজ, পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রী প্রমুখ বহু ভারতবিখ্যাত নেতা। দয়ানন্দ অ্যাংলো-বৈদিক কলেজ প্রাঙ্গনে, বছোয়ালি আর্যসমাজ মন্দিরে এবং অন্যান্য স্থানে

অনুষ্ঠিত সভায় উভয় সমাজের চিন্তাধারার সাদৃশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি দুই সমাজের মধ্যে মৈত্রী, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, অবাধ মতবিনিময় এবং পরিণামে মিলনের আহ্বান জানান। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২৯ নভেম্বর লাহোর পাঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে বলেন্দ্রনাথের উদ্যোগে যুক্ত উপাসনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উভয় সমাজের সদস্যেরাই যোগ দেন। এরপর ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে একই উদ্দেশ্যে বলেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার লাহোরে যান, ফেরার পথেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কয়েক মাস পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

পাঞ্জাবে তাঁর প্রচেষ্টা সম্বন্ধে যে কতদূর আগ্রহ ও উৎসাহের সঞ্চার হয়েছিল লাহোরের 'আর্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত শোকসংবাদে এবং পাঞ্জাব আর্যপ্রতিনিধি সভায় গৃহীত শোকপ্রস্তাবে তার পরিচয় পাওয়া যায় (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৮২১ শকাব্দ, পৃঃ ১০২)। সে যুগের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের দুই প্রান্তের এবং দুই ধর্মসমাজের লোকের মধ্যে ঐক্যস্থাপনের প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রগতিশীলতার পরিচায়ক ছিল।

বাংলা সাহিত্যের আসরে—বলেন্দ্রনাথের অবদান সংক্ষিপ্ত হলেও প্রতিভায় ও স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। তাঁর বাল্যকালে প্রধানত জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বালকদের লেখা প্রকাশের উদ্দেশ্যে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়; এই পত্রিকাতেই তাঁর প্রথম মুদ্রিত দুটি রচনা— 'একরাত্রি (বালকের রচনা)' নামে প্রবন্ধটি (বালক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২) এবং 'সন্ধ্যা' কবিতাটি (বালক, ফাল্গুন ১২৯২) প্রকাশিত হয়। ১২৯২ বঙ্গাব্দ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত 'বালক' 'ভারতী ও বালক,' 'সাধনা', 'সাহিত্য,' 'প্রদীপ' প্রভৃতি নানা সাময়িকপত্রে তাঁর লিখিত অনেকগুলি প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে কিছু কিছু তিনটি পুস্তকের আকারে তাঁর জীবিতকালেই সংকলিত হয়েছিল—'চিত্র ও কাব্য' নামে প্রবন্ধসংগ্রহ (১৩০১ ভাদ্র), 'মাধবিকা' (১৩০৩ বৈশাখ) এবং 'শ্রাবণী' (১৩০৪ আষাঢ়)নামে দুটি কাব্যগ্রন্থ। তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তাঁর ঐ তিনটি গ্রন্থ এবং মাসিকপত্রে বিক্ষিপ্ত কিছু রচনা নিয়ে 'স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হয়; পরে ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ 'বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী'র আরও সুসম্পূর্ণ একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মে উৎসাহ ও উপদেশ দানে সাহায্য করেছিলেন। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রদীপে' রবীন্দ্রনাথ

লিখেছিলেন : "বলেন্দ্র কোন রচনায় প্রবৃত্ত হইবার বিষয় লইয়া আমার সহিত আলোচনা করিতেন।" এমনকি বলেন্দ্রনাথের অসমাপ্ত একটি প্রবন্ধ তাঁর মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সম্পূর্ণ করে সেটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন ('শিবসুন্দর, প্রদীপ, ১৩০৬ আশ্বিন-কার্তিক)।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কাছের মানুষ হলেও রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে বলেন্দ্রসাহিত্য অনেক পরিমাণেই মুক্ত ছিল। বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধ' দিয়ে প্রবন্ধরচনার যে ধারাটির সূচনা হয়েছিল বাঙলা সাহিত্যে বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে তারই যেন সফল বিকাশ ঘটেছে। পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ, স্বদেশের উৎসব-অনুষ্ঠানে আগ্রহ এবং সৌন্দর্যজ্ঞান সম্ভবত তিনি রবীন্দ্রপ্রভাবের বৃত্ত থেকেই আহরণ করেছিলেন, কিন্তু যে ছন্দময় গদ্য তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য, তিনি স্বয়ং তার স্রষ্টা। রবীন্দ্রযুগে রবীন্দ্রসান্নিধ্যে বাস করেও এই স্বকীয়তার প্রকাশ বলেন্দ্রনাথকে মৌলিক গদ্যশিল্পীর আসনে বসিয়েছে।

বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধের বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষণীয়; কাব্য, চারুকলা, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, হৃদয়বৃত্তি, নিসর্গশোভা, ধর্ম, সমাজ, প্রাচীন সংস্কৃতি, উৎসব, প্রসাধনকলা ইত্যাদি বহু ভিন্নমুখী বিষয়ের আলোচনা তাঁর বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ভাষার সংযম এবং বিষয়ানুগ শৈলীর প্রয়োগ লক্ষ্য করার মতো। ভাষায় আড়ম্বরের ভার নেই, অলঙ্কারের বোঝা নেই, অস্বাভাবিক ও অকারণ উচ্ছ্বাস সুষ্ঠু আলোচনার পথে কোথাও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। যে সংযম গদ্যসাহিত্যের উৎকর্ষের পক্ষে অনিবার্য, তার যথাযথ ব্যবহারে বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি এক নিবিড় রসঘনত্ব লাভ করেছে, উচ্ছ্বাসের অনুপ্রবেশে বক্তব্যের তারল্য সৃষ্টি হয়নি।

গদ্যসাহিত্যে ভাবোপযোগী ভাষার ব্যবহার বলেন্দ্রনাথের রচনার এক বিশেষ গুণ। কোথাও তাঁর ভাষা গম্ভীর, ঋজু ও স্বচ্ছ, কোথাও ছন্দময়ী, কাব্যধর্মী ও মেদুর, আবার কোথাও-বা সে ভাষা সরসতা ও দৃঢ়তার এক সুসমঞ্জস সমাহার। ভাষার কোথাও জটিলতার লেশমাত্র নেই, মালিন্যের কোনও ছায়াপাত ঘটেনি।

শব্দচয়নে বলেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অবিসংবাদী। তাঁর প্রতিটি শব্দ কানে প্রসন্ন ধ্বনির সৃষ্টি করে, মনে নিখুঁত চিত্রের অংশবিশেষ গড়ে তোলে, ভাষাকে ন করে স্বচ্ছন্দ সাবলীল লাবণ্য। তিনি যেন এক ভাষার ভাস্কর, সাহিত্যের

মন্দিরকে যেন তিনি সাজিয়েছেন খণ্ড খণ্ড মনোরম শব্দের, যুগ্ম-ধ্বনির, অনুপ্রাসের অনুপম অলঙ্করণে। তাঁর গদ্যরচনার ছন্দ মূলত এই শব্দসুষমার ওপরেই নির্ভর করেছে। তাঁর প্রবন্ধের অবিক্ষত সৌন্দর্য বহু পরিমাণেই এই শাব্দিক সৌকুমার্যের সাহায্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

তাঁর কতকগুলি প্রবন্ধে কাব্যসমালোচনার প্রসঙ্গে নিরপেক্ষ বিচার, যুক্তিপূর্ণ রসজ্ঞান এবং মতপ্রকাশের নির্ভীকতা পরিস্ফুট হয়েছে। যেমন, 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা' প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ করুণরস ও হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তিতে বা হিমালয় ও সমুদ্রের বর্ণনায় কালিদাসের পটুতার অভাব বিনাদ্বিধায় উদঘাটন করেছেন, অথচ খণ্ড খণ্ড চিত্ররচনায় কালিদাসের দক্ষতাকে সম্যক স্বীকৃতি জানিয়েছেন; 'জয়দেব' প্রবন্ধে জয়দেবের কাব্যের ভাবদৈন্য যেমন তিনি দ্বিধাহীনভাবে তুলে ধরেছেন; তার শাব্দিক গীতঝঙ্কারও তেমনি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি।

বলেন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধেই ভারতের অতীত সংস্কৃতি ও গৌরব সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ও আকর্ষণ দেখা যায়; 'কণারক,' 'খণ্ডগিরি,' 'বারাণসী' প্রভৃতি প্রবন্ধে এর উদাহরণ মেলে। এদেশের উৎসবে অনুষ্ঠানে অন্তরের আদানপ্রদান এবং আতিথেয়তার প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি 'শুভ উৎসব' ও 'নিমন্ত্রণ-সভা' প্রবন্ধ দুটিতে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন; 'প্রাচ্য প্রসাধন-কলা' প্রবন্ধে দেশীয় প্রসাধনের মনোহারিতা এবং প্রকৃতির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি সপ্রশংস উক্তি করেছেন। এসব আলোচনা থেকে তাঁর স্বদেশপ্রীতির পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর একাধিক প্রবন্ধে এদেশের প্রথা ও আচারের অন্তর্নিহিত কল্যাণশ্রী উদ্ঘাটনের প্রয়াস দেখা যায়।

তাঁর অল্প কয়েকটি প্রবন্ধে বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়; উদাহরণ স্বরূপ 'অভিব্যক্তির নূতন অঙ্গ,' 'অভিব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর,' 'কৃত্রিম দাম্পত্য নির্বাচন,' 'ক্রিমিন্যাল মানবতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়।

প্রবন্ধের তুলনায় কবিতায় বলেন্দ্রনাথের সাফল্য অপেক্ষাকৃত কম। অবশ্য গদ্যের তুলনায় পদ্যে রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে তাঁর মুক্তি স্পষ্টতর। তাঁর কবিতায় ছন্দ ও ভাষার সৌন্দর্য উপভোগ্য। কবিতার বিষয়বস্তু প্রধানতঃ নানা পারিপার্শ্বিকে কবির মনের ভাব; অনেক ক্ষেত্রেই কবি চিন্তা প্রেম ও প্রেয়সীতে সীমাবদ্ধ। সংকীর্ণ বিষয়বস্তু সত্ত্বেও আন্তরিকতা ও সারল্যের

উষ্ণতার জন্যে বৈচিত্র্যের অভাব বড় অনুভূত হয় না। সনেট, ব্রহ্মসংগীত ইত্যাদিতে কবির সেই উদাস, প্রেমাতুর, অন্তরালবাসী সত্তাটির আবেদন মনকে স্পর্শ করে, বর্ষায় বসন্তে যার অনুরাগের রক্তিমে বহির্বিশ্ব রঞ্জিত হয়ে যায়, যার কল্পনার আলো প্রেমারাধনার শাশ্বত প্রদীপে দীপ্যমান।

তাঁর অধিকাংশ কবিতা বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, প্রাত্যহিক জীবন তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত মানসী ও নিসর্গ সম্বন্ধে তাঁর উচ্ছ্বাস ও ভাবপ্রণতা কিছুটা অসংযত। এক অতৃপ্ত কামনার রেশ তাঁর কবিতায় প্রবহমান।

বলেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনে তাঁর প্রতিভার সম্পূর্ণ পরিণতি আশা করা যায় না। কিন্তু তাঁর সম্ভাবনা ছিল। সেই অসম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দেওয়া তাঁর প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য।

দেবজ্যোতি দাশ

মার্কসবাদের অন্যতম স্রষ্টা ফ্রীডরিখ এঙ্গেলস

বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের অন্যতম জনক ফ্রীডরিখ এঙ্গেল্‌স্‌-এর সার্ধশত জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতার নাগরিকদের এই সভা* তাঁর স্মৃতির প্রতি *প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।*

কাল্‌ মার্কস-এর আজীবন সখা ও সহযোগীরূপে ফ্রীড্‌রিখ্‌ এঙ্গেল্‌স্‌ মানবচিন্তা ও কর্মকে বিপুলভাবে অগ্রসর করে দিয়েছিলেন। তাঁরা উভয়ে মিলে দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত জগদ্ব্যাপী সমাজবাদী সংগ্রামের নীতি পদ্ধতি ও শক্তিকে এগিয়ে নিয়েছিলেন। বিশ্ব ইতিহাসের বর্তমান পর্যায়ে শ্রমিকশ্রেণীর মৌল ভূমিকা এবং তার বিপুলসামর্থ্য ও সম্ভাবনার ব্যাখ্যা মার্ক্‌স্‌ এবং এঙ্গেল্‌স্‌ করেছিলেন। ফ্রীডরিখ্‌ এঙ্গেল্‌স্‌-এর বিশ্ববিহারী মনীষা সর্বদেশের মানুষের চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে বিচরণ করার শক্তি রাখত। বিশেষ করে প্রকৃতিবিজ্ঞান ও সমরবিদ্যা বিষয়ে তাঁর ছিল অসামান্য ব্যুৎপত্তি। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণিতত্ত্ব সম্পর্কে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বিধান প্রয়োগে তিনি সার্থকতা অর্জন করেছিলেন।

* ফ্রীডরিক এঙ্গেলসের ১৫০তম জন্ম দিবস ২৮শে নভেম্বর-এ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ভারত-গণতান্ত্রিক জার্মানি মৈত্রী সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কলকাতার নাগরিকদের জনসভায় গৃহীত, অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক উত্থাপিত ও শ্রীত্রিদিব চৌধুরী কর্তৃক সমর্থিত প্রস্তাব।

প্রকৃতি এবং মানব সমাজের ক্ষেত্রে মার্কসবাদকে একমাত্র সুসঙ্গত তাত্ত্বিক প্রকরণরূপে স্থাপিত করার কাজে সহায়তা এসেছে তাঁর বহু গ্রন্থ থেকে, যার মধ্যে উল্লেখ করা যায় "Dialectics of Nature" "পরিবার, ব্যক্তিস্বত্ব ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি" এবং "বানর থেকে নরে বিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা।" মার্ক্‌স্‌-প্রণীত ''ক্যাপিটাল" মহাগ্রন্থের দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের সম্পাদনা এঙ্গেলস্‌-এর এক অমর কীর্তি, শ্রমিকশ্রেণী এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্বজনের মুক্তি প্রয়াসে তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান। 'সাম্যবাদী সংস্থা' এবং 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন' প্রতিষ্ঠায় মার্ক্‌স্‌-এর সঙ্গে ঐকান্তিকভাবে যুক্ত থেকে ভবিষ্যতে শ্রমিকের শ্রেণীসংগঠনের নূতন আদর্শ তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। অভিন্নহৃদয় বন্ধু মার্ক্‌স্‌-এর সঙ্গে মিলে আজীবন তিনি দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ এবং নৈরাজ্যবাদী দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন।

ইংরেজ এদেশ জয় করার পর্ব থেকে এদেশের অবস্থা উপলব্ধি করার কাজে মার্ক্‌স্‌ এবং এঙ্গেল্‌স্‌ সে অবদান রেখে গেছেন, তা অমূল্য। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা তাঁর প্রকাশ করেছেন। ১৮৫৭ সালের সশস্ত্র বিদ্রোহকে ভারতীয় জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম বলে জয়জয়কার জানিয়েছিলেন। তিনি অকুণ্ঠে ও সতেজে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর পরিপূর্ণ আস্থা যে ভারতবর্ষের জনগণ নিজের মুক্তি সাধন এবং নবসমাজ জয় করে নেবার শক্তি রাখে।

জগতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় একজন শ্রুতকীর্তি মহাপুরুষ রূপে এঙ্গেল্‌স্‌ যুগযুগ ধরে পরিগণিত থাকবেন। তাঁর স্থান মেহনতী মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তিসাধকদের সঙ্গে, বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর নেতা হিসাবে তাঁর স্থান হলো সর্বোচ্চ শিখরে। এই সভা বারবার তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করছে

গামাল আবদাল নাসের

ভি. ভি. বালাবুশেভিচ

এরিখ মারিয়া রেমার্ক

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কালীপদ পাঠক

জীবনলাল চট্টোপাধ্যায়

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন

কে. এন. যোগলেকর

এস. ভি. ঘাটে

পরিচয়-এর পরম সুহৃদ, বিশিষ্ট লেখক, প্রগতিশীল সংস্কৃতিসেবী ও শিক্ষাব্রতী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আমাদের বেদনা জানাবার ভাষা নেই। তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধের মতো আমরাও শোকার্ত। তাঁর স্বজনপরিজনকে আমরা তাঁর মৃত্যুতে সমবেদনা জানাচ্ছি। আগামী সংখ্যায় প্রয়াত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রচনা প্রকাশিত হবে। সম্পাদক

পরিচয়
বর্ষ ৪০ । সংখ্যা ৫
অগ্রহায়ণ । ১৩৭৭

সূচিপত্র

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য । হিরণকুমার সান্যাল । সুশোভন সরকার ।
অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র । গোপাল হালদার । বিষ্ণু দে । চিন্মোহন সেহানবীশ ।
সুভাষ মুখোপাধ্যায় । গোলাম কুদ্দুস ।

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ সান্যাল

প্রচ্ছদ

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স' প্রিন্টিং ওয়ার্কস, চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত ।

এ-নির্বাচনে রণধ্বনি

এক। লোকসভার সার্বভৌমত্বের ক্ষমতায় জোর দিয়ে সংবিধানে মৌলিক প্রগতিশীল পরিবর্তন ;

ছুই। মৌলিক কৃষি-সংস্কার এবং চাষীর ফসলের ন্যায্য দাম ;

তিন। শক্তহাতে একচেটিয়া বিরোধী কাজ এবং ব্যাঙ্ক জাতীয়-করণের অনুবর্তী কাজ হিসাবে মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারীর নিরাকরণ ;

চার। শ্রমিকশ্রেণীর দাবী মেটানো এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের বিস্তৃতি ;

পাঁচ। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে শক্তিশালীকরণ এবং পশ্চাদপদ ও সংখ্যালঘু অংশের গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষণ ;

ছয়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও ঔপনিবেশিকতা বিরোধী গোষ্ঠীনিরপেক্ষতার বলিষ্ঠ বৈদেশিক নীতি; নয়া ঔপনিবেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা।

বাঙলাদেশের আধুনিক শিক্ষাসঙ্কট

ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন

ভারতের শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে অনেক শিক্ষক ও রাজনৈতিক প্রভৃতিরা এ-যাবৎ নানা আলোচনা ও মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের জীবনকালেই ১৯১৭'র Sadler Commission হইতে আরম্ভ করিয়া আরও কত অনুসন্ধান-ফল, মোটামোটা রিপোর্ট প্রভৃতি দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য অভিজ্ঞগণ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, সবশেষ যতদূর স্মরণ হয় ডক্টর কোঠারি-র অধিনেতৃত্বে ১৯৬৪'র মাঝামাঝি হইয়াছিল, এগুলির প্রধান বিবেচ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম-পরিচালনা, গঠন প্রভৃতি বিষয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মূলে থাকে হাই-স্কুল বা মাধ্যমিক শিক্ষা, তাহারও আদিতে থাকে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষা। বাড়ির তিনতলা নির্ভর করে দোতলা একতলা ও ভিতের উপর। সুতরাং নির্মাণ ও সংস্কার উভয় বিষয়েই গোড়া বাদ দিয়া ডগার বিবেচনায় কোনও ফল হয় না। সুতরাং শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করিতে হইলেই নিম্ন-প্রাথমিক স্তর হইতে আরম্ভ করা উচিত।

বর্তমানের ও আধুনিকের মূল থাকে নিকট অতীতে, এবং তাহার মূল থাকে দূর অতীতে। কোনও কিছুরই মূল একটামাত্র থাকে না, একই মূলের নানা শাখা-প্রশাখা চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া যেখানে সরস জমি পায় সেখান হইতে রস সংগ্রহ করিয়া নিজের প্রয়োজন সাধন ও পুষ্টি বর্ধন করে, ইহা যেমন উদ্ভিদের তেমনি সকল প্রাণবানের ধর্ম। আবার শুধু মূল নয়, উদ্ভিদের ডাল-পালাও যেদিকে সূর্যালোক পায় সেদিকে প্রসারিত হইয়া জীবনীশক্তি বাড়াইয়া ফুল-ফল প্রসব করে। ইহাও জীবের ধর্ম। সুতরাং মূল বলিতে কেহ যেন অতিসঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র একটা কিছুর উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন না, নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত বিবেচনা করিয়া মূলের অনুসন্ধান করিতে হয়।

২

দূর অতীত বা অতি-প্রাচীনের কথা অতএব প্রথমে বিবেচনা করি। ইহার আভাস পাই বেদ-পুরাণ-মহাভারতে। বেদে পাই ছাত্রেরা লোকালয়েই, তপোবনে নয়, গুরুগৃহে গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিত; পুরাণে কিন্তু পাই লোকালয়ে নয়, তপোবনে গুরুগৃহের কাহিনী—সোম গুরুপত্নী তারাকে হরণ করিলেন—পুরাণের বিবরণে এই গুরুগৃহ বনের মধ্যে, (পড়িলে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে তারা-ই নিরীহ সুদর্শন সোমের পিছনে লাগিয়াছিলেন, সোম বেচারির দোষ খুব বেশি ছিল না!); দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ ও দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী প্রভৃতি কত গল্প, আবার কোনও ছাত্র নিজশরীর দ্বারা ভাঙা আলের জল আটকাইল বা আকন্দপাতা খাইয়া অন্ধ হইয়া গেল ইত্যাদি। মনু প্রভৃতির নানা ধর্মশাস্ত্রে ছাত্রজীবন সম্বন্ধে যত নিয়মাবলির উল্লেখ আছে, তাহাতেও গুরুগৃহে বাসের উল্লেখ দেখা যায়। বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে নানাবিধ কৃচ্ছ্রাভ্যাস এইসব নিয়মাবলিতে প্রাধান্য পাইয়াছে, আবার গুরু অনুপস্থিত থাকিলে গুরুপত্নীর ঋতুরক্ষা ছাত্রের কর্তব্য প্রভৃতিও অনেক কথা আছে। কৃচ্ছ্রাভ্যাসের বিধিনিষেধগুলি শুধু Spartan ধরণের নয়, তাহাতে ascetical ভাব প্রবল, মনে হয় ইহার পিছনে সন্ন্যাসধর্মের আদর্শ ও স্মৃতি ছিল। ছাত্রেরা যে প্রায়ই adult, তাহাও বেশ বুঝা যায়, যেমন গুরুপত্নীর ঋতুরক্ষা, সোম ও কচ-কাহিনী প্রভৃতি হইতে। বৈদিক ব্রাহ্মণদের প্রধান শিক্ষার বিষয় ছিল গুরুমুখে শুনিয়া (পুঁথি হইতে পড়া দূষণীয় বিবেচিত হইত) বেদ কণ্ঠস্থ করা—একটি বর্ণনায় আছে ছাত্রেরা উচ্চৈস্বরে বেদাভ্যাস করিতেছে, শুনিলে মনে হয় যেন একপাল ব্যাঙ ডাকিতেছে। হয়তো এই ছাত্ররা adult নয়, অল্পবয়সী ছিল। কালক্রমে দেখি শুধু বেদপাঠ ছাড়া আরও অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে হইত, যেমন ছন্দ জ্যোতিষ ব্যাকরণ প্রভৃতি। অ-ব্রাহ্মণদের ছুতার প্রভৃতি vocational crafts শিক্ষার উল্লেখ দেখা যায়।

মহাভারত পুরাণ প্রভৃতিতে ছাত্রদের তপোবনে বাস খুব ফলাও করিয়া বলা হইয়াছে, তাহা সহরে বা গ্রামে বা তাহার কাছাকাছি নয়, গভীর বনের মধ্যে। রাজা দুষ্মন্ত মৃগয়ায় বাহির হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কণ্বমুনির যে আশ্রমে শকুন্তলার সাক্ষাৎ পান সেখানে (যদিও কণ্ব তখন সেখানে ছিলেন না) পঠন-পাঠন না হইতেছে এমন বিষয় নাই। ইহাতে নিঃসন্দেহ প্রাচীনকালের স্মৃতি ও উত্তরকালের পরিণতি, দুইই রহিয়াছে। নৈমিষারণ্যে শৌনকের আশ্রম

পুরাণ-মহাভারতে প্রসিদ্ধ। এখানে বয়স্ক মুনি-ঋষিরা মিলিত হইতেন, অল্পবয়স্ক ছাত্রেরা নয়—ইহাও প্রাচীন তথা উত্তরকালের স্মৃতিতে রচিত। প্রাচীনকালের কি স্মৃতি ইহাতে রহিয়াছে তাহা ক্রমে বলিতেছি—উত্তরকালের সন্ন্যাসধর্মী প্রতিষ্ঠানগুলি যে প্রকাণ্ড শিক্ষাকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে-কথাও পরে বলিতেছি। উপনিষদগুলির রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৫-৩ শতকে অর্থাৎ বেদ রচনাকালের প্রায় ৬-৮ শতক পরে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত আছে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সশিষ্যদলে বিদেহরাজ জনকের যজ্ঞে আসিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া "একসহস্র" গরু উপহার পাইলেন এবং শিষ্যগণসহ সেই গোদল খেদাইয়া নিজের তপোবন আশ্রমে লইয়া গেলেন। ইহা নিশ্চয়ই সমসাময়িক ঘটনার বর্ণনা নয়, ইহাতে অনেক কল্পনা ও প্রাচীন-স্মৃতি জাগরণের প্রয়াস আছে, কারণ অল্প পরেই দেখাইব খ্রীষ্টপূর্ব ৫-৩ শতকে অর্থাৎ মোটামুটি উপনিষদ বা বুদ্ধযুগে তপোবনে শিক্ষাক্ষেত্রের কথা অনৈতিহাসিক।

নেহাৎ প্রসঙ্গক্রমে বলি, রবীন্দ্রনাথ পৌরাণিক তপোবন-আশ্রমের আদর্শে না হউক, কালিদাসের শকুন্তলা নাটকে বর্ণিত কণ্বাশ্রমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শান্তিনিকেতনে প্রথমে যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম করিয়াছিলেন এবং পরে যাহা বিশ্বভারতী হইয়াছিল, আজ তাহার পরিণতি কি হইয়াছে? কেন্দ্রীয় সরকারের দাক্ষিণ্যে অর্থাভাব দূর হওয়ার পর আজ সেখানে কতটুকু ব্রহ্মসাধনা বা জ্ঞানান্বেষণ বা শিক্ষক-ছাত্রের অঙ্গাঙ্গীভাব বা আশ্রম-তপোবনের বাতাবরণ বিরাজমান? যেটুকু অবশিষ্ট আছে (যদিবা পূর্বে আদৌ কিছু থাকিয়া থাকে!) তাহা symbolical বহিঃশোভা বা ঢং ছাড়া আর কি? বাকি সবই তো নূতন নূতন বড়বড় বাড়িঘর, অন্য যে কোনও কৃত্রিম প্রাণহীন ইউনিভার্সিটিরই মতো নানা ক্রিয়াকাণ্ডময় জটিলতা, বিভ্রাট ও বৈফল্যের বিলাপলীলা মাত্র!

৩

শিক্ষাপ্রসঙ্গ ছাড়িয়া প্রাচীনভারতের খাঁটি ইতিহাস একটু আলোচনা করি। সে-যুগে সারাদেশ বনময় ছিল সত্য। হড়প্পা মোহেঞ্জোদাড়োতে খুব উন্নত ধরণের সহুরে সভ্যতা (urban culture) ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের নানাস্থান খননের ফলে আজ আমরা জানি তথাকথিত 'সিন্ধুসভ্যতা' শুধু হড়প্পা-মোহেঞ্জোদাড়োতে বা সিন্ধুনদীর কূলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাহার বাহিরে উত্তরপশ্চিম-পূর্বদক্ষিণ সবদিকেই বহুদূর পর্যন্ত বহু ছোটবড় সহরে ইহার বিস্তার হইয়াছিল। কিন্তু

এইসব ছোটবড় সহরের অল্প বাহিরেই যে গভীর বন-জঙ্গল ছিল তাহার প্রমাণ এই—এইসব সহরের অধিকাংশ বাড়িঘর রাস্তাঘাট কূয়া প্রভৃতি পোড়া ইটে তৈয়ারি ; ইটের পাঁজা পোড়াইতে অনেক আগুন কাঠ লাগে, অত কাঠ নিশ্চয়ই বেশিদূর হইতে আনা সম্ভবপর ছিল না, অবশ্যই তাহা সন্নিকটের বন-জঙ্গল হইতে আনা হইত। যে-দেশে বৃষ্টি সামান্য হয় সেখানকার বাড়িঘর পোড়া ইটে নয়, রৌদ্রে শুকানো ইটে বা কাদামাটিতে বানানো হয় ; যে-দেশে পোড়া ইটের প্রচলন সেখানে অতএব বুঝিতে হয় বৃষ্টি বেশি হইত। যেখানে বৃষ্টি বেশি সেখানে বন-জঙ্গলও বেশি হইয়া থাকে, আবার যেখানে বন-জঙ্গল কম বা নাই সেখানে বৃষ্টিও কম হয়, যেমন মরুময় দেশে। হড়প্পা-মোহেঞ্জোদাড়ো এমনকি সমগ্র পঞ্জাব আজ ঊষর অল্পবৃষ্টি দেশ কিন্তু প্রাচীনযুগে সেরূপ ছিল না ; বন-জঙ্গল কাটিয়া ক্রমে নষ্ট করিয়া ফেলায় সুবৃষ্টি দেশ আজ ক্রমে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে এবং আরও হইতেছে। শুধু পাঞ্জাব নয়, সারা উত্তর-ভারত এমনকি বাঙলাদেশের পর্যন্ত আজ এই অবস্থা হইতে চলিয়াছে। আলেকজাণ্ডারের সময় পর্যন্তও পঞ্জাবে খুব বর্ষা হওয়ার কথা গ্রীক ঐতিহাসিক-দের বিবরণে জানা যায়। হড়প্পা-মোহেঞ্জোদাড়োর বহু sealএ বাঘ হাতি গণ্ডার ও মাছের চিত্র মিলে, এইসব প্রাণী বন-জঙ্গল ও জল ছাড়া হয় না। পুরাণ ও মহাভারতে দেখা যায় সারাদেশে বহু গভীর অরণ্য, সেখানে রাজারা মৃগয়া এবং মুনি-ঋষিরা তপস্যা করিতেন। সে-যুগের কোনও রাজার রাজ্য বহুবিস্তৃত ছিল না, সারাদেশ বহু ছোটছোট রাজ্যে ও রাজত্বে বিভক্ত ছিল। সুতরাং রাজাদের নিজ রাজধানী ছাড়িয়া বহুদূরের বনে শিকার করিতে যাইতে হইত না, নগরের প্রায় উপকণ্ঠেই বনে ঘেরা গ্রাম ও তাহার অবিদূরে পশ্বাদিময় অরণ্য মিলিত। পালি বৌদ্ধসাহিত্যেও দেখি বুদ্ধের যুগে দেশে বহু বন, এমনকি রাজগৃহের মতো বড় সহরের আশেপাশে যত আমবাগান ও বনের বিবরণ আছে, আজ সেখানে দেখি ধানক্ষেত বা শূন্যস্থান। এমনকি ১৬ শতকে পর্যন্ত দিল্লীর উপকণ্ঠে বাবর শাহ গণ্ডার শিকার করিতেন, ঘন জলা-জঙ্গল বিনা গণ্ডার থাকিতে পারে না। আজ সেখানে সব শুকাইয়া খাঁখাঁ করিতেছে। ১২ শতকে বাঙলাদেশে মুসলমানদের প্রথম আক্রমণের যুগে মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় কাটোয়ার কাছে ভাগীরথীর পশ্চিম তীর হইতে গয়া পর্যন্ত গভীর বন ছিল।

অর্ধসভ্য আর্যরা ভারতে আসিয়া "সিন্ধুসভ্যতা" যুগের বহু জনস্থান আগুনে

পুড়াইয়া এবং নদীর বাঁধ ভাঙিয়া জলে ডুবাইয়া নষ্ট করিয়াছিল, ঋগ্বেদের উক্তি হইতেই আধুনিক পণ্ডিতরা এ-কথা অনুমান করিয়াছেন। খাণ্ডব দাহনের গল্প মহাভারতে সুজ্ঞাত, "অগ্নিং তদা তর্পিতং খাণ্ডবে চ।" অগ্নি ছিলেন আর্যদের বড় দেবতা, আর্যদের ধর্ম বা জাতির প্রতীক। শতপথব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে পঞ্জাবের সরস্বতী নদী হইতে পূর্বমুখে ক্রমে অগ্রসর হইয়া অগ্নি (অর্থাৎ আর্যরা) সদানীরা নদী (আধুনিক রাপ্তি, গণ্ডকের পশ্চিমে) পর্যন্ত আসিয়াছিলেন এবং সদানীরার অপর বা পূর্বতীরে প্রাচীনকালে কোনও ব্রাহ্মণ (আর্য) যাইতেন না। আধুনিক ঐতিহাসিক মতে এইসব অগ্নিকাণ্ডের অর্থ এই—আর্যরা বংশবৃদ্ধির ফলে যখন পঞ্জাবের পূর্বে ও দক্ষিণে ক্রমে বিস্তারলাভে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন তখন তাঁহারা আগুন লাগাইয়া বন-জঙ্গল নষ্ট করিয়া সেখানে ক্রমে ক্রমে বসতি স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইয়া বিস্তারভূমি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঘন বন-জঙ্গল কাটিয়া জমি পরিষ্কার করা অপেক্ষা আগুনে পোড়াইলে সে-উদ্দেশ্য বেশি সহজে সিদ্ধ হয়।

অতএব বুঝা গেল দেশময় তখন বহু বনভূমি ছিল। কিন্তু সেখানে বহু তপোবন ছিল, অনেক সাধুসন্ন্যাসীরা সেখানে তপস্যা যাগ-যজ্ঞ কৃচ্ছ্রাদি করিতেন, সেখানকার আশ্রমরাজিতে গুরুরা ছাত্রদের নানাশাস্ত্র পড়াইতেন, ইহার প্রমাণ কি? ঐতিহাসিক যুগে অর্থাৎ বুদ্ধ-মহাবীরের সময়ে (খ্রীষ্টপূর্ব ৬ শতক) তো ইহার কোনই পরিচয় বৌদ্ধজৈনশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। বুদ্ধ ও মহাবীর দুজনেই সুশিক্ষিত লোক ছিলেন কিন্তু তাঁহারা তো নিজনিজ জন্মস্থানে নিজগৃহে বা সেই স্থানেই (বনে নয়) গুরুগৃহে অর্থাৎ গুরুর কাছে গিয়া শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং সে গুরুগৃহ যে তপোবনের আশ্রমে ছিল তাহাতো কোথাও লেখা নাই। বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন অতিসুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহারাও তো তপোবনে গুরুগৃহে বাস করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন এইরূপ বলা হয় নাই। বৌদ্ধ-জাতকের (রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব অনুমান ৪-৩ শতক) গল্পে বিদ্যাপীঠরূপে তক্ষশিলা নগরের উল্লেখ আছে এবং অশোকপিতা বিন্দুসারের যুগে (বৌদ্ধজাতক রচনার প্রায় সমসাময়িক) দেখি তক্ষশিলা প্রকাণ্ড প্রাদেশিক রাজধানী, তাহারও আগে অর্থাৎ বিন্দুসারপিতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের (তথা আলেকজাণ্ডারের) কালে দেখি তক্ষশিলা বৃহৎ নগর। শ্রাবস্তী-বৈশালী বুদ্ধের যুগে বড় সহর ছিল, সেখানে আলাড় কালাম ও উদ্রক রামপুত্রের কাছে বুদ্ধ ধ্যানযোগাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন, তপোবনে গিয়া নয়। বাৎস্যায়নের কামসূত্রে '৬৪ কলা'র এবং জৈনশাস্ত্রে

অভিজাত নরনারীর '৭২ কলা' শিক্ষার কথা জানা যায়, তাহাও তো তপোবনে গিয়া নয়। বুদ্ধ 'পঞ্চভিক্ষু'র সঙ্গে যে বনে তপশ্চর্যা করিয়াছিলেন তাহা সুবৃহৎ গয়া নগরের উপকণ্ঠস্থ গ্রামসমীপে, যে-গ্রামে ভিক্ষাচর্যা করিয়া তাঁহাদের প্রাণধারণ হইত। তারপর একাকী বুদ্ধ যে বনে ধ্যানসাধনা করিয়া সম্বোধি লাভ করিলেন (আধুনিক বোধগয়া) তাহা গয়ানগরের মাত্র ৬ মাইল বাহিরে, তাহার নিকটেই লোকবসতি ছিল নতুবা সুজাতা তাঁহাকে আহার জোগাইতে পারিত না। অতঃপর বুদ্ধ যেখানে প্রথম ধর্মপ্রচার করিলেন সেই ঋষিপত্তন মৃগদাবকে মুনি-ঋষিদের আশ্রম বা তপোবন বলা চলে কিন্তু তাহাও তো ছিল সুবিখ্যাত বারাণসী নগরের মাত্র মাইল ছয়েক দূরে। পালিশাস্ত্রের আরও কয়েকটি বিবরণে দেখা যায় বুদ্ধ কখনও কখনও শিষ্যদলকে ছাড়িয়া একাকী কিছুকাল নির্জন বনে বাস করিতেন, তাহারও সমীপে গ্রাম ছিল যেখানে তিনি ভিক্ষাটন করিতেন। তাঁহার কয়েকজন সম্পন্ন অবস্থার শিষ্য নির্জনে থাকিবার জন্য একবার কিছুকাল একটা উপবনে (বোধহয় উহাদেরই মধ্যে কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি) বাস করিয়াছিল, বাহিরের লোকে আসিয়া যাহাতে বিরক্ত না করিতে পারে সেজন্য উপবন দ্বারে রক্ষক বসাইয়াছিল। ছোটছোট বৌদ্ধ ভিক্ষুমণ্ডলী যে নগর বা গ্রামাঞ্চলের কাছাকাছি বনে কুটীর বাঁধিয়া থাকিত তাহারও বিবরণ আছে। বুদ্ধ নিজেও সশিষ্য নালন্দার আমবাগান, বৈশালীর গণিকা আম্রপালীর আমবাগান প্রভৃতি নগর বা গ্রামের সন্নিকটস্থ বহু বন-উপবনে থাকিয়াছিলেন। মহাবীরও তপস্যাকালে কিছুদিন বনে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্যগণেরও অনেকে সেরূপ করিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীর সন্নিকটে আজীবিক সম্প্রদায়ের গুরু গোশালও গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বৌদ্ধ জৈন আজীবিক, ব্রাহ্মণ্য সমাজের বহির্ভূত এই তিন প্রধান শ্রমণ সম্প্রদায় যেমন, তেমনি ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের বানপ্রস্থাবলম্বীদেরও বনবাসের (অবশ্যই নগর বা গ্রামসন্নিকটে) বিবরণ ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে মিলে। বৌদ্ধশাস্ত্রবর্ণিত রাজগৃহের একটি পাহাড়ের নাম ছিল ঋষিগিরি, লৌকিক বা প্রাকৃত উচ্চারণে ইসিগিলি। লৌকিক ব্যাখ্যায় ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছিল 'যে পাহাড় ঋষিদের (তপস্যারত বানপ্রস্থীদের) গিলিয়া ফেলে,' অর্থাৎ যেখানে গিয়া ঋষিরা আর ফিরিতেন না, অর্থাৎ সেখানেই তাঁহারা আমরণ থাকিতেন। অতএব এই সকল বিবরণ হইতে বুঝা যায় "তপোবনে" মুনি-ঋষি, শ্রমণ বা বানপ্রস্থীরা বাস করিতেন। জৈন-বৌদ্ধ কোনও আখ্যানে গুরু ও ছাত্রগণাধ্যুষিত তপোবনের কথা দেখা যায় না। জৈন-বৌদ্ধ

ও আজীবিকরা ভারতের প্রাচীনতম সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। ইহাদের উদ্ভব খুব সম্ভবত হইয়াছিল বাণপ্রস্থীগণ হইতে। ইহারা বনে বাস করিয়া তপস্যা করিতেন, নানা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের চর্চা করিতেন, উপনিষদীয় আত্মা-ব্রহ্মবাদের গুপ্ত "রহস্য" ইহাদেরই আবিষ্কার। পালিশাস্ত্রে তক্ষশিলার পর বারাণসী শিক্ষাকেন্দ্ররূপে উল্লিখিত। মহাভারত-রামায়ণে দেখি অযোধ্যা ও প্রয়াগ শিক্ষাকেন্দ্র। এগুলি সবই বন নয়, সহর। Esoteric বা religious সাধনা ও শিক্ষার কেন্দ্র বনে থাকিতে পারে যেহেতু তাহার শিক্ষক ছিলেন সাধু-সন্ন্যাসীরা, কিন্তু secular education-এর স্থান যদি বনে হইত তবে তাহা বুদ্ধের যুগেই সব লুপ্ত হইতে পারে না। Sacred lore শিক্ষাগুরুরাও সকলে সর্বদা সাধু-সন্ন্যাসীও হইতেন না, গৃহীও হইতেন।

আর্যরা যখন ভারতে আসে—ঐতিহাসিক মতে অনুমান খ্রীষ্টপূর্ব ১৪ শতক, তখন তাহারা অর্ধবর্বর semi-nomadic pastoral জাতি, গরু ঘোড়া পুষিত, ঘি-মাখন খাইত, কৃষিকর্মাদি কিছু এবং হাঁড়িকুঁড়ি বানানো প্রভৃতি শিল্পকাজও কিছু জানিত। পেশা ছিল ইহাদের লুঠপাট করা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, আগুন লাগানো। প্রকৃতি ছিল ইহাদের অতি নৃশংস। দুটি জিনিস ইহারা জগতে সর্বপ্রথম আয়ত্ত করে—(১) ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া অতর্কিত দ্রুত আক্রমণ, লুঠপাট, যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া লোকবসতি বিনাশ ও অধিকার, এবং (২) লৌহাস্ত্র ব্যবহার, যাহার তুলনায় অন্য জাতিদের তখন পর্যন্ত জ্ঞাত অন্যান্য ধাতুনির্মিত অস্ত্রাদি দৃঢ়তা ও সংহার শক্তিতে ন্যূন ছিল। ঘোড়ার পরিচয় অন্য জাতিরাও জানিত কিন্তু গাড়ি টানা ছাড়া তাহার অন্য প্রয়োগ জানিত না। বহুদিন আর্যরা অশ্ব-ব্যবসায়ী বলিয়া প্রাচীন এশিয়ার অন্য জাতিদের কাছে পরিচিত ছিল। বংশবৃদ্ধির ফলে বিস্তার আবশ্যক হইলে তাহাদের কয়েক দল উত্তরে ও পশ্চিমে ইউরোপের দিকে এবং কয়েকদল পারস্য ও ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইয়া লুঠপাট যুদ্ধ-বিগ্রহ চালাইয়া দেশ অধিকার করিতে লাগিল। যুদ্ধে ঘোড়ার পিঠে চড়ায় তাহাদের mobility অন্যের তুলনায় বহুগুণ বেশি হইত, এবং লৌহাস্ত্র ছিল তাহাদের superior weapon—সকল যোদ্ধারাই জানেন যুদ্ধে quick mobility এবং superiority of arms কত কার্যকর হয়। ইরান ও ভারতে অগ্রসর হইবার আগে পশ্চিম এশিয়ায় তাহারা কয়েক শতক বসবাস করিবার ফলে ইউফ্রেতিস-টাইগ্রিস নদীতীরের প্রাচীন সভ্য জাতিদের অনেক সংবাদ তাহাদের কর্ণগোচর হয় এবং তাহাদের সভ্যতার সঙ্গে কিছু কিছু সংস্পর্শও লাভ হয়।

আর্যদের মধ্যে দুটি সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল, প্রথম যাগ-যজ্ঞকারী অগ্নি-উপাসক পুরোহিত বা ব্রাহ্মণ এবং দ্বিতীয় যোদ্ধবর্গ বা ক্ষত্রিয়। সংসার বৈরাগ্য তো দূরের কথা, লেখাপড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা বা বিদ্যাদির সঙ্গে তাহাদের অল্পই সম্বন্ধ ছিল, তাহারা শুধু জানিত শত্রুনাশ ও ভোগসুখ, উভয় উদ্দেশ্যের সিদ্ধিতেই দেবতার কৃপালাভে ব্যগ্র হইত এবং তাহারই প্রয়োজনে প্রাধান্য পাইয়াছিল যাগ-যজ্ঞ এবং তৎসাধক পুরোহিত বা ব্রাহ্মণরা। পঞ্জাবে বেশ কিছুদিন বসবাস করিয়া প্রাগার্য ভারতীয়দের সঙ্গে মিশিয়া, তাহাদের নারীদের সঙ্গে সহবাসদ্বারা প্রভূত বংশবৃদ্ধি করিয়া তাহারা ক্রমে সভ্যতা অর্জন করিল। প্রাগার্য ভারতীয়রা অতি সুসভ্য ছিল, তাহাদের কাছে আর্যরা ক্রমে নানাবিদ্যা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলাদি শিখিতে লাগিল। ঋগ্বেদের রচনাই (অবশ্যই লিখিত-ভাবে নয়, মুখে মুখে প্রচলিত) আরম্ভ হয় আর্যরা ভারতে আসার প্রায় সমকালে। অলমতিবিস্তরেণ, আজ যতকিছু আমরা আমাদের ধর্মে সমাজে সংস্কৃতিতে "আর্যঋষিদের" কৃতি বলিয়া গর্ব করি, তাহার সাড়ে পনেরো আনা প্রাগার্য ভারতীয় সংস্কৃতি হইতে জাত—যেমন অর্ধসভ্য রোমানরা সুসভ্য গ্রীকদের জয় করিয়া তাহাদেরই প্রভাবে সভ্যতা অর্জন করে, পরাজিত গ্রীকরা রোমানদের হাতে বন্দী হইয়া দাসরূপে বিক্রীত হইল, রোমান বড়লোকেরা বিদ্বান গ্রীকদের দাসরূপে ক্রয় করিয়া নিজ নিজ পরিবারে সন্তানদের শিক্ষক-রূপে নিয়োগ করিয়াছিল।

নানা crafts, arts প্রভৃতি secular শিক্ষা সেকালে সবদেশেই পিতা হইতে পুত্র শিখিত বা apprentice শিক্ষার্থীকে master-craftsman-এর কাছে শিখিতে হইত। সব প্রাচীন দেশেই উচ্চশিক্ষা religion-orientated হইত, শিক্ষাদান পুরোহিত বা ধর্মযাজকদের হাতে ছিল। অন্য নানা লৌকিক বিদ্যাও প্রথমে তাঁহারাই শিখাইতেন। প্রাচীন মিশর ও ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের ইতিহাসে ইহাই দেখা যায়।

"সিন্ধুসভ্যতা"র সুসভ্য প্রাগার্য ভারতীয়রা আর্যরা ভারতে আসিবার আগে প্রায় হাজার দুই বৎসর ধরিয়া এদেশে বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা যোদ্ধাজাতি ছিলেন না, শান্তিময় জীবনযাপন করিয়া শিল্প-বাণিজ্যের ব্যবসায় করিতেন, নিম্নশ্রেণীয়রা চাষ আবাদের কাজ করিত। মিশর ব্যাবিলন সুমের প্রভৃতি প্রাচীন দেশের মতো তাঁহাদের দেশ ও সমাজশাসনবিধি পুরোহিত-তান্ত্রিক Theocracy ছিল। এই পুরোহিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা বিদ্যাচর্চা

ছিল, যাহা ক্রমে "আর্য" আরতের সভ্যতার অঙ্গীভূত হয়। অ-পুরোহিতদের মধ্যেও বহু বিদ্বান চিন্তাশীল লোক অবশ্যই ছিলেন। প্রাগার্য পুরোহিতদের অনেকে "আর্য" সমাজের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মিশিয়া গেলেন, অভিজাত ও ধনীরা ক্ষত্রিয়-বৈশ্য এবং নিম্নশ্রেণীয়রা শূদ্র হইল। আর্যদের সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মাত্র ছিল, জাতিভেদও ছিল না। জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল খুব সম্ভবত প্রাগার্য সমাজে—গীতার "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ" কথাতেই সর্বপ্রথম চারি বর্ণের উল্লেখ দেখা যায় এবং গীতার রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ২ শতকের আগে বলিয়া মনে হয় না। ধর্ম সমাজ দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বহু উন্নত চিন্তাধারার প্রবর্তন প্রথমে প্রাগার্যদের মধ্যে হয়, পরে তাহা "আর্য" চিন্তা বলিয়া পরিচিত হয়। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে আজ যাহা ব্রাহ্মণ, আরণ্যক অর্থশাস্ত্র তর্ক ধর্মশাস্ত্র ব্যাকরণ ছন্দ জ্যোতিষ নিরুক্ত উপনিষদ স্মৃতি প্রভৃতি নামে পরিচিত, তাহার সবেরই উদ্ভব সম্ভবত হয় প্রাগার্য সমাজে।

প্রাগার্যদের ধর্ম ঠিক কি ছিল তাহা এখনও পুরাপুরি জানা যায় নাই, তবে তাঁহারা যে ঘরে ঘরে Mother Goddess প্রভৃতি figurine পূজা করিতেন, বহুবিধ আচমন-স্নানাদি "আচার"বিধি পালন করিতেন, গীতোক্ত "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং" দ্বারা ধূপদীপ সহকারে পূজার্চনা করিতেন, আহারাদি সম্বন্ধে বহুবিধ নিষেধ নিয়মাদি মানিতেন, তাহা একরকম ধরিয়া লওয়া চলে, যাহা সবই ক্রমে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সমাজে পরিগৃহীত হয়। হড়প্পা-মোহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কারের পরে যে অনুমান করা হইয়াছিল সিন্ধুসভ্যতায় লিঙ্গ-যোনির পূজা করা হইত, তাহাতে আজ সন্দেহের কারণ দেখা গিয়াছে কারণ যাহাকে লিঙ্গ-যোনির প্রতীক মনে করা হইয়াছিল, আজ প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা বলিতেছেন তাহা পূজ্যদ্রব্য নয়, কোনরকমের architectural pieces ছিল যাহা ঠিক কি প্রয়োজন সাধন করিত তাহা এখনও অনির্ণীত। ইহা কিন্তু নিশ্চিত যে, প্রাগার্যরা আর্যদের মতো পশুবধ ও তুমুল হৈচৈসহ হোম-যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অগ্নি উপাসনা করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতার তুষ্টিসাধন করিতেন না। কিন্তু যাহাকে স্মৃতিশাস্ত্র বলা হয়, তাহার অর্থ কি? কিসের "স্মৃতি"? যাহারা লুঠপাট যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে কয়েকশত বৎসর কাটাইয়া সম্প্রতি সভ্য হইয়াছে তাহাদের মধ্যে এমন কি সুসভ্য সামাজিক ব্যাপারের "স্মৃতি" থাকিতে পারে? বাস্তবে মনে হয় ঐ "স্মৃতি" বা প্রাচীন রীতিনীতি অধিকাংশ প্রাগার্যদের সামাজিক আচারাদির। গুরুগৃহে "১২ বৎসর" পাঠসমাপনান্তে ছাত্ররা আনুষ্ঠানিক স্নান করিয়া স্নাতক

হইয়া স্বগৃহে ফিরিত (সম্-আবর্তন)। দস্যুধর্মী আর্যরা এত বিদ্যাপ্রীতি এবং শীতপ্রধান দেশ হইতে আসিয়া এত স্নান করিতে শিখিলেন কিরূপে? অপরপক্ষে মোহেঞ্জোদাড়োর Great Bath হইতে এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈনদের শাস্ত্রে বর্ণিত প্রাচীন রীতিনীতি হইতে বুঝা যায় ভারতীয়দের মধ্যে স্নান আচমন প্রভৃতি অতি নৈষ্ঠিক ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ বলিয়া মনে করা হইত, প্রাচীন জৈনশাস্ত্রে দেখা যায় লোকে প্রত্যেক শুভকর্মের আগে "স্নাতঃ কৃতবলিকর্মা কৃতকৌতুকমঙ্গল প্রায়শ্চিত্তঃ" হইত অর্থাৎ স্নানাচমন পূজাদি করিত। আনুষ্ঠানিক আচার হইতে খুবই ভিন্ন জিনিস দার্শনিক চিন্তা। ভারতের প্রাচীনতম দার্শনিক চিন্তা ছিল পুরাতন সাংখ্যে; বৌদ্ধ-জৈন-ব্রাহ্মণ্য সকল দার্শনিক চিন্তার অন্তরালে সাংখ্য-মতবাদের আভাস পাওয়া যায়। সাংখ্যকে জীবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী কিন্তু পরমাত্মা বিষয়ে নির্বাক, এমনকি অবিশ্বাসীই বলা যায়; সাংখ্যে ক্রিয়াকাণ্ডের নয়, বিচার-জ্ঞানবুদ্ধির প্রাধান্য এবং সাংখ্য বেদবিরোধী। সাংখ্যের উৎপত্তি অবশ্যই প্রাগার্য। যাগ-যজ্ঞপরায়ণ আর্য-ব্রাহ্মণরা প্রাগার্যদের জ্ঞান-বুদ্ধির সংস্পর্শে আসিয়া বেদের "ব্রাহ্মণ" নামক অংশের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যখন বৈদিক আর্য ব্রাহ্মণ সমাজে প্রাগার্য সুশিক্ষিত পুরোহিতরা মিশিয়া গিয়াছিলেন—যাহাতে যাগ-যজ্ঞের বিবিধ অনুষ্ঠানগুলিকে আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল। সংসারবৈরাগ্য কৃচ্ছ্র বানপ্রস্থ প্রভৃতির উদ্ভব ভোগসুখী যোদ্ধাজাতির মধ্যে অপেক্ষা যাহারা বহুযুগ ধরিয়া শান্তিময় Settled Life-এর সংসারসুখ উপভোগ করিয়া কিছুটা ক্লান্তিবোধ করিয়া পরকালের চিন্তা করে, তাহাদেরই মধ্যে হওয়া বেশি সম্ভবপর। সুতরাং প্রাগার্যদের মধ্যে সন্ন্যাসধর্মী, বনবাসী বা ভ্রাম্যমান তপস্বী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অনুমান করা অযৌক্তিক নয়; ভিক্ষাব্রত ও কৃচ্ছ্রসাধনও ইহাদের ধর্ম হইত; ঋগ্বেদে দীর্ঘকেশশ্মশ্রু বনপ্রান্তরবাসী মুনির উল্লেখ আছে এবং ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন শাস্ত্রে বহুবিধ তপস্বী সম্প্রদায়ের কথা দেখা যায়। ইহাদের হইতেই তপোবন আশ্রম প্রভৃতির উদ্ভব কল্পনা করা যায় কারণ ইহাদের অনেকে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করিতেন, ইহারাই বোধহয় ছিলেন আরণ্যক বানপ্রস্থী প্রভৃতি। প্রাগার্যদের যে পুরোহিত সম্প্রদায় সমাজ শাসন করিতেন তাঁহারাই সম্ভবত ছিলেন "ঋষি"-নামবাচ্য; ইহাদের অনেকেই গৃহস্থজীবন যাপন করিতেন। তপস্বীদের কাছে অবশ্যই তরুণরা নয়, অতি-বয়ঃপ্রাপ্তরা তপস্যা শিক্ষা করিতেন এবং তরুণ ও কিশোর-যুবকরা লোকালয়-

বাসী শিক্ষকদের কাছে গিয়া অথবা তাঁহাদের গৃহে (বা ছাত্রাবাসে?) থাকিয়া বিদ্যার্জন করিত। প্রাচীনযুগে সবদেশেই ধর্মযাজক পুরোহিত সম্প্রদায় শিক্ষকতা করিতেন, যেমন মধ্যযুগের ইউরোপে এবং সেদিন পর্যন্ত লামাশাসিত তিব্বতে Monasteryগুলি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এই সকলের সংমিশ্রণ হইতে গুরুকুল ঋষিকুল প্রভৃতি কথার উদ্ভব হয়। খুব বড় বড় Monastery মধ্যযুগের ইউরোপ এবং একালের তিব্বতেও ছিল কিন্তু "কুলপতি" শব্দের অর্থাৎ তপোবনবাসী তপস্বী শিক্ষক সম্প্রদায় প্রধানের যে ব্যাখ্যা পরে টীকাকারদের কল্পনায় উদ্ভূত হইয়াছিল, "যিনি দশ সহস্র শিষ্যকে বিদ্যা ও অন্নদান করেন," তাহা অবশ্যই ভারতীয় কল্পনাসুলভ নিতান্ত অত্যুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। হড়প্পা-মোহেঞ্জোদাড়োর পৌর ব্যবস্থায় যে uniformity এবং দীর্ঘকালব্যাপী অপরিবর্তিত rigidity দেখা যায়, তাহা হইতে অনুমান হয় সে স্থানগুলির শাসন নিয়ন্ত্রিত হইত একটা highly centralized authority দ্বারা। প্রাচীনযুগের মানবসমাজ শাসনে রাজবিধি অপেক্ষা অনেক বেশি কার্যকর হইত ধর্মের শাসন এবং সে ধর্মশাসন পরিচালিত হইত কোনও মন্দিরাদি দেবস্থানাশ্রিত ধর্মযাজকমণ্ডলী কর্তৃক। uniformity এবং rigidity দুইই orthodoxy হইতে প্রসূত হয়, যাহার মূলে থাকে পুরোহিত-নিয়ন্ত্রিত (priestly) বিধিব্যবস্থা। আমরা জানি আমাদের সমাজবিধি নিয়ন্ত্রিত হইত "মুনি-ঋষি"দের ব্যবস্থা হইতে। সুমের মিশর ব্যাবিলন প্রভৃতি প্রাচীনদেশে সমাজশাসন হইত দেবস্থান-পরিচালক পুরোহিতকুল দ্বারা। অনেক প্রাচীনদেশে High Priestই ছিলেন রাজা বা রাজাই হইতেন High Priest যেমন গ্রীস-রোমের ইতিহাসেও দেখা গিয়াছিল। আমরাও আধুনিক যুগেও গুরুপুরোহিতের কাছে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতাম। দেবস্থানচ্ছায়াধিষ্ঠিত গুরুপুরোহিতদের কাছে ব্যবস্থা গ্রহণের স্মৃতি হইতেই পুরীমন্দিরের মুক্তিমণ্ডপের পণ্ডিতদের কাছে ব্যবস্থা গ্রহণরীতি প্রচলিত হয় এবং আজও উড়িষ্যার বহুলোক ইহার অনুবর্তন করে।

ঐতিহাসিক যুগে দেখা যায় সংঘবদ্ধ সন্ন্যাসজীবন সমধিক বর্ধিত হইয়াছিল বৌদ্ধ-জৈনদের দ্বারা। "চৈত্য" বলিতে প্রাচীন কালে দেবস্থান বুঝাইত, যেমন জৈনশাস্ত্রবর্ণিত মণিভদ্র প্রভৃতি "যক্ষ"দের আলয় (মন্দির নির্মাণ যখনও আরম্ভ হয় নাই)। বৌদ্ধদের কাছে বুদ্ধের "ধাতু" বা পূতাস্থি-সমন্বিত চৈত্য পূজাস্থান রূপে মান্য হয়, চৈত্যের আশ্রয়ে সংঘারাম বা monastery নির্মিত

হয়, তাহা ক্রমে বিহার বা বিদ্যাচর্চা ও শিক্ষার কেন্দ্র হইয়া উঠে। তক্ষশিলার পর পাটলিপুত্রে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বহু বিহার ও সংঘারাম দেখিয়াছিলেন (৪-৫ শতক)। দক্ষিণভারতে অমরাবতী ও নাগার্জুনীকোণ্ডাও এইযুগে প্রসিদ্ধিলাভ করে। ৫ শতকের পর আরম্ভ হইয়া নালন্দার মহাবিহার দেখেন ৭ শতকে হিউয়েন-চাং—নালন্দা ১২ শতক পর্যন্ত বর্তমান ছিল। ভারতের সর্বস্থানে তিনি আরও অনেক বড় বড় বিহার-সংঘারামের কথা বলিয়াছেন। ১০-১২ শতকে বিক্রমশীলা ও উদ্দণ্ডপুর বা ওদন্তপুরী খ্যাতিলাভ করে, সে-যুগে বাঙলাদেশের জগদ্দল ও সোমপুরের (পাহাড়পুর) নাম হয়। পশ্চিমভারতের বলভী, মধ্যভারতের উজ্জয়িনী ও ধারা এবং ক্রমে কাশী মিথিলা নবদ্বীপ প্রভৃতি কত স্থানে বিদ্যাকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। এগুলির কোনটিও তপোবন ছিল না। হয় monasteryতে, না হয় গুরুগৃহে (যাঁদ ধনীদের অর্থে পুষ্ট গুরুর সে সামর্থ্য থাকিত), অথবা ধনীদের সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্রদের স্বপরিচালিত ছাত্রাবাসে, কিম্বা আত্মীয়কুটুম্বগৃহে থাকিয়া ছাত্ররা লেখাপড়া শিখিত। কিন্তু ইতিহাসের কি বিড়ম্বনা! কাদম্বরী ও হর্ষচরিত প্রণেতা কবি বাণভট্ট ৭ শতকে বিন্ধ্যপর্বতের বনে প্রকাণ্ড তপোবন-আশ্রম আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন, যেখানে বিপুল ছাত্রদল গুরুদের কাছে হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন সর্বশাস্ত্র চর্চায় ব্যাপৃত! কবিকল্পনার কাছে অসম্ভব কিছুই নাই।

মানুষের ইতিহাসে দেখা যায় প্রাচীনযুগের জিনিস পবিত্র বলিয়া ধার্য হয়—আদিম মানব বনে-জঙ্গলে বাস করিত অতএব বনবাস পুণ্যময়, সে উলঙ্গ থাকিত অতএব তাহা ধর্মবর্ধক, সে ফলমূল খাইত সুতরাং তাহা সাত্বিক (স্বাস্থ্যতত্ত্বের কথা অবশ্য এখানে না তুলিয়া), সে মৃগচর্ম পরিত বা কুশাসনে বসিত শুইত অতএব তাহা পবিত্র; সেলাই করা জামা-কাপড়ের আগে এদেশে সেলাইহীন ধুতি-চাদর প্রচলিত ছিল অতএব শুভকর্মে তাহার ব্যবহার প্রশস্ত ইত্যাদি। এই Atavism মানুষের বহু ধারণা ও বিশ্বাসের মূলে থাকে, যদিও পরে নানা sophistication দ্বারা ইহার rational ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। দশরথের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের আগুনে ভীষণমূর্তি দিব্যপুরুষের আবির্ভাব ও প্রসাদ দান; সেই যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল যিনি কখনও স্ত্রীলোক দেখেন নাই সেই ঋষ্যশৃঙ্গের তপঃপ্রভাবে, দিব্যপ্রসাদ ভোজনে চার রানীর গর্ভসঞ্চার প্রভৃতি যেমন অলীক কবিকল্পনা, মুনি-ঋষিদের বনবাস, তপোবন আশ্রমে ছাত্রগণের বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতিও মনে হয় সেইরূপই ভিত্তিহীন legend মাত্র।

৪

প্রাচীনযুগের শিক্ষাব্যবস্থার একটা মোটামুটি ধারণা পাইলাম। মধ্যযুগে নানা রাষ্ট্রীয় ওলটপালটের মধ্যে, বিদেশী বিধর্মীদের নানা বিপ্লব সত্ত্বেও শিক্ষার স্রোত সম্পূর্ণ ব্যাহত হয় নাই, যদিও নানাভাবে সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামির বৃদ্ধি হইয়াছিল। এককালে এদেশে বিদেশ হইতে কত বিদ্যাবুদ্ধি আহরণ করা হইয়াছে, ৫-৬ শতকেও "যবনাচার্য"দের মত, Alexandriaর জ্যোতির্বিদদের মত, "রোমকসিদ্ধান্ত" প্রভৃতি দ্বারা ভারতীয় জ্যোতিষচর্চা পুষ্ট হইয়াছে; ৭ শতকে চীনা পণ্ডিত হিউয়েন-চাং ভারতের রাজা পণ্ডিত প্রভৃতিদের কাছে কত সম্মান পাইয়াছেন কিন্তু ১১ শতকে ভারতে আসিয়া মুসলমান মহাপণ্ডিত আল্-বেরুনী এখানকার বিদ্বৎসমাজের কি দুর্দশা দেখিলেন! তিনি বলিয়াছেন ইহাদের কি অহঙ্কার! কি কূপমণ্ডূকতা! ইহাদের নিজ দেশ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও দেশ বা সুসভ্য জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি উদার ঔদাসীন্য! যত বিদ্যাবুদ্ধি সব ইহাদেরই নিজস্ব, বাকি সকলে অনার্য ম্লেচ্ছ হেয় অবজ্ঞেয়! পণ্ডিতের কোনও সম্মান নাই! আল্-বেরুনী সত্যই বলিয়াছিলেন যে দেশ পাণ্ডিত্য ও বিদ্যার সম্মান করে, সে দেশ পণ্ডিত ও বিদ্বানেরও সম্মান করে, যেখানে বিদ্যার সম্মান নাই সেখানে বিদ্বানেরও সম্মান নাই (এবং vice versa)।

তারপর ইতিহাসের স্রোতে কত শক-হূণদল পাঠান মোগল, কত ঘাত-প্রতিঘাত, কত উত্থান-পতন ঘটিল। নূতন আলোক ছাড়িয়া আমরা প্রাচীন বিদ্যা লইয়াই রহিলাম, প্রাচীনের চর্বিত-চর্বণে সহস্র টীকা-টিপ্পনী, decadent কাব্য সাহিত্য ও কামকলার চর্চা (যেমন কোণারক ও খাজুরাহোতে চিত্রিত) চলিতে লাগিল। তবুও পাঠশালা টোল চতুষ্পাঠী:তে সংস্কৃত ও বাঙলার, মক্তব-মাদ্রাসায় আরবি-ফারসি-উর্দুর চর্চা চলিয়াছিল, বুদ্ধিজীবী হিন্দুরাও অনেকে আরবি-ফারসি শিখিয়া অর্থ ও মান-সম্ভ্রম, সামাজিক মর্যাদা লাভ করিলেন, চোগাচাপকানে শোভিত হইয়া নূতন ও বর্তমানের সঙ্গে যোগরক্ষা করিয়া বাঁচিয়া রহিলেন। কলাশিল্প, arts and crafts, শুধু যে বাঁচিয়া রহিল তাহা নয়, শিল্পীরা ধর্মে ও সামাজিক ব্যবহারে যত রক্ষণশীলই হউন, আধুনিকের practical প্রয়োজনে নূতনের সঙ্গে সমস্রোতে চলিয়া পুরাতনকে বিসর্জন না করিয়া সঞ্জীবিত রাখিলেন।

তারপর পর্তুগিজ দেনেমার ওলন্দাজ ফরাসি ইংরেজ আসিল, ইংরেজ কায়েমি

হইয়া বসিল। বাণিজ্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, শব্দে ভাষায় বেশভূষায় জীবনযাত্রায় কত নবীনতার সংযোগ হইল, যদিও ইহার অধিকাংশ adoptive, বড়জোর adaptive, অতিকচিৎ creative ছিল। মুসলমান শাসনের অবসান হইয়া ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভ হইলে দেশে একটা নবজীবনের সূত্রপাত হইল। তাহার একটা প্রধান কাজ হইয়াছিল Rule of Law প্রবর্তন, বলবানের স্বেচ্ছাতন্ত্রের উচ্ছেদ; দেশের শিক্ষিত লোক একটা নবীন সুসভ্য প্রগতিশীল আধুনিক বিদেশী জাতির সংস্পর্শে আসিয়া পরাধীনতার গ্লানির পরিবর্তে জাগরণের ও উন্নতির নবালোকের সন্ধান পাইল। দেশে সুবিচার সুশাসন, দুষ্টের দমন, নূতন নূতন অকল্পনীয় যন্ত্রশক্তির প্রচলন, রাস্তাঘাট রেল ষ্টিমার, ডাক টেলিগ্রাফ অস্ত্রচিকিৎসা ঔষধ প্রভৃতি কত কি অভিনবের প্রবর্তন দেখা গেল। স্বদেশপ্রেমিক অবশ্য চট করিয়া বলিয়া উঠিবেন, না না, এইসব হইয়াছিল দেশের লোকের সুখের জন্য মোটেই নয়, শাসক সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য। ঠিক কথাই, কিন্তু আমরা বিবেচনা করিতেছি ইংরেজের উদ্দেশ্য নয়। যে উদ্দেশ্যেই করা হউক না কেন, যাহা করা হইয়াছিল তাহাতে দেশের লোকের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি, তাহাদের ক্রিয়াবলি ও জীবনযাত্রা কিভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল তাহাই আমাদের বিচার্য। অচিরে স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি হইল, টোল-চতুষ্পাঠী উঠিয়া গেল, দলে দলে তরুণরা প্রাণে গ্রহণ করুক-না-করুক ইংরেজি বিদ্যা (যদিও কেহ কেহ মনেপ্রাণে এই বিদ্যা আকণ্ঠ গ্রহণে পুষ্ট হইয়াছিলেন) শিখিয়া (বেশির ভাগ মুখস্থ করিয়া) চাকুরি ও সসম্মান জীবিকার পথ লাভ করিল। ক্রমে কেরানিগিরি ও সরকারি চাকুরির বাজার মন্দা হইয়া আসিল, ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারি-ওকালতি পড়িয়া জীবিকার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল, private enterpriseএ অল্প লোকেরই অন্নসংস্থান হইল। নূতন জাতীয়তাবাদের আহ্বানে প্রচলিত শিক্ষাবিধিকে ধিক্কার করিয়া নিজস্ব যে-পদ্ধতিতে ইংরেজিকে পদচ্যুত করিয়া রঙিন আদর্শের জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন হইল, তাহাতে দলে দলে মূঢ়প্রজ্ঞ অজ্ঞানদৃপ্ত অর্ধশিক্ষিতের সৃষ্টি হইল, সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডস্যোপরি পিণ্ড হইয়াছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিধ অনাচার—মোড়লদের বংশধরেরা সর্বত্র ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট; কর্তাভজাদের দ্বারা tabulator examiner প্রভৃতির ক্ষেত্রে নানা কারসাজি; প্রশ্নপত্র leak করান; শিক্ষার ক্ষেত্রে favouritism ও nepotismময় dictatorship; বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বর্ধনে top-heavy Post-Graduate Department খুলিয়া pseudo-research

workএর পথ পরিষ্কার; সঙ্গে সঙ্গে তহবিল খালি; তাহা পূরণের জন্য examination standard কমাইয়া দলে দলে অপোগণ্ডদের পাশ করাইয়া fee fund বর্ধন প্রভৃতি। সরস্বতীমন্দির-দূষণের এই বিষ কলেজ ও স্কুলেও সংক্রামিত হইয়া সর্বত্র শিক্ষার পবিত্রতা ও মান খর্ব করিল। মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে আরও আসিল ইংরেজপ্রবর্তিত শিক্ষাবিধির প্রতি বিস্পৃহা, boycott ও strike। জাতীয় স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষায়তন-গুলির দেশময় কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক, কারণ তাহা সকলেরই সুজ্ঞাত ও আজ প্রত্যক্ষদৃষ্ট।

সব অনুন্নত দেশেই সর্বপ্রকার progressive বা reform movementএর অগ্রসারিতে থাকে যুবা educated minority। ইহাদের মধ্যে যাহারা সাংসারিক দায়িত্ববান বা জীবিকার্জক, তাহারা অন্যকাজে ব্যাপৃত থাকায় সাক্ষাৎভাবে কোনও movement এ যোগ দিতে পারে না, তাহারা পিছনে থাকিয়া moral support দেয়। কিন্তু ভাবপ্রবণ দায়িত্বহীন তরুণরা কর্মক্ষেত্রে নামিয়া শিক্ষার আহ্বান না শুনিয়া কর্মের আহ্বানে কান দেন। যেখানে আবার revolutionএর মন্ত্র প্রচার করা হয়, proletariatকে বলপ্রয়োগে অধিকার লাভে জাগ্রত করা হয়, যেখানে unemployment problem গুরুতর, যেখানে সমাজধনের ভোগ ও বণ্টনে, মনুষ্যসাধারণের সহজাত অধিকার ভোগে social বা economic অসাম্য ও অবিচার প্রবল সেখানে শিক্ষিত ও ভদ্রশ্রেণীর বুর্জোয়াদের অপেক্ষা ধ্বংসবাদের লীলায় লুঠপাটের প্রলোভনে বেশি কর্মপ্রবণ হয় নিঃস্ব ও anti-social elements, যাহাদের বৈধ-অবৈধ ন্যায়-অন্যায় বিষয়ে নৈতিক বোধ নাই। আজ বাঙলাদেশের যে এই অবস্থা হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবে কে? দেশের বা সমাজের সকল সমস্যা পরস্পর-সম্বন্ধ, যেমন দেহের একস্থানের রোগের চিকিৎসা শুধু local treatment দ্বারাই হয় না। দৈহিক ও মানসিক ব্যাধিও পারস্পরিক সম্বন্ধ। পাঠক স্মরণ রাখিবেন আমরা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বা সামাজিক সমস্যার কথা এখানে তুলিতেছি না, আমাদের আলোচ্য শিক্ষাবিষয়ক সমস্যা, যদিও ইহাও অবশ্যই স্বীকার্য যে শিক্ষাসমস্যা অন্যান্য সমস্যা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, তৎ-নিরপেক্ষও নয়।

বর্তমানে চারিদিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে তাণ্ডব দেখিতেছি তাহার স্বরূপ কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না, তাহার মূল কারণগুলিও এমনকিছু রহস্যাবৃত বা দুর্নির্দেশ্য নয়। রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতি-সংস্কারকরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে বা total

revolution, disruption যাঁরা সর্বক্ষেত্রে একযোগে এবং একই উপায়ে যাহা করিতে চাহেন করুন, কিন্তু শিক্ষাব্রতীদের নিজমতানুসারে শিক্ষাক্ষেত্রের কথা ভাবিতে হইবে। যদি শুনি ইহাতে বয়োধর্মে অঙ্গীভূত আমাদের করণীয় বা চিন্তনীয় কিছু নাই, নবীনের স্রোত সকল সমস্যার সুবিধান করিবে, তবে ভালই এবং বলিবার কিছু নাই, বিনাশ ও ভাঙনের হাতেই পুনর্গঠনের ভরসায় সব ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু তাহা যদি সম্পূর্ণ না মানি অর্থাৎ বিপ্লবদ্বারাই সকল সমস্যার সমাধান হয় ইহা অথবা বিপ্লবও হওয়া যদি সম্ভবপর বা কাম্য না মনে করি তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে করণীয় কি, তাহা আমাদের নিশ্চয় ভাবিতে হইবে এবং সে সম্বন্ধে frank আলোচনাও অবশ্য করিতে হইবে।

অকালকুষ্মাণ্ড বা পূতিকুষ্মাণ্ড উৎপাদনে যেমন কৃষিকার্য বিফল হয়, তেমনি মানুষের মনোরূপ (এবং দেহরূপও) জমিতে মানবোচিত বিদ্যা-বুদ্ধি বল-বিক্রম হৃদয়বৃত্তি ও চরিত্রের বীজ বপন করিয়া সুফল প্রসব করিতে না পারিলে শিক্ষাদান বৃথা হয়।

অত্যন্ত সংক্ষেপে আবার বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থাটা স্মরণ করি। ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাইবার ইচ্ছা থাকে, লেখাপড়াও তাহারা কিছুটা শিক্ষা করে, যদিও তাহার অধিকভাগ মুখস্থ করা মাত্র। তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে হাইস্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি বিরাগ অশ্রদ্ধা ও বিরক্তি, discipline অসহিষ্ণুতা, শিক্ষকবর্গের প্রতি তাচ্ছিল্য, পঠনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়ে অবিশ্বাস, শিক্ষারীতিতে অনাস্থা, শিক্ষালয়ে মারামারি, গুণ্ডামি, ল্যাবরেটারি নাশ, লাইব্রেরিতে আগুন, শিক্ষক ও শিক্ষালয় কর্তৃপক্ষকে অপমান লাঞ্ছনা ঘেরাও, প্রহার, শিক্ষায়তনের ভিতরবাহির অষ্টপৃষ্ঠে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলীয় মতবাদগত slogan লেখা, সকল বিষয়ে disruption ও বিপ্লবের মনোভাব ক্রমবর্ধিষ্ণু হইতে থাকে। যেটুকু বিদ্যালোচনা নেহাৎ হয় তাহা মুখস্থদ্বারা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যে মাত্র; সে-পরীক্ষাও আবার কয়েকবার পিছাইয়া অবশেষে হয় নামে মাত্র, কারণ বইপত্র দেখিয়া নির্বাধায় টোকাটুকি, পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ, "গার্ড"দের ভয় দেখাইয়া বা পয়সা দ্বারা বশ করা, অথবা কঠিন প্রশ্নের ওজুহাতে পরীক্ষাস্থলে তাণ্ডব বা লঙ্কাকাণ্ড; যদি পরীক্ষা নেহাৎই ঘটে তবে অতঃপর খাতা চুরি ও হারানো, পরীক্ষকদের ও ফলবিবেচকদের ভীতি বা লোভ প্রদর্শন দ্বারা ফলাফল নির্ণয় বিফল করা, ফেল করিলে তাহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভাদি করিয়া তাহা উল্টাইয়া ফেলা—ইহাই তো নিত্য দৃষ্ট হয়। যাহারা পাশের

ছাপ লইয়া বাহির হয় তাঁহারা সেই দাবিতে যে-কাজে যোগ দেয়, সে-কাজ যথাযথ সম্পাদনে তাহাদের ইচ্ছাও থাকে না, যোগ্যতায়ও কুলায় না, অতএব আত্মস্বার্থ সংরক্ষণে আবার কর্মক্ষেত্রে বিক্ষোভ চালাইয়া যাইতে হয়। এই ধারার মোট ফল দাঁড়ায় ছাত্রগণপক্ষে সময় ও শক্তির অপচয়মাত্র, দেশের পক্ষে বৃথা অর্থব্যয় ও মারাত্মক আতঙ্ক। শিক্ষালয়ে ভর্তি হওয়া, শিক্ষাকাল সমাপনান্তে পরীক্ষা দেওয়া, কিছুরই উদ্দেশ্য এখন শিক্ষালাভ বা বিদ্যাচর্চা নয়; উদ্দেশ্য চাকুরির বাজারের জন্য যোগ্যতার কোনওরূপ একটা ছাপ সংগ্রহ। সে বাজারও আবার আজ ভাঙাহাট, সেখানে মেকি মার্কা দেখাইয়াও বেচাকেনা বন্ধ হইবার জোগাড়। ফলে দেশময় যুবকদের বেকারসমস্যা, frustrationজাত ব্যর্থতায় বিক্ষোভের লীলা, বিপ্লবদ্বারা ভাঙনের পর শুষ্কমরুতে সোনা ফলাইবার বাসনা। এইসকলজনিত সমস্যার পরস্পর সংঘাতে অপর ফল হয় যত অভাব ও অসন্তোষবৃদ্ধি তত বিপ্লবেচ্ছার বৃদ্ধি, ভাঙন দ্বারা নবীন পুনর্গঠনের স্বপ্ন। সে স্বপ্নে যাঁহারা ফলবান হইবেন মনে করেন তাঁহারা নিজকর্তব্য করুন কিন্তু আমরা সে-স্বপ্নের সাফল্যে সন্দিহান বলিয়া অপর পথের সন্ধান করিতেছি। বিপ্লব যদি অনিবার্য হয় তবে তাহা অবশ্যম্ভাবী এবং তাহা নিবারণে বা আহ্বানে উৎসাহ আমাদের নাই। আমাদের প্রয়াসদৃষ্টি অন্যবিধ গঠনের উপর।

৫

সাবেকি শিক্ষাব্যবস্থা মৃতকল্প। স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটি যেভাবে চলিতেছিল, বর্তমানের দুর্যোগ কাটিয়া গেলে অল্পাধিক সংস্কার-পরিবর্তন করিয়া সে ধারা আবার চালাইতে পারা যাইবে, একথায় বিশ্বাস হয় না, সে-আশায় নিরাশ হইতে হইবে মনে হয়। টোল-চতুষ্পাঠীর যুগ যেমন বৃটিশ আমলের শিক্ষাব্যবস্থার আরম্ভে বিলীন হয়, বর্তমান ধারায় এখন তেমনি অবসানকাল সমাগত মনে হয়।

যাহাদের অন্নবস্ত্রের চিন্তা নাই বা অল্পে সন্তুষ্ট হইয়া যাহারা জ্ঞানাহরণ বা বিদ্যাচর্চায় আগ্রহী এবং তাহাতে প্রাপ্ত মানযশ ও প্রভাবপ্রতিষ্ঠা লাভেই তৃপ্ত, তাহাদের কথা চিন্তায় প্রয়োজন নাই। অধিকাংশের সে-পথ নয়। অধিকাংশের পক্ষে শিক্ষিত বিদ্যাকে কার্যকরী অর্থকরী হইতে হইবে, আর্থিক লাভজনক প্রয়োগ practical utility করা employment-oriented হইতে হইবে বাস্তবজগতের প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ হইতে হইবে। অর্থবান লোকের নিজসন্তানদের শিক্ষার জন্য নিজব্যয়ে নিজমনোমত শিক্ষালয় গঠন বা শিক্ষাবিধি

প্রবর্তনে কোনো বাধা থাকার আবশ্যকতা বোধ করি না। নিজ নিজ আদর্শে ভবিষ্যতের মানুষ তৈয়ার করায় যেমন সমাজের ও রাষ্ট্রবিধির দায়িত্ব কর্তব্য বা অধিকার আছে, মাতাপিতারও তাহা থাকা উচিত, অবশ্য যদি তাহা সমাজসম্মত আদর্শের পরিপন্থী না হয়।

ভবিষ্যতের মানুষ তৈয়ারির জন্য মাতাপিতা ও পরিবারবর্গের সকলেরই শিশুর জন্মের পূর্ব হইতেই সুস্থমাতার যাহাতে সুস্থ সন্তান জন্মে, সে-বিষয়ে কিছু pre-natal শিক্ষা থাকা আবশ্যক। সন্তানজন্মের পরে post-natal জীবনের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য, উপযুক্ত পদ্ধতিতে লালন-পালন বিষয়ের শিক্ষাও সকলের পক্ষে আবশ্যক। এইসকল বিষয়ে জ্ঞানের অভাববশত আমাদের দেশের শিশুদের পালনে যেসব বহু দোষ হয়, তাহার ফল পরিণত জীবনেও কার্যশীল থাকিয়া ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয়, সর্বক্ষেত্রে বহু অবাঞ্ছিত মনোবৃত্তি ও ব্যবহার-বিভ্রাট সৃষ্টি করে—এইসকল বিষয় শিশুচিকিৎসক child psychologist, educational psychologist এবং social psychologistগণ বিচার ও বর্ণনা করিয়াছেন, এখানে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। আমাদের দেশে কয়জন মা-বাপ জানেন বা মনে রাখেন যে, কান্না বা আবদার খোটের ফলে শিশু যদি মা-বাপের অনিচ্ছা ও অসম্মতি সত্ত্বেও নিজের ইচ্ছা একবার মিটাইতে পারে তবে সারাজীবনে তাহার সে-অভ্যাস বদলান যায় না?

তারপর নার্সারি ও কিণ্ডারগার্টেন শিশুশিক্ষার বয়স। খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুদের এই বয়সে হাত-পা-চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার, অন্য অনেকের সঙ্গে একত্র মিলিতভাবে কাজ করা, নিয়মতন্ত্রতা অভ্যাস, শিক্ষাদায়িকাদের নেতৃত্বে এবং নিজেদের মধ্যেও পরস্পরের নেতৃত্বে খেলা ও কাজ শিক্ষা দিতে হয়। শিশুরা নিয়মতন্ত্র শিখিতে ও অভ্যাস করিতে (যেমন queueing up) ভালবাসে, নেতৃত্বের অধীনতা তাহাদের প্রিয়; সেই পথে তাহাদের পরিচালনা করিয়া সম্মিলিত সামাজিক জীবনের রীতি শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন করিতে হয়। কোন শিশুর স্বভাব ও মনোবৃত্তি কিরূপ, দোষ-গুণ কি, বুদ্ধিবৃত্তির ন্যূনতা বা প্রাখর্য কিরূপ, রুচি ও ইচ্ছার গতি কোন্ দিকে, এইসকল বিষয় বুঝিবার ও তাহাতে কোনও angularity বা perversity থাকিলে তাহা শোধনের প্রকৃষ্ট সময় এই বয়সে। বর্ণপরিচয় গণন প্রভৃতি বিষয় অতিপ্রাথমিক বিদ্যা ধীরেধীরে, বিনা প্রয়াসে যাহাতে শিশুর হৃদয়ঙ্গম হয় সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়, শিক্ষণীয় বিষয়ে জোরজবরদস্তি করিলে শিক্ষাবিষয়ে শিশুমনে ভীতির সঞ্চার

হইয়া বহু কুফল প্রসব করে। এইসকল বিষয়েও শিশুমনোবিদগণ বহুশিক্ষা দিয়াছেন। শিশুশিক্ষার মোটকথা শিশু যেন সানন্দে, নিজসামর্থ্যের অনুরূপ ভাবে, খেলাধূলার মধ্য দিয়া নিজ শরীর ও মনের ব্যবহার বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষকের নেতৃত্বে অথবা অন্য পাঁচজন সমবয়সীর সঙ্গে একত্র সম্মিলিত ভাবে করিতে শিক্ষা করিয়া সমাজধর্মের সমবায় বা co-operative মনোভাবে সুদীক্ষিত হইতে পারে। ভাঙাচোরায় যেমন তেমনি গড়া বানানো প্রভৃতি কাজেও শিশুরা উদ্যমী হয়; এই পথে constructive ও creative আদর্শে হাত-পা-বুদ্ধি ও মনোভাবের ব্যবহার শিক্ষাদ্বারা শিশুকে বাস্তব জীবনের উপযুক্ত করিতে হয়।

৬

কিণ্ডারগার্টেনের রীতিই প্রাইমারি স্কুলেও শিক্ষার্থীদের সাত-আট বৎসর বয়স পর্যন্ত চলা উচিত। তারপর উচ্চতর পর্যায়ে ১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা-বিধিতে বালক ও বালিকাদের জন্য বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন প্রকারের curriculum আবশ্যক, যাহাতে উহাদের প্রত্যেকের প্রকৃতি ও ভবিষ্যজীবনের প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয়-নির্বাচন হইতে পারে। এই বয়সে খেলাধূলার মাধ্যমের পরিবর্তে (খেলাধূলার স্বকীয় প্রয়োজনীয়তা অবশ্য কদাপি উপেক্ষণীয় নয়) crafts বা হাতের কাজের মাধ্যমে সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ (basic education) বিধেয়। সে-হাতের কাজ শুধু সখের কাজ নয়; বাস্তব জীবনের নিত্য ও অবশ্য প্রয়োজনীয় নানা জিনিষ কিভাবে উৎপাদন ও নির্মাণ হয়, তাহা নিজের হাতে অভ্যাস করার ও তাহারই মাধ্যমে অপর বহু intellectual বিষয়ে প্রবেশ লাভ করার নাম basic education। এই বিষয় সম্বন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাঁহারা এই শিক্ষাবিধিকে crude বা primitive বা medieval আদর্শ ও মনোভাবজাত মনে করেন। কিন্তু এ-ধারণা অত্যন্ত ভুল! আজকাল সকল উন্নত ও সুশিক্ষিত দেশের শিক্ষাবিজ্ঞানবিদরা হাতের কাজের মাধ্যমে শিক্ষাবিধান প্রবর্তনের পক্ষপাতী। এই রীতি যেমন তরুণ শিক্ষার্থীদের মানসিক ধারার অনুগামী তেমনই গণতান্ত্রিক সোশালিস্ট সমাজের আদর্শে ভবিষ্যতের মানুষ তৈয়ারির পথ। Practical জ্ঞানের অভাবে আমাদের শিক্ষায় দেখা যায় ছেলেপিলে সপ্তর্ষি মণ্ডলের সাতটা নক্ষত্রের নাম মুখস্থ করে কিন্তু আকাশের সপ্তর্ষিমণ্ডল কখনও তাহাদের দেখান হয় না এবং নিজের বাড়ির সামনের গাছ বা তাহাতে বসা পাখির নামও জানে না।

শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের অন্তর্নিহিত শারীরিক—মানসিক যাবতীয় শক্তি সম্যক উদ্বুদ্ধ ও বিকাশ করা, চিন্তা কল্পনা চরিত্র কর্মশক্তি সৃষ্টিশক্তি প্রভৃতি গুণাবলি যাহার প্রকৃতিতে যেইরূপ আছে, সে-সম্বন্ধে নিজে সচেতন হওয়া এবং নিজের যে-বিষয়ে ন্যূনতা বা দুর্বলতা আছে তাহা পরিহার করিয়া যে-বিষয়ে উৎকর্ষ আছে তাহা অনুশীলন দ্বারা বর্ধন করা। সকলের সব গুণ থাকে না, আবার কোনও গুণই নাই এমন মানুষও হয় না। যাহার যে-গুণ আছে তাহার বর্ধনেই সমগ্র সমাজের কল্যাণ-পরিপুষ্টি হয়।

বিদ্যাবুদ্ধি বিষয়ক অন্য বহু প্রসঙ্গের কথা না বলিয়া শুধু এইটুকু মাত্রই বলা এখানে যথেষ্ট হইবে যে, বাল্যের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি নানা বিষয়ের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচায়ক হওয়া উচিত—ভাষা ইতিহাস ভূগোল গণিত, নানাবিষয়ক বিজ্ঞান প্রভৃতি। নানা বিষয়ের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ের ফলে শিক্ষার্থীরা নিজনিজ রুচি ও সামর্থ্য বুঝিতে পারিবে এবং অভিভাবক ও শিক্ষকরাও সে-সামর্থ্যের পরিমাণ অনুমান করিতে পারিবেন। রুচি না থাকিলে সামর্থ্য হয় না, আবার রুচি থাকিলেই সামর্থ্যও থাকিবে এমন কোনই কথা নাই। যাহার যে-বিষয়ে রুচি বা সামর্থ্য নাই, সে-বিষয়ে তাহাকে গুঁতানো নিরর্থক।

আমার মনে হয় প্রাইমারি স্কুলে পড়ানো উচিত বয়স অনুযায়ী নয়, সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থাৎ যে-বয়সই হউক, যাহাদের যে-বিষয়ে মাথা আছে তাহাদের একত্র সে-বিষয় পড়াইলে প্রগতি দ্রুততর হইবে, যাহারা সে-বিষয়ে slow বা dull তাহারা উহাদের গতিরোধ না করিয়া নিজেদের বুদ্ধি অনুযায়ী ভিন্নভিন্ন ক্লাসে পড়িবে। আরও মনে হয়, পরীক্ষাব্যবস্থায় ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক পরীক্ষার পরিবর্তে প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন বিষয়ে (ঠিক যেন স্কুলে বসিয়া home work করিতেছে, এইভাবে) পরীক্ষা লইয়া সেই অনুসারে সারা বৎসরের ফলাফল নির্ণয় করিলে ভাল হয়, ইহাতে পরীক্ষা সম্বন্ধে ভীতি বা strain নিবারিত হয়। অল্পবয়সীদের পক্ষে বাড়িতে home task-এর চাপ ভাল নয়, বাড়িতে অন্যরকমের কাজ ও পড়ায় উৎসাহ দেওয়া বেশি ভাল। বাৎসরিক ক্লাস প্রোমোশন, পাস-ফেল বলিয়াও কিছু থাকা অনাবশ্যক—পরীক্ষায় ফেল হওয়া, প্রোমোশন না পাওয়া প্রভৃতিতে inferiority complex জন্মিয়া সমগ্র জীবনে নানা অবাঞ্ছিত মনোভাব সৃষ্ট হয়। ১২ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইলে সকলেই প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষা সমাপন করিবে। এই বয়স পর্যন্ত শিক্ষাবিধি অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক, free and compulsory হওয়া উচিত। তারপর

সকলে বিভিন্ন বিষয়ে নিজনিজ যোগ্যতার পরিমাপক নম্বর বা গ্রেড পাইয়া উচ্চতর স্কুলে পারিলে ভর্তি হইবে অথবা জীবিকা উপার্জনের স্বরুচি ও সামর্থ্যানুযায়ী শিক্ষালাভের পন্থা অনুসরণ করিবে।

বিদেশী পর্যবেক্ষকমাত্রেই—কিবা মহোচ্চশিক্ষিত কিবা সাধারণশিক্ষিত—বলিয়া থাকেন আমাদের শিক্ষাবিধির কয়েকটা গুরুতর দোষ এইগুলি—(১) ইহাতে গোড়াপত্তন হয় খুব কাঁচা গাঁথুনির উপর, ছাত্ররা যে-বিদ্যা সংগ্রহ করে তাহা মুখস্থমাত্র হওয়ায় তাহাদের হৃদয়ে বা মস্তিষ্কে তাহা প্রবেশ করে না এবং বুদ্ধিবৃত্তি বা যুক্তিশক্তির সঙ্গে অঙ্গীভূত হইয়া চরিত্রসৃষ্টিও করে না, (২) যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা বিচারবুদ্ধিতে গৃহীত না হওয়ায় কার্যত প্রয়োগে অসমর্থ হয়, (৩) এই দুই কারণে লোকের মন বি-এ-এম-এ পাশ করিয়াও logical ও rational না হইয়া বালবৎই অপরিপক্ব ও অস্থির থাকিয়া যায়, ইত্যাদি। বাঙালী তরুণদের intelligence কাহারও অপেক্ষা কম নয়, বরং অনেকের তুলনায় বেশিই, কিন্তু সাধনা, শ্রম, intellectual maturity ও discipline এর অভাবে সে বুদ্ধিবৃত্তি এবং তাহার পরিচালনা অস্তিমে পাশ্চাত্যদের এবং জাপানীদেরও সঙ্গে সামর্থ্য ও নিষ্ঠায় পারিয়া উঠে না। প্রাথমিক শিক্ষার গোড়া পত্তন খুব পাকা হইলে সে-শিক্ষায়ই মানুষ ক্রমে জীবনে সর্বক্ষেত্রের সম্মুখীন হইতে পারে।

৭

তারপর Secondary শিক্ষার কথা বলিব। ১৩ হইতে ১৬ নয়, ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত Secondary বা Higher Secondary শিক্ষার অর্থাৎ হাইস্কুলের সময় হওয়া উচিত। এই সময় হইতেই আজকাল শিক্ষাক্ষেত্রে যে-সব সমস্যার উদয় হইয়াছে তাহার প্রারম্ভকাল এবং সেই সমস্যাগুলি ক্রমে আরও বাড়িয়া হাইস্কুলের পর কলেজ, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যন্ত কণ্টকিত করিতেছে। দেশের ও বিদেশের শিক্ষা ও ছাত্রজগতের সঙ্গে যাঁহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে বর্তমান কালে আমাদের দেশে যাহারা হাইস্কুলে বা কলেজে বা Universityতে পড়ে তাহাদের অর্ধেকের উপর ঐ ঐ শিক্ষার অনুপযুক্ত। কথাটি এদেশের অনেকের কাছে খুবই অপ্রিয় হইবে, কিন্তু তাহা হইলেও উহা সত্য। Secondary শিক্ষা শুধু humanities বা sciences নয়, নানাবিধ vocational, technical, commercial প্রভৃতি শাখায়

বিস্তৃতিলাভ করা উচিত। সবদেশেরই লোকের মধ্যে অনেকেরই intelligence থাকে, কিন্তু intellectual শক্তি সে-তুলনায় অনেক অল্পলোকের থাকে। Humanities ও scienceএর শিক্ষা শুধু যাহাদের intellectual মেধার এবং রুচি ও আগ্রহের বল আছে তাহাদেরই জন্য হওয়া উচিত, বাকিদের পক্ষে অন্য বহুতররূপ শিক্ষা ও কর্মের ক্ষেত্রে প্রসারিত হওয়া উচিত। গুঁতাইয়া পিটাইয়া গণ্ডাখানেক প্রাইভেট টিউটার রাখিয়া, বা পরীক্ষা পিছাইবার বা ভণ্ডুল করিবার বহুপ্রয়াসের পর, বা টোকাটুকি খাতাবদল, গার্ডদের হাত প্রভৃতির পর যাহারা ফেল বা কোনক্রমে থার্ড ডিভিশনে পাশ করে, তাহাদের নিজেদের পক্ষে ও সমাজের পক্ষে অনেক বেশি হিতকর হয় যদি তাহারা সে-শিক্ষায় না গিয়া যাহাতে তাহাদের রুচি ও সামর্থ্য আছে, যাহাতে জীবিকার সংস্থান হয় এমন শিক্ষা বা Occupation অনেক আগেই অবলম্বন করে। যাহাদের intellectual চিন্তা মেধা ও সৃষ্টিশক্তি যত প্রবল তাহারা অবশ্যই তত উচ্চ সম্মান ও উচ্চ পারিশ্রমিক লাভের যোগ্য কারণ দেশের ভবিষ্যোন্নতি তাহাদেরই হাতে কিন্তু সমাজসেবায় প্রযোজ্য যাহা অপরদেরও দেয় তাহার সম্মান বা মূল্য কম মনে করা উচিত নয়। হাতের পাঁচটা আঙুলের ক্রিয়া ও আকার বিভিন্ন কিন্তু যে কোনোটির অভাবেই হাতের কর্মশক্তি খর্ব হয়; মস্তিষ্ক না থাকিলে জীবমাত্রেই যতটা বিকল হয়, দেহযন্ত্রের অন্যান্য অংশের অভাবে বৈকল্য সেইরূপই ঘটে।

আমাদের যৌবনকালের একটা গল্প বলি। বাঙলাদেশের কোনও সরকারি কলেজের ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল কলিকাতা ইউনিভার্সিটির সেনেট মীটিংএ আপত্তি তুলেন যে, সব পরীক্ষায় শতকরা ৭০-৮০ জন অযোগ্য ছাত্রকে পাশ করান হইতেছে কেন? উত্তরে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সাহেবকে প্রশ্ন করেন সাহেব বিলাতের যে ইউনিভার্সিটির যে যে পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন, সেই সেই পরীক্ষায় সেই সেই বৎসর তাঁহার ইউনিভার্সিটিতে কয়জন ফেল করিয়াছিল? সাহেব ইহার উত্তর দিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার দেশে কদাচিৎ কেহ কোনও পরীক্ষায় ফেল হয়—ইহার কারণ এখনই বলিতেছি—পরীক্ষার্থীরা সকলেই পাশ করে। অতএব প্রমাণ হইল বিলাতী ইউনিভার্সিটির তুলনায় কলিকাতা ইউনিভর্সিটিতে ঢের বেশি উঁচু standard maintain করা হয় কলিকাতার পরীক্ষা আরও বেশি strict। সাহেবকে এইভাবে নিরুত্তর নির্বাক করিয়া দেওয়ায় আমরা তখন সার আশুতোষকে খুব বাহবা দিয়াছিলাম কিন্তু আজ বুঝি তিনি যে sophistry দ্বারা সাহেবকে নিরুত্তর করিয়া দিয়াছিলেন,

সাহেব সরলবুদ্ধি শিক্ষাব্রতী ছিলেন বলিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ ছেদন করিতে পারেন নাই যাহা ধড়িবাজ ব্যবসায়ী বা আইনজীবী হইলে পারিতেন। আশুতোষের যুক্তি ও তুলনায় যে fallacy ছিল তাহা তাঁহার মতো বিজ্ঞব্যক্তির অজ্ঞাত থাকা আশা করা যায় না এবং তাহা এই—বিলাতে প্রাইমারি শিক্ষা সমাপক ছাত্র-বৃন্দের ৫০%এর বেশি হাইস্কুলে যাইতনা যাহারা যাইত তাহাদেরও প্রায় ১০%বা ততোধিক হাইস্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হইবার আগেই, এবং যাহারা আদপেই হাই স্কুলে যাইত না তাহারা অন্য জীবিকায় প্রবেশ করিত বা তদুপযোগী শিক্ষালাভে (apprenticeship) প্রবৃত্ত হইত, আমি অবশ্য যে-যুগের কথা বলিতেছি তখন ইংলণ্ড পুরা ক্যাপিট্যালিস্ট দেশ, ডেমক্রাসি সে-দেশের লোকের আজীবন মজ্জাগত হইলেও এবং লেবার পার্টির লোক পার্লামেণ্টে থাকিলেও কনজারভেটিভ ও লিবারেল, এই যে দুই প্রধান রাজনৈতিক দলে সে-দেশ তখন বিভক্ত ছিল, তাহাদের কেহই সোশালিস্ট মতবাদী ছিল না। সে-তুলনায় পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশে সোশালিস্ট ধারা অনেক বেশি অগ্রসর হইয়াছিল। সে-যুগে বিলাতে হাইস্কুল শেষ হইলে বড়জোর ২০% ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ কলেজে যাইত, বাকিরা অন্য নানা জীবিকামার্গ অবলম্বন করিত, যাহাতে যথাকালে প্রভূত অর্থ প্রতিপত্তি ও মানযশাদিও লাভ হইত। আমাদের দেশে সেযুগে জীবিকামার্গ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, তাই দলে দলে ছাত্র স্কুল-কলেজ আচ্ছন্ন করিত। এই প্রসঙ্গে আরও বলা উচিত যে ক্যাপিট্যালিস্ট দেশ হইলেও এবং হাইস্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মহার্ঘ হইলেও ইংলণ্ডে উপযুক্ত মেধাবী ছাত্রদের হাইস্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার কোনও কালে কোনও বাধা হইত না। প্রত্যেক স্কুল ও কলেজে private donarগণের প্রদত্ত এত ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। তারপর অক্সফোর্ড—কেম্‌ব্রিজের মতো নামজাদা aristocratic বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বড়-লোকের ছেলেরা প্রবেশ করিত (অবশ্য হাইস্কুলের শিক্ষা তাহারা ফাঁকি দিয়া নয়, সুযোগ্যভাবেই সমাপন করিয়া আসিত) তাহারা কিছুটা লেখাপড়ার চর্চা করিয়া বাকি সময় খেলাধূলা ও সামাজিক জীবনচর্চায় কাটাইয়া ৩-৪ বৎসর পরে পরীক্ষা না দিয়াই (দিলে হয় ফেল করিত, না-হয় নীচ ক্লাস পাইত) বিশ্ব-বিদ্যালয় ত্যাগ করিত, কারণ তাহাদের জীবিকাপথের জন্য ডিগ্রিসংগ্রহের প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং যাহারা শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দিত তাহারা প্রায় সকলেই হাইস্কুল হইতেই স্কলারশিপ পাওয়া মেধাবী ছাত্র, তাহাদের কেহই যে পরীক্ষায় ফেল করিবে না, ইহাতে বিচিত্র কি? অতএব দেখা গেল সার আশুতোষের

ধোঁকা কত ফাঁকা ছিল।

কলিকাতা ইউনিভার্সিটিতে যেমন অকাতরে ছাত্রদের পাশ করান হইত অপর দিকে আবার সেকালে মাদ্রাজ ও এলাহাবাদে, এবং কিছুমাত্রায় কয়েক বৎসর নবস্থাপিত পাটনা ইউনিভার্সিটিতেও, তেমনি অকাতরে ছাত্ররা ফেল করিত, পাশের মাত্রা প্রায় ৩০% ছিল। ইহাতে শুধু উঁচু standard ছাড়া (standard সর্বদা উঁচু থাকাই ভাল) আরও একটা জিনিষ প্রমাণ হয়—অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর অযোগ্যতা। অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং যেমন বিপজ্জনক, অনধিকারীকে বিদ্যাদানও সেইরূপ নিরর্থক। এই সূত্রে স্মরণীয়, হিউয়েন চাং বলিয়াছেন নালন্দা মহাবিহারে প্রবেশার্থী হইয়া সারা ভারত হইতে যত ছাত্র আসিত তাহাদের অন্তত ৭-৮ জনকে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইত, অর্থাৎ মাত্র ২০-৩০% বাছাই করা ছাত্রই নালন্দায় পড়িবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। অতএব নালন্দার যে এশিয়ামহাদেশব্যাপী সুখ্যাতি হইয়াছিল তাহার একটি কারণ বিদ্যাবিষয়ে বিচার অধিকারী। অতএব বলিতে চাই শিক্ষা-সোপানাবলি যত উপরে উঠিতে থাকিবে তত ছাঁটাই-বাছাই, screening ও sieving দরকার, এবং যাহারা সুযোগ্য তাহাদের পক্ষে উত্তরোত্তর উচ্চশিক্ষা লাভে কোনও আর্থিক বাধা থাকা অনুচিত। যেহেতু আমাদের দেশে শিক্ষায়তনের জন্য private donars প্রায় নাই বলিলেই হয়, সেহেতু যোগ্য ছাত্রদের যাহাতে উচ্চশিক্ষা লাভে আর্থিক বাধা না হয়, সেইজন্য state হইতে ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। পাশ্চাত্যদেশে বিদ্যার্থে কত ধনীরা অজস্র অর্থদান দ্বারা কতরকম Foundation সৃষ্টি করেন; যাঁহাদের তত সামর্থ্য নাই তাহারাও অনেকে নিজেরা যে স্কুলে পড়িয়াছেন সেখানে অনেকে বৃত্তির ব্যবস্থা করেন, অনেকে কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণের পর সেই স্কুলে বিনা বেতনে কোনরূপ কাজও করেন—সে spirit আমাদের দেশে দুর্লভ, সেইরূপ নিষ্ঠাময় সেবালাভের যোগ্যতাই বা আমাদের দেশের কয়টা স্কুল-কলেজের আছে?

যে-ছাত্রেরা Primary stage শেষ করিয়া Secondary স্কুলে আসিবে তাহাদের নিজ স্কুলের শেষ পরীক্ষামাত্রের নয়, সমগ্র প্রাইমারী শিক্ষা জীবনের পড়াশুনা ও স্বভাব চরিত্রের record দেখাইয়া সেকেণ্ডারি শিক্ষায় ভর্তি হইতে হইবে। শুধু তাই নয়, যে-সেকেণ্ডারি স্কুলে তাহারা ভর্তি হইতে আসিবে, সেই স্কুলের কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা করিয়া যাহাকে ইচ্ছা ভর্তি করিবেন, যাহাকে ইচ্ছা না হয় করিবেন না। এইরূপে মাত্র যোগ্যকেই ভর্তি করিবার পরও সেকেণ্ডারি

স্কুলের কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের পড়াশুনা আচরণ-ব্যবহারে যখনই অসন্তুষ্ট হইবেন তখনই তাহাদের বহিষ্কার পর্যন্ত ইচ্ছানুরূপ শাস্তিদান করিতে পারিবেন, তাঁহাদের এই অধিকারে কেহ বাধা দিলে State হইতে আইন আদালত প্রভৃতিদ্বারা বাধা-দায়কের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য। শিক্ষাস্রোতের অনাবিল প্রবাহ এই উপায়াবলি দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রতিবন্ধকহীন করিলে স্কুলে যে বাতাবরণ সৃষ্ট হইবে তাহাতে ছাত্র ও শিক্ষকের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে সহজ ও স্বাভাবিক ধারা চলিতে পারিবে। বলা বাহুল্য শিক্ষকগণেরও অতি সুযোগ্য ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন। যাহার আর কিছুই হইল না সেই ইস্কুলমাষ্টার হইল, ইহা নয়; বেতন ও সম্মান উভয়ই যেন এমন সন্তোষজনক হয় যে শিক্ষকদের টিউশান প্রভৃতি নানা উপায়ে অর্থচিন্তা না করিতে হয়। প্রাইভেট টিউশনির প্রয়োজন শিক্ষাবিধির ব্যর্থতা, ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই অযোগ্যতা প্রমাণ করে, এইসূত্রে কত দুর্নীতিও যে প্রশ্রয় পায় তাহাও সকলেই জানেন। ভর্তি, পাশ-ফেল, নম্বর দেওয়া প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষকদের বা শিক্ষালয়ের যদি দুর্নীতি বা corruption প্রভৃতির অপ্রবাদ রটে তবে এইবিষয়ে public enquiry হইয়া সমুচিত প্রতিকার-ব্যবস্থা কর্তব্য। দেশের মানুষ তৈয়ারির পন্থা প্রধানত secondary education—সরিষায় ভূত ধরিলে ছাড়াইবে কে?

Humanities, sciences, technology, commercial প্রভৃতি বিষয়াবলির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্কুল থাকা উচিত। প্রত্যেক স্কুলে ১৩-১৮ বৎসর বয়স্ক ছাত্রদের জন্য ছয়টি ক্লাস থাকিবে এবং কোনও sectionএ ২৫ জনের বেশি ছাত্র থাকিবে না। পড়াইবার method এইরূপ হইবে যেন theory শিক্ষার পর তাহা প্রয়োগের প্রতি বেশি যত্নদৃষ্টি দেওয়া হয়—theoryতে শিখিয়া অনর্গল আওড়াইলাম, কিন্তু practical applicationএর কার্যক্ষেত্রে কিছুই পারিলাম না, পাশ্চাত্যের সকলেই আমাদের দেশের শিক্ষাবিধিতে এই ত্রুটি লক্ষ্য করেন। সকল শিক্ষার এই আদর্শও শিক্ষা দেওয়া উচিত যে তাহা যেন সমগ্র সমাজের হিতবর্ধক হয়, শুধু একজনের বা কয়েকজনের হাতে এইভাবে ব্যবহৃত না হয় যে অন্যকে exploit করিয়া তাহা মাত্র কয়েকজনের স্বার্থবৃদ্ধি করে। খুব প্রকাণ্ড বাড়িতে অজস্র বড় বড় ক্লাসে ছাত্র কিলকিল করার যুগ এখন অতীত। Secondary স্কুলের বয়স হইতেই স্কুলের তথা স্বগৃহপরিবারের ছায়ায় ছাত্রদের কোনরূপ কাজ দ্বারা কিছু কিছু অর্থার্জনের ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হয়—এইরূপ productive কাজ যাহাতে নিজ হাতে, প্রয়োজন অনুসারে কিছু যন্ত্রপাতির সহযোগে

কাজ করিতে হয়, যাহা white collar জাতীয় নয়, যাহা শ্রমসাপেক্ষ এবং সমগ্র সমাজের প্রয়োজনে লাগে, যাহার চাহিদা আছে এবং ছাত্রদের ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির প্রয়োগ ব্যবহার ও উৎকর্ষ হইতে পারে। ইহাতে ছাত্রদের মনে স্বাবলম্বন-দায়িত্ব সম্বন্ধে বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হইবে। এইরূপ জিনিষ উৎপাদন শিক্ষা করা ও কিছু অর্থার্জনও করা কর্তব্য, যে-জিনিষ ধনীদের বিলাসের, সৌখিনের সখের বা শিশুর খেলনা না হইয়া সাধারণ লোকের ব্যবহার্য। ইহাতে ডেমক্রাটিক ও সোশালিস্ট মনোভাব সৃষ্ট হইবে। বুর্জোয়াভাবের অর্থ যেখানে সুরুচিমত্তা শালীনতা, culture ও refinement, সেখানে তাহা অবশ্য অর্জনযোগ্য, কিন্তু যেখানে ইহার অর্থ শরীরকর্মে বিমুখতা ও লজ্জাবোধ, snobbery, manual বা menial কাজের প্রতি তাচ্ছিল্য উক্তবিধ কর্মীদের প্রতি অবজ্ঞাভাব, সেখানে তাহা অবশ্য নিন্দনীয় ও বর্জনীয়। প্রথম ইংরেজ আমলের একজন লাটসাহেব প্রত্যহ সকালে কলিকাতা ময়দানে morning walk করিতেন, দেখিয়া আমাদের দেশের লোকে সাব্যস্ত করিল নিশ্চয়ই উহার মাথা খারাপ, কারণ লাট-বেলাটদের কি পায়ে হাঁটিয়া বেড়ান উচিত?

Curriculum সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, সর্ববিধ secondary স্কুলে বেশ কিছু পরিমাণে ব্যবহারিক বাঙলা (মাতৃভাষা) ও ইংরেজি (যাহা সাহিত্যিক শোভার জন্য নয়, যাহা জাগতিক প্রয়োজনে নিত্যব্যবহারে লাগিবে) এবং ইতিহাস ও ভূগোল (প্রত্যেকে ১০০ নম্বর) Compulsary হওয়া উচিত, তাহা ছাড়া উচ্চমানে আরও তিনটি যে-কোনও বিষয়, প্রত্যেকে দুই শত করিয়া নম্বর, সর্বসমেত মোট ১০০০ নম্বর, ইহাই matric বা higher secondary বা school finalএর standard হওয়া কর্তব্য, স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক মাসে একটা করিয়া পরীক্ষা লইয়া ছয় বৎসরের পর high standard অনুযায়ী সামগ্রিক ফল নির্ণয় করিবেন, বৎসরের মাঝখানে আর কোনও পরীক্ষা থাকিবে না। পরীক্ষা দিতে বসিয়া যে-ছাত্র কোনরূপ গোলযোগ বা ওজর-আপত্তি করিবে তাহাকে স্কুল হইতে বহিষ্কার এবং আদালত সোপর্দ করা হইবে। যে-ছাত্র কোনও বৎসর ফেল করিবে তাহাকে সে-স্কুল ছাড়িতে হইবে—অন্য স্কুল ইচ্ছা করিলে পরীক্ষা করিয়া তাহাকে ভর্তি করিতে পারিবেন (যাহারা কোনো স্কুলে ভর্তি হইতে পারিবে না তাহাদের কথা পরে বলিতেছি)। লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরির উত্তম ব্যবস্থা ও ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন। লাইব্রেরি আজকাল স্কুলের কি কথা, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতেও নিয়মরক্ষক শোভামাত্রে

দাঁড়াইয়াছে, Postgraduate ছাত্রেরাও text বা prescribed বই ছাড়া অন্য কিছু স্পর্শও করে না, recommended বইএর হয়তো নামও জানে না, অন্য বই চোখেও কখনও দেখে না। লাইব্রেরির ব্যবহার এইভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যাহাতে ছাত্রেরা শিক্ষকের কাছে শিক্ষণীয় বিষয়াবলির মূলসূত্রে ও মূলতত্ত্বগুলি বুঝিয়া লইয়া বাকি সব তথ্যাবলি নিজেরা নানা বই দেখিয়া সংগ্রহ ও আয়ত্ত করে। পুরাতন তত্ত্ব হইতে কিভাবে নূতন তত্ত্বের উদ্ভব হয়, পুরাতনের ত্রুটি নূতনে কিভাবে সংশোধিত হয়, এই সকল বিষয় নূতন-পুরাতন উভয়বিধ পুস্তকের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় থাকিলে সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়; কোনও বিষয়ের ব্যাপকতাই বা কিরূপ, তাহারও বোধ জন্মে নানা প্রামাণিক বই পাঠে। বই ঘাঁটিতে হইলে যুক্তিপূর্বক বিচার ও লক্ষ্য করিতে হয় কোন্ বইতে নূতন কি যুক্তিসম্মত তথ্য আছে। পঠনীয় বিষয় ছাড়া অন্য নানা বিষয়ক out-books, যেমন ভ্রমণবৃত্তান্ত জীবনী বিজ্ঞান adventures, explorations, বৈদেশিক ইতিহাস ও জীবন-যাত্রা, fiction, romance প্রভৃতি—ছাত্রেরা যত পড়ে তত ভাল। বড়বড় লাইব্রেরির বিখ্যাত পুরাতন গ্রন্থাবলীর বহু যে ক্রমে misplaced, not found, not returned প্রভৃতি নানা ভাঁওতার অন্তরালে বাস্তবে বেহাত হইয়া যাইতেছে, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন।

প্রসঙ্গত মনে হইল—কলিকাতার একটি প্রসিদ্ধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে একটি সুন্দর Children's Library আছে, উহাতে বৈকালবেলা ছেলেমেয়েরা পড়ে। কিন্তু বৈকালে বদ্ধঘরে কৃত্রিম আলোতে কাটানোই তরুণদের পক্ষে ভাল, না মুক্ত-বায়ুতে দৌড়াদৌড়ি খেলাধূলাই ভাল? শীতপ্রধান দেশে যেখানে শীতকালে শীত-বায়ু বা বরফপাত বা বৃষ্টিতে ঘরের বাহির হওয়া যায় না সেখানে ছেলেদের বৈকালে ও সন্ধ্যায় ঐভাবে কাটানোর ব্যবস্থা থাকে কিন্তু গ্রীষ্মের বৈকালে বা শীতকালে বরফান্তে রৌদ্র উঠিলে কেহ ঘরে বদ্ধ থাকে না। অপর—কিশোরদের সমাজ-সেবার মনোভাব, স্বাবলম্বন শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের জন্য বিলাতে Boy Scout movement এর সৃষ্টি হইয়াছিল। আমাদের দেশে দেখি উহাতে snobbery, চালিয়াতি ও বড়লোকি ঢংএরই পোষণ হয়। একবার রেলের খুব বড় একটা জংশন স্টেশনে, শীতকালের প্রায় শেষরাত্রে প্লাটফর্মে ট্রেনের প্রতীক্ষায় ট্রাঙ্কের উপর বসিয়া থাকাকালে দেখিয়াছিলাম অবাঙালী বড় একদল বয়স্কাউট অন্য ট্রেন হইতে নামিয়া ঐ প্লাটফর্মে জমায়েৎ হইলে স্কাউটমাস্টার মহাশয় হুকুম দিলেন প্রত্যেকে যেন refreshment roomএ গিয়া এককাপ করিয়া চা

খাইয়া আসে। যে-ট্রেনে তাহারা যাইবে তাহার অনেক দেরি ছিল। বিলাতে হইলে এইরূপ ক্ষেত্রে স্কাউট দল প্লাটফর্মের এক অন্তে গিয়া নিজেদের স্টোভ জ্বালিয়া (কারণ প্লাটফর্মে কাঠকুটা বা কাগজের open fire জ্বালান নিষেধ) নিজেদের কেঁৎলিতে জল ফুটাইয়া নিজেদের চা-চিনি-দুধ নিজেদের enamelled পেয়ালায় খাইত। আর একবার মধ্যভারতে ভ্রমণকালে দেখিয়াছিলাম ex-curtion ফেরৎ একদল কলেজের ছাত্র একটা বড় জংশনে দিনের বেলায় আমার ট্রেনে উঠিলেন, প্রত্যেকের পরিধানে নূতন শার্ট প্যাণ্ট জুতা, প্রত্যেকের সঙ্গে একটি করিয়া দামী চামড়ার আনকোরা নূতন suit-case ও নূতন hold-all। সেই লগেজে দুটা III class যাত্রী Compartmentএর বেঞ্চ মেঝে (upper bunk নয়) ভরাট হইয়া (অর্থাৎ যাত্রীগণের বহু অসুবিধা করিয়া) ছাদ পর্যন্ত পৌছিল, বাবাজীবনরা নিজেরা, যদিও III class ticketধারী, সেকেণ্ড ফার্স্ট যেখানে পারিলেন উঠিলেন। বিলাত হইলে ইঁহারা excursion উপযোগী অর্ধপুরাতন মোটা জামা-জুতা পরিয়া, পিঠের haversackএ সদাপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া বাকি জিনিষ মিলিটারিদের মতো পুরু canvas-এর ব্যাগে ভরিয়া অন্য যাত্রীদের অসুবিধা না হয় এমনভাবে গাড়িতে চাপাইয়া থার্ডেই উঠিতেন। আমাদের দেশে সকল জিনিষেরই কিভাবে বিকৃতি ঘটে।

মধ্যবিত্তেরা সকল দেশের সমাজের যেমন মেরুদণ্ড স্বরূপ—কালিদাস যেমন হিমালয়পর্বত সম্পর্কে বলিয়াছেন পৃথিবীর মানদণ্ডের (মাপকাঠি, measuring rod) মতো প্রসারিত হইয়া উহার দুই অন্ত সমুদ্রে নিমজ্জিত রহিয়াছে—সেইরূপ মধ্যবিত্তরা এক অন্ত (অর্থাৎ upper middle class) দ্বারা aristocracyকে এবং অন্য অন্ত (lower middle class) দ্বারা proletariatকে স্পর্শসংযোগ করিয়া সমাজের স্থিতিস্থাপক সাম্য রক্ষা করেন। Class conflict ও class struggleএর শত বাণী প্রচার করিলেও উচ্চ-মধ্য-নিম্নবিত্তের ত্রিগুণাত্মক ত্রিমূর্তি চিরকাল সমাজধর্ম ও সমাজগঠনের প্রতীক হইয়া রহিবে মনে হয়। Middle বা Secondary স্কুলের শিক্ষা তেমনি জাতির চরিত্র ও সামর্থ্যের অস্থি ও মজ্জা স্বরূপ। এই শিক্ষাকে যত দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া যত আলো-বাতাস-সার-জল দিয়া পুষ্ট করা যায়, সমাজপ্রগতি সূচক ভাল ফুল ফল তত বেশি উহাতে প্রসূত হয়। রহস্যচ্ছলে বলি—ভারতীয় দার্শনিক মতে প্রকৃতির ত্রিগুণাত্মক ক্রিয়ার সম্পূর্ণ সাম্য বা undisturbed equilibrium অবস্থায় জগৎ সৃষ্টি হয় না অর্থাৎ সৃষ্টি ক্রিয়া থাকে না বা লোপ পায়—কিন্তু

কোনও সৃষ্টি নাই, প্রকৃতির এমন অবস্থা কি বাস্তবে হইতে পারে? সুতরাং উহা একটা speculative hypothesis বা philosophical fiction মাত্র। অতএব class distinction, মানুষের মধ্যে শ্রেণীভেদে নানাবিষয়ক তারতম্য সমাজ-জীবনে অপরিহার্য; উহার বিলোপসাধন নয়, সকলের মধ্যে বিরোধ না ঘটাইয়া মৈত্রীস্থাপন, co-operational harmonyই অতএব কাম্য। "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম-বিভাগশঃ" এই শাস্ত্রবাক্য বোধহয় শুধু vested interested সংরক্ষণচেষ্টা বা conservativeness প্রসূতই নয়, বাস্তবজীবনের অভিজ্ঞতাজাতও হইয়া থাকিতে পারে।

আমাদের গরমদেশে সব ঘরবাড়ি-রেল-ট্রাম-বাস air-conditioned কবে হইবে জানি না (পাশ্চাত্যে অমন শীতকালে ঐসবেই heatingএর ব্যবস্থা থাকে)। এইরূপ অবস্থায় দুপুরের গরম ও ঘামের কষ্টের পরিবর্তে সব স্কুল-কলেজ সকালে—এবং residential হইলে বিকালেও কিছু সময়—হওয়া উচিত। ঋতু-অনুসারে সময় কিছু কিছু করিয়া আগাইয়া পিছাইয়া দিতে হয়। ইহাতে ক্লান্তি এবং অকারণে শক্তিক্ষয় কম হইবে। প্রত্যহ ৫ ঘণ্টা ক্লাস হইবে, প্রত্যেক periodএর পর interval, মধ্যকালে জলখাবারের আধঘণ্টা ছুটি; সর্বসমেত ছয় period class। গ্রীষ্মের ও পূজার লম্বা ছুটি তুলিয়া দেওয়া উচিত—বিলাতি স্কুলের দৃষ্টান্তে আমাদের দেশে গরমের ছুটির ব্যবস্থা হইয়াছিল কিন্তু বিলাতে গ্রীষ্মের দুই মাসই outdoor খেলাধূলা বেড়ান প্রভৃতি আমাদের অবসর হয়, বাকি সব মাস বৃষ্টি ঝড় মেঘ কুয়াসা বৃষ্টি বরফে indoor জীবনের অনুকূল। আমাদের দেশে উল্টা—শীতের দুইমাসই outdoor বেড়ান খেলা প্রভৃতির সময়। শীতের দুইমাস দুপুরে class হইবে, পড়ানর চাপ কমাইয়া উহাতে আধা-ছুটির ভাব করিয়া outdoor activityতে উৎসাহদান কর্তব্য (সারা বৎসরই সন্ধ্যাবেলায় ঘণ্টাদুয়েক লাইব্রেরি ল্যাবরেটারি workshop machineshop প্রভৃতি খোলা রাখিয়া শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের কাজ করিবার ব্যবস্থা কর্তব্য। আমাদের দেশের লোক একলা বসিয়া নির্জনে কাজ করিতে ভয় পায়, নিঃশব্দে কাজ করা বসিয়া কাজ করা অপমানজনক মনে করে। ইহার কারণ যে বাল্যের বদ অভ্যাস, গৃহপরিবারের বাতাবরণ ও দেশরীতিজনিত কতকগুলি মানসিক complexপ্রসূত তাহা শিক্ষকগণ মনস্তত্ত্ববিদদের কাছে সহজেই জানিতে পারিবেন। Teachers trainingএ মনস্তত্ত্ব ও মনোবিশ্লেষণ বিষয়ে শিক্ষকদের শিক্ষাদান কর্তব্য এবং এইবিষয়ে তাঁহাদের জন্য মধ্যে মধ্যে

refresher courseও হওয়া উচিত।

Primary ও Secondary উভয় শিক্ষার Syllabus ও Text book নির্ধারিত হইবে সরকারি শিক্ষা Board দ্বারা। Text book বিষয়ে কত দুরাচার হয় সকলেই জানেন। স্কুলের জলখাবার ছাত্ররা সঙ্গে আনিতে পারে কিন্তু school হইতেও co-operative প্রথায়—contractor দ্বারা নয়—সস্তায় পুষ্টিকর রুচিকর খাঁটি Tiffinএর ব্যবস্থা কর্তব্য, যাহার প্রস্তুতি ও বণ্টন শিক্ষক ও ছাত্রদের হাতেই থাকিবে। নানারূপ extra-curricular ও extra-mural কাজে ছাত্রদের উৎসাহ দান কর্তব্য। ইহাতে ও ক্লাসের শিক্ষায় social ও civic senseএর উপর দৃষ্টি যেন রাখা হয়, চাঁদা তুলিবার উৎসাহ দস্যুবৃত্তির প্রকারান্তর; অবিশ্রাম loud-speaker বাজান বর্বরভাবে আত্মপ্রচারক sadism; কোথাও queue না করিয়া ধাক্কাধাক্কি ও queue jumping গুণ্ডামি; ট্রামে-বাসে নিজের সীটে অপরকে বসিতে না দিবার চেষ্টা ছোটলোকি, লোকের যাতায়াতের পথ আটকাইয়া দাঁড়াইয়া গল্পগুজব বা হুড়াহুড়ি পশুত্ব—এইসব সম্বন্ধে চেতনার উদ্রেক আবশ্যক। Political indoctrination অপেক্ষা social ও civic বিষয়ক indoctrination অনেক শুভকর মনে করি।

শিক্ষারীতিতে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে home work জাতীয় exercise বাড়াইতে হয়। যাহা শিক্ষা দেওয়া হইল তাহা ছাত্ররা যত বেশি ব্যবহারে প্রয়োগ করিতে শিখে ততই শিক্ষাদান সার্থক হয়। শিক্ষকদের উপর অন্য কাজের ভার এইরূপ লঘু হওয়া উচিত যাহাতে তাঁহারা এই tutorial work সযত্নে পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনমত দোষত্রুটির উপর ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার যথেষ্ট সময় পাইতে পারেন। ইহাতেই ঠিক পড়াশুনার প্রকৃত ফল হয়।

প্রত্যেক secondary স্কুলে ছাত্রদের ছয় বৎসরের কাজকর্মের ফলাফল বেশ strictly বিবেচনা করিয়া যে-সার্টিফিকেট দিবেন তাহা দেখাইয়া পাশ-ছাত্ররা কলেজে ভর্তির অধিকারী হইবে—অবশ্য প্রত্যেক কলেজ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে নিজেরা পরীক্ষা করিয়া ছাত্র ভর্তি করিবেন। ইহাছাড়া সরকারি Secondary Education Board নিজস্ব পরীক্ষার আয়োজন করিবেন। যে-ছাত্ররা কোনও স্কুলে ভর্তি হইবে না বা হইতে পারিবে না তাহারা প্রাইভেট টিউটারের কাছে পড়িয়া Boardএর Test পরীক্ষার পর (Standard যেন Schoolএর পরীক্ষা অপেক্ষা কদাপি নিচে না হয়) Finalএ পাশ করিলে কলেজে ভর্তি হইতে পারিবে। স্কুলের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণরাও Board পরীক্ষা দিতে পারিবে

কিন্তু দুইবার ফেল করিলে কেহই আর পরীক্ষা দিতে পারিবে না। সব স্কুলে অভিভাবক ও শিক্ষকদের ইচ্ছা হইলে কিছু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিতে পারে। দেশাত্মবোধের শিক্ষা সদা দাতব্য। সর্ববিধ Secondary শিক্ষায় মাতৃভাষা, practical English, ইতিহাস ও ভূগোল Compulsory হওয়ার কথা আগেই বলিয়াছি।

৮

কলেজের শিক্ষা বা Higher Education গবর্মেণ্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট Syllabus অনুযায়ী হওয়া উচিত। ভর্তির মালিক হইবেন কলেজ নিজে। পরীক্ষাও করা হইবে University দ্বারা নয় State Higher Education Board দ্বারা। কলেজের attendance percentage তুলিয়া দিতে হইবে, যাহার ইচ্ছা আসিবে ইচ্ছা না হয় আসিবে না কিন্তু আসিয়া কোনও অবাঞ্ছনীয় আচরণ করিলে দণ্ডিত বা চিরতরে বহিষ্কৃত হইবে। পরীক্ষার Standard বেশ উঁচু রাখিতে হইবে। কোনও সরকারি চাকুরির জন্য কাহারও graduate হইবার আবশ্যক নাই, প্রত্যেক প্রকার চাকুরির জন্য গবর্মেণ্ট ভিন্ন স্বতন্ত্র পরীক্ষা করিবেন। স্কুল বা Secondary Boardএর পরীক্ষায় পাশ করিলে সকলেই তাহাতে appear হইতে পারিবে। Universityর নিজেরও Graduation পরীক্ষা থাকিবে, Post-Graduate পড়িতে হইলে তাহাতে পাশ করিতে হইবে। যাহারা P. G. পড়িবে না তাহারাও এই পরীক্ষা দিতে পারিবে। যাহারা Secondary শিক্ষার পর জীবিকার্জনে যাইবে তাহারা যদি Graduation পড়িতে চায় তবে তাহাদের জন্য সান্ধ্য কলেজ থাকা উচিত। Master's Degree ও ডক্টরেট সংক্রান্ত শিক্ষা ও পরীক্ষাদি সম্পূর্ণ Universityর অধীনে থাকিবে। যতদিন উচ্চ শিক্ষিতদের জীবিকার্জনের নানা পথ প্রসারিত না হয় ততদিন উচ্চ শিক্ষাদানের কোনও সার্থকতা না থাকায় তাহাতে কেহ আগ্রহবান হইবে না, কিন্তু ঐবিষয়ক চিন্তা ও ব্যবস্থা শিক্ষাব্রতীদের নয়, অন্য দেশনেতৃবৃন্দের কর্তব্য। প্রত্যেক কলেজকে গবর্মেণ্ট দ্বারা recognised হইতে হইবে।

Undergraduate ছাত্রদের কিছু কিছু part-time কাজ করিয়া অর্থার্জনের দ্বারা নিজনিজ শিক্ষাব্যয় আংশিক বহন করা উচিত। শিক্ষার জন্য গবর্মেণ্টকেও অবশ্য বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে—যে-দেশ যত উন্নতিকামী সে-দেশে শিক্ষাকার্যে সরকারি দান তত বেশি। যাবতীয় প্রকারের শিক্ষালয়ে শান্তি ও শোভনীয়তা রক্ষা করা শুধু শিক্ষালয় কর্তৃপক্ষের নয়, গবর্মেণ্টেরও কর্তব্য—"রাজরক্ষিতব্যানি

হি তপোবনানি নাম"—শিক্ষালয়ই এইযুগের তপোবন। Recognised কলেজ ছাড়া Unrecognised Coaching Institutionএও Graduation-এর জন্য পড়া যাইতে পারিবে।

যাহা বলিলাম তাহা অনেকের কাছে হয়তো utopian মনে হইতে পারে। তাঁহারা নিজনিজ প্রস্তাব প্রকাশ করিলে ভাল হয়। যাহা বলিয়াছি তাহা শিক্ষকসমাজের বিবেচনার জন্যই, তাহাতে lacuna যাহা যাহা রহিল তাহা তাঁহারাই পরিপূরণ করিতে পারিবেন কারণ কি অভিপ্রায়ে কি বলিয়াছি তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। চিরকাল বা দীর্ঘকালের জন্য কিছু বলি নাই, যাহা বলিলাম তাহা বৎসর পাঁচেক পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

পরিশেষে আরও একটা বিষয় যোগ করা অতি-আবশ্যক মনে করি। Undergraduate কলেজের ছাত্ররা এবং P.G. প্রভৃতি উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্ররাও যৌবনোচিত আগ্রহ ও উৎসাহে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আদর্শ বা কর্মের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইবে ইহাতে আশ্চর্য কিছু নাই, সক্রিয়ভাবে তাহাতে যোগ দেওয়া না দেওয়াও তাহাদের নিজ দায়িত্ব। কিন্তু সে ক্রিয়াশীলতার ক্ষেত্র হইবে দলগত রাজনীতিচর্চার নিজনিজ পীঠভূমি, শিক্ষায়তনে নয়। শিক্ষালয়ে কোনও প্রকার দলগত রাজনৈতিক ক্রিয়ার—যদি তাহা নিতান্ত academic natureএর না হয়—পীঠস্থান হওয়া অবাঞ্ছনীয়, সুতরাং উহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। ছাত্রদের Unionএও শুধু academic জীবনের ছাত্রমঙ্গল বিষয়ক ছাড়া কোনও প্রকার দলীয় রাজনীতির আমদানি হইলে সে Unionকে শিক্ষালয়-কর্তৃপক্ষ ও গবর্মেণ্ট উভয়েরই শাসন করা কর্তব্য। Street urchin হইতে আরম্ভ করিয়া সকল উচ্চগ্রামের ছাত্রদের দ্বারা দলগত স্বার্থবুদ্ধির প্রচেষ্টায় আমাদের রাজনৈতিক নেতারা ছাত্রদের তথা সমাজের মহা অনুপকার সাধন করিয়াছেন মনে করি।

Graduation পরীক্ষায় কোনও বিষয় compulsory থাকার প্রয়োজন নাই। যে-কোনও তিনটি বিষয়—তাহার মধ্যে ইংরেজী ও মাতৃভাষাও থাকিতে পারিবে, সবই অবশ্য high standardএ পাঠ্য হইবে! প্রত্যেক চাকুরি সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় high standardএ practical ও মাতৃভাষার test থাকা ভাল।

ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেনের মতামত একান্তভাবে তাঁরই নিজের। এই বিতর্কমূলক রচনাটির বিষয়ে পাঠকদের সুচিন্তিত আলোচনা আহ্বান করছি। সম্পাদক, পরিচয়।

বিদ্যাসাগর ঃ দেড়শ বছর পরে

গোপাল হালদার

১৩৬৭ বঙ্গাব্দে ৩১এ শ্রাবণ কনিষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা এক চিঠিতে বিদ্যাসাগর ঘোষণা করেছিলেন, 'বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম।' তিনি বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করেই ক্ষান্ত থাকেননি, একমাত্র পুত্র নারায়ণকে বিধবা-বিবাহ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা করেছিলেন। ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র দাদাকে এই বিবাহে বাধা দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কারণ এরপরে বন্ধু এবং আত্মীয়েরা সামাজিকভাবে তাঁদের একঘরে করতে পারেন। বিদ্যাসাগর সেই অনুরোধের জবাবেই এই চিঠিটি লিখেছিলেন। তিনি এই চিঠিতে আরো বলেছিলেন, "আমি বিধবাবিবাহের প্রবর্ত্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমনস্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না, ভদ্র সমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর চরিত্রে 'যে অজেয় পৌরুষ এবং অক্ষয় মনুষ্যত্ব' লক্ষ্য করেছিলেন উপরোক্ত চিঠিটি তারই উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এখানে তাঁর নিজস্ব কার্যকলাপ এবং মূল্যবোধ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের নিজস্ব মতামতেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগরের জীবন ও কার্যকলাপকে আমরা প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি, (১) সামাজিক সংস্কার—(ক) বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, (খ) বহুবিবাহের বিরোধিতা, (গ) স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন। (২) শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যাবলী—(ক) সংস্কৃত কলেজে গঠনমূলক কার্যকলাপ, (খ) শিক্ষার মাধ্যম এবং শিক্ষার জন্য কি কি ভাষা শিখতে হবে সেই সম্পর্কে চিন্তা, (গ) লোকশিক্ষার প্রসার, (ঘ) স্কুল এবং কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং সেগুলির পরিচালনা। (৩) সাহিত্য সৃষ্টি—(ক) উদ্দেশ্য (খ) গদ্যরচনার প্রতিভা।

সামাজিক সংস্কার

(ক) বিধবা বিবাহ

১৮৫৬ সালের ২৫ নং ধারায় হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইনসম্মতভাবে ঘোষিত হোলে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাসে এটি বৃহত্তম সাফল্য বলে গণ্য হলো। একে কেন্দ্র করে একদিকে রক্ষণশীলদের আপত্তি এবং ঘৃণা অপরদিকে মুষ্টিমেয় প্রগতিশীল হিন্দুর কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা বিদ্যাসাগরের উপর সমভাবে বর্ষিত হয়েছিল। ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিবারণও এ-রকম আলোড়নের সৃষ্টি করতে পারেনি। এমন কথাও শোনা যায় যে বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তনের ফলে সিপাহীকুল এবং রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে অবিশ্বাস ও সন্দেহের আভাস দেখা যায় তা ১৮৫৭-৫৮ সালের সিপাহী বিদ্রোহে অন্যতম ইন্ধন যুগিয়েছিল। এবং সমসাময়িক কালের সাক্ষ্যে দেখা যায় বিদ্যাসাগর এবং রাজনারায়ণ বসুর মতো যাঁরা বিধবাবিবাহে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন বিদ্রোহী সিপাহীদের হাতে তাঁদের জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল।

অবশ্য এ-কথা ঠিক যে এ-ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের পূর্বেও কিছু কিছু আন্দোলন ও রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ১৮৪২ সালে 'ইয়ং বেঙ্গলে'র মুখপত্র 'The Bengal Spectator'এ বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি জানানো হয় এবং 'পরাশর সংহিতা'র সেই বিখ্যাত উদ্ধৃতিটি তুলে বিধবা-বিবাহের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। এই উদ্ধৃতিটি পরে বিদ্যাসাগরের হাতে শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৮৫৫খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের প্রথম আবির্ভাব। এই পত্রিকাতেই বিদ্যা-সাগরের দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় আরও একমাস পরে। এই দুটি প্রবন্ধই পরে প্রচারের জন্য পুস্তিকা হিসাবে বের করা হয়। ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর বাবা ও মায়ের সম্মতি যোগাড় করেছিলেন এবং রক্ষণশীল হিন্দুদের যুক্তি ও তর্ক দিয়ে পরাভূত করবার জন্য হিন্দুশাস্ত্র থেকেই বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে উদ্ধৃতি ও প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব, শক্তি এবং দৃঢ়তা নিয়ে শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতির বলে বলীয়ান হয়ে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীকে এবং দেশীয় সমাজকে প্রভাবিত করার জন্য কাজে নামলেন। পুস্তিকার পর পুস্তিকা প্রকাশিত হতে লাগল এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ও পালটা আক্রমণ

হানতে লাগলেন। ঈশ্বর গুপ্ত এবং দাশরথি রায়ের মতো কবিরা বিদ্যাসাগরের সমর্থনে কবিতা ও গান রচনা করলেন এবং কৃষ্ণনগরের তাঁতিরা তাঁদের বোনা শাড়ির ওপর বিধবা-বিবাহ বিষয়ক গান বুনে দিতে লাগলেন। এইরকম উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে ১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর, 'ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা' স্বাক্ষরিত একটি আবেদনপত্র সরকারের কাছে জমা পড়ল। এতে সরকারকে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যাপারে সমস্ত বাধা অপসারণের জন্য আইন করতে অনুরোধ করা হলো। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের বাকি অংশেও এই আন্দোলন সাড়া ফেলে দিয়েছিল। মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণ-ভারতের এক প্রভাবশালী অংশ বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করলেন কিন্তু বিরোধীদের সংখ্যা ছিল অগণ্য। আর সমস্ত বাঙলাদেশ তখন ঝড়ের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে ; বিধবা-বিবাহের পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রায় ৫০০০০ স্বাক্ষর সমন্বিত ২০টি আবেদনপত্র জমা পড়েছিল। অন্তত ১০০টি প্রচারপুস্তিকা ও আবেদনপত্র জনসমক্ষে প্রচার করা হয়েছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে জনসাধারণের শতকরা ১০ ভাগের বেশি লোকের সমর্থন বিদ্যাসাগর পাননি। কিন্তু তাঁর সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন নদীয়ার মহারাজা এবং বৈষ্ণব পণ্ডিতদের মতো শাস্ত্রবিশারদেরা। বিদ্যাসাগরের জীবনে এই অধ্যায়টি আসলে 'জয়লাভের মধ্যে পরাজয়' হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। তিনি তাঁর সমস্ত প্রভাব ও শক্তি বিস্তার করে বিধবা-বিবাহ আইনসম্মত হওয়ার পর বিবাহযোগ্য তরুণ-তরুণীদের এ-ব্যাপারে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর সমস্ত বন্ধু এবং সমর্থকদের বিধবা-বিবাহে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রাধানাথ রায়ের মতো যাঁরাই এ-ব্যাপারে আপত্তি করেছেন তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর নিজের থেকে এ-জাতীয় বিবাহের খরচা যুগিয়েছেন। বর-বধূকে উপহার দিয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই বরপক্ষ কন্যাপক্ষের কাছে যে-সব গহনা দাবি করেছিল সেগুলি নিজেই কিনে দিয়েছেন। একবার যখন এই বদান্যতার কথা প্রচারিত হয়ে গেল তখন আর বিদ্যাসাগর এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাননি। তাঁকে ঋণ করে বিধবা-বিবাহ দিতে হয়েছে। এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা প্রায়ই জোচ্চোর ও ঠগেরা তাঁর এই মহানুভবতার সুযোগ নিয়েছে। টাকা-পয়সা নিয়ে বিধবা-বিবাহ করবার পর অনেক ক্ষেত্রেই নব-বিবাহিত যুবক তার বধূকে বিদ্যাসাগরের জিম্মায় ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে। যখন ভেতর থেকে এ-জাতীয় আক্রমণ আসছিল তখন বাইরে থেকে রক্ষণশীল সম্প্রদায় এই বিবাহ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যাসাগরের ওপর এবং সাধারণ

ভাবে সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের ওপর আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করছিল। প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর—পাত্র ছিলেন সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগরের সহকর্মী শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। সমসাময়িক কালের সংবাদপত্র-গুলিতে দেখা যায় যে কলকাতায় এই প্রথম বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠান কালে কি জাতীয় চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের শত্রুরা তাঁকে লাঞ্ছনা ও প্রহার করবার জন্য গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছিলেন, এমনকি তাঁর জীবনও বিপন্ন হতে বসেছিল। কিন্তু এ-সমস্তই বিদ্যাসাগরকে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুলেছিল এবং কিছুতেই তিনি আত্মসমর্পণ করতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ঘটনাস্রোত পরিবর্তিত হতে শুরু করল। বিধবা-বিবাহ বিদ্যাসাগরকে নৈরাশ্য ও ঋণের বোঝায় জড়িয়ে ফেলছিল। তাঁর বন্ধু ও সমর্থকেরা ক্রমশই সরে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর ঋণের বোঝা ক্রমশই বেড়ে চলছিল। এই জাতীয় বন্ধুদের সম্পর্কে তিনি যে কতখানি হতাশ হয়েছিলেন তা প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ডঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটা চিঠিতে জানা যাবে, "আমি ক্রমাগত কয়েকদিনই চেষ্টা দেখিলাম. কিন্তু তোমার কাগজ খোলসা করিয়া দিবার উপায় করিতে পারিলাম না। তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত তোমার কাগজ লই নাই। বিধবাবিবাহের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে লইয়াছিলাম, কেবল তোমার নিকট নহে অন্যান্য লোকের নিকট হইতেও লইয়াছি। এ সকল কাগজ এই ভরসায় লইয়াছিলাম যে, বিধবাবিবাহপক্ষীয় ব্যক্তিরা যে সাহায্য দান অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা অনায়াসে পরিশোধ করিতে পারিব। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই অঙ্গীকৃত সাহায্য দানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। সেই সকল ব্যক্তি অঙ্গীকার প্রতিপালন করিলে, আমাকে এরূপ সংকটে পড়িতে হইত না।…এইরূপে আয়ের অনেক খর্ব্বতা হইয়া আসিয়াছে কিন্তু ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিয়াছে সুতরাং এই বিষয় উপলক্ষে যে ঋণ হইয়াছে তাহার সহসা পরিশোধ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।…আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্ব্বে জানিলে, আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না।…" (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর, পৃষ্ঠা ২৮৬-৮৭)।

অবশ্য এই হতাশা সত্ত্বেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে গেছেন এবং যাঁদেরই বিদ্যাসাগরের চরিত্র সম্পর্কে ধারণা আছে তাঁরাই জানেন যদি তিনি প্রথম থেকেই বন্ধুদের অপদার্থতার কথা বুঝতে পারতেন তাহলেও

তিনি এই কাজ থেকে বিরত হতেন না। অবশ্য বিশেষ করে বাঙালি অভিজাত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিবারের লজ্জাজনক নিরপেক্ষতা এবং বিধবা-বিবাহের ব্যাপারে জড়িত লোকদের চারিত্রিক দৈন্য তাঁকে মানসিকভাবে প্রায় বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। শেষ জীবনে তাঁর প্রকাশন ব্যবসার ক্রমবর্ধমান আয় থেকে তিনি তাঁর সমস্ত ঋণ শোধ করতে পেরেছিলেন বটে কিন্তু আমাদের ভদ্র সমাজের আচরণ সম্পর্কে নৈরাশ্যজনক অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের মহত্তের প্রতি তাঁর বিশ্বাস শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

(খ) বহুবিবাহের বিরোধিতা

বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আন্দোলন অন্তত আংশিকভাবে সফল হয়েছিল এবং আইনের স্বীকৃতিও পেয়েছিল। কিন্তু 'কৌলিন্যপ্রথা' এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তা এমনকি আইনের স্বীকৃতিও পায়নি। বহুবিবাহ ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। কিন্তু বাংলা দেশে বিশেষ করে অভিজাত বাঙালি ব্রাহ্মণদের মধ্যে কৌলিন্যপ্রথার নামে এটি একটি বীভৎস ও ঘৃণ্যরূপ ধারণ করেছিল। এই আইনের ফলে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কন্যার সঙ্গে সেই গোষ্ঠীরই পুরুষের বিবাহ দিতে হবে এবং সে-রকম পাত্রের সন্ধান না পাওয়া গেলে কন্যাকে আজীবন অবিবাহিত থাকতে হবে; তথাপি অন্য কোথাও তার বিবাহ দেওয়া যাবে না। এর ফলে কুলীন ব্রাহ্মণেরা অজস্র অর্থ নিয়ে বৃদ্ধা থেকে বালিকা পর্যন্ত বিভিন্ন বয়সের মেয়েদের বিবাহ করে বেড়াত। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায় এবং 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায়ই সর্বপ্রথম প্রতিবাদ জানান।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকেই সর্বপ্রথম কৌলিন্যপ্রথার একটি জীবন্ত এবং বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়। এবং এই নাটকের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে যে সে-যুগের জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে কৌলিন্যপ্রথাকে অপছন্দ করতে আরম্ভ করেছিল। ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তনের ফলে বিদ্যাসাগর একই পদ্ধতিতে বহুবিবাহ প্রথার বিলোপ সাধন করতে চাইলেন। ১৮৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করবার জন্য প্রথম প্রতিনিধিদল সংগঠিত করেন। জনগণের স্বাক্ষর সমন্বিত একটি আবেদনপত্রও তৎকালীন গভর্নর জেনারেলের কাছে পাঠানো হয়। সরকারী পক্ষ থেকে একটি বিল আনার প্রতিশ্রুতিও এই মর্মে দেওয়া হয়। কিন্তু

১৮৫৭-৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহ বৃটিশ শাসকদের এদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় আচরণগুলির সংস্কার সাধনে নিরুৎসাহী করে। অবশ্য সরকারের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর নিরুদ্যম হলেন না। তিনি পুনরায় লেখনী ধারণ করলেন এবং তাঁর বিধবা-বিবাহ বিষয়ক রচনার ১৫ বছর পরে ১৮৭১ সালে বহুবিবাহের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম বাঙলা প্রবন্ধ লিখলেন। দ্বিতীয় রচনাটি বেরুল ১৮৭৩ সালে। এছাড়া তিনি অন্তত আরও ৫টি বেনামী রচনা লিখেছিলেন। ব্যঙ্গরচনার এগুলি ছিল অপূর্ব নিদর্শন। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীকেও তিনি এর দ্বারা প্রভাবিত করতে পারলেন না আবার জাতীয় ভাবধারাকে তিনি উদ্বোধিত করতেও সমর্থ হলেন না। কারণ, 'বিদেশীদের বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা অনুষ্ঠিত সংস্কারের' বিরোধী মনোভাব তখন সারা দেশে দেখা গিয়েছিল। অবশ্য বিদ্যাসাগর তাঁর দেশের লোকের এইজাতীয় মনোভাবের সঙ্গে একমত ছিলেন না এবং এই ব্যর্থতা তাঁর দেশের লোকের আন্তরিকতা সম্পর্কে তাঁর মনে আরও সন্দেহ জাগিয়ে তুলল।

(গ) স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তন

সামাজিক পশ্চাদমুখীনতা দূর করবার জন্য অগ্রসর হয়ে বিদ্যাসাগর লক্ষ্য করেছিলেন যে যে-কোনো সংস্কারের জন্য দুটি মূল জিনিষ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রথমত এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত আইনের সাহায্যে অন্যায় কুসংস্কারগুলি দূর করতে হবে। সুতরাং প্রথম থেকেই স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে তিনি সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে ছিল, বেথুন স্কুলের দক্ষ সম্পাদক হিসেবে তাঁর কার্যকলাপ (ডিসেম্বর ১৮৫০ থেকে মার্চ ১৮৬৯), বিদ্যালয় সমূহের সহকারী পরিদর্শক (১৮৫৭-৫৮) হিসেবে গ্রামে গ্রামে বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বীরসিংহ গ্রামে নিজের ব্যয়ে বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা এবং মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁর সারা জীবনব্যাপী আগ্রহ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চন্দ্রমুখী বসু প্রথম মহিলা হিসেবে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোলে বিদ্যাসাগর তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে যে-চিঠি লিখেছিলেন তাতেই তাঁর এই আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যাবে। গ্রামে গ্রামে বালিকাদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মনোমালিন্য দেখা যায় এবং এরই ফলে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যালয় সমূহের সহকারী পরিদর্শকের পদ পরিত্যাগ করেন।

এ-কথা ঠিক যে খৃষ্টান মিশনারীরাই সর্বপ্রথম কলকাতা এবং তার আশে-পাশের অঞ্চলে স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা করেন। রাজা রাধাকান্ত দেব ১৮২৯ সালে শোভাবাজার রাজবাড়িতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। স্যার জে. এস. ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন যখন তৎকালীন শিক্ষাকমিটির সভাপতি ছিলেন তখন ১৮৪৯ সালের ৭ই মে তিনিই 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুলে'র প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তার পরেই সরকারের পক্ষ থেকে এ-ব্যাপারে উৎসাহ দেখানো শুরু হয়। ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারে এই বিদ্যালয়ের নাম রাখা হয় বেথুন স্কুল। স্যার ড্রিঙ্কওয়াটার তাঁর স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্তনের কাজে 'ইয়ং বেঙ্গল' (বিশেষ করে দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী) এবং বিদ্যাসাগর ও তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সমর্থন লাভ করেছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের মতামত এবং যোগ্যতা জানতেন এবং তাঁকেই ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর বিদ্যালয়ের সম্পাদক হবার জন্য আহ্বান জানালেন। বেথুন জানতেন যে বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কোনো লোকই সমাজের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সমস্ত বাধা বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করে স্কুল পরিচালনা করতে পারবেন না। কয়েকমাসের মধ্যেই বেথুন মারা গেলেন কিন্তু ইতিমধ্যেই ডালহৌসির শাসনাধীনে ভারত সরকার এই স্কুলকে আনুকূল্য দেখাতে শুরু করেছিলেন এবং বিদ্যাসাগর ১৮৬৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত প্রায় ১৯ বছর ধরে এর সম্পাদকপদে আসীন ছিলেন। অবশ্যই এইসময় বেথুন স্কুলের উন্নতি ও অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। এবং বিদ্যাসাগর তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় হিন্দুদের মন থেকে প্রাচীন এবং রক্ষণশীল ধারণাগুলি দূর করবার চেষ্টা করেছিলেন। যখন বেথুন স্কুলকে মহিলা শিক্ষকদের শিক্ষণ বিদ্যালয়ে পরিণত করবার কথা উঠল তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বিদ্যাসাগর সম্পাদকের পদ ত্যাগ করলেন। কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে বাঙলার তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় কোনো বয়স্কা তরুণী এই শিক্ষণ বিদ্যালয়ে ছাত্রী হিসাবে ভর্তি হবে না। বিদ্যাসাগরের এই আশঙ্কাই যথার্থ হয়েছিল এবং ১৮৭২ সালে এই পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়। পদত্যাগ করা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুলকে যে দৃঢ়ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে যান তারই ফলে এটি বাঙলাদেশের প্রথম মহিলা কলেজ হিসেবেও উন্নীত হয় এবং যখন প্রথম দুজন মহিলা ছাত্রী কাদম্বিনী বসু (পরে গাঙ্গুলী) এবং চন্দ্রমুখী বসু ১৮৭৮ সালে এই বিদ্যালয় থেকে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং যখন তাঁরা দুজনেই ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহিলা স্নাতক হবার সম্মান অর্জন করেন তখন বিদ্যাসাগর তাঁদের সাদর

অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রমুখী বসু ইংরেজিতে M. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অসুস্থ বিদ্যাসাগর সেক্সপীয়ারের রচনা পাঠিয়ে অভিনন্দন জানান। বস্তুত সেই নৈরাশ্য এবং অসুস্থতার মধ্যে এই সাফল্য তাঁর মনে বিপুল আশার সঞ্চার করেছিল। অন্তত তাঁর একটি প্রচেষ্টা যে সাফল্য লাভ করেছিল এতে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। এইদিক দিয়ে বিচার করলে বিনয় ঘোষের এই মন্তব্য যথার্থ বলেই মনে হয় যে, "স্ত্রীলোকদের অধিকার অর্জন করার সংগ্রাম অপেক্ষা কোনো বস্তুই বিদ্যাসাগরের কাছে প্রিয়তর বা মহত্তর ছিল না এবং স্ত্রীলোকের অধীনতার বিরুদ্ধে তিনি নির্ভীকভাবে যে-সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন আর কোথাও তিনি সেভাবে চালাননি।"

শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যাবলী

বিদ্যাসাগর তাঁর জীবনের অনেক ক্ষেত্রে চূড়ান্ত জয়লাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের কৃতিত্ব তাঁর নিশ্চয়ই পাওয়া উচিত। সারা জীবন ধরেই তিনি শিক্ষা বিস্তারকে তাঁর অন্যতম আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। এবং তাঁর সমস্ত কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে একজন শিক্ষাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

(ক) পরিচালন দক্ষতা

সে-সময়ে বাঙালিদের সাধারণত কোনো শাসনভারের দায়িত্ব বিশ্বাস করে দেওয়া হতো না, অবশ্য এখনও তাঁদের এ-ব্যাপারে তেমন কোনো খ্যাতি নেই। বিদ্যাসাগর একের পর এক চাকরি ছেড়েছেন এবং অনেক সময়েই 'দলবদ্ধ'ভাবে কাজ করতে অসমর্থ হয়েছেন। কিন্তু একজন পরিচালক হিসেবে তাঁর দক্ষতার প্রশংসা না করে উপায় নেই। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে, বিদ্যালয় সমূহের সহকারী পরিদর্শক হিসেবে, বেথুন স্কুল অথবা নিজের 'মেট্রোপলিটন স্কুল এবং কলেজ', অতুলনীয় দক্ষভাবে পরিচালনায় অথবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্যান্য যে-সমস্ত সংগঠনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন (যেমন 'হিন্দু ফ্যামিলি এ্যান্যুয়িটি ফাণ্ড', অথবা 'দুর্ভিক্ষ পীড়িত কিংবা রুগ্নদের সাহায্য করার প্রতিষ্ঠান') সেগুলির পরিচালনায় তিনি তাঁর যোগ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। এবং প্রত্যেকেই এ-কথা অনুভব করতে পারবেন যে কর্তৃপক্ষ এবং সহকর্মীদের শৈথিল্য, সঙ্কীর্ণতা এবং নির্বুদ্ধিতাই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষের জন্য

প্রধানত দায়ী। এ-ব্যাপারে তাঁর ব্যক্তিত্ববোধ এবং দৃঢ়তাকে অথবা ঠাকুর্দার কাছ থেকে তিনি যে 'এঁড়ে' মনোভাব পেয়েছিলেন তাকে খুব বেশি দায়ী করা চলে না। তাঁর শক্তি, সাহস, দৃঢ়তা, পরিপূর্ণ সততা এবং কাজ করার ব্যাপারে অপরিসীম দক্ষতার দ্বারা তিনি সংস্কৃত কলেজের মতো একটি গোলমেলে প্রতিষ্ঠানকে আধুনিক জ্ঞানদানের উপযোগী একটি আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পেরেছিলেন; হ্যালিডের জনপ্রিয় শিক্ষা পরিকল্পনাকে অবিশ্বাস্য-রূপে কম সময়ের মধ্যে দেশীয় ও বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে তিনি সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন এবং একটি মৃতকল্প বিদ্যালয়কে প্রথমে একটি সুপরিচালিত বিদ্যালয় এবং পরে তাকে প্রথম বেসরকারী ভারতীয় কলেজে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই কলেজটি মেট্রোপলিটন কলেজ নামে পরিচিত ছিল (বর্তমানে এর নাম বিদ্যাসাগর কলেজ)। এই কলেজের জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন। এমনকি অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে এর শিক্ষাদান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতেন। ছাত্রদের তিনি সুশৃঙ্খল করে তুলতে পেরেছিলেন এবং ব্যক্তিগত স্নেহ-ভালবাসার দ্বারা তাঁদের সমমর্মী হয়ে উঠেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো খ্যাতিমান শিক্ষকদের তিনি নিযুক্ত করেছিলেন এবং সতর্ক ভালবাসা ও দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁদের সেইযুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকে পরিণত করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তাঁর কলেজ সে-যুগের একটি শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল এবং ভবিষ্যৎকালে অনেক বাঙালি জননায়কের সৃষ্টি এখান থেকেই হয়। শাসন পরিচালনার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের দক্ষতার এ-হলো এক উৎকৃষ্টতর প্রমাণ এবং তাঁর এই যোগ্যতার কথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে।

(খ) শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনা

আমাদের এ-কথা মনে রাখতে হবে যে বিদ্যাসাগর গতানুগতিক পথের পথিক ছিলেন না এবং উদ্দেশ্যহীন কোনো কাজও তিনি করতেন না। তিনি যখনই যা কিছু করতেন তার পিছনে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং কর্মসূচী থাকতো। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে যখন তিনি যোগ দেন তখন থেকেই আমরা সমগ্র শিক্ষাজগতের জন্য তাঁর পরিকল্পনার পরিচয় পাই। আমাদের শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি কিরকম হবে সে-নিয়ে তিনি গভীর চিন্তা করেছেন। গ্রামের মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নতুন পদ্ধতির কথা তিনি ভেবেছেন এবং জ্ঞানকে প্রকৃত ফলপ্রসূ করবার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন।

(গ) শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং প্রয়োগপদ্ধতি

১৮৪৬ সালে ৩রা মে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদত্যাগ করার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি যে চিঠি লেখেন তাতেই তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার যে-সমস্ত সংস্কার সাধন করতে চেয়েছিলেন তা হলো, "সংস্কৃত এবং ইংরেজী শিক্ষাবিষয়ে গভীর দক্ষতা অর্জনের জন্য ব্যবস্থা করা এই জাতীয় শিক্ষার ফলে যাঁরা শিক্ষিত হয়ে উঠবেন তাঁরা আমাদের মাতৃভাষার সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতাকে মিলিয়ে দেবার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হবেন" (বিনয় ঘোষ ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৯)

প্রকৃতপক্ষে এখানেই বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসম্পর্কিত ভাবধারার মূল আদর্শটি বিবৃত হয়েছে। তখন বিদ্যাসাগরের বয়স মাত্র ২৫ অথচ তখনই তিনি সংস্কৃত এবং ইংরেজী শিক্ষাকে মেলাতে চাইছেন, মাতৃভাষাকে শিক্ষার উপযুক্ত বাহন করতে চাইছেন এবং শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতার ওপর জোর দিতে চাইছেন। অর্থাৎ আমরা যাকে 'আধুনিক জ্ঞান' বলি বিদ্যাসাগর এখানে তার কথাই বলেছেন। বিদ্যাসাগর অনুভব করেছিলেন যে ভারতীয় সমাজের আধুনিকীকরণের জন্য আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ১২ই এপ্রিল তারিখের 'সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কিত বক্তব্যে'র মধ্যে দেখা যাবে যে বিদ্যাসাগর 'যোগ্য' ব্যক্তিদের 'ইউরোপীয় উৎস স্থল' থেকে শিক্ষাসম্পর্কিত মাল-মশলা আহরণের জন্য বলছেন এবং সেগুলি যে 'সুচারু, প্রকাশযোগ্য এবং প্রবচনমূলক বাঙলা ভাষায়' প্রকাশযোগ্য করে তুলতে হবে তাও বলেছেন। এটাই ছিল বিদ্যাসাগরের শিক্ষাসম্পর্কিত পরিকল্পনার মূল আদর্শ। সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এই সংস্কৃত পণ্ডিতের ইংরেজী শিক্ষার বৈপ্লবিক ভূমিকা সম্পর্কে 'ইয়ংবেঙ্গল' এবং হিন্দু কলেজের বিদ্রোহী ছাত্রদের অপেক্ষাও অনেক বেশি স্পষ্ট ধারণা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম ভারতের জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে ঘোষণা করেছিলেন—মাতৃভাষাই একমাত্র বাহন হবে।

(ঘ) পরিকল্পনা ও কর্মসূচী

যেহেতু আমাদের আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি তখনও পর্যন্ত পাশ্চাত্য ভাষা থেকে আধুনিক জ্ঞান আহরণের যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি সেই কারণে

বিদ্যাসাগর ভাষাকে তৈরি করবার জন্য এক বিস্তৃত পরিকল্পনা রচনা করলেন। সংস্কৃত ভাষা ভাল করে শিখলে বাঙালি মাত্রেই বাঙলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পাবে এবং মাতৃভাষার মর্যাদাও তারা উপলব্ধি করতে পারবে। দ্বিতীয়ত একই সঙ্গে এই সমস্ত শিক্ষার্থীরা ইংরেজী ভাষাও শিখবে যাতে তারা আধুনিক জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, এবং এই ভাবেই ভাষা শিক্ষা হলেই মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সমৃদ্ধ করা সম্ভব। 'সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কিত' ঐ বক্তব্যে বিদ্যাসাগর আরও বলেছেন 'যাঁরা সংস্কৃতে দক্ষ নন তাঁদের পক্ষে সুচারু, প্রকাশযোগ্য এবং প্রবচনমূলক বাঙলারীতি' আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

এটা পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় যে মাতৃভাষা যেই মুহূর্তে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্বাভাবিক বাহন হয়ে উঠবে, সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা ততই ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু ইংরেজী যেহেতু অধিকতর উন্নত ভাষা এবং বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে জানার জন্য যেহেতু এই ভাষার একান্ত প্রয়োজন, সেই কারণেই এই জাতীয় ত্রিভাষামূলক শিক্ষা পরিকল্পনায় ইংরেজীর স্থান নির্দিষ্ট হবে মাতৃভাষার পরে। আজকের দিনে এ-কথা বেশ জোর দিয়েই বলা যায় যে আধুনিককালের উপযোগী ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরেরই সর্বপ্রথম একটি পরিষ্কার ধারণা ছিল। ভারতবর্ষের শিক্ষাজগতের ভাষা সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি চেষ্টা করে ছিলেন এবং যদি তাঁর পরিকল্পনা কার্যকরী করবার সুযোগ তিনি পেতেন তাহলে হয়তো এই ত্রিভাষা সূত্র কিছুটা সংশোধনসহ আজকের দিনেও গ্রহণযোগ্য হতো।

১৮৪০ সালের পূর্ব পর্যন্ত কলকাতায় এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলসমূহের মধ্যে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত ছিল। ইংরেজী ছিল এই শিক্ষার মাধ্যম এবং সংস্কৃত পড়ানো হতো টোলে। কিন্তু মাতৃভাষা কিংবা আধুনিক ভারতীয় কোনো ভাষার সেই শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো ভূমিকাই ছিল না। আসলে সমস্ত পরিকল্পনাটাই ছিল শাসকগোষ্ঠীর। তাঁরা বিদ্যালয়গুলিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিছুটা সহুরে কেরানী উৎপাদন করবার জন্যে। যদি জনসাধারণকে সামগ্রিক ভাবে শিক্ষিত করতে হয় তাহলে তা তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই করতে হবে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে তা করা যাবে না। তাছাড়া সাধারণ মানুষের স্কুলে অবাধ প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। এইজন্যই বিদ্যাসাগরের শিক্ষা পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলো গ্রামেগ্রামে বালক এবং বালিকাদের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা। হ্যালিডের পরিকল্পনা, 'যা প্রকৃতপক্ষে

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরামর্শানুসারেই তৈরি হয়েছিল', বিদ্যাসাগরের সামনে ১৮৫৪ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত একটি সংক্ষিপ্ত সুযোগ এনে দিল এবং বিদ্যাসাগর বাঙলা স্কুল স্থাপন করে তাঁর জনশিক্ষার পরিকল্পনা সফল করতে চাইলেন। এরপরের ঘটনা সকলেরই জানা। আমাদের বৃটিশ শাসক এবং ভারতীয় ভদ্রলোক শ্রেণী মাতৃভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। বিদ্যাসাগর ক্রমশই শাসন-কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়তে লাগলেন। তাঁর পদত্যাগপত্রে তিনি এই কারণটির কথা উল্লেখও করেছেন।

সুতরাং একটি মহৎ পরিকল্পনা কাজে পরিণত হবার পূর্বেই ব্যর্থ হয়ে গেল। জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার প্রথম প্রচেষ্টা গুণগত ও পরিমাণগত উভয়ভাবেই বিনষ্ট হলো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেতে বাঙলাভাষার আরো অনেকদিন সময় লেগেছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মনস্বী ব্যক্তিরা বৃথাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙলাকে স্বীকৃতি দেবার জন্য দাবি জানিয়ে আসছিলেন।

সাহিত্যিক অবদান

১৮৫৮ সালে চাকরী ছাড়ার সময় বিদ্যাসাগর পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে অতঃপর তিনি বাঙলাসাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন এবং দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও তাদের জ্ঞানার্জনে সহায়তার জন্য আরও বাঙলা বই লিখবেন। বিদ্যাসাগর কেবলমাত্র 'উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য'ই রচনা করেননি 'জ্ঞানের সাহিত্য'ও রচনা করেছেন। তিনি শিক্ষাবিস্তারের জন্য এবং সমাজ সংস্কারের জন্যই প্রধানত লিখেছেন। কিন্তু তিনি জানতেন যে এরজন্য তার লেখার স্টাইল হতে হবে 'সাবলীল প্রকাশযোগ্য এবং বাগ্‌বৈশিষ্ট্যসম্মত'। এই গুণগুলি থাকার জন্যই তিনি যাই লিখেছেন তাই সাহিত্যিক স্তরে উন্নীত হয়েছে।

১. উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য

বিদ্যাসাগর বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া প্রায় কিছুই লেখেননি। অবশ্য তাঁর 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' এবং 'আত্মচরিত' এর ব্যতিক্রম। এ-দুটি নিছকই সাহিত্যিক রচনা। তাঁর শিক্ষাসম্পর্কিত গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে সংস্কৃত উপক্রমণিকা, ঋজুপাঠ, বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) স্বচ্ছন্দ অনুবাদ, আর বাঙলার ইতিহাস (১৮৪৮),

জীবন চরিত (১৮৪৯), বোধোদয় (১৮৫১), কথামালা (১৮৫৬), চরিতাবলি (১৮৫৬) মূল ইংরেজী রচনা অবলম্বনে রচিত। কিন্তু শকুন্তলা (১৮৫৪), সীতার বনবাস (১৮৬০) অথবা ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯) অনুবাদ হিসেবে প্রচারিত হলেও এগুলিকে অনায়াসে মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টি বলা চলে। বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সম্পর্কিত পুস্তিকাগুলি যুক্তিধর্মী বাঙলা গদ্যরচনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩), ব্রজবিলাস (১৮৮৪), রত্নপরীক্ষা (১৮৮৬) বিদ্রূপাত্মক, কৌতুকধর্মী রচনার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। বিদ্যাসাগরের সাধু গদ্যরীতির সঙ্গে এর রচনাভঙ্গির পার্থক্য প্রচুর। প্রত্যেকটি বই ধরে বাঙলাসাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অবদান বিচার করা এখানে সম্ভবপর নয়। তবে এই অবদানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষামূলক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রেও তিনি একটি বিশেষ যুক্তিসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে চলতেন। উপক্রমণিকা রচনা করে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের মূল সূত্রগুলি সর্বপ্রথম সাধারণ বাঙালির কাছে সহজবোধ্য করে তুললেন। তারপর ধাপে ধাপে লিখিত হলো তিনখণ্ডে বিভক্ত ঋজুপাঠ। প্রথম খণ্ডটি রচিত হয়েছিল পঞ্চতন্ত্র অবলম্বনে, দ্বিতীয়টি রচিত হয়েছিল রামায়ণ ও মহাভারত অবলম্বনে এবং তৃতীয়টির উৎস হলো মহাভারত, হিতোপদেশ ও ভট্টিকাব্য। ব্যাকরণ-কৌমুদী তাঁর রচিত দ্বিতীয় সংস্কৃত-ব্যাকরণ গ্রন্থ, এবং এতে সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর সূত্রসমূহের সরলীকরণ করা হয়েছিল এর ফলে ছাত্রদের পক্ষে সংস্কৃত কাব্য ও নাটক অধ্যয়ন করা সহজতর হয়ে উঠেছিল। অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, মেঘদূতম্, উত্তররামচরিতম্ ইত্যাদি গ্রন্থের সম্পাদনা করে তিনি সটীক সংস্করণ বের করেছিলেন, এবং এগুলির সম্পাদনা তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করে। প্রধানত, তাঁর চেষ্টাতেই সংস্কৃতের সঙ্গে সাধারণ বাঙালির একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের প্রথম লক্ষ্য ছিল 'এক সমৃদ্ধ বাঙলাসাহিত্য সৃষ্টি'। উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক, ছাত্রসহায়ক পুস্তক এবং সাধারণ জ্ঞানের পুস্তক রচনা করে তিনি এই লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব হলো বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য জগতের সভ্যতা এবং আধুনিক যুগের প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং নৈতিক মূল্য সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করা। তিনি রূপকথা, উপকথা অথবা ধর্মীয় শিক্ষার উপর মোটেই জোর দেননি।

১৮০১ সালে রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্যচরিত' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই

প্রকৃতপক্ষে বাঙলাগদ্যের সূচনা। ১৮০১ সাল থেকে ১৮৫১ সালে বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে মাত্র কিছু কিছু ঘটনা উল্লেখযোগ্য। উইলিয়ম কেরীর 'কথোপকথন' যদি তাঁর নিজের লেখা হয় তাহলে তিনিই প্রকৃতপক্ষে কথ্য বাঙলা গদ্যের প্রথম স্রষ্টা। রামমোহন রায় যুক্তি ও বুদ্ধির ওপর যতটা জোর দিয়েছিলেন স্টাইলের দিকে ততটা দেননি। তার 'রসবোধ' বোধহয় তেমন ছিল না। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হননি। অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন বিদ্যাসাগরের বন্ধু এবং সমসাময়িক। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মিলও ছিল। তবে অক্ষয়কুমার ছিলেন তীক্ষ্নদৃষ্টি-বস্তুবাদী। তিনি অত্যন্ত চিন্তাশীল লেখক ছিলেন তবে প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্য বা শিল্পকলা নিয়ে তিনি খুব বেশি মাথা ঘামাননি। তাঁর গদ্যরচনায় কোনো স্টাইল ছিল না। অবশ্য বিদ্যাসাগরের আর একজন সমসাময়িক টেকচাঁদ ঠাকুর ওরফে প্যারীচাঁদ মিত্রের কথ্যভাষার উপর বেশ দখল ছিল। তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' দক্ষতার পরিচয় বহন করে। কিন্তু, শিক্ষা সম্পর্কিত গদ্যরচনায় বিদ্যাসাগর আলালীভাষার প্রয়োগ করতে পারতেন না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে স্বচ্ছ, সরল ও ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষায় গভীর জ্ঞানের কথা প্রচার করা। স্বভাবতই তাঁর সাহিত্যরীতি এই পথ ধরেই চলেছিল।

বালক ও তরুণদের জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৫ সালে প্রকাশিত হলো। বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা ও যুক্তির সঙ্গে ধাপে ধাপে বর্ণমালা শিক্ষার এ-হচ্ছে প্রথম বাঙলা গ্রন্থ। সরল অক্ষর থেকে প্রথাগতভাবে যুক্তাক্ষর শেখা, স্বরবর্ণ থেকে ধীরে ধীরে ব্যঞ্জনবর্ণ শেখার অপূর্ব ব্যবস্থা এই গ্রন্থ দুটিতে আছে। এই বইয়ের প্রথমে রয়েছে সেই অপরূপ ছন্দোময় 'জল পড়ে পাতা নড়ে' যার ধ্বনিমাধুর্যে একদা বালক রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। তারপর সহজ সংক্ষিপ্ত ছড়ায় রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী এবং সবশেষে অতি বিখ্যাত 'গোপাল অতি সুবোধ বালক' আর 'রাখাল অতি খারাপ বালক' শীর্ষক দুটি নীতিমূলক গল্প। বর্ণপরিচয়কে আজ পর্যন্ত কেউ ছাড়াতে পারেনি এবং পরবর্তীকালে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে-সমস্ত বই লেখা হয়েছে তাদের প্রায় প্রত্যেকটিরই আদর্শ ছিল এই গ্রন্থ। দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি রচনা করেছিলেন কথামালা (১৮৫৬)। ঈশপের উপকথার অবলম্বনে গ্রন্থটি রচিত। তৃতীয় পর্যায়ের

জন্য রচিত হয়েছিল চরিতাবলী (১৮৫৬)। কিছু মহৎ ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী এই গ্রন্থে আছে। এই পাঠ্যসূচীর পরিণতি ঘটানো হতো ১৮৫১ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত বোধোদয় গ্রন্থের সাহায্যে। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ইংরেজী ভাষা থেকে সংগ্রহ করা হলেও এর ভাষা, রীতি, প্রকাশভঙ্গি সবই বিদ্যাসাগরের নিজস্ব। বইটিতে অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞানের কথা আছে। এই বইটির দ্বারা লেখক তরুণ পাঠকদের বলতে চেয়েছেন যে 'পৃথিবীকে জান, বস্তুজগৎকে জান'। বিশ্বস্রষ্টা সম্পর্কিত অধ্যায়টি প্রথম সংস্করণে নাকি ছিল না। তবে দ্বিতীয় সংস্করণে কারো কারো অনুরোধে তিনি এই অধ্যায়টি যোগ করেন। অবশ্য এই অধ্যায়টিতে একটি আকর্ষণীয় ব্যাপার আছে। এখানে শিক্ষার্থীদের বলা হয়েছে যে স্রষ্টা কেবলমাত্র 'আকৃতিহীন'ই নন তিনি 'নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ', অর্থাৎ "আকৃতিহীন চেতনা"। বস্তুত অনেকেই মনে করেন ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত অনুভূতিরই এটি একটি বিশেষ প্রতিফলন। পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগর তিনখণ্ডে বিভক্ত 'আখ্যানমঞ্জরী (১৮৬৫-৬৮) রচনা করেন। এতে প্রায় ৭৮টি ছোট-বড় কাহিনী আছে এবং বিদ্যাসাগরের সাধুভাষার উৎকর্ষতার এ-হচ্ছে জ্বলন্ত নিদর্শন।

২. বাঙলা গদ্যের অন্তর্নিহিত প্রতিভার আবিষ্কার

বিদ্যাসাগরের লেখাতেই সর্বপ্রথম বাঙলা গদ্যের অন্তর্নিহিত প্রতিভার সন্ধান পাওয়া গেল। বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) প্রথম সংস্করণে দেখা গেল যে গদ্যের উপর তাঁর দখল তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৫০) দেখা গেল যে তিনি সংস্কৃত যুগ্মশব্দের অনাবশ্যক বোঝা ত্যাগ করতে পেরেছেন। 'জীবন চরিত' (১৮৪৯) অথবা 'বোধোদয়' (১৮৫১) থেকে তিনি যা-কিছুই রচনা করেছেন সেগুলির গদ্য স্বচ্ছ, সহজবোধ্য এবং প্রকাশের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। শকুন্তলা (১৮৫৪) এবং সীতার বনবাসে (১৮৬০) তিনি একটি পৃথক ও উচ্চমানদণ্ডের গদ্য সৃষ্টি করলেন। এই গ্রন্থ দুটির বিষয়বস্তু নীরস ও তথ্যমূলক ছিল না, এগুলি ছিল সাহিত্যধর্মী রচনা, এদের ভাব ও ভাষা অপরূপ সমন্বয়ে গঠিত। তাঁর তর্ক-বিতর্কমূলক প্রচার পুস্তিকাগুলিতে তিনি তৃতীয় আর এক জাতীয় গদ্য রীতির প্রবর্তন করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর জীবনচরিত বাঙলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম এই জাতীয় রচনার নিদর্শন। রচনার প্রসাদগুণে ও মাধুর্যে এই গ্রন্থ ত্রিশ বৎসর পরে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতির কথা স্মরণ

করিয়ে দেয়। রামমোহন এবং তাঁর অনুবর্তীরা বাঙলাগদ্যের যে মানদণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন তার মধ্যেই দীর্ঘকাল বাঙলাগদ্য আবদ্ধ ছিল। বিদ্যাসাগরের হাতেই প্রকৃতপক্ষে সৃজনধর্মী বাঙলাগদ্যের জন্ম, এবং এই সমস্ত গ্রন্থই তাঁর কৃতিত্বের প্রমাণ বহন করছে। ঝাঁঝালো, ব্যঙ্গপূর্ণ রচনাতে তিনি যে কি-জাতীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর বেনামী রচনাগুলি তার নিদর্শন। নির্মলশুভ্র হাস্যরসের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব ও ব্যঙ্গের মিশ্রণে এই জাতীয় পুস্তিকাগুলি জীবন্ত ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। আবার, 'প্রভাবতী সম্ভাষণের' মধ্যে মৃত্যু ও নৈরাশ্যের আক্রমণে বিচলিত আবেগপ্রবণ এক অন্য বিদ্যাসাগরের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রভাবতী নামক এক তিন বৎসরের বালিকা এই তেজস্বী পণ্ডিতের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তার অকাল মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর যে গ্রন্থ লেখেন সম্ভবত, তাই বাঙলাসাহিত্যের সর্বপ্রথম 'ব্যক্তিগত বা আত্মধর্মী রচনা'।

গদ্য শিল্পী

বিদ্যাসাগরের আগে এবং তাঁর পরে বাঙলাগদ্যের অবস্থা বোঝানোর জন্য দুই যুগের গদ্যরচনা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিতে পারলেই ভালো হতো। কিন্তু স্থানাভাবের জন্য তা সম্ভব নয়। বাঙলাগদ্যের অন্তর্নিহিত শক্তিটি তিনিই আবিষ্কার করেন এবং তিনিই একে সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে বিদ্যাসাগর 'বাঙলাগদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী'। বাঙলাগদ্যের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'বিদ্যাসাগরের পূর্বে বা পরে আর কেউ এমন স্বচ্ছ এবং মাধুর্যগুণ সম্পন্ন বাঙলা লিখতে পারেননি।' অবশ্য বঙ্কিম বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে এখানে নিজের কৃতিত্বের কথা স্বীকার করতে চাননি। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে বঙ্কিমের মতো যাঁরা পরবর্তী কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁরা বিদ্যাসাগরের মূল্যবান উত্তরাধিকার থেকেই যাত্রা শুরু করেছিলেন।

বাঙলাভাষার সম্ভাব্য লেখকদের সংস্কৃত ও ইংরেজীতে গভীর জ্ঞান থাকা বিদ্যাসাগর বাধ্যতামূলক বলে মনে করতেন। এই ভাষা দুটির সাহিত্য-সম্পদের জন্য তো বটেই প্রকাশভঙ্গি ও রীতিবৈচিত্র্য শেখার জন্যও একজন মনোযোগী ছাত্রের এই দুটি ভাষা জানা দরকার। নব্য ভারতীয়-আর্য ভাষা গোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে বাঙলাকে সংস্কৃতের ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হতো। এমনকি প্রথম যুগের উইলিয়ম কেরী ও অন্যান্যেরাও এই সত্য উপলব্ধি করতে

পেরেছিলেন। তারপর থেকে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রচেষ্টায় বাঙলা গদ্য বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে, আর এঁরা প্রত্যেকেই ভালো সংস্কৃত জানতেন। ইংরেজী ভাষার চর্চা করেই বোধহয় বিদ্যাসাগর জানতে পারেন যে গদ্যের যথার্থ আদর্শ কি হতে পারে। গদ্য একদিকে যেমন আধুনিক যুগোপযোগি 'জ্ঞানের সাহিত্যের' বাহন হয়ে উঠবে অপরদিকে তেমনি আবার একে 'হৃদয়ের সাহিত্যে'র বাহনও হয়ে উঠতে হবে। প্রথমশ্রেণীর রচনায় বস্তুনিষ্ঠা, স্বচ্ছতা, যুক্তিনিষ্ঠা ও ভারসাম্যবোধ থাকা দরকার আর দ্বিতীয়শ্রেণীর রচনায় এগুলির তো দরকারই আর এ-ছাড়া দরকার হৃদয়ধর্মিতা, কল্পনাপ্রবণতা ও ব্যঞ্জনাসৃষ্টির ক্ষমতা। বিদ্যাসাগরের রচনায় এই দুটিই ছিল। বিদ্যাসাগরের গদ্য হৃদয় ও বুদ্ধির অপরূপ সমন্বয়। তিনিই প্রথম বাঙালি লেখক যিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষার সাহিত্যসম্পদের সমন্বয়সাধন করে সম্ভাবনাপূর্ণ বাঙলাগদ্যরীতির সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেন।

বাঙলাসাহিত্য বিদ্যাসাগরের কাছে দুটি প্রত্যক্ষ অবদানের জন্য ঋণী থাকবে। এ-দুটি অবদানই এখন বাঙলাগদ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তিনিই প্রথম কমা, দাঁড়ি জাতীয় ছেদচিহ্নের ব্যবহার করেন, দ্বিতীয়ত বাঙলাগদ্যের অন্তর্নিহিত ছন্দের ও ধ্বনিমাধুর্যের তিনিই আবিষ্কর্তা। তাঁর বুদ্ধি ও বিচারবোধের দ্বারা, হৃদয়ের উপলব্ধির সাহায্যে তৎসম শব্দ ব্যবহার করে তিনি এই ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করেছিলেন। 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাসে'র গদ্যে এর বহু নিদর্শন পাওয়া যাবে।

বিদ্যাসাগরের গদ্যের বৈশিষ্ট্য ও বাঙলাসাহিত্যে তাঁর অবদান সম্পর্কে দুটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। বলা চলে দুটি ধারণাই অর্ধসত্য। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে বিদ্যাসাগরের কোনো রচনাই মৌলিক নয় এমন ধারণা অনেকেরই আছে। কিন্তু তাঁর পুস্তিকাসমূহ, আত্মচরিত, প্রভাবতীসম্ভাষণ সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। তাছাড়া তাঁর তথাকথিত অনুবাদগুলি আসলে মৌলিক সৃষ্টিরই সমতুল্য। 'শকুন্তলা' এবং 'সীতার বনবাস' সম্পর্কে এ-কথা জোর করে বলা যায়। দ্বিতীয় ভ্রান্ত ধারণাটি হলো 'বিদ্যাসাগরী ভাষা সম্পর্কে। অনেকেই মনে করেন যে এটি হলো দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দে ভরপুর একশ্রেণীর সাধুভাষা। এ-কথা ঠিক আধুনিক বাঙলা গদ্যের সঙ্গে তুলনা করলে বিদ্যাসাগরের গদ্যকে অনেকটা সংস্কৃত ঘেঁষাই মনে হবে। বঙ্কিমের রীতিও প্রথমে এরকমই ছিল, পরে তিনি 'বিশুদ্ধ বাঙলা' লেখার চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাসাগরও তাঁর কোনো কোনো পুস্তিকায় এবং বিতর্কমূলক রচনায় বিশুদ্ধ বাঙলাই লিখেছেন।

বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি সর্বদাই বিষয়বস্তু অনুযায়ী পরিবর্তিত হতো। তিনি নানা বিষয়ের ওপর কাজ করেছেন তাদের উপর প্রবন্ধ লিখেছেন কিন্তু সর্বদাই স্বচ্ছ এবং সাবলীল গদ্য রচনার চেষ্টা তিনি করে গেছেন, কোথাওই তা দুর্বোধ্য হয়নি। বিদ্যাসাগরের বাক্যের গাম্ভীর্য ও ধ্বনিমাধুর্য প্রকৃতপক্ষে আমাদের মনে ক্লাসিকাল পরিবেশের সৃষ্টি করে। ক্লাসিকাল রীতির গদ্যের এই হচ্ছে চূড়ান্ত নিদর্শন। আর অন্যান্যক্ষেত্রের মতো এ-ক্ষেত্রেও এই রচনারীতির মধ্য দিয়েই পিছনের মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। বিদ্যাসাগরের রচনারীতির মধ্য দিয়ে একজন বিজ্ঞাননিষ্ঠ শিক্ষাব্রতী, একজন চিন্তাশীল সমাজসংস্কারক, একজন দয়ার্দ্রচিত্ত কোমল হৃদয়বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং একজন রুচিশীল সাহিত্যপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিককে খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের সমস্ত কোলাহল ও বাধাবিপত্তির মধ্যেও এই গুণগুলি চিরকাল অম্লান ছিল।

বর্তমান যুগে বিদ্যাসাগরের উপযোগিতা

প্রায় একশ বৎসর পিছনের দিকে তাকিয়ে বিদ্যাসাগরের কর্মময় জীবন ও তাঁর কার্যাবলীকে তিনটি বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে (অর্থাৎ তাঁর সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা এবং সাহিত্যজগতে তাঁর অবদান) আমরা আজ নিজেদেরই প্রশ্ন করতে পারি যে বর্তমান যুগের পক্ষে বিদ্যাসাগরের কার্যকলাপ ও অবদানসমূহের কোন কোন অংশ প্রয়োজনীয় এবং এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টাও আমাদেরই করা উচিত।

ক. লেখক বিদ্যাসাগর, নিজে হয়তো যা কোনোদিন আশা করেননি, বাঙলা সাহিত্যে উচ্চতম পর্যায়ে স্থায়ীভাবে আসীন। অবিসম্বাদিতভাবেই তিনি বাঙলাগদ্যের স্রষ্টা এবং পরবর্তী লেখকদের অন্যতম পথিকৃৎ। খ. শিক্ষাবিদ বিদ্যাসাগর বোধহয় আজকের দিনের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় হতেন। তিনিই আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম এবং প্রধান শিক্ষাবিদ যিনি প্রথম আধুনিক ধরনের জাতীয় শিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিলেন। (১) শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পর্কে তিনি পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে 'পশ্চিমীজগতের বিজ্ঞান ও সভ্যতা সম্পর্কিত জ্ঞান' অবশ্যই অর্জন করতে হবে। (২) শিক্ষাক্ষেত্রে ত্রি-ভাষা সূত্রও তাঁরই দেওয়া। আঞ্চলিক বা জাতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রচারের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। এ-ছাড়া আধুনিক জগত ও জীবনকে জানার জন্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সাহিত্যকে আয়ত্ত করার জন্য ইংরেজীভাষা ও অতীত ঐতিহ্য এবং আঞ্চলিক ভাষাকে সমৃদ্ধ

করার জন্য সংস্কৃতভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনিই প্রথম ঘোষণা করেন। (৩) বিদেশী সরকারের বিরোধিতা সত্ত্বেও জনশিক্ষার প্রসারের প্রয়াসের নেতৃত্ব তিনিই দিয়েছিলেন। (৪) স্কুল ও কলেজের আদর্শ প্রতিষ্ঠাতা, প্রশাসক ও পরিচালকের ভূমিকায়ও তাঁকে দেখা গিয়েছিল। গ. সবশেষে বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারগুলির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও আলোচনা করে নিতে হবে। এই সীমাবদ্ধতার আংশিক কারণ সময়ের পরিবর্তন আর দ্বিতীয় কারণ আমাদের বাঙালি রেনেসাঁসের সঙ্কীর্ণ সামাজিক ভিত্তি। এর প্রভাব আসলে ভদ্রলোক হিন্দুদের মধ্যেই সীমিত ছিল। বিধবাদের পুনর্বিবাহ অথবা বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণের প্রভাব কেবল তথাকথিত ভদ্রসমাজের উপরই পড়েছিল, অথচ তাঁরা ছিলেন একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। অবশ্য বিদ্যাসাগরের এই দুই প্রচেষ্টাই তাঁকে স্ত্রীজাতির মুক্তির জন্য শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রামী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কোনো নির্দিষ্ট সমাজসংস্কার বা অবদানের জন্য না হলেও জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সততার জন্য, সাহস ও নিষ্ঠার জন্য, সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অবিরাম সংগ্রামের জন্য, তাঁর আদর্শবোধ এবং পুরুষোচিত গুণাবলীর জন্যই বিদ্যাসাগর আজকের দিনেও স্মরণীয় হয়ে আছেন এবং থাকবেন। বিদ্যাসাগরের 'অজেয় পৌরুষ এবং অক্ষয় মনুষ্যত্বের' এ-সমস্তই বড় প্রমাণ। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর দেশবাসী বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তৎকালীন জাতীয় নেতারা তাঁকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন, উপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠী তাঁকে অবহেলা করেছিলেন এবং শেষজীবনে একাকী বিষণ্ণ অবস্থায় তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের এই নৈরাশ্য সত্ত্বেও আমরা অনুভব করতে পারি যে তিনি তাঁর কালের অনেক অগ্রবর্তী ছিলেন এবং আধুনিক যুগের চলমান জীবনস্রোতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ এইদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন—"বহমান কালগঙ্গার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবনধারার মিলন ছিল, এইজন্যই বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক।" (প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৯)।

রমাকান্ত গোপাল হালদার রচিত একটি ইংরাজি নিবন্ধের শ্রীবিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য-কৃত অনুবাদ।

রাণীর কাছে পাঞ্জা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

আসলে হয়ত এইভাবে প্রথম কথা বলেছিল মনীশ 'কেমন আছো ?' যদিও এই 'কেমন আছো' বলাটার বিরুদ্ধে চিরকালই মনীশ মনে মনে একটা সংঘর্ষ করে এসেছে। ভদ্রমহিলাটি একটা সাড়ে-তিন বছরের মেয়েকে ধমক দিতে দিতে মনীশকে চিনতেই পারল না এমন গোছের চাউনি রাখে। মনীশ কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছিল। অনেক বদল ঘটেছে সত্যি, তবু সব বদল আর সময়ের একটা টানা বিলম্ব পেরিয়েও তারাকে চেনা যায়। সন্ধ্যের দিকে এ-এলাকায় শেয়াল ডাকে কেউ বলে থাকলে এখন তা সত্যি হয়ে ওঠে। দূরে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার মতো গাছপালা হুহু করে হাওয়া ছুঁড়ে দেয়। তারা তবু মনীশকে চিনতে পারেনি। সেটা তারার দোষ নয়। কেননা মনীশের চেহারায় একটা বড় রকমের রূপান্তর ঘটেছিল বটে। তাই মনীশকে নিজের পরিচয় দিতে হলো সাবেকি রীতিতে—'আমি মনীশ।' তারাকে হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে পড়তে দেখল মনীশ। তারা বাচ্চা মেয়েটির হাত ধরে সামনের বেঞ্চিটায় বসে পড়ল। মনীশও বসল তারার পাশে। এবং সে ভেবে নিতে পারল অনেক দিন পরে তারার পাশে বসলুম।

সাড়েতিন বছরের মেয়েটি একরাশ পাখি ও ফুল আঁকা ফ্রকে, অন্ধকারে, নতুন লোক দেখে লজ্জা পাবেই, হয়ত ভয়টয়ও পেয়ে থাকবে। অথচ আজকাল মনীশের চেহারায় এমন একটা ছাপ পড়েছে যা দেখে করুণা জাগাই উচিত। কিন্তু অতটুকু মেয়ে কি তা বোঝে ? তবে কি তারার মনে করুণা জাগল ?

তারা বলল, 'পতু, ওনাকে প্রণাম করো। তোমার কাকু।' পতু লজ্জায় আরো জড়োসড়ো, আরো চুপচাপ, আর সেই ফাঁকে পতুর গাল টিপে দিল তার কাকু। মনীশ বলল, 'অনেকদিন পরে কেমন দেখা হয়ে গেল তাই না ?' তারা হাসল। তারার নীরক্ত মুখে সেই হাসি কোনো সুন্দর কিছু প্রমাণ করল না। পতুটা বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়ল। আর দশটা বছর পরে জীবনে যে এমন বৃহৎ ত্রিনপর্বের ঘটনা ঘটতে পারে সেটার প্রমাণ মিলল তারাকে দেখেই। স্পষ্ট না

হোক কিছু কিছু পূর্বকালের ঘটনা মনীশ মনে রেখেছিল। বহুদিন পর আবার তারাকে দেখতে হলো। কত কিছু পাল্টে গেল। মনীশের বিয়েটাও হয়ে উঠল এই সেদিনই। তারা যেখানে হাতের শাঁখা ভেঙে সিঁদুর মুছে সাড়ে-তিন বছরের মেয়েটাকে নিয়ে অন্ধকারে ফুঁপিয়ে ওঠা হাওয়ায় গাছপালা মাঠ আকাশ ও সৌরলোকে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা নক্ষত্রের পুঞ্জ দ্যাখে এক অপার বৈধব্য নিয়ে, সেখানে মনীশের বউ প্রথম বাচ্চা পেটে নিয়ে বাপের বাড়িতে।

তারা কোনোকালেই বেশি কথা বলতো না। মনীশ যদি প্রশ্ন করে সে-জবাব সে দেবেই। এরজন্যে এককালে মনীশ কত অভিমান করেছে। পরে বুঝেছিল ওটাই তারার স্বভাব। তেমনি আজকেও। পতুটা ঘুমিয়ে পড়তেই মেয়েকে কোলে টেনে নিল তারা। সময়ের হিসেব রেখে অন্ধকার আসে। একটা সিগারেট ধরাল মনীশ, আর বলল, 'তারা, তোমাকে দেখে আমার অনেক কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে।' তারা সেই নীরক্ত হাসি ছড়াল। অন্ধকার, ঘুমন্ত পতুর কষ বেয়ে নাল, মনীশের আঙুলে আঙটি ছিল না শুধু দড়ির মতো শিরারা মধ্যমা অনামিকার দিকে ছুটছে। তারা চুপ করে থাকতে পারল না। তাই বলল, 'বাড়িয়ে যদি বলতে হয় আমি এখন ইতিহাসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।'

মনীশ বলল, 'তারা, জীবনে কখনো বা আধখানা দেড়খানা নাটকের অপেক্ষা থাকে। নইলে সারাদিন এ-গাঁ ও-গাঁয়ে পার্টির মিটিং করেছি, আর এক ডাকা-বুকো অন্ধকার মাঠে এই ভিটেতে তোমাকে যে দেখতে পাব তা ভাবিনি।' তারা হাসল। পতু ঘুমোয়।

এবার যেন চারদিকটা ভালোভাবে দেখে নিতে ইচ্ছে হয়। মনীশকে যে-ঘরে থাকতে হবে সেখানে অভাবটাই বড়। একটা লণ্ঠন জ্বলছে ; আর দেড়খানা মোমবাতি। দেওয়ালে সাজানো ইঁটের দল অহরহ হাসছে, মেঝেতে সতরঞ্চি, জলের গেলাশ, একগাদা পলিটিক্যাল কাগজ-পত্তর, পোস্টার, রঙ, চায়ের ভাঁড়, কুঁজো, ময়লা বালিশ ও সবুজ চাদর। গরমকাল, তবু ঘরের জানলা দিয়ে অন্ধকার মাঠ থেকে বাতাস আসে। ঘরের মুখেই একফালি বারান্দা। সেখানে বেঞ্চিতে ঘুমন্ত মেয়েকে নিয়ে তারা। পূর্বকালের কিছু ব্যাপার-ট্যাপার মনীশ মনে রেখেছিল। সেই সহায়তায় তারাকে নতুন করে পাওয়ার কোনো পথ মেলে না। দশবছর আগে বড় কাছাকাছি হয়েও তারাকে বরাবর রহস্যময়ী মনে হয়েছে। দুঃখ বা আনন্দ কোনোটাতেই একেবারে বিমূঢ় হয়ে উঠতে তারা শেখেনি। আজ তারাকে দেখে মনীশের পুরোনো ধারণা বদলাল না।

কৌতূহলের প্রবণতা চিরকালই তারার ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন। তারা চুপ করে বসেছিল। এইভাবে কতকাল সে চুপ করে থাকতে পারে। কিন্তু তারা যেন পালাবার পথ খুঁজছিল। পতুকে টেনে হি চড়ে কোলে তুলে বলল, 'তুমি তো আছ, পরে কথা হবে।' মনীশ তখন দেখছিল অন্ধকার মাঠে জনতার মতো গাছগাছালি হাওয়া ছুঁড়ে দিয়ে হুই হুই করে উঠছে।

মেয়েকে নিয়ে তারা ফিরে গেল। 'আমি এখন ইতিহাসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি' তারার কথাটা এবার যখন মনীশের মনের মধ্যে ফিরল তখন তা হাসি ছড়াল। মনীশ ভাবতে পারেনি তারা এমন আবেগের কথা বলবে। অথচ বলল। হয়ত সত্যি কথাটাই বলেছে তারা। আর সত্যিটা যদি মনের গভীর কোনো অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয় তবে তা কিছুটা আবেগের হবেই। এমন সিদ্ধান্তটা জোগাড় হতেই মনের হাসি অর্থহীন হলো। মনীশ সতরঞ্চির ওপর সবুজ চাদরটা বিছিয়ে দিল। মোম ফুরোতেই বাতি নিবল। লণ্ঠনটা জ্বলছিল। মনীশের প্রসারিত ছায়াটা গাঁথা থাকে দেওয়ালেই। তবে অস্থির, বুক-হাত পাগুলো বেখাপ্পা অনুপাতের। তাই মনীশ ভাবল, আমি কি মানুষ নই? যখন বুঝল ছায়ামাত্রই অমন চরিত্রের তখন মনের মধ্যে আর প্রশ্ন ফিরল না। মাটিতে শুয়ে পড়তেই ছায়াটা হারিয়ে গেল। মনীশ ভাবল নিজের বউয়ের কথা। নীহারকে মনে পড়লেই আর একটা কথা মনে পড়ে। আমাকে বাবা হতে হচ্ছে। যা মনীশকে চট করে ভাবিত করে তোলে।

মনীশের কাছে ঘড়ি ছিল না। ক্ষিধে পেয়েছিল। ভাবল, তারাকে বললেই হয় একটু চা খাব। সে বুদ্ধিটুকু তারার ছিল। ভাবনার মধ্যেই একটা বারো তেরো বছরের মেয়ে চা নিয়েই দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল। মেয়েটা কাঁপছিল। কথা বলল ও কেঁপে কেঁপে, 'আপনার চা।' নীহার বলেছিল, তুমি কি অমানুষ গো। বাপের বাড়িতে ক'টা মাস পড়ে আছি কই একবার তো এলে না। সেটা চিঠির কথা। চিঠির জবাব দিয়েছিল চিঠিতেই। মনীশ লিখেছিল, আমি খুব ব্যস্ত। সামনে ইলেকশন। তারপর নীহার আর চিঠি দেয় না। কাঁদেটাদে হয়ত। গাঁয়ে বসে পেটে বাচ্চা নিয়ে বউ যে-মানুষটার জন্মে কাঁদে সে-মানুষটা তেতে-পুড়ে গাঁয়ে গাঁয়ে মিটিং করে বেড়াচ্ছে। নীহার বলেছিল, 'আমার পেটের বাচ্চা পেটেই মরুক।' দাড়ি কামাবার দিন হয়ত সেদিনটাই। গালে রেজার টানতে টানতে মনীশ বলেছিল, 'যদি মরে আমরা কি করতে পারি নীহার।' নীহার ফুঁসে উঠেছিল, 'হ্যাঁ' তাতো বটেই। এমন জানলে কি আর বাবা তোমার

সঙ্গে আমার বিয়ে দিত।' নীহার তার বাবাকে নিয়ে গর্ব করে। আসলে বাবার বিঘে বিঘে জমি ভরিয়ে ধান পাটের ফলনের দোহাইতে নীহার আইবুড়ো কালটা রাজকন্যার মতো কাটিয়েছে। নীহার কাঁদত। আর তখন মনীশ বলত, 'মিছে কাঁদছ নীহার। তোমার বাবাকে আমি ছোটো করবো কেন। তাঁকে বড় করার যদি কোনো উপায় না থাকে আমি কি করতে পারি। আর সত্যিকে তো ফেরাতে পারি না।' চোখের জল মুছে খাটে শুয়ে সিনেমার কাগজ দেখত নীহার এবং বলত, 'জানি, কথায় তোমার সঙ্গে পেরে উঠব না।'

চট্‌পট্ দু-চারটে মশা উড়ল। তারার পাঠিয়ে দেয়া চা-হালুয়া শেষ হয়ে গেল। এই ভিটের মধ্যেই ডেকে উঠল একটা কুকুর। জলছোঁড়ার শব্দ হলো। শন্‌শন্ হাওয়া ছুটছে মাঠে। আকাশে চাঁদ জ্বলছিল টিম্‌টিম্ করে।

স্বপ্ন দেখার অভ্যেস সব মানুষেরই থাকে। কিন্তু অহেতুক কল্পনার বুনোনে বুঁদ হয়ে থাকাটা মনীশের ক্ষেত্রে কোনোদিনই ঘটেনি। এমনকি কিশোর বেলাতেই সে ঘরে বসে স্বপ্ন-টপ্ন দেখেনি। বরং সে স্বপ্ন তৈরি করেছে বন্ধুর দল নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়ে বন্যা দুর্ভিক্ষ বা মড়ক এমন কোনো দুর্যোগ কাটাবার জন্যে সামর্থ্য সংগ্রহের ভেতর দিয়েই। তাই সে ছোটোবেলা থেকেই একটা প্রাণবন্ত মনোভাব নিয়ে বেঁচে উঠতে শিখেছে। তারা এইদিক থেকেই মনীশকে চিনেছিল। 'আপনাকে বড়-মা ডাকছেন'—আবার সেই মেয়েটি ফিরে এল। এবারো মেয়েটির গলা কাঁপল, কাঁপুনিটা এড়াবার জন্যে হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনের নিচে থেকে রেকাবি ও কাপটা তুলে নিল। মনীশ গায়ে চাপাল পাঞ্জাবি। তারপর মেয়েটার পিছু পিছু চলল। দোরগোড়াতেই তারা দাঁড়িয়ে ছিল। এখানে আলোর বহর একটু বেশি যাতে তারাকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়া গেল, তারা মোটা ও ফ্যাকাসে হয়েছে ঠিক। তারা বিধবা হয়ে মনীশের মুখোমুখি হবে তা কোনোদিনই মনীশ ভাবেনি। কাছাকাছি পতু ছিল না। উঠোনে একটা লোক একটা কুকুরকে চান করাচ্ছিল। কুকুরটা ঘেউঘেউ করছিল এবং সেই সঙ্গে জল ছোঁড়ার শব্দ। আর লোকটা কখনো হাসছিল, কখনো গান গাইছিল এমনকি নিজেকেই মাঝেমধ্যে ধমক দিচ্ছিল। মনীশ অবাক হয়ে চেয়েছিল সেদিকেই। তারা বলল, 'পাগলা মানুষের কাণ্ড আর কতক্ষণ দেখবে, ভেতরে এসো।' বারো-তেরো বছরের ভীরু মেয়েটি এরি মধ্যে পালিয়ে গিয়েছিল। মনীশ ঘরের ভেতরে এসে দেখল পতু ঘুমোচ্ছে। পতুর গায়ে সেই ছবিঅলা ফ্রক নেই। খালি গায়ে পতু ঘুমোচ্ছে। পতুর সারা গায়ে ঘামাচি

এ-ঘরটা ওপরের সাড়াৎই বটে। এখানেও দেওয়ালে দেওয়ালে সাজানো ইটের হাসি। জানলা দিয়ে এখান থেকে অন্ধকার মাঠটা দেখতে পাওয়া যায় না। মনীশ বলল, 'তুমি যে বনবাসে রয়েছ।' তারার উচিত ছিল নীরক্ত হাসিটুকু ছড়িয়ে দেওয়া। তারা তা মানল না। তারা বলল, 'বনবাস হবে কেন?' মনীশ জবাব দেয়ার সাহস পেল না। তারা বলল, 'বেশ আছি। উনি এককালে দলটল নিয়ে অনেক হইচই করেছিলেন। শেষকালে জেলখানাতেই মারা গেলেন।' এবার তারা নীরক্ত হাসি ছড়ানোর দায়িত্ব মেটাল। মনে মনে আঁতিপাঁতি করেও সে তারাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

একদিন নয় অনেক দিনই রাত্তিরের দিকে নীহার মনীশকে শরীর দেখিয়ে উত্তেজিত করতে চেয়েছে। মা কাঁদতে কাঁদতে সত্যি কাশী না যান, হুট করে মারা গেলে বুকে একটা আক্ষেপ নিয়ে যেতেন। মনীশকে এইসব ভেবেই বিয়ে করতে হলো।

তারাকে দেখে মনে হয় শরীর দেখিয়ে উত্তেজিত করার মতো ক্ষমতা নীহারের আছে। বউ পেটে বাচ্চা নিয়ে বাপের বাড়ি যেতেই মনীশ ঠিক করে ফেলল, সংসারের চেয়ে সমাজ বড় বলেই তাকে দায়িত্ববান হতে হয়।

হাতপাখা নিয়ে বাতাস করছিল তারা। মাছি উড়ছিল। পতু এক কোণে একটা ভাঙা সিঁড়ির ওপর বসে ছিল। তারা বলল, 'যদিও বুকচেপে বলি দিব্যি আছি। তবু পুরোপুরি যে সত্যি বলি না তাতো জানি।' মনীশ স্মৃতি উদ্ধার করল না। কি লাভ। নীহারকেও বারবার মনের মধ্যে টেনে তারার পাশাপাশি দাঁড করানোই বা কি দরকার। খেতে খেতে মনীশ বলল, 'আমার শরৎচন্দ্রের গল্প মনে পড়ছে। তুমি যা কাণ্ডটা করছো।' তারা বলল, 'তুমি মাছের ঝোল খেতে ভালোবাসো। তবু মাছের ঝোল রাঁধিনি। তবে কি করে তোমার যে শরৎচন্দ্রের গল্প মনে পড়ল বুঝতে পারছি না।' কথাটা শুনে মনীশ এমন জোরে হেসে উঠল যে বাইরে থেকে কুকুরটা চীৎকার করে উঠল। এইবার তারা গলা উঁচু করে কাদের যেন ডাকল। একটা খাকি হাফপ্যাণ্ট আর কাঁধকাটা গেঞ্জি পরে সেই পাগল মানুষটা এল। তারা হেসেই ফেলল, 'ছাখ, নিজের বলতে আছে দেওর রামু, তাও আবার পাগল।' সেই বারো-তেরো বছরের ভীরু মেয়েটি এল। তারা তার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল, 'বিন্নুরও কেউ নেই।' ওরা খেতে বসল। মনীশ সজনেডাঁটা চিবুতে চিবুতে তারার গিন্নিপনা দেখল। রামুর এখানে অবাধ্যপনা নেই, শুধু নিজের মনে বিড়বিড় করে বকল এই যা। তারাকে

দেখতে দেখতে মনীশের মনে হলো জীবন যন্ত্রণার সংজ্ঞাটা তার নিজের কাছে একটা বিলাস ছাড়া আর নতুনই বা কি।

ঠ্যাঙ ছড়িয়ে বসে রামুও সজনেডাঁটা চিবোয়, বিন্নু ভারি লাজুকভাবে জড়োসড়ো হয়ে বসে ভাত খাচ্ছে, তারার কপালে দু-চার গাছা চুল ঘামে সেঁটে আছে, তারার তাকিয়ে থাকাটায় বেশ কিছুটা উদাসীনতা, তবু মনে হয়, মনীশেরই, নিজেকে একটু সখের কাতরতায় মগ্ন।

খাওয়া চুকতেই উঠোনের ধারে ঘটি করে জল নিয়ে এসে তারা বলল, 'হাত পাতো।' উঠোনের মাথায় আকাশ। নির্মেঘ আকাশে পট্‌পট্‌ করে রাশিরাশি তারা জলছিল। রূপোলি তারা, নীল এবং সবুজ তারাও ছিল। অন্ধকার মাঠে ফিরে গলা ছেড়ে গান গাইছিল রামু। তারা বলল, 'এ-সংসারে পানের পাট নেই।' পিঁড়ির ওপর কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল পতু। তাকে কোলে টেনে নিয়ে চাপড়াতে লাগল তারা।

সেই ঘরে ফিরে এল মনীশ। ততক্ষণে লণ্ঠনের আলোর শিখা কমে এসেছিল, ফলে অন্ধকারটার ছন্নছাড়া চেহারাটা চারদিকে নাচছে। আর মনীশের ছায়াটাকে নিয়ে রাতারাতি কাণ্ড করে সেই অক্ষম আলো।

নীহার বলত, 'তোমার কি দুঃখু যে অমন হন্যে হয়ে মিটিং করে বেড়াও।' এ-সব প্রশ্নের উত্তর দেয়ার অভ্যেস মনীশ কাটিয়ে উঠেছিল। নীহারের এমন অনুযোগ গা-সওয়া হয়ে গেছে। আসলে নীহার যে নিজে থেকে এ-সব কথা বলতে শিখেছিল তা নয়। বাপের বাড়ি থেকেই শিখেছিল। মনীশ বোঝাবার চেষ্টা করেনি। বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে কি লাভ। নীহার বিয়ের পরও সেই রাজকন্যার জীবন খুঁজতে চায়। তারা বলেছে 'পতুটাকে এইভাবে জঙ্গলে মানুষ করতে চাই না। এখন না হোক আর তিন-চার বছর পরে মেয়েটার জন্যে তো সত্যিই ভাবতে হবে। আমার নিজের বলতে কেউ নেই, এতদিন তাই জানতুম কেননা সত্যি বলতে কি বিয়ের পর থেকে যখন ইতিহাস হাতছানি দিয়েছে আমাকেই, তখন তোমাকে মনে পড়েনি। আজ হঠাৎ এতদিন পরে তোমাকে দেখে একটা ভুল যেন শুধরে ওঠার অবসর পাচ্ছে।' মনীশ এর উত্তরটা দিতে পারেনি। কেননা তারা যেমন দু-দিন আগে মা হয়েছে তেমনি মনীশও তো বাবা হতে চলেছে। হলোই বা দু-দিন পরে।

অন্ধকার মাঠে সারসার গাছপালা দেখে তার জনতার কথা মনে পড়ে। মনীশ লড়াই করে। কায়মনে যুদ্ধ করে যায় মনীশ। অজ গাঁয়ে মিটিং করতে

গিয়ে, ইলেকশনের দিনগুলোতে খাওয়া-দাওয়া জুটেছে আধপেটা, মশা-মাছির অত্যাচারে, শীতের কাঁপুনিতে, গরমে কিংবা তুমুল বর্ষায় কত ঘুমহীন রাতের স্মৃতি। তবু মনে মনে এইভাবে, এমন মত্ততায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠে মনীশ তো স্বপ্ন তৈরি করেছিল। আজ তারার কথা মনীশকে বড় ভাবায়। এতদিন হাত-পা ছুঁড়ে মনীশ মানুষকে যে আশ্বাসের স্বপ্ন দেখিয়েছিল, মা হয়ে, অপার বৈধব্য নিয়ে, তারা যেন সেই দাবি নিয়ে মনীশের মুখোমুখি।

জ্যোৎস্না ফুটেছিল। অন্ধকার ক্রমশ ফুরিয়ে গেলে আকাশে ভাঙা চাঁদা অল্প স্বল্প আলো ছড়াল। রামু কিংবা কুকুরটা মাঠে নেই। মাঠটা অনেকদূর পর্যন্ত ছড়ানো। মাঝে-মধ্যে গাছপালার জটলা। তারা বসে আছে মাঠটাতে। এমন শিথিল ভঙ্গি নিয়ে হয়ত কখনো-সখনো মনীশের পাশাপাশি গড়ের মাঠে তারা বসে থাকত। মনীশের মনে হলো এককালে হয়ত তারার আন্তরিক হয়েছিলুম। সবে কলেজে ঢুকেছিল তারা। সে-সব দিনে সে নিজের ইচ্ছেতেই পার্টিতে এসেছিল। পার্টিতে এমন একজন মেয়ে পেয়ে মনীশ খুশী হয়েছিল। সেদিন কিন্তু সে এতসব কথা ভাবেনি। আজ ভাবল। হয়ত তারার প্রেমে পড়েছিলুম।

তারার মাথায় ঘোমটা ছিল না। কাপড় সাদাসিদেভাবে পরা। মনীশ নিজেকে দোষ দিল। সেই সময় আমার একটু তারার দিকে তাকানো উচিত ছিল। তবে হয়ত তারার এমন অবস্থাটা হতো না। নীহার রাজকন্যাই থাকত। মাঠের গাছপালা কাঁপিয়ে একটা দুরন্ত হাওয়া ছুটে এল। তারার শাদা কাপড় শোকের রুমালের মতো উড়ল। এইভাবে তারাকে দেখার অভ্যেস কোনোদিন ছিল না। দশবছর আগে শেষ যেদিন দেখাদেখি হয়েছে সেদিনও কাজকর্মের কথাবার্তা ছাড়া অন্য কিছু ঘটেনি। সেদিন তারারা চিরকালের জন্যে বাঙলাদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। বাবার মৃত্যুর পর, লেখাপড়ার পাট ঘুচিয়ে মায়ের সঙ্গে ছোটো-ছোটো ভাইবোনগুলোর হাত ধরে বেঁচে থাকার বন্দোবস্ত প্রস্তুত ছিল বাঙলাদেশের জল হাওয়া থেকে দূরে খাস বিহারে। সেটা তারার মামার-বাড়ির দেশ। মনীশ তারাকে সেদিন যাযা বলেছিল এখনো তা তার নির্ভুল মনে আছে। দশবছর পরে পুরানো কথাগুলো মনীশ নিজের মনে আওড়ে নিল : তারা যে আদর্শকে অবলম্বন করে জীবনে একটা ব্রত উদযাপনের বিশ্বাস নিয়েছো তাকে অশ্রদ্ধা কোরো না। দেখা আমাদের হবেই। বাপের বাড়িতে যাওয়ার আগের দিন রাত্তিরে নীহার মনীশকে অনেক আদর-টাদর করেছিল

আর নিজেকে অসহায়ের মতো সে-সময়ের জন্যে সঁপে দিতে চেয়েছিল মনীশের কাছেই। 'আজ তোমার যা খুশি তাই কর' নীহারের এমন অনুরক্ত প্রশ্রয় মনীশকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি। নীহারের পেটে যেখানে বাচ্চা তৈরি হচ্ছিল সেদিকে চেয়ে মনীশ নিজের দুর্বলতা টের পেয়েছিল। নীহার বলেছিল, যদি সত্যিই আমার ছেলে হয় তবে আমি তাকে মানুষ করব। বাপের মতন এমন ছন্নছাড়া যাতে না হয় সেদিকে চোখ রাখতে হবে তো।'

জ্যোৎস্নার মাঠে তারা বসেছিল। মনীশ ভাবল, এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে আমি কি করব? সিগারেট ধরিয়ে সে শুয়ে পড়ল। তবে কি আমি বিপ্লব চাই? বিপ্লবের ইচ্ছে যদি আমার মধ্যে কোথাও ঠাঁই নিয়ে থাকে তবে হয়ত তা কোনো জীবন্ত মগ্নতায় বেঁচে থাকার ইচ্ছে। আর আমি আদর্শ জীবনবোধের, স্বপ্নের, ভালোবাসার মৌলিকতা ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে এসেছি এতদিন। তারার জীবনটা কেমন ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। এমন যদি নীহারের হতো তবে নীহার আত্মহত্যা করত। তারা বুদ্ধিমতী। মনীশ পতুর দায়িত্ব নিক এমন আব্দার সে করেনি। তারা চায় মনীশ যেমন তার কুমারী জীবনে একটা দায়িত্বের টান অনুভব করেছিল তা-ই জাগুক পতুটার জন্যে।

রাত বাড়লে শুধু ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকল। মাঠে হাওয়ার নাচ চলল। আর কখনো বা ডেকে উঠল শেয়ালের দল। দূর থেকেই ট্রেন চলার শব্দ ফিরল। মনীশের চোখে ঘুম এল না। এ-ঘরে যেন আর আলো নেই। এক জাতের উড়ন্ত পোকার গায়ে যেমন আলোর একটা তুচ্ছ দীপ্তি থাকে ঘরের আলোর বর্তমান অবস্থাটা তেমনি। জ্যোৎস্না অল্প-স্বল্পই ছড়িয়ে ছিল বাইরের মাঠটাতে। তারা নেই। মাঠটা ভীষণ ফাঁকা। নিজের ভেতরটাও ভীষণ ফাঁকা। আমি শুধু ভেবেই এসেছি আদর্শের কথা। এই ক্ষমতা নিয়ে মানুষ কি আদর্শবান হতে পারে?

পরের দিন সকালে মনীশের কোনো স্বপ্নের কথা মনে পড়েনি। তারা নিজেই চা নিয়ে এসেছিল। সকাল বেলায় উঠে তারা স্নান করেছিল। মাথায় ভিজে চুল জড়ানো ছিল। তারার আঁচলে কোনো চাবির গোছা নেই। নীহারের রঙিন শাড়ির আঁচলে বাঁধা থাকে রূপোর বাহারি রিঙে তেরো-চোদ্দটা চাবি। তারার ঘরে সিন্দুক আলমারি না থাক টিনের তোরঙ্গ বা কাঠের বাক্সও কি নেই? মার্কস সাহেবের তত্ত্ব গিলে মনীশ এতকালে যা বিন্দুমাত্র প্রমাণ করতে পারল না সেখানে মূর্তিমতী দৃষ্টান্ত হয়ে রইল তারাই।

চা খেতে খেতে মনীশ বলল, 'পতু কোথায়?' তারা বলল, 'ঘুমোচ্ছে। কাল

সারারাত ঘুমোয়নি, জ্বালিয়েছে।'

ভারি মিথ্যে হয়ে দাঁড়ায় সব কিছু। মূল্যবোধ তছনছ হয়ে যেতে কতক্ষণ। একেবারে শব্দহীনতায় ফিরে গিয়ে মনকে হাজার প্রশ্ন করলে ও সেখানে শুধুমাত্র নিরুত্তরের অন্ধকার। নিজেকে প্রতারক মনে হয়। মনের জমি খুঁড়ে আকুল হয়ে ওঠে জিজ্ঞাসা, তারা, তুমি কি নিয়ে বেঁচে আছো? এখন পাথরে মাথা ঠুকলে রক্ত ছুটবে কিন্তু পাথর ভেঙে ওলোটপালটের বন্যা তো আসবে না।

তারা বসে রইল মনীশের মুখোমুখি। আর তো রাত্তির নেই। চতুর্দিকে দিব্যি দিনের আলো। মনীশের বুকের ভিতরকার কলকব্জাসমূহ কি তারা দেখতে থাকল? মুহূর্তে তারার চোখ কি ভারি অলৌকিক প্রতিপন্ন হলো না?

ঘরে টানানো ছিল পতুর বাবার ছবি। চশমার চোখে এক পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী মুখ। ভাঙা-চোরা গাল। চওড়া কপাল।

ছবি ঘিরে কোনো ভক্তি শ্রদ্ধার ঘটা নেই। চন্দনের ফোঁটা নেই। মালা নেই। তবে ছবিটা যেন সময়মতো পরিষ্কার করা হয় তা বোঝা যায়। মনীশ বিমূঢ় হয়ে ওঠে। ভিন্ন গাঁয়ে বিরাট ন্যাংটা মাঠের ওপরে একটা বুড়ো মন্দিরের মতো তারার আস্তানা, গা-ভরা ঘামাচি নিয়ে সাড়ে-তিন বছরের পতু, পাগল দেওর রামু, নেড়ি কুকুর, আর এর মধ্যে অলৌকিক মনে হয় তারাকে, তবুও এটুকুতেই তো সব ক্ষান্ত নয়, নীহারের পোয়াতি চেহারাটা বার বার মনীশকে উত্যক্ত করে। পুরোনো দিন আজকের দিনের বিচারে কোনো সম্ভাবিত লক্ষণ নিয়ে হাজির হচ্ছে না। আর এখন সারাটা দিন ফুরোতে অনেক সময় বাকি। এই তো সবে রোদ উঠল। এইতো সবে তারা স্নান করল। তারার মাথার চুল এখনো ভিজে আছে। দূরের থেকে রেলগাড়ি ছুটে যাওয়ার আওয়াজ এল। সকালে শেয়াল ডাকল না। মাঠের গাছগাছালিদের বড় ম্রিয়মান মনে হচ্ছে। মনীশ চা খাচ্ছিল। এই সময় বিনুর কোলে চড়ে পতু এল। ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করছিল। তারা বলল, 'বিনু, তুই যা, জল তুলে ফ্যাল। আমি গিয়ে ভাত চাপাচ্ছি।' তার পর চোখের জলের শুকনো দাগ নিয়ে পতু ঘরের মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে রইল, শূন্য চায়ের কাপ ঘিরে মাছি ওড়ে, আর যেই পতু বলে উঠল 'কাকু' তক্ষুনি তারা হাসল, আশ্চর্য, পতু ফর্সা, হলুদ, হলুদ, পতুর শরীরে ক'ছটাক রক্ত আছে, মনীশের শরীরে রক্ত ছিল। সব রক্ত জমে ক্রমশ কি পাথর হয়ে যাবে?

এবার কথা বলল মনীশ। অন্তত পাঁচ-সাত মিনিট ধরে সে কথাগুলো সাজিয়েছে। সাজানো শব্দগুলি এবার ঠোঁটনাড়িয়ে উচ্চারিত করে ফেলল

মনীশ, সেই মনীশ, যার কাঁধে একবার দাঙ্গার সময় পুলিশের লাঠির আঘাতে সাপের খোলসের মতো দাগ তৈরি হয়েছে, যে চিরটা কালই 'মানুষের মঙ্গল' নামক শব্দটা নিয়ে ভেবে এসেছে, সেই মনীশ বলল, 'পতুর দায়িত্বটা আমি কিভাবে নেবো ভেবে পাচ্ছি না। আর সত্যি বলতে কি টাকাপয়সার জোর তো আমার নেই।'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল তারা। পরে সব ঘুচিয়ে তারা বলে উঠল, 'ছি ছি মনীশ, আমি যেন কি। পতুর ভাবনা আমার কাছেই থাকুক।'

পতুর সঙ্গে তারার মিল কতোখানি। পতুর মুখটা ভীষণ নির্বোধ, চোখটা তারার মতোই খয়েরী, ফ্রকের বোতাম নেই। পিঠটা খাঁ খাঁ, ঘামাচি, রোগা কাঁধ থেকে ফ্রকটা একদিকে কাত হয়ে গেছে। মনীশ চিরকালই ছোট ছেলে-মেয়েদের একা পেলে অসহায় হয়ে ওঠে। ভয় এমন থাকে যদি বাচ্চাটা বায়না ধরে। মনীশ খুব অসহায় বোধ করল। পতুর বাবার ছবিটার কাঁচে ময়লা, তারি ওপর দিয়ে সর সর করে আরশোলা ছুটে যাচ্ছে। গতকাল কেন হঠাৎ তারার মুখোমুখি হওয়ার ঘটনাটা ঘটল। তাই মনীশ দেখতে পেল নিজের নড়বড়ে কলকব্জাগুলো, টলমল অস্তিত্বটা। মনীশ কিন্তু জানতেই পারেনি দিনের পর দিন সে এইভাবে জীর্ণ হয়ে উঠেছে।

নীহার বউ মানুষের গয়নাগাঁটি দেখলে বিড় বিড় করে সোনার হিসেব কষে। কানেরটা পাঁচআনা না কতো। হাতেরটা আদপে সোনার কি না ব্রোঞ্জের। তারার হিসেব অন্যরকম।

মনীশের কাছে ঘড়ি ছিল না। চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে মনীশ দেখল সূর্য জ্বলছে। মনীশের কাঁধে একটা ঝোলা। এইভাবে বিদায়বেলার মুহূর্ত রচিত হলো। তারা বলল, 'এখান থেকে টানা কলকাতাতেই তো যাবে।' মনীশ বলল, 'হ্যাঁ, সেইরকমই তো ইচ্ছে আছে।' পতু মায়ের আঁচল জড়িয়ে কাকুর দিকে তাকিয়ে ছিল। এরি মধ্যে হঠাৎ সামনের বটগাছে নেড়ি কুকুরটাকে বেঁধে রামু একটা ছড়ি দিয়ে পিটতে শুরু করে দিল। সে-এক বীভৎস ব্যাপার। জ্বলন্ত রোদ্দুরের মধ্যে চিৎকার করে উঠছে একটা কুকুর। আর সেই সঙ্গে এক পাগল মানুষের উল্লাস। তার রাগ দপ্‌দপ্‌ করছে। সারা গায়ে জ্যাবজ্যাব করছে ঘাম। পতু তো ভয় পাবেই। তারা ঠায় কতোক্ষণ এমন চুপচাপ থাকতে পারে। মনীশ ভেবেই পেল না এই সময় তার কি করা উচিত। তক্ষুনি দড়ি ছিঁড়ে ল্যাজ তুলে কুকুরটা খাঁ খাঁ মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে কোথায় যে পালাল। পতুর অবিন্যস্ত

চুল ও রোগা কাঁধের ওপর দিয়ে মনীশের করতল ছুঁয়ে যায়। তখন রামু বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসে। স্থিরভাবে দোরগোড়াতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা। বার-তেরো বছর আগে মির্জাপুর স্ট্রীটের পার্টি অফিসের ছাদে তারা একবার ফিট হয়ে পড়েছিল। সাধন আর দুলাল ছুটে গিয়ে নিয়ে এসেছিল এককাপ গরম দুধ। চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতেই তারার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। দুধের কাপ দেখে বলেছিল, 'না, না, দুধ কি হবে। আমার কোনো কষ্ট নেই।' দুলুদা মারা গেছেন। সাধন এখন অষ্ট্রেলিয়াতে। পতু আর তারা!

কুকুরটা পালিয়েছে, রামুটাও। মনীশ মাঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ফাঁকা মাঠ, দূরবিস্তৃত, রৌদ্রময়, তারার দাঁড়িয়ে থাকা, পতুর লাজুক চাউনি, এক আকাশ আগুন, গাছপালার দল আর কি জনতার কথা মনে করায়, মির্জাপুর স্ট্রীটের পার্টি অফিসের ছাদে বারো-তেরো বছর আগে সেই-যে তারা বলেছিল, '...আমার কোনো কষ্ট নেই' তা বুঝি সারা জীবনের জন্যে বলে রাখা কথা। এই বাড়িটার পাশাপাশি আরো দু-তিনটে পরিবারের আশ্রয়। ভাঙাবাড়ি, ঝুলন্ত চটের পর্দা, পাকা বাড়ি নয়, কাঁচা দেওয়ালের গায়ে খড়ি দিয়ে ভূত পেত্নির ছবি আঁকা, 'ওখানে কারা থাকে?' মনীশ জিজ্ঞেস করল। তারা বলল, 'শ্বশুরবাড়ির জ্ঞাতিরা।' নতুন মানুষ দেখার জন্যে চটের পর্দার ফাঁকে, কাঁচা দেওয়ালে চোখের গর্তের মতো জানালায় কৌতুহলী কতক মুখ, সে-সব দেখে তারা বলল, 'ওদের সহানুভূতি নেই, কৌতুহল আছে।' এবং বলেই হেসে ফেলল, 'কথাটা কেমন বইয়ের ভাষার মতো বললুম।'

মনীশ দেখল মাঠ তেঙে ভূপতি আর মুরারি আসছে। কাল ওরাই মনীশকে এই আস্তানায় পৌছে দিয়ে গেছে। তারাও দেখল মাঠ ভেঙে ওদের আসা। মনীশ দূর মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল। রামু বত্রিশ পাটি দাঁত দেখিয়ে 'আমরণ' গোছের হাসি হেসে চলে গেছে। নেড়ি কুকুরটাও পালিয়ে গেছে। শুধু চারদিকে রোদ্দুর জলছে, খরার দিনের মতো, জনতার স্মৃতিরই সেইসব গাছপালা, বট বাবলা যে নামেরই হোক না কেন, সে-সব এখন পাঁচিলের দোসর। বিধাতায় কারই বা বিশ্বাস। তারারও নয়, মনীশেরও নয়। তবু কাল সন্ধ্যেবেলায়, সেই সবে তারার মুখোমুখি, তারার জ্ঞাতি কুটুমের বাড়িতে শাঁখ বাজল, দু-হাত জড়ো করে কপালে ঠেকিয়েছিল পতুই, সাড়ে তিন বছরের পতু, সে কি ভগবানের উদ্দেশে? সম্বিৎ জুটিয়ে দিন-দুপুরে মনীশ দেখল তারাকে, পতুকে, রক্তহীন, আস্তানা, আদ্যিকালের। কাঠ, রোদ্দুর আর রোদ্দুর। খরাকালের মতো হা হা শূন্য মাঠ পেরিয়ে এসেই বললো, 'চলুন, ওরা সব রেডি।'

মাঠের ওপর হাঁটতে থাকল ওরা। মনীশও। মনীশের মাথার চুল ওড়ে। রোদের গনগনে আঁচ দিগ্বিদিক জুড়ে। রগের ওপর দর দর করে গড়িয়ে পড়ে ঘাম। মনীশ পেছন ফিরে তাকাল না।

মানুষ মারলে এখন তদন্ত হয় না

কুশল লাহিড়ী

তার উপর নির্দেশ ছিল যেন সে, শিবু-শিবপদ মুখোপাধ্যায়, ১/১ রামকুমার লেনের কালীচরণ বিশ্বাসকে যত তাড়াতাড়ি, নির্দেশ পাওয়ার পরমুহূর্তে সম্ভব হ'লে তাই, খতম করে। সেই তরল অন্ধকারে হিমতুল্য শীতল বস্তুটি তার হাতে এলে সে পিস্তলস্পর্শের প্রথম অনুভবে ও নিকেশ করার ব্যাপারে যুগপৎ রোমাঞ্চিত ও কাঙ্ক্ষিত, কারণ এই প্রথম সে এমন একটি জিনিষের সঙ্গে, যা নাকি তার কল্পনায় কাঙ্ক্ষিত ছিল, শারীরিক ও মানসিকভাবে জড়িয়ে গেল, অথচ তখুনি শিবু 'কালীচরণকে খতম করবো কেন' এমন প্রশ্নে বিচলিত হয়ে যখন প্রশ্ন করার জন্য উন্মুখ 'প্রশ্ন করা এক্তিয়ারে নেই, শুধু আদেশ পালন, যে কোনও আদেশ' ইত্যাদি মনে পড়ার সঙ্গে কালীচরণের চেহারা তার পুরু গোঁফ ঈষৎ দীর্ঘ জুলফি ঠোঁট আলগা বেচারা বেচারা ভাব ভেসে উঠে মিলিয়ে যেতে 'তোমার পাড়ার, লোডেড্' শুনে বুঝল, শুধু লক্ষ্যের উপর তাগ্ ক'রে ট্রিগার টিপলেই তার কাম ফতে, যদিচ কালীচরণ শিবুর প্রতিবেশী নয়, তবু খুব দূরেও সে থাকে না। তাদের গলি পেরিয়ে যে বড় রাস্তা সেই রাস্তা ধ'রে ডানদিকে শ-খানেক গজ এগুলে বাঁদিকে প্রথম গলির প্রথম বাড়ির গায় আর একটা সরু গলির, অন্ধগলি, মাথায় ছোট্ট বাড়ির ভাড়াটে বা মালিক কালীচরণ একদিন ঐ বাড়ি বা ঐ গলি থেকে কালীকে বেরুতে দেখে এখন তার মনে হয় কালীচরণের বাড়িই ঐটে। কালীচরণের সঙ্গে তার পরিচয় কথাবার্তা হৃদ্যতা কিছুই নেই, অথচ কালীচরণকে তার গোঁফ ও জুলফির জন্য মনে রাখা কঠিন নয়, কারণ এ-ধরনের গোঁফ ও জুলফি সচরাচর কেউ রাখে না, ফলে কালীচরণকে একবার দেখলে ভোলা মুস্কিল। 'কিন্তু কালীচরণ এমন কি করতে পারে যার জন্যে' শিবু ভাবতে ভাবতে দিশেহারা, তখন 'আর ভাববো না' প্রায় মরিয়া হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে কিভাবে কখন কালীচরণকে নিকেশ করা যায় তার পরিকল্পনা ছকতে ছকতে কালীচরণের গতিবিধির উপর কড়া নজর রেখে তার গতিবিধি আচার-আচরণে একটা দুর্বলতা কোনোমতে বের ক'রে বা সঙ্গে সঙ্গে সেই দুর্বলতার সুযোগে

কাজ হাসিল করতে হবে ভাবলে সমস্ত শরীর কেমন চিনচিনাল, গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠতে সে নিজের আবেগকে সংযত করার জন্য 'মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে' ভেবে কিছুটা অসম্ভব হ'লে 'কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় একজনকে খতম করা কি সম্ভব' প্রশ্ন জাগতে সে আবার বিমূঢ়, তখন তাড়াতাড়ি সমস্ত ভাবনা চিন্তা ঝেঁটিয়ে বিদেয় করার জন্য অসময় বাড়ি ঢুকে কাগজ কলম টেনে নিজের বাড়ি থেকে কালীচরণের বাড়ি পর্যন্ত মোটামুটি একটা ছক আঁকতে চেষ্টা করল, এবং কিছু কাটাকুটির পর ছকটা দাঁড়িয়েছে দেখে মনে মনে খুশি হ'লে হঠাৎই প্যাণ্টের ডান পকেটে হাত চলে গেল। একটা ঠাণ্ডা বোধ অনেকটা মৃত্যুর মতো ঠাণ্ডা, শিবু অনেকদিন আগে এক বন্ধুর বাবার মৃতদেহ চিতায় তুলতে গিয়ে ছুঁয়েছিল, ঠিক সেই রকম ঠাণ্ডা হিম-হিম পকেটে রাখা পিস্তলের শরীর, যদিও এসময় পিস্তল পাওয়ার পর বহুক্ষণ কেটে গেলেও তা এতক্ষণ পকেটে থাকার ফলে পিস্তলের নল অন্তত ঠাণ্ডা না থাকারই কথা। 'একবার দেখলে কেমন হয়, পিস্তল শুদ্ধ হাত প্রায় বাইরে উঠে এসেছিল' ততক্ষণে কেউ দেখে ফেলার ভয়ে সেই দারুণ কৌতূহল চেপে এখন কি করবে দিশে না পেয়ে ডাকল 'বিশু।' বিলু তার ছোট ভাই, ক্লাশে টেনে পড়ে। কিন্তু বিশুকে ডাকার পর 'কেন ডাকলাম মনে হতে খানিক হাসল, 'যাক্, বিলুর কাছ থেকে কিছু জানা যাবে নিশ্চয়' ভেবে ঘর থেকে পা বাড়াতে বিলু হাজির। বিশুকে দেখে হঠাৎ কি করে বিশুকে কালীচরণের কথা জিজ্ঞেস করবে ঠিক বুঝতে না পেরে তুম্ ক'রে প্রশ্ন করল, 'কালীদা কি তোদের ক্লাবের মেম্বার ?' তার উত্তরে 'কোন্ কালীদা' শুনে 'সেই রামকুমার লেনের' তখন বিশু 'রামকুমার লেনের ?' বিশুর প্রশ্ন শুনে 'হ্যাঁ হ্যাঁ রামকুমার লেনের। কালীচরণ বিশ্বাস' বিশু তখনও ঠাহর করেনি বুঝে 'আরে কালীচরণ। কালী বিশ্বাস' তার আগেই বিশু 'গুঁফো' বললে বিশুর সঙ্গে শিবু-ও হেসে উঠল। হাসি থামলে বিশু 'বিশ্বাসদা লোক খুব ভালো, কারু-র সাতে পাঁচে থাকে না। আমাদের ক্লাবের একজন একটিভ্ মেম্বার' তখন শিবু 'বিশ্বাসদা করেন কি ?' বিশু-র দৃষ্টি এধার সেধার করলে 'টিচার নাকি ?'-র উত্তরে 'না' শুনে 'তবে কি ?' এমন বিরক্তি প্রকাশ করলে বিশু আমতা আমতা করে 'তাইতো, তাইতো' তখন শিবু 'বিয়ে করেছে ? তার উত্তরে 'না' শুনে শিবু বিশুকে এড়াতে চাইলে বিশু 'খুব চা সিগারেট খান' শুনে 'নাকি' বলার আগেই বিশু 'সর্বদা অলিম্পিয়ায় থাকেন।' বললে 'অলিম্পিয়ায়, সর্বদা' মনে মনে আওড়ালে সে যেন কালী সম্বন্ধে কি একটা পেয়ে যায়, তাই অলিম্পিয়া

রেস্টুরেণ্টে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গিয়ে ঠারেঠোরে কালীচরণসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তার দৈনিক রুটিন খাওয়া-দাওয়ার লিস্ট বিশেষ কাজ-কর্মের বিবরণ তার চাকরির স্থল ইত্যাদি জানা দরকার, এবং কালী কোনসময় একেবারে একা থাকে সেই সময়টি জানা সবচেয়ে জরুরি, কারণ ঐ সময়ে গিয়ে নিঃশব্দে চকিতে কাজ সেরে সেই ঘরে যেখানে তরল অন্ধকার অস্পষ্ট ছায়াছায়া আলো, গিয়ে বলতে হবে, 'আরও কাজ দিন, একা করার কাজ।' অতএব এবার শিবু বিশুকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে পাশ কাটাবার চেষ্টা করলে বিশু 'হঠাৎ মাস্টার-দার কথা জিজ্ঞেস করলে যে' সে 'মাস্টার-দা' শুনে অবাক হোলে বিশু 'ক্লাবের সবাই বিশ্বাস-দাকে মাস্টার-দা বলে' বলতে সে 'মাস্টার-দা, সূর্যসেন' বলে জানিয়ে দিতে চাইল যে এখন আর তার বিশুকে দরকার নেই, এবং প্রায় ঠেলে বিশুকে সরিয়ে নেমে এলো রাস্তায়।

তারপর নানা জায়গা ঘুরে কয়েকজনের সঙ্গে ঠারেঠোরে বা সরাসরি কথা কয়ে যেমন অলিম্পিয়ার ম্যানেজার জিতেনবাবু ঐ দোকানের বয় মাখন কালীদের পাড়ার একটা দশ-এগারো বছরের ছেলে পেট্রোলপাম্পের বন্ধু ইত্যাদি—সে কালীচরণ সম্বন্ধে যে-তথ্য ও সংবাদ জোগাড় করল তা এই :

কালীচরণ বিশ্বাস স্বর্গীয় রামচরণ বিশ্বাসের দ্বিতীয় পুত্র। রামচরণের জ্যেষ্ঠ পুত্র মাত্র চার-বছর বয়সে ডিপথিরিয়ায় মারা যায়, ফলে রামচরণ ও মন্দোদরীর দারুন আদরে মানুষ হয় কালী। কালীর পর রামচরণের রাধা ও লক্ষ্মী নামে দুটি কন্যা হয়, বর্তমানে উভয়ে বিবাহিত এবং স্বামীর ঘরে বসবাসকারী। রামচরণ ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ করেন, কিন্তু অকস্মাৎ সন্ন্যাসরোগে তাঁর মৃত্যু ঘটে। ফলে রামচরণের বিষয়-আশয়ের সমস্ত কিছুর ভার পড়ে কালীর উপর, কিন্তু কালীর বিদ্যাচর্চার দিকে বিশেষ মনোযোগ থাকায়, সেই অবসরে রামচরণের বিশ্বস্ত কর্মচারীরা ব্যবসায়টিকে লাটে তুলে দেয় অচিরে, কালী তখন ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্র। কালীচরণের বিদ্যানুরাগ ও বিষয়-আশয়ের প্রতি উদাসীনতা লক্ষ্য করে কালীর মা মন্দোদরী তার বিয়ের ব্যবস্থা করেন, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েই সে দারপরিগ্রহ করে (এ-ক্ষেত্রে বিশুর খবর ভুল), বর্তমানে সে দুটি সন্তানের জনক।

কালীচরণ লম্বায় পাঁচ ফুট সাড়ে-পাঁচ ইঞ্চি, ওজন একশপঁয়ত্রিশ পাউণ্ড, রঙ শামলা হলেও উজ্জ্বলের দিকে, মিতভাষী এবং সাধারণভাবে আড়ম্বরপ্রিয় নয়। চা ভালোবাসে, তবে সিগারেট একদম খায় না (এ-বিষয়ে বিশুর খবর ভুল), তবে চা-র সঙ্গে আলুরচপ ও বেগুনি খেতে ভালোবাসে, এই দুটি জিনিষ

অলিম্পিয়ায় খুব ভালো তৈরি হয়। আজ পর্যন্ত সে কারুর সঙ্গে ঝগড়া করেনি, তার ব্যবহারও অমায়িক। কালীর বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা নেহাৎ কম, নেই বলাই ভালো। জানা-শোনার সঙ্গে তার বাক্যালাপ 'কেমন আছেন' 'ভালো তো' 'আজ বেজায় গরম' ইত্যাদি মধ্যে সীমাবদ্ধ, কেবল ক্লাব-লাইব্রেরীর দু-একটা ছেলের সঙ্গে মাঝেমধ্যে চপ খায়, নইলে একাই আসে।

কালীচরণ খুব ভোরে প্রায় পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে বিছানায় থাকা অবস্থায় শীর্ষাসন ও শবাসন করে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট একঘণ্টা ধরে, তারপর বিছানায় বসে থাকে নিস্পন্দ নিশ্চুপ কিছুক্ষণ, তারপর প্রাতঃকৃত্য সেরে স্নানের পর চলে আসে অলিম্পিয়ায়, কারণ ওদের বাড়িতে চা-র পাট নেই। অলিম্পিয়ায় পরপর দু-কাপ চা ও একটি রুটি কিংবা সার্কাস জাতীয় বিস্কুট খেয়ে কোথায় বেরিয়ে পড়ে তা কেউ সঠিকভাবে বলতে পারে না। কেউ বলে টিউশনিতে যায়, কেউ বলে সে কিসের দালালি করে, তারই ফিকিরে বেরিয়ে পড়ে ঐ সকালে। তবে বেলা সাড়ে-নটা দশটায় আবার তাকে দেখা যায় অলিম্পিয়ায়, সেখানে ঘণ্টা দেড়েক দুয়েক কাটিয়ে ফিরে আসে বাড়ি। খেয়েদেয়ে আবার সে বের হয়, কেউ বলে সে সারা দুপুর ঘুমোয়, আবার বের হয়। কিন্তু কোথায় যায় কেউ ঠিকমতো বলতে পারে না, অথচ সন্ধ্যার পর সাতটা সাড়ে-সাতটায় সে ক্লাবে হাজির হবেই হবে ঝড়-জল-শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে, তারপর ন-টায় বাড়ি ফেরে, এখন যে-বাড়িতে থাকে তার সামনের দুটি ঘর কালীদের, বাড়ির বাকি অংশটি এক জ্ঞাতি-কাকার কবলে।

কালীচরণ নির্বিরোধ ভালোমানুষ কারুর সাতেপাঁচে নেই ইত্যাদি বিষয়ে সকলে একমত হওয়ায় শিবু খানিকটা বিমূঢ় ও বিচলিত হয়, কারণ একজনকে খতম করতে গেলে হত্যাকারীর অন্তত রক্ত গরম হওয়ার মতো কিছু কারণ থাকা চাই। অথচ এ-ক্ষেত্রে সংগৃহীত তথ্য ও সংবাদ তন্নতন্ন বিশ্লেষণ করে যে-কটি দুর্বলতা খুঁজে পায় (এক, অত্যধিক চা-পান, দুই, চপ ও বেগুনি ভালোবাসা, তিন, শীর্ষাসন ও শবাসন করা) তার সবকটি একজনকে একটা চড় মারার পক্ষেও যথেষ্ট নয়, কিন্তু দল যখন ভার দিয়েছে এবং এ-পাড়ায় বিশেষ ঐ লোকটিকে বেছেচে তখন নিশ্চয় লোকটি ভালো নয়, এবং তখুনি শিবুর মনে পড়ে 'আচ্ছা কেউ তো বলতে পারলো না কালী কি করে, তবে কি সে টিকটিকি?' সঙ্গেসঙ্গে ধারণাটা তার বদ্ধমূল হোলে 'খতম করো' স্লোগান সমস্ত রক্তকে চনচনিয়ে দেয়—'দালালকে হালাল করো' 'মারকে বদলা মার, খুন কা বদলা খুন',

শুধু রিভলবার তুলে ট্রিগার টেপার অপেক্ষা। এতদিন সে এই দিনটির অপেক্ষায় ছিল, দলের অনেকেই অ্যাকশানে গেছে, সেও; কিন্তু এবার একা তার মানে 'আমি এখন রেসপনসিবল মেম্বার' এবং তা ভেবে সে আনন্দে শিহরিত হোলে তার যে সম্মান পার্টির অন্যান্য-র কাছে বেড়েছে মনে হতে আবার পুলক বোধ করল। 'হাঁ একটা কাজের মত কাজ, প্রতিক্রিয়ার হাত যারা শক্ত করছে, প্রতি-ক্রিয়াকে ধ্বংশ করতে হোলে সবচেয়ে দুর্বল জায়গায় ঘা মারতে হবে' ভাবার পর 'কিন্তু কালীচরণকে মেরে কি হবে। দু-একটা খুনেই কি গোটা ব্যবস্থা পালটানো যাবে?' প্রশ্ন উঠলে সে কিছু বিচলিত, কিন্তু ততক্ষণে সমস্ত দুর্বলতা মোচন করে 'লীডার কখনও ভুল করতে পারেন না' এমন সিদ্ধান্ত মনের মধ্যে সজোরে ঢুকিয়ে শিবু হাঁফাতে থাকে, আর হাঁফাতে হাঁফাতে সে একসময় হতাশায় ভেঙে পড়লে অনেক রাতে দু-একজন 'নন্‌কমিটেড' বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মেরে বাড়ি ফিরে না খেয়ে নিজের শোয়ার ঘরের দিকে পা চালালে 'শিবু, এত রাত হলো যে' মা-র গলা শুনে হতভম্ব ও অবাক, কারণ মা কোনোদিন এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন না। 'তবে কি মা জেনে ফেলেছেন?' ভাবতেই প্যাণ্টের পকেটে হাত গেলে বস্তুটি যথাস্থানে আছে জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে খামকা হাসল, 'এই আর কি।' পাশ কাটাতে চাইলে মা 'তোর চোখ-মুখ যেন কেমন মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই জ্বর কিংবা' বলতে বলতে কাছে এসে কপালে বুকে হাত দিয়ে দেখতে থাকলে 'তোমার যত ভয়' বললে মা 'তবে খেলি না যে বড়' বলতে সে 'ও' এই অব্যয়-ধ্বনিতে মাকে পাশ কাটিয়ে মা-র দুশ্চিন্তা উড়িয়ে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলো।

এখন সে একা, শোয়ার ঘরে। আবার সে কালীচরণের যাবতীয় কাজকর্ম দৈনিক রুটিন কর্মপদ্ধতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দুর্বলতা বের করার চেষ্টায় যখন নাজেহাল তখন চকিতে 'পিস্তলটা দেখলে কেমন হয়' মনে হোলে সে ওই বন্ধ ঘরের চার-পাশে কেউ আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য খাটেরতলা দেরাজের ভেতর ইত্যাদি সম্ভব-অসম্ভব জায়গাগুলো দেখে নিল, তারপর প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পিস্তলের হিমহিম ঠাণ্ডা ছোঁয়া পেতে নিমেষে কেমন বদলে যেতে থাকল—এই পিস্তল তার জীবনে প্রথম মর্যাদা বহন করে আনছে, এই পিস্তলের ঘায়ে সে একজনকে ধরাশায়ী করবে, এই পিস্তলের সাহায্যে এতবড় একটা দায়িত্ব সফল ভাবে সম্পন্ন করতে পারলে দলের অন্যান্যদের কাছে তার মর্যাদা হাজারগুণ বেড়ে যাবে। কিন্তু পিস্তল বের করে যে দেখবে তাতে ভরসা পাচ্ছে না, কারণ পিস্তল বের করে দেখার অর্থ নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা জানানো, যেহেতু "অবিশ্বাস করা

শত্রুতার সমান, নেতার নির্দেশ বিনা দ্বিধায় পালন করতে হবে" সেই অমোঘ উপদেশের কথা স্মরণে এলে সে মনেমনেই আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যুক্তি খাড়া করতে চাইল, অথচ কোনও যুক্তি আপাতত খাড়া করতে পারল না দেখে প্রায় হাল ছেড়ে জামা-প্যাণ্ট না-বদলে শুয়ে পড়ল। 'পারবো কি ?' সংশয়, এবং সংশয় কাটানোর জন্য নানা চিন্তার চেষ্টা কিন্তু কোনো চিন্তাই দানা বাঁধছে না, অতএব সে বাতি নিবিয়ে দিলে আচমকা অন্ধকার তীব্র হয়ে তরল হয়ে গেল, যেহেতু শোয়ার ঘরের কাচের ভেন্টিলেটার দিয়ে রাস্তার নিঅন আলো ঘরে ছড়িয়ে পড়তে থাকল, এবং সে ঐ অবস্থায় আগামীকাল কাজ শেষ করে সেই ঘরে গিয়ে কি বলবে তার পরিকল্পনা ছকলে 'তাহলে কোনসময় কালীকে খতম করব' মনে হতে উঠে বসেই সুইচ অন করল।

এবার কাগজ-কলম নিয়ে সেই ম্যাপ ও সংগৃহীত তথ্যাদিসহ শিবু গভীর মনোযোগে নিজের বাড়ি থেকে কালীচরণের বাড়ি পৌছতে কত সময় লাগবে ও কোনসময় গেলে সহজে ও অব্যর্থভাবে নিকেশ করতে পারবে তাই পরীক্ষায় রত হলো। কাগজ-কলম না টানলে মাথা খোলে না, অথচ কাগজ-কলম টেনে নিয়ে এত রাতে লাইট জ্বালিয়ে কাজ করলে কেউ সন্দেহ করবে মনে হতে সে একবার বাথরুম যাবার অজুহাতে দরজা খুলে সারাবাড়ি অন্ধকার দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে দরজা বন্ধ করে নিজের পরিকল্পনায় মন দিল। 'এখান থেকে কালীর বাড়ি যেতে ম্যাকসিমাম', শিবু মনেমনে একবার এ-বাড়ি থেকে রামকুমার লেন পাক দিয়ে এলো, 'হাঁ মিনিট পাঁচ-ছ, আচ্ছা দশ মিনিট ধরা যাক', তারপর ঐ দশ মিনিট সময় হাতে রেখে তন্নতন্ন খুঁজে সে দুটি সময় বের করল—এক, স্নান সেরে যখন কালী অলিম্পিয়া যাবার জন্য প্রস্তুত হয়; দুই, যখন সে রাত্রে বাড়ি ফিরে খাওয়ার আগে বিশ্রাম নেয়। এই দুটি সময়ে কালীচরণকে নিশ্চিত ভাবে বাড়িতে পাওয়া সম্ভব, 'আচ্ছা যদি রাস্তায় একলা পাই' লহমায় মনে পড়লে রাস্তায় কাজ সারার বিপদ আছে বুঝে সে সকাল ও রাত্রের সময় দুটিকে যথার্থ সময় ভেবে কিছুক্ষণ আঁক কষে বের করল যে, সকালে যদি যায় তবে পৌনে সাত থেকে ছ-টা পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে, আর রাত্রে গেলে নটা বাজার মিনিট পাঁচেক আগে গেলেই চলে। কিন্তু সকাল ও রাত্রের মধ্যে কোনসময়টা বিশেষ সুবিধের তা ঠিক বের করতে না পেরে সে লটারী করার জন্য দুটো কাগজ ছিঁড়ে একটায় 'স' এবং অন্যটায় 'র' লিখে গুলি পাকিয়ে নিজের সামনে ফেলে চোখ বুজে খানিকক্ষণ গুলি দুটো হাতড়ে একটা তুলেই চোখ মেলল,

কাগজটা খুলে ধরতে দেখা গেল—স। 'আমি যা ভেবেছি ঠিক তাই' শিবু আনন্দে ফুলেফুলে উঠছে, 'কাজটা তাহলে নির্বিঘ্নে শেষ হবে', সে যেন হাততালি দিয়ে জানিয়ে দিতে চাইল, তখন 'সংযম জীবনের শ্রেষ্ঠ মূলধন' মনে হতে একটু দমে গিয়ে আবার ম্যাপের উপর দৃষ্টি সংযোগ করল। 'এই কাজের সাফল্যের উপর আমার ভবিষ্যত নির্ভর করছে' ভাবতে ভাবতে আবার সে হিসেব কষে কষে পাতা ভরিয়ে ফেললে পাতা ওলটানোর সময় নজর পড়ল প্যাণ্টের পকেটে, পকেটটা প্যাণ্টের সঙ্গে যথাসম্ভব মিশে আছে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে হালকা বোধ করল, তারপর হাই তুলে তুড়ি মেরে এবার আরও গভীরভাবে মনঃসংযোগ করার চেষ্টা করল যাতে তিলমাত্র ভুল না হয় সময় এবং কাজের। 'কিন্তু উন্টে কালী যদি আমায় আক্রমণ করে', শিবু থমকালো, এবং সে এবার নিজেকে দেখল রক্তের স্রোতে ভাসমান একটা শব হিসেবে, যার মাথা বিদীর্ণ হয়েছে, বুক ঝাঁঝরা আর শতশত মাইল বেগে রক্ত বেরিয়ে এসে তার সমস্ত শরীরকে বিকৃত করে দিচ্ছে, শিবুর শরীর বেঁকেবেঁকে দুমড়ে-মুচড়ে নানা জ্যামিতিক আকারে পরিণত হলে, শিবু সেই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে চোখ বুজে চিৎকার করে উঠবে, তেমন সময় খেয়াল হলো সে নিজের ঘরেই আছে এবং সেখানে কেউ নেই। 'আমি কাপুরুষ, নাহলে এসব ভাবতাম কখনো', নিজেকে চাবুক মেরেমেরে সে চাঙ্গা করতে গিয়ে বুঝল, নেতা হওয়া কি কঠিন ব্যাপার। 'যাকৃগে যাক্', সে কোনোমতে নিজের দুর্বলতা কাটালো এইসব কথা ভেবে 'শ্রেণীশত্রুকে খতম করতেই হবে' 'প্রতিক্রিয়ার হাত যারা জোরদার করে তাদের রেহাই নেই' 'আমরা আনবো নতুন দিন' 'বিপ্লবের অগ্নিশিখায় সবাইকে আহুতি দিতে হবে' ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং সে অচেতনেই আবার কাগজে-কলমে মন দিয়ে তার পরিকল্পনা রূপায়ণে ডুবে গেল। বাইরে তখন কড়া নাড়ার শব্দ ও শিবু শিবু ডাক। চোখ মেলে চাইতে ঘরে আলো দেখে 'এত রাত্রে আবার কে' বিরক্তিতে ওঠার সময় অবশ্য খেয়াল করে সে অতিদ্রুত কাগজপত্র তোষকের নিচে চালান দিয়ে ঘুমের জড়তা কাটানোর চেষ্টায় চোখেমুখে দু-তিনবার হাত বুলিয়ে দরজা খুলতেই সামনে মাকে দেখে তার চোখ ছোট হয়ে তীক্ষ্ণ হলো। 'লাইট জালিয়েই রেখেছিলি ' তারপর ' একটা ছেলে ডাকছে' তত্‌ক্ষণে শিবুর খেয়াল হলো ভোর হয়েছে, 'ক-টা বাজে মা'-র উত্তরে 'ছ-টা কুড়ি' শুনে সে অতি নিশ্চিন্তে 'এত সকালে আবার কে ?' তখন মা 'কে এক রতনবাবু নাকি পাঠিয়েছে' শুনে 'রতনবাবু' বিস্ময়ে শিবু কিছুটা বিচলিত হয়ে সামলে নিল 'ওঃ তাই বলো।'

আসলে সে রতনবাবু নামে কাউকে চেনে না, নিশ্চয় পার্টির কেউ, কারণ গুপ্ত সংস্থার সভ্যদের আসল নাম থাকে না, একএক সময় একএকটা নাম নিতে হয়। অতএব সে ঐ অবস্থায় চলে এলো বাইরের ঘরে। আসার সঙ্গেসঙ্গে ছেলেটি কোনও কথা না বলে একটা কাগজ গুঁজে দিয়েই চলে গেল। কাগজের ভাঁজ খুলে দেখল, অ আ, তার মানে কাজ শেষ করেই দেখা করো। লেখা দেখে সে খানিক বিরক্ত হলো। 'এতো আমারই কাজ, দেশের জন্য দশের জন্য যখন কাজে নেমেছি', আপন মনে বিজবিজিয়ে 'আমাকে তৎপর হতে হবে' এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত বিরক্তি কাটিয়ে চলে এলো নিজের ঘরে তৈরি হবার জন্য, কারণ সাতটার আগেই তাকে রওনা হতে হবে কালীচরণের বাড়ির দিকে। কোনোমতে মুখ ধুয়ে মাকে এড়িয়ে (মা-র সঙ্গে দেখা হলে কথা বলতে হবে অনেক তাই দেরী হয়ে যাবে) কোনোমতে বাবার ঘরে ঢুকে টুক করে ঘড়ি দেখল, 'ছটা পঁয়ত্রিশ।' সে একবার এমনি 'অনন্ত' বলে ডেকে চা পাওয়া যায় কিনা দেখার ইচ্ছায় মুহূর্ত-খানেক অপেক্ষা করল, এবং অনন্তর উত্তরের অপেক্ষা না করেই নেমে এলো রাস্তায়। আর রাস্তায় নামতেই এবার সে সেই মেজাজ ফিরে পেলো যে-মেজাজে দেশের জন্য দশের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়া যায়।

তখন তার হাফ প্যান্টের ডানপকেটে, হাতের মুঠোয় পিস্তল, 'আমি একটা কাজের মত কাজ করতে যাচ্ছি, দলের কাজ, নেতার হুকুম,' কিন্তু একটু এগুতে খেয়াল হলো, এভাবে প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে রাস্তায় হাঁটলে লোকের সন্দেহ জাগবে এবং এভাবে যাওয়া শোভন নয় অন্তত এখন। বড়রাস্তায় পড়তে একটা জীপ্ গা ঘেঁসে চলে গেলে সে ডানদিকে পা চালালো। এখন রাস্তা ফাঁকা, ক্বচিৎ দু-একজন পথচারী কাছে বা দূরে আসছে কিংবা চলে যাচ্ছে। শিবু একবার পেছন ফিরে দেখল—দূরে রাস্তার পাশে একটা লরি দাঁড়িয়ে আছে, একটা লোক দোকানের ঝাঁপ খুলছে, তার একটু কাছে একজন লোক তার দিকেই এগিয়ে আসছে। শিবু এবার সামনে তাকাল—দূরে 'আসাম ওএল' লেখা ও তার গণ্ডার, দুজন এদিকপানে আসছে, ডানদিকের দোকান বেয়ে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে রাস্তায়। সে এবার নিশ্চিন্ত হয়ে দৃঢ়ভাবে পা ফেলতে ফেলতে এগুতে থাকল। পীচের রাস্তার সঙ্গে তার জুতোর শব্দ 'বিপ্লব আকাশে বাতাসে' তারপর একটা লরি দুমদাম শব্দে পাশ দিয়ে চলে যেতে 'গ্রামে গ্রামে বন্দরে বন্দরে মানুষের জাগরণ, লক্ষলক্ষ মানুষ' সে তাকাল অর্থহীনভাবে তখনও লরির ধাক্কায় রাস্তা কাঁপছে 'হিংসার বদলে হিংসা, সশস্ত্র বিপ্লব, আমরাই

পৃথিবীকে মুক্ত করবো' দূরে কয়েকটা কাক কা-কা রব তুললে 'শোষণমুক্ত দুনিয়া, স্বাধীন পৃথিবী' ততক্ষণে একজন পথচারীর পাশ দিয়ে চলে যেতে তার চটির শব্দ খসরখস্ 'আমরা নতুন পৃথিবী গড়বো' এবার শিবুর চলার বেগ দ্রুত হলো পীচের সঙ্গে জুতোর শব্দ উঠছে নামছে 'প্রতিক্রিয়ার চক্র চূর্ণ করো, কেউ রুখতে পারবে না আমাদের গতি, আমরা অজেয়' সেই সময় আরও কিছু শব্দ কোলাহল তুলতে সে সেই কোলাহলের উৎসে তাকাতে দেখল, একটা বাচ্চা ছেলে টিন বাজাচ্ছে আর তার সামনে কয়েকটা পাখি। দূরে ঘূর্ণ বেজে উঠতে শিবু সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখল যে সে রামকুমার লেন পেরিয়ে কয়েকগজ এগিয়ে এসেছে, মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াতে তার রক্ত যেন ফুটতে থাকল টগবগিয়ে 'হাঁ একটা গুলি' এবং সে বুকে হাত দিয়ে বুকের স্পন্দন স্বাভাবিক করার জন্য কয়েক সেকেণ্ড চুপ দাঁড়িয়ে থাকল গলির মাথায়, তখন একটা 'টুং' শব্দ শুনে সাতটা বাজে ভাবতে চকিতে প্রায় ছুটেই এসে দাঁড়াল কালীচরণের দোরগোড়ায়।

তখন তার বুকের স্পন্দন দ্রুত।

টোকা মারল আস্তে আস্তে।

উত্তর নেই।

একটু থেমে জোরে টোকা মারল, তবু উত্তর নেই। 'তবে কি কালী বাড়ি নেই' একটা আশঙ্কা, এবার টোকাগুলো আগের বারের চেয়ে জোরে।

উত্তর নেই।

শিবুর ভ্রূ কোঁচকালো, বিরক্তি। 'থেকেও খুলছে না নাকি,' এবার শরীর উষ্ণ এবং টোকার পরিবর্তে কড়া নাড়া।

কোনও সাড়া নেই, শব্দ নেই।

তখন শিবুর রক্ত ফুটতে শুরু করেছে, এবং কড়া নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাক 'কালীচরণবাবু বাড়ি আছেন, কালীবাবু।'

নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল।

শিবুর চোখের সামনেই পুরু গোঁফ ও ঈষৎ দীর্ঘ জুলফি।

'কাকে চাই?'

'আপনাকে।'

'আমাকে।' কালীর স্বরে বিস্ময়, তারপর স্বাভাবিক 'ও', একটু থেমে, 'আসুন আসুন।'

দরজা থেকে কালীচরণ পিছন ফিরে 'বসুন' বলেই চকিতে শিবুর মুখোমুখি

হলো, ততক্ষণে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো শিবুর হাত চলে গেল পকেটে। এবং ততোধিক দ্রুততায় গর্জে উঠল, 'হ্যাণ্ডস্ আপ্।'

বলার সঙ্গেসঙ্গে কালীচরণের হাত উঠে এলো এবং একই সঙ্গে শিবুর পিস্তল ধৃত ডানহাত কালীচরণের দিকে তাগ্ করল।

'দেশের জন্য দশের জন্য আমি আপনাকে—,' শিবুর বাক্য শেষ করার আগেই একটা দারুন শব্দ, গুলির সেই শব্দের সঙ্গে একটা বিরাট চিৎকার আর সেই শব্দ ও চিৎকার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে মিলিয়ে যাবার আগেই প্রায় রিভলভার থেকে গুলি বেরুবার সঙ্গেসঙ্গে শিবু মেঝের উপর পড়ে গেল সশব্দে, তার হস্তধৃত পিস্তলটা দূরে খেলনার মতোই পড়েছিল আর 'শালা হারামি, জানে না 'এস, বি'-র কাছে সর্বদা মাল থাকে,' একটা ফিসফিসানি ধীরেধীরে উঠে 'মানুষ মারলে এখন তদন্ত হয় না' এমন কোলাহল তুলে শিবুর দেহ ঘিরে উড়ে উড়ে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে থাকল, ততক্ষণে শিবুর দেহ এঁকেবেঁকে দুমড়ে-মুচড়ে রক্তে-ঘামে নানা জ্যামিতিক আকার নিতে নিতে স্থির হয়ে গেছে।

শোকের মধ্যে বাঙলাদেশ

দুর্গাদাস সরকার

রামগতি, ভোলা, বরজব্বর, হাতিয়া আর কই ?
দৃশ্য-দৃশ্যান্তর শুধু চিহ্নহীন, সমান সমান
সব, সমতল জলে হিন্দু, বৌদ্ধ, কে মুসলমান ?
কুটিল ও কালো স্রোতে তা তা থৈ তাথৈ তাথৈ।
কে ছিলি সুপারি বনে ? নারিকেল গাছে ? কে যে কার ?
লুব্ধ দরিয়ার বুকে নেই বৃদ্ধ মাঝিদের পাল।
নিঃশব্দ ক্রন্দসী থেকে বন্দিনীর সামাল সামাল
ধ্বনিতে জলের তলে কাঁদে যেন চোদ্দ লক্ষ হাড়।

তারই জন্যে বুকফাটা শোক। তবু অন্ধকার নয়।
কারণ যা হারাবার ফুরোবার নয়, তা আমার
তা তোমার মধ্যে আছে। একান্ত আপন পরিবার
ভেঙে দু টুকরো হলে এক হয় বিপন্ন হৃদয়
প্রকৃতির ক্রূর হাস্যে ফিরে এসে আবার সঙ্গতি।
সেই দ্বীপগুলি খোঁজে আমাদের সন্তান-সন্ততি।

কবিতা

রবীন সুর

যেখানে সূর্যাস্ত নেই কিংবা রাত্রি নক্ষত্রের অমেয় যৌতুকে
হাজার মাইল ব্যাপ্ত জ্যোতির্ময় আকাশের সীমা
তুমি তার কতটুকু অন্তর্গত রহস্যের ধ্বনিত প্রতীকে
আরোপিত ব্যবহার
সমস্ত দুর্জ্ঞেয়তম পিপাসার ঘুমন্ত কোরক
কতিপয় চিত্রকল্প অনুমেয় শব্দের অভিধা
কতটুকু উন্মোচনে পেয়েছে বিকাশ

কেবা জানে কাকে বলে অভিজ্ঞতা
কার নাম বিষয়ের মৌলিক ধারণা
জীবন যৌনতা মৃত্যু যোগ্যতার উদ্বর্তন আপাতত যার চতুর্দিকে
যে কেবল একা একা
অন্ধকার পার হয়ে কিছুক্ষণ অলৌকিক আলোর সীমায়
তারপর পুনর্বার লোকায়ত দুর্গতির অন্ধকার অস্তের পশ্চিমে

হয়তো সঠিক কোনো শ্রোতা নেই নিকটে বা দূরে
কিংবা তার সমগ্র সংলাপ
উত্তরের অপেক্ষা না রেখে
যখন যে দিকে খুশী ভবঘুরে ইচ্ছার বিলাস

দিগ্বিদিকে কেউ নেই অথবা প্রত্যেকে আছে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত
জেনে কোনো লাভ নেই   কেবল স্বগত
উচ্চারণে অন্তরঙ্গ অনুভব জানিয়ে যাওয়ার
বীতনিদ্র অভিপ্রায়ে দিনগুলি রাতগুলি শিল্পায়িত ভাষার উৎসার।

আত্মকথন

শিশির সামন্ত

যেজন সাগর চেনে সেই তো ভরায়
অনেক ভঙ্গুর নৌকা
সময় উজানী স্রোতে, যে সমুদ্র
মুখে ফেণা তোলে, ও তটিনী
তটের সমুখে গড়ে নিপুণ রঙ্গভরা
যে ঢিবি এ শিশুরাই ;
হাসে বুঝি সমুদ্র তা দেখে।

বাঁশের কেল্লাও ভাঙে অবশেষে
সে' তিতুমিরের,

অনেক হাজং ব্যর্থ, কাকদ্বীপে
অনেক অহল্যা মা কাঁদে

আজ এই চিতাশালে উসকিয়ে আগুন
খুঁজে ফিরি
এ ওর স্বামী, এ ওর ভাই ;
গার্হস্থ্য কল্যাণে ছিল
বংশলতিকার মতো সাংসারিক ভিতে।

সময়ের অবিসম্বাদী, আজ এই কোন
উলুধ্বনি, বেজে ওঠে শাঁখ ?
শিব তরায়ের দেশে যে ছলনা
ডেকে নিয়ে গেল তাকে ;
সুমন ফেরে না বুঝি আর।

পাগলিনী কাঁদে অম্বা,
যে যন্ত্রবিভূতি ওই দেখা যায়
বাঁধ,
মুক্তধারাকে বাঁধে ;
অলৌকিক আত্মম্ভরী যে প্রবাহ বয়ে যেত
জনস্রোত, অস্তিত্ব উন্মাদ।
ইতিহাস স্থির হয়ে মাঝে মাঝে ঘটায় প্রমাদ।

আর এক সূর্য

মনোমোহন দত্ত

তোমাদের রথ আজ অনায়াসে উড়ে যায় চাঁদের আকাশে ;

দুরন্ত পায়ের চিহ্নে আঁকো সে ধূলায়
পৃথিবীর কোনো কথা ?—
　　　　　　সভ্যতা বনাম
সে কোন নূতন পরিণাম !

যে অশান্ত ঘূর্ণীহাওয়া ছোটে
আটলান্টিক পার হয়ে টংকিং সাগরে—
তারই বেগে উদ্ধত নিশান
উড়াও নিবাত শূন্যে গ্রহ থেকে দূর গ্রহান্তরে।

কী পেলে চাঁদের দেশে ?
কী এনেছ ?—মুঠি মুঠি ছাই! অনেক সোনার দামে,
ভুখা-মিছিলের মুখে—শেষে তাই দেবে ?—
এ দিয়ে কি থামবে লড়াই!

মরা চাঁদ—হাড়ের খবরে,
থামে না চকোর-কান্না;
বুকের তৃষ্ণা তার জ্যোৎস্নার গান হয়ে ঝরে।

তোমার অদ্ভুত রথ
আর কত দূর যাবে,
—আর কত দূরে!
পার হয়ে কোন ছায়াপথ
সে-কোন্ সবিতৃলোকে,
কোন্ আলোকের অন্তঃপুরে!

যে ধীময়ী বাণী
ধ্বনিত প্রচেতঃকণ্ঠে,—
তার চেয়ে শ্রেয় কিছু আর
আছে কি তোমার দেয়!—তার কতখানি
মুছে দেবে—অনাদি, অকূল অন্ধকার!

দুর্জয় আগ্নেয় রথচূড়া
হয়তো বা প্রতিঘাতে
একদিন হয়ে যাবে গুঁড়া;
এ মন্ত্র মন্ত্রিত হবে তখনো আকাশে
অন্য এক আলোর আশ্বাসে॥

সময় নেই

অমিয় ধর

গুমোট
বাবরি মাথা আকাশ
মাথা ঝাকালেই বৃষ্টি
চড়-বড়, চড়-বড়
এ্যাস্‌ফল্‌টে ভাপ ওঠা গন্ধ
ধুয়ে মুছে সাফ হলে
এদিক-ওদিক
হৈ-চৈ
সবকিছু শব্দের ভেতর দিয়ে
স্বস্তির শ্বাস টেনে
স্নিগ্ধতায়
পায়ে পায়ে
প্রগল্‌ভ শহর থেকে
খেয়াঘাটে
স্মৃতি-বিস্মৃতির
আলো অন্ধকার
নৈঃশব্দ্যে
জন্ম-মৃত্যু খেয়া পারাপারে
সুখ দুঃখ বেগবান স্রোতে
একবার
শুধু একবার !
সময় নেই
এক মুহূর্ত থেকে
আর এক মুহূর্তে
উত্তরণে
স্নেহমমতায়

গোনাগাঁথা মুহূর্তগুলো
বেগবান স্রোতে
জন্মমৃত্যু কোলাহলে
একবার, শুধু একবার।
এপারে খেয়াঘাটে
আলো জ্বলছে
দুলছে নদী
ঝিঁ-ঝিঁ পোকায় নৈঃশব্দ্য
ফিরব কি ফিরব না
ভাবতে ভাবতে
উঠে দাঁড়াতেই
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বৃষ্টি!
বেগবান স্রোতে
আলো ঝলমল
নূপুরের শব্দ
ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে
অবিরাম
জন্ম এবং মৃত্যু!
জন্ম এবং মৃত্যু
বীজ থেকে ফলে
ক্রমাগত অনস্তিত্বে
আমাদের যাত্রা
পূর্ণতায়!
সময় নেই
ফেরি ঘাটে
সচকিত বাঁশি
ভয়ঙ্কর নৈঃশব্দ্য
বুকের কাছে দম আটকানো
অস্বস্তি
স্নেহ মমতায় ব্যাকুল প্রিয়জন

ঘরে ফেরার আর্তি
আমার ঘর নৈঃশব্দ্যে
ধূপ আর বেলফুলের গন্ধে
স্নিগ্ধ বিষণ্ণতা !

বাঙলার দ্বৈরথে

শুভ বসু

কী হবে অনেক বেঁচে, এই
　　বাঙলার দ্বৈরথে, বাঙলায়,
মুখের ভেতরে নাচে প্রেত, কুকুরের পাল,
জঙ্ঘা আলোড়িত যায় মেয়ে
　　যেন জীবনের সারার্থ বোঝাতে,
বেপথু মনন চায় আত্মকৈবল্যের বোধ
যৌথতার দর্শনের ভানে,
শিশুরা চাঁদের বুকে দেখে রাহুদংশের স্বাক্ষর।
স্পর্শ সমাতুর মনে
তবু লাউসেন, চাঁদ, যেন
　　চেতনার অতন্দ্র প্রদেশে
　　বহমান ইছামতী, যোগাযোগ দিবসরজনী
এ সমস্ত কেন্দ্র করে
অনায়াসে বেড়ে যেত চেতনার বাঙ্ময় পরিধি
　　　　　　　　শুধু
অলৌকিক ঘুরে যাচ্ছে হাওয়ার নিশান,
"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানহসি বেদম"
কেউ নেই, ইতিহাস পুরুষের সাথে পাঞ্জা কষে
কেউ নেই, এই চাঁদ-বেহুলার দেশে
নির্বিচারে হেসে যাচ্ছে
　　গুটিকয় বেহেড শকুন।

রৌদ্রেরও বুকে কিছু গূঢ় কথা আছে

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

রৌদ্রেরও বুকে কিছু গূঢ় কথা আছে
কাছে পেলে জলভরা একখণ্ড মেঘ
ইন্দ্রধনু ছবি আঁকে
স্মৃতি কিছু স্নিগ্ধ ছায়া আকাশের পটে

দাউ দাউ খরা বুকে রুখু মাটি রিক্ত
কখন আশ্চর্য দেখ
দহনে প্রেমের ফলভারে নত নারী
পত্র পুষ্পে বৃক্ষ মাতা
সীতা মুখে ফাল ফাল মাটি
বিস্তীর্ণ হরিৎ ক্ষেত্র
সুপ্ত বীজ উজ্জ্বল অঙ্কুর মুখ
যেন শিশু হাসে মার কোলে
জটায়ু পাখির বুকে ঝোড়ো হাওয়া
প্রভঞ্জন প্রলয় পাখায়
তবু আশ্চর্য মমতা
আমৃত্যু জীবন পণ রক্ষা করে
মৃত্তিকা মায়ের শিশু
স্নেহ ধন্যা জনক দুহিতা সীতা।

দোহাই তোমার, পতাকাটা আরো একটু শক্ত হাতে

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

দোহাই তোমার
পতাকাটা আরো একটু শক্ত হাতে…

ছেলেগুলো বাঘের মতো লড়ছে
ভাগ্যের কপালে লাথি মেরে

মা-লক্ষ্মীর নাকে বুড়ো আঙুল ছুঁইয়ে
পাহাড়ে আর বনে, বস্তিতে আর গলির মোড়ে
গ্রামের পথে আর চালের আড়তে
ছেলেগুলো বাঘের মতোই লড়ছে।
লড়তে লড়তে লড়তে লড়তে
বাঘের মতো লড়ছে বলেই হয়তো
কাঁটাবনে দা চালাতে চালাতে
দা-এর কোপে রাগের কোপে
তোমার ডালিয়া আর সূর্যমুখী
আমার যুঁই আর বেলফুলের বনেও
এমন কি বুনো শুয়োর ঠেকাবার জন্যে যে বেড়া বেঁধেছিলে
নোনাজলের বান ঠেকাবার বাঁধটাও
আর ওইসব সরস্বতীর বিষয়-আশয়
এমন কি বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ
না হয় বাদই দেওয়া গেল
তাই দোহাই তোমার পতাকাটা আরো একটু শক্ত হাতে…

মারতে মারতে আর মরতে মরতে
ছেলেগুলো বাঘের মতো লড়ছে
আমি ভাবছি এই তো হলো
এই তো আমি
এই তো জ্বলছে সেই নবযুগের আলো
তারপরেই বিকেল গড়াতে না গড়াতেই
সেই বুনো শুয়োরের দাঁত নোনাজলের বান
ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভাঙা বাঁধের সুযোগ নিয়ে
আমি উদ্বিগ্ন হই
পতাকাটার জন্যে দোহাই তোমার
পতাকাটা আরো একটু শক্ত হাতে…

ছেলেগুলো লড়ছে

বাঘের মতোই লড়ছে বটে
ওদের মার এবং ওদের মরা
অস্থির আবেগে আমাকে বিহ্বল করে
তারপর বিহ্বলতা কেটে যেতেই
আমার এবং নিতাই মোড়লের
আমজাদ এবং মিশির ভাইয়ের
ডানহাতটা অবশ হয়ে যায়
অথচ ঠিক তখনই
ভাঙা বেড়ার ফাঁকে বুনো শুয়োরের দাঁত
খোলা বাঁধের বুকে রাশ রাশ নোনাজল
আহ্লাদে আটখানা.
ডানহাতটা এখন বেজায় কাজের হতো
তাই বলছিলাম হে আমার জ্যেষ্ঠ
পতাকাটা আরো একটু শক্ত হাতে···

আসলে আমাদের চারপাশে এখন আলো-আঁধারির যাদু
হঠাৎ কিছুর ঝলকানি চোখ ধাঁধিয়ে দিতেই পারে।
তুমি, আমি এবং আমরা অন্ধকারের গা বেয়ে বেয়ে
কতোদিন ধ'রে কতোদূর থেকে
খানিকটা আলো এনে ফেলেছি আমাদের উঠোনে
অন্ধকার কিছু কেটেছে
তবু ক্লান্ত, বিষণ্ণ আর কাতর মা আমাদের
এখনো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না দশদিক
আরো কিছু আলো চাই।
উপায় নেই
বাঁ-দিকের খাড়াই পার হয়ে দক্ষিণের সাগর পার হয়ে
মরণ পার হয়েই আনতে হবে আলো।
ততক্ষণ ততদিন
হে আমার জ্যেষ্ঠ দোহাই তোমার দোহাই তোমার
পতাকাটা আরো একটু শক্ত হাতে ধরো।

পড়শী

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

ভদ্রলোককে প্রায়ই দেখি। আমহার্স্ট স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে মহাবীরের পান-বিড়ির দোকান, সেখানে সিগারেট কিনছেন। কোনোদিন খুব ব্যস্ত, কিনেই তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। কোনোদিন বা ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে লাগলেন। কখনো দেখি হাতে ঝোলা, বাজার করে ফিরছেন। কখনো চলেছেন রিকসায়—রিকসা চড়া যেন এক রোগ—এখান থেকে এখানে যাবেন, তো ওঠো রিকসায়। ফাঁকা ট্রাম পেলে (তখন পাওয়া যেত!) সোজা হাইকোর্ট-ইডেনগার্ডেনের দিকে একটা ট্রামে চেপে বসে খানিকটা ঘুরে এলেন। পরিচ্ছন্ন ধুতি-পাঞ্জাবী শীতকালে জহর কোট, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি, উজ্জ্বল রঙ, নাকটা উঁচু ও একটু বাঁকা, চোখে শিক্ষা ও রুচির আলো। দেখেই মনে হয়, আলাদা। চোখে না পড়ে উপায় নেই। বিশেষ করে আমাদের এই হতশ্রী পটলডাঙা পাড়ায় কে এই বিশিষ্ট ভদ্রলোক?

জানা গেল—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

আমাদের পাড়ায়? কোন্ বাড়িতে?

ঐ যে! গলির গলি, তস্য গলি। জলপাইগুড়ির পাট তুলে সিটি কলেজে এসেছেন। বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন এই পাড়ায়। তাহলে পটলডাঙার সুদিন কি আবার ফিরে এল! রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের আমলে অনেক নায়ক-নায়িকা পটলডাঙায় বাস করত। সে-সব সত্যযুগের কথা। এখন তারা বোধহয় সব বালিগঞ্জে চলে গেছে। নায়ক-নায়িকা তো দূরের কথা, একটা কাটা সৈনিক পর্যন্ত চোখে পড়ে না। হায় পটলডাঙা, তোমার দিন গিয়েছে—এ-শোক যখন আমাদের রীতিমত সয়ে গেছে, তখন নারায়ণবাবু ঢিলেঢালা পোষাকে সিগারেট টানতে টানতে সরবে সহাস্যে খোসমেজাজে পটলডাঙায় প্রবেশ করলেন। পরে শুনলাম, একা নন। ঐ বাড়িতে এক জোড়া সাহিত্যিক আছেন। নবেন্দু ঘোষ কিছুদিন নারায়ণবাবুর সহবাসী ছিলেন।

পটলডাঙার কপাল ফিরল, কিন্তু আমার নয়। বড়লোক (ধনী ও শ্রেষ্ঠ

ছু-জাতেরই) সম্পর্কে আমার অস্বস্তি আছে, তাই এড়িয়ে চলি। বেশ কয়েকজন বড়লোক আমার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছেন, একটু মাথা ঝোঁকালেই কপাল ফিরতে বা ফুঁড়তে পারত। কিন্তু কোনোক্রমে মাথা বাঁচিয়েছি। নারায়ণ বাবু আমাদের পাড়ায় আসবার আগেই দস্তুরমতো নামজাদা লোক, বড় লোক। সুতরাং নারায়ণবাবুর বাড়িতে আমি যাই নি, তাঁর সঙ্গে পরিচয়ও হয় নি।

অথচ তাঁর সম্পর্কে আগ্রহ নেই এমন নয়। ওঁর লেখা তো আগে থাকতেই পড়ি। তখন বাড়িতে 'ভারতবর্ষ' ও 'শনিবারের চিঠি' রাখা হতো। 'উপনিবেশ' ভারতবর্ষের পাতাতেই প্রথম পড়েছি। পঞ্চাশের মন্বন্তর পেরিয়ে এসেছি। 'আলু খলিফার শেষ খুন' চালের চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে আমাদের ক্রোধকেই যেন প্রকাশ করল। 'বনজ্যোৎস্না,' 'টোপ'—অসহায় মানুষের পীড়নের মর্মান্তিক চিত্র। এমনও হয় ?—জিজ্ঞাসা আমাদের। 'স্বর্ণসীতা' 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী' 'বৈতালিক'—নতুন দিগন্ত, নতুন ভাষা। সে ভাষায় আমরা মুগ্ধ ছিলাম। পরের কথাসাহিত্য-সম্রাট যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সে বিষয়ে আমার সংশয় ছিল না। সেদিনের কোনো তরুণ সাহিত্যিকেরই ছিল না।

অনেকগুলো বছর নানা ঘটনায় পা দিয়ে দিয়ে হেঁটে—বা ছুটে—চলে গেল। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে কয়েকটা বাড়ির ফারাক—সেটা রয়েই গেল। নারায়ণ-বাবুর বাড়িতে ঢোকার সরু গলিটা আমাদের পাড়ার সর্ট্‌কাট্‌ রাস্তা। পাড়ার সবাই ব্যবহার করে এ গলিটা—আমিও। সে গলি আবার গলির শিরোমণি। দুটো লোক সামনাসামনি পড়লে ধাক্কা দিয়ে ছাড়া পেরোনো অসম্ভব। এ গলিতে আমরা উভয়ে বহুবার মুখোমুখি হয়েছি। সে প্রায় সম্মুখ সমরের মত। কিন্তু সসম্ভ্রমে ওঁকে অনাহত অতিক্রম করতে দিয়েছি। কারণ ছোটবেলা থেকে এই গলিরই কল্যাণে আমরা কাত হয়ে চলতে তুরন্ত সুদক্ষ। এরই মধ্যে আশা দেবী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন, দেখি বই-খাতা নিয়ে ঐ গলি দিয়েই ক্লাস করতে যান। একদিন এম্. এ. পাশও করে গেলেন। কিন্তু আমরা যে অপরিচিত সেই অপরিচিতই রয়ে গেলাম।

নৈহাটি কলেজে একবার অধ্যাপক সমিতির বার্ষিক সম্মেলন। যে ট্রেনে সবাই ভোরবেলা চলে গেছেন, সে-ট্রেনটি স্টেশনের কাছে আমার বাড়ি বলে আমি যথারীতি মিস্ করেছি। পরের ট্রেনে যাব—গাড়িতে উঠেছি। উঠে দেখি, স্টেশনের কাছের আর একজন ভদ্রলোক গাড়ি ফেল্ করেছেন। তিনি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। পাশে তাঁর আর এক অধ্যাপক। (এঁকে তখন চিনতাম না।

এখন চিনি, সিটি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাহ্নবীবাবু) তিন জন একই কামরায় নৈহাটি পর্যন্ত গেলাম। ওঁরা দু'জন সারা ট্রেন গল্প করতে করতে গেলেন। আমি একা—অতএব চুপচাপ। ওঁদের কথাবার্তা সবই কানে আসছে—নারায়ণবাবুই প্রধান বক্তা। কিন্তু কান গলালেও ওঁদের কথার মধ্যে নাক আমি একদম গলাই নি। প্রতিবেশী ও সহযাত্রী—কিন্তু অপরিচিত।

আমার বাড়ির সামনেই একজন উকিল ভদ্রলোক থাকেন। তাঁর নাম মণিবাবু। এঁর বাড়িতে নারায়ণবাবু ও আশা দেবীকে কয়েক দিন ঘনঘন যাতায়াত করতে দেখলাম। কী ব্যাপার? নারায়ণবাবু বাড়ি কিনছেন। এ বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন। আমাদের পাড়া ছেড়ে তাহলে চললেন নারায়ণবাবু! না, ছেড়ে আর কই! এই বৈঠকখানা রোডে বাড়ি কিনেছেন। না, তাহলে পাড়া-ছাড়া বলা যায় না। আগে ছিলেন পাড়ার কেন্দ্রে, এখন গেলেন পাড়ার সীমান্তে। কিন্তু আগে ছিলেন নড়বড়ে ভাড়াটে এখন একেবারে পাকাপোক্ত পাড়াটে।

বৈঠকখানার এই বাড়িতে নারায়ণবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ—একজন উভচর বন্ধুর মাধ্যমে। বন্ধুটি পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, 'ইনি হচ্ছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।'

'আমি চিনি।' বললাম আমি।

বন্ধুটি আমার পরিচয় দিলেন নারায়ণবাবুর কাছে।

নারায়ণবাবু বললেন, 'বলতে হবে না। আমিও চিনি।'

আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'কি করে?'

নারায়ণবাবু দুষ্টু হাসি হেসে আমার সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য—লেখা ও চাকরি সংক্রান্ত—বলে গেলেন।

'জানলেন কি করে?'

নারায়ণবাবু এবার জোরে হেসে উঠলেন: 'ম্যাজিক মশাই, ম্যাজিক।'

পরে জেনেছি, এ ম্যাজিক শুধু এই দীন পড়শী সম্পর্কেই নয়, অনেকের সম্পর্কেই ছিল। বহুর খবর তিনি রাখতেন। বিশেষত সাহিত্যিক ও শিক্ষকদের খবর ছিল তাঁর নখাগ্রে।

সূচনা থেকেই 'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকার সঙ্গে আমার যোগ ছিল। এই কাগজে প্রতি বছরের বিশেষ নাট্য-সংখ্যাগুলি আমি সম্পাদনা করতাম। অন্যান্য সংখ্যাতেও বিশেষ সহযোগিতা থাকত। স্বনামে-বেনামে নানা লেখাও আমার থাকত। গোড়া থেকেই নারায়ণবাবুর সঙ্গে এই কাগজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

এই সম্পর্ক প্রধানত সম্পাদকই রক্ষা করতেন, কিন্তু পড়শী হিসেবে কোনো কোনো সময় সংযোগরক্ষাকারী ছিলাম আমি। 'বিংশ শতাব্দী'-তে স্বনামে ও বেনামে অনেক লেখা বেরিয়েছে নারায়ণবাবুর। বেনামী লেখাগুলি স্বতন্ত্র একটা প্রবন্ধের উপজীব্য হতে পারে। সুতরাং এ প্রসঙ্গটি আপাতত বাদ রাখছি। পরে অন্য কোনো সময় বিস্তৃত করে লেখা যাবে।

এর পরে 'প্রবন্ধ পত্রিকা' বের হয়। ওঁর কাছে গিয়ে পরিকল্পনাটি বললাম।

উনি বললেন, 'দারুণ আইডিয়া। রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাবার নতুন পথ, শক্ত পথ। শুধু প্রবন্ধের একটা মাসিক! শুনি যে এখন সিনেমার কাগজ ছাড়া আর কিছুই চলে না—আপনার সাহস আছে মশাই। চলবে?'

'চালাতে পারলে চলবে। যত কমই হোক সীরিয়াস পাঠক বাঙলা দেশে আছে। বরং তাদের উপযুক্ত কাগজ নেই। আমাদের সাহায্য পেলে চলবে।'

'বলুন কী সাহায্য চান। এ রকম একটা উদ্যোগে সব রকম সাহায্য দিতে রাজী।'

'টাকা চাই না।'

হেসে উঠলেন: 'খুব বাঁচিয়েছেন। "সব রকম সাহায্য" বলেই ভয় পেয়েছিলাম।'

'প্রতি সংখ্যা একটি করে আপনাকে দিয়ে যাব। গ্রহণ করবেন। কিন্তু গ্রাহক হতে হবে না।'

'বেশ, বেশ, এ পর্যন্ত বেশ ভালই বোধ হচ্ছে।'

'লেখা চাই।'

'নিশ্চয়ই। এ কাগজে লেখা আমার কর্তব্য। তাছাড়া, প্রবন্ধের অনেক বিষয় মাথায় ঘোরে, সেগুলো সময় ও তাগাদার অভাবে, লেখা হয় না। আপনার তাগাদায় এবার সেগুলো করা যাবে।'

'প্রথম সংখ্যাতেই আপনার লেখা চাই।'

'এত তাড়াতাড়ি! হাতেও কাজ রয়েছে, আর প্রবন্ধ তো তাড়াতাড়ি লেখা যায় না।'

'আচ্ছা, তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যা।'

'ঠিক আছে।

'কিসের ওপর লিখবেন ভাবছেন?'

'কমলাকান্তের দপ্তর সম্পর্কে কতগুলো চিন্তা অনেক দিন মাথায় আছে।

একটু লম্বা হবে। "ছোট এ তরী" বলে ফেলে দেবেন না তো ?'

'আপনার ফসলটা অন্তত নেব। লম্বা লেখা তো চাই। তাহলে অনেকের কাছে ঘোরার দায় ঘোচে।'

'না, না, অন্যদের বাদ দিয়ে যেন আমারটা দেবেন না। বরং ধারাবাহিক করে দিন। তাতে আমারও সুবিধে। একবারে সবটা লেখা সম্ভব হবে না। প্রতি মাসে লিখব। এটা আসলে একটা বই হবে।'

'আমি তো বর্তে যাই, আপনার একটা ধারাবাহিক লেখা পেলে।'

প্রথম নয়। দ্বিতীয়তেও লিখে উঠতে পারলেন না। তৃতীয় সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৬৭) ওঁর লেখা পেলাম—কমলাকান্তের দপ্তর ও বঙ্কিমচন্দ্র। অসম্পূর্ণ রচনা। নিচে লেখা—ক্রমশঃ।

শুধু কমলাকান্তের ওপর পুরো একটা বই। আমার কাছে কথাটা শুনে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু প্রথম কিস্তির ধরতাই দেখে ব্যাপারটা বোঝা গেল। উনি লিখলেন, 'বঙ্কিমের ধর্মলোকের পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে গেলে 'কমলাকান্তের দপ্তর'ই প্রথম ও প্রধান পাঠ্যবস্তু। কেন বঙ্কিম এই বইখানিকেই নিজের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে বিশ্বাস করতেন সে প্রশ্নের উত্তর এর মধ্যেই পাওয়া যাবে।'

বঙ্কিমের মর্মলোকের পূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটন করতে চেয়েছিলেন নারায়ণবাবু এই লেখাটিতে। প্রথম পরিচ্ছেদে উনি কমলাকান্তর অন্তরালে বঙ্কিমের যে মনটি কাজ করছিল, তার পরিচয় দিয়েছেন। উনি লিখেছেন 'কমলাকান্তের দপ্তর তাঁর জীবনে এক অপূর্ব সন্ধিলগ্নের সৃষ্টি। অনুদ্ভাসিত উষার প্রদোষলগ্ন কমলাকান্ত'কে অনিশ্চিত বিষাদে ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। পরাভবের সাময়িক গ্লানিতে তাঁর কর্মোত্তম নিশ্চল—অকাল জরার প্রব্রজ্যা, অরুণবিহীন পূর্বাকাশ কালো মেঘে আবৃত। কিন্তু এই অন্ধ আকাশেও একটি নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে —সেটি তাঁর অকৃত্রিম মানবপ্রেম।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলেছেন, ডি কুইনসির সঙ্গে কমলাকান্তের 'শত যোজন ব্যবধান।' তারপর 'আত্মমুখী রচনা'-র একটি ধারাকে দেখাচ্ছেন। মঁতেন সম্পর্কে আলোচনা শেষ করে বলছেন, 'কমলাকান্তের গোমুখী উৎস এইখানেই। কিন্তু আরো বহু ধারা-উপধারার প্রয়োজন ছিল।'

এই পংক্তিতেই প্রথম কিস্তি শেষ। এবং এটাই শেষ কিস্তি। কাজের চাপ, সময়াভাব, ভগ্নস্বাস্থ্য ইত্যাদির জন্যে তিনি এই লেখা আর শেষ করতে পারেন

নি। এই লেখাটির জন্য একটু সময় নিয়ে গুছিয়ে বসা দরকার বলে তিনি মনে করতেন, তা আর হয়ে ওঠেনি।

তিন মাস পরে প্রবন্ধ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা (১৩৬৭) অসম্ভব কাজের চাপের মধ্যেও আমাদের দিলেন 'শরৎচন্দ্র ও ইন্দ্রনাথ'।

পরের বছর ১৩৬৮র শারদীয়তে লিখলেন—'আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে: মৃত্যু-জল্পনা।' হেমিংওয়ের একটি মূল্যায়নের প্রচেষ্টা এই প্রবন্ধটি। ঠিক তার পরের সংখ্যাতেই অগ্রহায়ণ, (১৩৬৮) 'নতুন গল্পের কথা।' এটি 'সমীপেষু' থেকে পুনর্মুদিত। তখন 'নতুন রীতির' আন্দোলন চলছিল। এ-সম্পর্কে 'বেশ উত্তেজিত তর্ক-বিতর্কও চোখে পড়ল "পরিচয়ে"-এর পাতায়।' এবং এই রীতি প্রসঙ্গে নারায়ণবাবুর মত পাচ্ছি প্রবন্ধটিতে।

১৩৬৯-এর নববর্ষ সংখ্যায় (বৈশাখ) বেরোয় 'অমরেন্দ্র ঘোষ'। এটিও 'সমীপেষু' থেকে নেওয়া; অবহেলিত সাহিত্যিক অমরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা আছে, আছে তাঁর সাহিত্যবিচার। আর আছে পরাভূত অমরেন্দ্রের জন্য মর্মবেদনা: 'অমরেন্দ্র ঘোষ অসমাপ্ত রয়ে গেলেন। কিন্তু সেজন্যে তিনি দায়ী নন। আমরা তাঁকে অন্ন জোগাতে পারিনি, তাঁর ব্যাধির ওষুধ দিতে পারিনি, তাঁর উপবাসী শিশুর কান্না শুনতে পাইনি। তাঁর অপূর্ণতার অপরাধ আমাদেরই। তবুও হয়তো তাঁর উপায় ছিল। যৌনপ্রবৃত্তিকে সুড়সুড়ি দিয়ে; ডিটেকটিভ-মার্কা সিচুয়েশন তৈরি করে, বস্তুবৈচিত্র্যের চমকে তিনি বেস্টসেলারদের দলে মিশতে পারতেন। সাহিত্য নাই হোক, অন্নচিন্তা তাঁর থাকত না। কিন্তু তাতে অমরেন্দ্র ঘোষের প্রবৃত্তি ছিল না। জীবননিষ্ঠ জাতসাহিত্যিকের দায়িত্ব মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ পর্যন্ত তিনি পালন করে গেছেন। পরাভূত হয়েছেন, কিন্তু সে পরাভব মহত্ত্বে সমুজ্জ্বল।'

১৩৬৯এর শারদীয় সংখ্যায় বেরোয় 'একটি শব্দের জন্য'। 'কবিতায় হোক, গদ্যে হোক—এক একটি শব্দের কী অসাধারণ ভূমিকা। যথাকালে, যথাস্থানে তার প্রয়োগ মূল বক্তব্যকে প্রকাশিত করে, গভীর করে, তুচ্ছকে অনন্য করে তোলে।' এই শব্দের অনুসন্ধান কোন লেখকের কী রকম তার ইতিবৃত্ত এই প্রবন্ধটি।

১৩৭০এর শারদীয়তে রয়েছে 'শারদীয় সংখ্যা'। 'মুশকিল এই যে শারদ সাহিত্য ছাড়া লেখকেরও সুযোগ কম।…কিন্তু কুড়িটি গল্প এবং তিনখানি উপন্যাস দেড় মাসের মধ্যে দাঁড় করালে তার ফল কী হয়?' এই প্রশ্নটির মুখো-

মুখি দাঁড়াবার চেষ্টা এই প্রবন্ধে।

পরের সংখ্যাতেই (কার্তিক, ১৩৭০) বেরিয়েছে 'সাহিত্য বিচারে মোহিত লাল'। এটি 'উত্তরকাল' থেকে পুনর্মুদ্রিত। মোহিতলালের সাহিত্যবিচারের মূল সূত্রগুলি দেখাতে চেয়েছেন এই প্রবন্ধে।

একদিন বললেন, 'রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ওপর একটা বক্তৃতা করেছি। ওটাকে আপনার প্রবন্ধ পত্রিকায় ঠাঁই দেবেন ?'

'পেলে তো বর্তে যাই।'

'আসছে সপ্তাহে আসুন, আপনার বর্তে যাওয়ার ব্যবস্থা করব।'

পরের সপ্তাহে যেতেই হাত উলটিয়ে বললেন, 'ও লেখাটা কাউকে দেওয়ার নাকি আমার অধিকার নেই।'

'কেন ?'

'ওরা বক্তৃতার জন্যে কয়েকটা টাকা দিয়েছিল। সেই সুবাদে রবীন্দ্রভারতী পত্রিকায় ওটি ছাপবার অধিকারও নাকি ওদের ওপর বর্তেছে।'

'কথামালা' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব গোড়ার দিকে আমার ছিল। শুধু গল্প উপন্যাসের কাগজ, বলতে গেলে নারায়ণবাবুর স্ব-ক্ষেত্র। এখানেও লেখা দেবেন বলেছেন, কিন্তু কাজের চাপে দিতে পারেননি। কিন্তু নিয়মিত পড়তেন ও পরামর্শ দিতেন। বাঙালি লেখকেরা সাধারণত নিজের লেখা ছাড়া আর কারো লেখা পড়ে সময় নষ্ট করেন না, এ-তথ্য সর্বজনবিদিত। নারায়ণবাবু এঁদের মধ্যে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। 'কথামালা'র অতিনবীন লেখকদের লেখাও পড়তেন। এ-অভিজ্ঞতা বহু তরুণ লেখকের আছে। নারায়ণবাবু তাঁদের লেখা পড়েছেন, আলোচনা করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, নিজে থেকে প্রকাশকের কাছে নিয়ে বই প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন,—এ রকম ঘটনা বহু রয়েছে।

কথাশিল্পী ছিলেন তিনি, মুখের কথাতেও। দুর্ভাগ্য বাঙলাদেশের, সে কথাগুলোকে কেউ ধরে রাখেনি। লিখতে লিখতে অনুভব করছি, কিছুতেই এ লেখায় তাঁর চেহারাটা খুলছে না, কারণ তাঁর মুখের ঠিক-ঠিক কথাগুলো অনেক আমি হারিয়ে ফেলেছি। জিভের ডগায় তাঁর যেন দীপ্ত সুন্দর কথাগুলো সাজানো থাকত। মুখ খুললেই সজীব সরস সহাস্য বাণীর মালা।

ভাষা শেখার আগ্রহ হয়েছিল শেষ দিকে। ফরাসী ভাষা ভালোই জানতেন। অন্য দু-একটি ভাষার চর্চা ছিল। ঐ কাজের চাপের মধ্যে এত করতেন যে কখন! অসাধারণ পরিশ্রমী ছিলেন মানুষটি। তাঁর সহকর্মীদের মুখে শুনেছি

বিরাট ক্লাস নিয়ে সবাই যখন ক্লান্ত, নারায়ণবাবু তখন বাড়তি ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে উনি পূর্ববঙ্গের স্মৃতিতে ডুবে গেলেন। হঠাৎ এক সময় যেন জেগে উঠে বললেন, 'আপনাকে বলে আর কী হবে। আপনি ঠিক বুঝবেন না। আপনি তো পশ্চিমবঙ্গের লোক। আপনি তো সে-সব দেখেন নি।'

'সে কি! আপনি যে আমার পরিচয়টা ভুলিয়ে দেবেন।'

'কেন?'

'আমার বাড়ি পূর্ববঙ্গে।'

'কোথায়?'

'ফরিদপুর।'

'ফরিদপুর! তাহলে তো আপনি আমার স্বাদেশের লোক।'

'আপনার বাড়ি তো ফরিদপুর নয়।'

'কিন্তু ফরিদপুরে কয়েকটি খুব আনন্দের দিন কেটেছে আমার। আমি আর নরেন (মিত্র) তো ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে পড়তাম।'

'হ্যাঁ, নরেনবাবুর গ্রাম আমার গ্রাম থেকে খুব দূর নয়। ওঁর 'রস'-এই অবশ্য ফরিদপুর-ফরিদপুর গন্ধ পেয়েছি।'

উনি তখন ফরিদপুর ও রাজেন্দ্র কলেজের নানা স্মৃতি বলতে লাগলেন। আর আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল ফরিদপুরের, আমার সহরের নানা প্রিয় চিত্র। এখন উভয়েরই বিচ্ছেদের বেদনায় যা প্রিয়তর।

ওঁকে একদিন দারুন লজ্জা পেতে দেখেছি। উনি ডি-ফিল হলেন। দেখা হতেই অভিনন্দন জানালাম। উনি ভীষণ লজ্জা পেয়ে বললেন, 'ও কথা থাক। এই বয়সে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড। ওটা থাক।'

ডি-ফিল পেয়ে এত লজ্জিত হতে আমি আর কাউকে দেখিনি।

উনি হেড একজামিনার। আমি ওঁর অধীনস্থ পরীক্ষক। আমাকে প্রায় অনুনয়ের স্বরে বললেন, 'আমায় একটু সাহায্য করবেন?'

'কী?'

'আমার সঙ্গে স্ক্রুটিনি করুন। "না" বলবেন না। একটু নির্ভরযোগ্য লোক চাই। আর আপনার বাড়িটা খুব কাছে ওটা আমার সুবিধে। যখন তখন আপনাকে পাব।'

'কিন্তু আমি তো ও-কর্ম কোনোদিন করিনি, জানি না।'

'ও কিছু না। একদিনে শিখে নেবেন।'

ক্রুটিনির জন্য পরীক্ষকরা প্রধান পরীক্ষকের কাছে উমেদারি করে। আর এখানে প্রধান পরীক্ষক বিনীতভাবে পরীক্ষককে অনুরোধ করছেন! এই বিনীত ভাষণ ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ। একবার ডক্টর সুকুমার সেন আমার কাছে অন্য এক প্রখ্যাত অধ্যাপকের সঙ্গে প্রতিতুলনায় নারায়ণবাবুকে বর্ণনা করেছিলেন এইভাবে: 'অমুক আর নারায়ণ দুজনেই খুব বিনয়ী কিন্তু তফাৎ আছে। অমুকের বিনয় দেখা মাত্রই বোঝা যায় যে ওটা বানানো। কিন্তু নারায়ণের বিনয় ওর স্বভাবের অঙ্গ।'

পর পর দু-বছর নারায়ণবাবুর কাছে ক্রুটিনির কাজ করেছি। এই সূত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওঁর বাড়িতে কাটিয়েছি। কাজে এবং অকাজে। এই সময় তাঁকে আরো কাছ থেকে দেখার সুযোগ হলো।

আতিথেয়তার পরিমাণ এমন ছিল যে কাজে এসেছি কি নিমন্ত্রণে এসেছি বুঝতে পারতাম না। আশা দেবী নিজে ভোজ্যবস্তুর তদারক করতেন। বহুদিন নিজে রেঁধেও খাইয়েছেন। ভোজ্য এবং আড্ডার প্রাচুর্যে কাজের বিরক্তিটা গায়ে লাগত না।

প্রধান পরীক্ষকের অন্তত শতকরা পাঁচ ভাগ খাতা দেখার কথা। অনেকে তা দেখেন না, এবং যা দেখেন তা ক্রুটিনিয়ারের ব-কলম। কিন্তু এখানেও নারায়ণবাবুর সেই নিয়মনিষ্ঠ পরিশ্রমী মূর্তি। বিকেলে বা কোনো কোনো দিন দুপুরে গিয়ে আমরা কাজে বসে যেতাম। উনি কলেজ-ফেরত আমাদের ঘরে ঢুকতেন।

'কতক্ষণ এসেছেন? অমুক আসেননি? চা-টা খেয়েছেন? ওরে রাম, শীগগির চা দে।'

গৃহভৃত্য রাম ছুটে এল। চা খেতে খেতে খানিকটা গল্প হলো। তারপরে উনি বলতেন, 'আচ্ছা আপনারা কাজ করুন। আমি একটু ওপরে যাচ্ছি। দু-একটা লেখা-পত্তরের কাজ আছে। ঠিক আটটায় নামব।'

ঠিক আটটাতে নেমে আবার: 'কই রে রাম আমাদের একটু চা দিবি।'

একটি সিগারেট ধরিয়ে একটা তাকিয়া বুকের তলায় রেখে ঝুঁকে (এটাই ছিল ওঁর লেখাপড়া করতে বসার প্রিয় ভঙ্গি) খাতা নিয়ে বসে গেলেন। একটানা কাজ। মাঝে মাঝে সিগারেট। আর কোনো কোনো খাতা থেকে দু-একটা মজাদার লেখা দু-এক সময় পড়ে শোনাচ্ছেন। সরস মন্তব্যও দুটো-একটা করে যাচ্ছেন। পাশে এসে 'মিউ' ধ্বনি করল পোষা বেড়ালটি। যতদূর মনে পড়ছে,

বিড়ালটির নাম দিয়েছিলেন উনি 'কেষ্ট'। কেষ্টর অনেক গুণবর্ণনাও আমাদের কাছে করেছেন। 'মিউ'র উত্তরে নারায়ণবাবু বললেন, 'ঐখানে চুপ করে বোসো। এখন কাজ করছি।'

কেষ্ট পরম অনুগতের মতো গুটিসুটি হয়ে বসল এবং একটু পরেই চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে গেল।

নারায়ণবাবু মাঝে মাঝে বিরক্ত হচ্ছেন। পরীক্ষার্থীদের ওপর নয়। ছাত্রদের স্বার্থ রক্ষায় সর্বদাই খুব মনোযোগী ছিলেন। বিরক্ত পরীক্ষকদের ওপর। যাঁরা বেশি কড়া, অথবা যাঁরা এলোমেলো অসম মানদণ্ডে খাতা দেখেন, তাঁদের ওপর বিরক্ত। এই ধরনের বহু পরীক্ষককে বহুবার উনি ডেকে পাঠিয়ে আবার সংশোধন করিয়েছেন খাতা। কেউ কেউ তাতে অসন্তুষ্টও হতেন। কিন্তু নারায়ণবাবু ছাত্রদের ক্ষতিটা হতে দিতেন না। সহৃদয় ও বিবেকসম্পন্ন প্রধান পরীক্ষক ছিলেন তিনি।

একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীণ প্রভাবশালী অধ্যাপক একটি রোল নম্বর পাঠালেন, তাকে যেন পাশ করিয়ে দেওয়া হয়।

নারায়ণবাবু ব্যাজার মুখে বললেন, 'খাতাখানা বার করুন তো।'

বার করলাম।

'খাতাটা একবার দেখুন তো।'

দেখলাম।

'পাশ করানো যায়?'

'না। পরীক্ষক এ-খাতা খুবই ভালোভাবে দেখেছেন। যথেষ্ট নম্বর দিয়েছেন। আর দেওয়া যায় না। পঁচিশ দেওয়া হয়েছে।'

'মহা মুস্কিল। কী যে করা যায়!'

নিজেও খাতাটা নেড়েচেড়ে একটু দেখলেন।

খানিক বাদে বললেন, 'পঁচিশ পর্যন্ত যত খাতা আছে সব বার করুন। ওরাই বা কী দোষ করেছে! ওদের মুরুব্বি নেই, এই তো! আমিই ওদের মুরুব্বি। পঁচিশ পর্যন্ত সব পাশ করাব।'

বলে বালিশে বুক দিয়ে সব পঁচিশকে পাশ করাতে বসে গেলেন। অনেক রাত পর্যন্ত চলল সেই কাজ। বললেন, 'পাপ যখন করতেই হবে, অন্তত কিছু প্রায়শ্চিত্ত করি।'

হেডএক্জামিনারদের উপার্জন যাতে সকলের সমান হয়, তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি

ছিল। সেইভাবেই তিনি কাজ ভাগ করে দিতেন। একবার এই সমবণ্টনের চরম করে অনেকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন তিনি। একজন স্ক্রুটিনিয়ার অসুস্থতার জন্য কম কাজ করতে পেরেছিলেন। তাঁর কাজ অন্যরা করে দিয়ে ছিল। কিন্তু বিল করবার সময় নারায়ণবাবু বললেন, 'সবার সমান করে দি। ও বেচারার অসুখ হয়েছিল, ওর বড়ই কম কাজ হয়েছে। কিন্তু অসুখে ওর খরচও হয়েছে।'

সবাই আমরা সম্মতি দিলাম, কেউ কেউ অবশ্য বিরস মুখে।

দূরের স্ক্রুটিনিয়াররা নটা-সাড়ে-নটা থেকে একে একে বিদায় নিতেন। পড়ে থাকতাম আমি। নারায়ণবাবু বলতেন, 'আরে বসুন, এই তো এখানে আপনার বাড়ি। ওরে রাম, আমাদের দু-কাপ চা দিবি বাবা? বলুন, খবর-টবর বলুন। অমুকের ঐ লেখাটা পড়লেন? কেমন লাগল? তমুক কিন্তু আজকাল তেমন ভাল লিখতে পারছে না, অথচ সুরু করেছিল চমৎকার।'

চা এল। উনি সিগারেট ধরালেন। খাতাগুলো সরিয়ে রাখলেন। কেষ্ট একবার চোখটা অর্ধেকটা খুলে ব্যাপার-স্যাপার দেখে ডিনারের অনেক দেরী দেখে হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার চোখ বুজল। ওপরে আশাদেবী ও বাবলুর সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। রামও বোধহয় নৈশ চা দিয়ে একটু গড়াতে গেল। নারায়ণবাবু বললেন, 'এতক্ষণ তো কাজ হলো। এখন একটু গল্প করা যাক। বসুন।'

আমি বললাম, 'আপনার বোধহয় বিশ্রাম দরকার এখন।'

'না, না, বসুন। এই তো বিশ্রাম। আড্ডার মত বিশ্রাম আর কিছু আছে নাকি!'

পরদিন সকালেই হয়তো আবার টেলিফোন এল: 'ভাই, একবার আসতে পারেন? কাল রাত্তিরে আড্ডার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে করতে একটা কাজ বাকি থেকে গিয়েছে।'

কিন্তু রাত্তিরে ঐ আড্ডাগুলো খুবই জমত। নানা বিষয়ের নানা কথা এলোমেলোভাবে আসত, যেত। নানা লোকের ঘটত আনাগোনা—কাহিনীতে, ছায়ায়, স্মৃতিতে। দুএকটি লোকের কথা উল্লেখ করি।

মাঝে মাঝে আসতেন একজন নামকরা ছবি-আঁকিয়ে। তাঁর আসার সময় রাত সাড়ে দশটা। তিনি একটু পানরসিক। পান-পর্ব সমাধা করে নারায়ণবাবুর সঙ্গে গল্প করতে আসতেন। মধ্যরাত পর্যন্ত থেকে তারপর উঠতেন।

আমি বলতাম, 'অত প্রশ্রয় দেন কেন ওঁকে। অত রাত পর্যন্ত থাকেন, আপনার কাজের ক্ষতি, শরীরের ক্ষতি।'

ওঁর সহৃদয়তার সুযোগ নিয়ে অনেকে ওঁর বাড়িতে এসে উপদ্রব করত। তাই আমার স্বর হয়তো কিছু উগ্র হয়ে থাকবে।

উনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'না, না, অমন করে বলবেন না। ওর মস্ত ক্ষমতা, রীতিমত প্রতিভা। তাছাড়া ওর আধা-মাতাল আধা-শিল্পী কথা শুনতে আমার বেশ ভালই লাগে।'

'আমি ওঁকে বাড়ি থেকে বার করে দিতে বলছি না। একটু সীমার মধ্যে রাখতে পারেন ওঁকে।'

'অসম্ভব। ও একেবারে অসীম। ও তো আমাকেই আমার বাড়ি থেকে একদিন বার করে দিয়েছিল প্রায়।'

'কী রকম?

'ও, সে-গল্প আপনাকে বলা হয়নি বুঝি।'

ঘটনাটা বললেন নারায়ণবাবু। শিল্পী ভদ্রলোক একদিন যথারীতি রাত সাড়ে দশটার পরে এসেছেন, পান-টান করেই এসেছেন। নারায়ণবাবুর সঙ্গে গল্প হচ্ছে। হচ্ছে তো হচ্ছেই। অনেক রাত হয়ে গেছে। উভয়েই ক্লান্ত। দুজনেরই ঘুম পেয়ে গেছে। অতিথিবৎসল নারায়ণবাবুর পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়। শিল্পীরও চোখে ঘুম, কথাও আর মুখে আসছে না, ক্লান্ত, খুবই ক্লান্ত। শিল্পীর এখন নিজে থেকেই উঠে বাড়িতে গিয়ে ঘুমোনো উচিত। কিন্তু তেমন কোনোই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এইরকমভাবে আরো কিছুক্ষণ চলবার পর শিল্পী বললেন, 'ভাই নারায়ণবাবু, কিছু মনে করবেন না, আমার বড় ঘুম পেয়েছে, আপনি এখন বাড়ি যান, আমি এখন ঘুমোব।'

নারায়ণবাবুর তন্দ্রাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র চক্ষু মুহূর্তে ছানাবড়ার আকার ধারণ করল।

আর একদিন এক ভদ্রলোককে খুব শিষ্টতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওপরে নিয়ে গেলেন। বহুক্ষণ বাদে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকে বিদায় দিলেন। পরে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'লোকটিকে চিনলেন?'

'না।'

নারায়ণবাবু নামটি বললেন। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলাম। বিগত যুগের একজন নামজাদা অভিনেতা। মঞ্চে ও চিত্রে একাধিক নাটকে নায়কের পার্ট করেছেন। একটি বিখ্যাত রবীন্দ্র-উপন্যাসের চিত্ররূপেও নায়ক ছিলেন। কিন্তু

তখন দেখেছি তাঁর অসাধারণ ভালো স্বাস্থ্য। চওড়া কপাটের মতো বুক। উজ্জ্বল বর্ণ। নাক-চোখ চোখা বলিষ্ঠ সুপুরুষ। আর এখন হাড় বেরিয়ে বুকের খাঁচাটা প্রকট। গাল চোখ বসে গেছে। ফলে নাকটা অহেতুক দৈর্ঘ্যের অস্বস্তি ভোগ করছে। রঙটা ময়লা। জামা-কাপড় সর্বত্র দারিদ্র্যের ছাপ প্রকট হয়ে আছে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি ছেঁড়া জুতোর ফাঁকে পা। পায়ের আঙুলের ফাঁকে ময়লা। শুধোলাম, 'এমন হলো কী করে?'

'অভিনেতার ভাগ্য। বাজার পড়ে গেছে। এখন দেখতে পান আর কোনো মঞ্চে বা চিত্রে?'

ভিক্ষুকের অবস্থা অভিনেতাটির। পূর্বপরিচয়ের সূত্রে মাঝেমাঝে নারায়ণ-বাবুর বাড়িতে আসেন। ভিক্ষাপ্রার্থনার সে এক করুণ রূপ। নারায়ণবাবু ওঁকে কিছু চাইতে দেন না। চাওয়ার আগেই বলেন 'আজকে কিন্তু আপনি এখানে খেয়ে যাবেন।' তারপরে ওঁর যাতায়াতের জন্য খুবই সৌজন্যের সঙ্গে 'ট্যাক্সি-ভাড়া' দিয়ে দেন। (আমার অনুমান, এই অভিনেতা ও ঐ শিল্পীর আবছা ছাপ তাঁর, একটি গল্পে ও একটি উপন্যাসে আছে।)

এই রকম অকৃপণ দাক্ষিণ্যের ইতিহাস আরো আছে, বিশেষত ছাত্রদের ক্ষেত্রে। বহু ছাত্র তাঁর কাছে বহু রকমের উপকার পেয়েছে। সে-উপকার সম্পর্কে সর্বদাই বিনম্র নীরবতা পালন করতেন। শুধু একবার একজন ছাত্র (বর্তমানে অধ্যাপক) সম্পর্কে ক্ষোভ ও বেদনা আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। ছাত্রটি গ্রন্থ, অর্থ, ও অন্নের সাহায্য পেয়েছিল নারায়ণবাবুর কাছে, এবং পরে মিথ্যেকথা বলে ওঁকে ঠকিয়েছিল।

একদিন বহুরূপী প্রযোজিত 'রক্তকরবী'র কথা উঠল। আমি এটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রযোজনা বলে মনে করি। কিন্তু শুনলাম, নারায়ণবাবুর ভালো লাগেনি। কেন? জিজ্ঞেস করলাম। উনি অভিনয় ইত্যাদির প্রশংসা করলেন কিন্তু একটা যায়গায় ওঁর খটকা লেগেছে। আধুনিক কালের পোষাক পরিয়ে চরিত্র-গুলিকে বড় বেশি বেঁধে ফেলা হয়েছে। ওদের মুখে যখন রক্তকরবীর ঐ অসাধারণ ভাষা বলানো হয়, তখন দুটোকে মেলানো যায় না, অসামঞ্জস্যটা উৎকট হয়ে ওঠে। এটা সারাটা নাটকেই চলতে থাকে, ফলে রসবোধে হানি হয়।

কম্যুনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার সময় দেখেছি তাঁর যন্ত্রণাকাতর মুখ। এটা তাঁর কাছে রাজনৈতিক সঙ্কট তো ছিলই, ব্যক্তিগত সঙ্কটও ছিল।

কারণ উভয়পক্ষেই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ছিলেন। দু-দিকের দুই বিপরীতমুখী টানে তিনি দীর্ণ হতেন।

ওঁর বৈঠকখানার বাড়ি ঠিক রাজাবাজারের লাগোয়া। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা উত্তেজনার সময় এ এলাকায় অশান্তির আশঙ্কা থাকে। এই সময়গুলিতে পাড়ায় যতগুলি শান্তি-উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, নারায়ণবাবু তার অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন। তাঁর বাড়ির লাগোয়া হিন্দু-মুসলমানের একটি মিশ্র বৃহৎ বস্তি ছিল। এইখানকার লোকেদের জন্যে এই উদ্যোগ বিশেষ জরুরী ছিল।

এইরকম অশান্তির সময় অনেক বন্ধু ওঁকে কয়েকদিনের জন্য অন্তত বিপদ-মুক্ত এলাকায় গিয়ে থাকতে বলতেন। কিন্তু উনি কোনো সময়ই তা যাননি। বলতেন, 'না, আমায় মারবে না। আমায় চেনে।'

পটলডাঙা-বৈঠকখানা পাড়াতেই তাঁর জীবনের দীর্ঘতম কাল কেটেছে। এই সূত্রে পটলডাঙা আবার নতুন করে সাহিত্যের পাতায় ফিরে এল। নারায়ণ-বাবুর শিশুসাহিত্যে এ-নামটিকে তিনি স্থায়ী করে রেখে গিয়েছেন। পটল-ডাঙার নামে আমিও অনেক সময় শিশুমহলে খাতির পেয়েছি। যেই শুনেছে আমার বাড়ি পটলডাঙায়, অমনি শিশুদের প্রশ্ন, 'আচ্ছা, পটলডাঙ্গার টেনিদাকে চেনেন? সত্যি টেনিদা বলে কেউ আছে?'

ওদের হতাশ করে বলতে হয়েছে, 'না। টেনিদা পটলডাঙায় নেই। টেনিদা আসলে ছিল নারায়ণবাবুর সৃষ্টিশীল কল্পলোকে। পটলডাঙার মাটিতে উনি তাকে লালন করেছিলেন।'

অনেক সময় তিনি নিজেকে 'পটলডাঙার লোক,' 'উত্তর কলকাতার লোক' ইত্যাদি বলে পরিচয় দিতেন, গর্বের সঙ্গেই বলতেন। একদিন সেই নারায়ণ-বাবু উত্তর কলকাতার বাস তোলবার সিদ্ধান্ত নিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী, আপনি নাকি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন?'

'আপনাদের ছেড়ে যাব কোথায়? তবে বাড়িটা ছাড়ছি। সামনে ঐ কর্পোরেশনের গোখানায় রাত চারটে থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ শুরু হয়। রাতে শুই দেরীতে, ভোররাতে উঠে পড়তে হয়। ঘুম হয় না।'

এ-ছাড়াও অন্য অসুবিধে ছিল, আমি আগেই শুনেছিলাম। সে-সব কথাও বললেন।

বললেন, 'দক্ষিণে যাচ্ছি বলে আপনারা যেন আমায় ছাড়বেন না। যাবেন ও বাড়িতে, এখানকার মতোই। আপনার তো চাকরি করতে যাওয়ার পথেই।'

'হ্যাঁ, নিশ্চই যাব।'

কিন্তু জীবনের বহু প্রতিশ্রুতির মতো এটাও রক্ষা করা হয়নি। যাতায়াতের পথে অনেক বার মনে হয়েছে, নামি। কিন্তু নামা হয়নি। দেখা হলে বলেছেন, 'বাড়িতে আসুন একদিন।' আশাদেবীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, উনিও বলেছেন, 'নতুন বাড়িতে এলেন না?'

'হ্যাঁ, শীগগিরই যাব।'

সেই গেলাম। কিন্তু বড় দেরীতে। ওঁর মৃত্যুসংবাদ পেলাম পটলডাঙারই এক প্রতিবেশীর কাছে। সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি, ভদ্রলোক বললেন, 'শুনেছেন, নারায়ণবাবু মারা গেছেন—আমাদের নারায়ণবাবু—সাহিত্যিক নারায়ণবাবু। এইমাত্র রেডিয়োতে বলল।'

পটলডাঙার লোক ওঁকে, নিজেদের লোকই মনে করত, 'আমাদের নারায়ণবাবু।'

পরদিন গেলাম সেই দক্ষিণের বাড়িতে। বহু লোক জড় হয়েছেন। ছাত্র, ছাত্রী, অধ্যাপক, সাহিত্যিক। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর লরিতে ফুল দিয়ে সাজিয়ে ওঁকে নিয়ে আসা হলো শেষবারের মতো।

তারপরে আবার যাত্রা, কেওড়াতলার দিকে। আমরাও শোকযাত্রার সঙ্গে গেলাম শ্মশানে।

সেখানে আগে থেকেই অনেকে অপেক্ষা করছিলেন।

এতটা লিখেও মনে হচ্ছে, আসলে লোকটাকে ভালো করে ধরা গেল না। জীবনের স্রোতটা বয়ে চলে গেলে শুকনো নুড়ির ওপর বসে স্মৃতির আঁজলায় কতটুকুই বা ধরা যায়।

স্মৃতিকথার খসড়া

দেবেশ রায়

প্রায় পঞ্চান্ন চলছে এমন একজন প্রিয় কবি স্মৃতিকথা লিখতে সুরু করবেন শুনে এমন হেসেছিলাম—"আপনি সত্যি বুড়ো হলেন!" যদিও জানতাম তাঁর স্মৃতি-কথা পড়তে আমাদের খুব ভালো লাগবে। তখন কি ভেবেছি আমাকেই স্মৃতি-কথার পালা সুরু করতে হবে। তখন কি ভেবেছি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আমার স্মৃতির প্রথম পরিচ্ছেদ হয়ে উঠবেন, এতো তাড়াতাড়ি, আমার এই বয়সে, নারায়ণবাবুর এই বয়সে।

"নারায়ণবাবু" কথাটা লিখবার আগে একটু ভেবেছি। আমি তাঁকে কখনও ডাকিনি। কী বলে ডাকবো সে নিয়েই গোলমাল কাটলো না। আমার ছোটবেলায়, ইস্কুলে তখনো ভর্তি হইনি বা পাড়ার পাঠশালায় মাত্র যাতায়াত করি, তাঁর ভাইঝি আমার খেলার সঙ্গিনী ছিল। মিনু। মিনুর দাদা, সাধন-দা ছিলেন আমার দাদার সহপাঠী ও বন্ধু। তখন তাঁকে বলতাম, আড়ালে, 'মিনুর কাকা' না 'সাধন-দার কাকা'। বি-এ পাশ করা পর্যন্ত তাঁকে আমাদের শহরে পূজোর ছুটিতে নিয়মিত দেখতাম। রাস্তাঘাটে দেখা হোলে তিনি একটু পরিচিত হাসি মুখে লাগিয়ে রাখতেন। আমার ধারণা তাঁর দিকে আমার চাউনি দেখে বুঝি আমাকে চেনা ভাবতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় দেখি উনি আমাকে চিনে রেখেছেন। মানে, ভোলেননি। পরে বুঝেছি ভোলাটা ওঁর স্বভাবে ছিল না, মনে রেখে দেওয়াই ছিল ওঁর ধাত। তখন রীতি অনুযায়ী তাঁকে ডাকার কথা "স্যার"। তাও পারিনি। বোধহয় তাঁকে শুধু মাস্টামশাই আমি ভাবতে চাইতাম না। আমাদের গল্প তখন দু-চারটে বেরয়। কিন্তু উনি কথাবার্তায় আমাদের এমন লেখক বানিয়ে দিতেন, বোধহয় তাঁর সঙ্গে লেখকের সম্পর্কটাই আমার আকাঙ্ক্ষিত ছিল। সে যাই হোক। এতগুলো বছর তাঁর সঙ্গে চেনাজানা সত্ত্বেও, তাঁকে ডাকা হলো না—কি নামে ডাকবো সেটা ঠিক করার আগে তিনি ডাকে সাড়া দেবার বাইরে চলে গেলেন।

"মিনুর কাকা" বলে যাঁকে নিজেদের ভেতর বলতাম, ঐ ছেলেবেলায় তাঁকে "কাকা" বলতে অসুবিধে কি ছিল। আসলে ডাকার যে কোনো উপলক্ষই ছিল না। মিনুদের বাড়িটা ছিল সাবেকি তিনঘরো। সামনে একটা পোর্টিকোর মতো ঘর, তার দুপাশে দুটো। বাইরের ঘর দিয়ে বাঁদিকের ঘর দিয়ে ভেতরে যাবার দরজা। বাড়ির সামনে বেশ খানিকটা মাঠ, উত্তরমুখো, তারপর রাস্তা, তারপর একটা বড় মাঠ কোণাকুনি পেরলে আমাদের বাড়ি। ছুটোছুটির পথ হয়ে যেত বাড়ি থেকে মাঠ পেরিয়ে মিনুদের বাইরের ঘর, মিনুর কাকার ঘর দিয়ে, উঠোন দিয়ে, টিনের দরজা দিয়ে আবার মাঠ। ব্যাপারটা দাঁড়াত যেন মিনুর কাকাকে পাক দিয়ে আমরা দৌড়তাম। পরে জেনেছি উনি তখন 'উপনিবেশ' লিখতেন। তক্তপোশের সঙ্গে একটা টেবিল লাগানো ছিল। একদিনও আমাদের দিকে ফিরে তাকাননি। একদিনও একটা কথা বলেননি। একদিনও বকেননি। বিকেলে বেড়াতে বেরতেন। সব মনে আছে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে বলে মনেই পড়ছে না। যাঁকে কোনোদিন ডাকতে হয়নি, যার সঙ্গে কোনোদিন কথা বলতে হয়নি, তাঁকে এতো মনে আছে কেন। কারণ, তাঁর অনন্যমনস্কতা, আমাদের একেবারে না-দেখা।

আমার ছেলেবেলায় দেখা সেই অনন্যমনস্কতায় তিনি সবাইকে ছেড়ে চলে গেলেন। আমি যে সেই শহরটাতেই আছি। পুরনো পাড়ার সেই মিনুদের বাড়িটা অবিকল একরকম। মাঠটাও। আমরা যে-বাড়িটাতে ভাড়া থাকতাম সেটাও। আমার স্মৃতিতে সেখানে একটা কিছু যে ফাঁকা হয়ে গেল। এতো তাড়াতাড়ি তো আমার স্মৃতিতে ফাঁকা ধরবার কথা ছিল না।

স্কুলে, এইট-নাইনে, সবে গল্প-উপন্যাস সুরু করার বয়সে নারায়ণবাবুর লেখা ছাড়া আমাদের গতি ছিল না। আমাদের পাড়ার লেখক। আমাদের চোখে দেখা লেখক। কিন্তু কখন যেন তিনি আমারই লেখক হয়ে উঠেছিলেন। ঐ বয়সে নারায়ণবাবুর ভাষায় রোমাঞ্চ তো লাগবারই কথা, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা একটু অন্যরকম। ঐ বয়সে নিজেদের মফঃস্বল শহরের পরিবেশকে একটু-আধটু সবে চিনতে সুরু করেছি ছুটির দুপুরের সীমাহীনতায় বা এমন-কি তখনই, তিস্তার পাড়ের বিকেলে। কনক, পুষ্পেন আর আমি ছিলাম তিনবন্ধু, তাই নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ ছিল না, কনক আজ কোন্ দেশি ফার্মের বড় অফিসার। পুষ্পেন জলপাইগুড়িতে চাকরিজীবি। কিন্তু বন্ধু আমরা রয়েই গেছি। তার কারণ শুধু এটাই নয় যে সেই বয়সেই আমাদের বন্ধুত্বটা এতো জমাট বেঁধে

গিয়েছিল যে বাতাস গলবার পথ ছিল না। তার আসল কারণ অন্যত্র। জলপাইগুড়ির করলা নদীর লোহার ব্রিজে—৬৮র বন্যায় ভেসে গেছে—পা ঝুলিয়ে বা এখন বাঁধের মাটিতে চাপা পড়া কিং সাহেবের ঘাটে তখন আমাদের সামনে আর এক জগৎ খুলে গেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসে জলপাইগুড়ির চেনাজানার জগৎ এক অপরূপ চেহারা নিয়ে ধরা পড়েছে। জলপাইগুড়ি শহরের পুরনো কলেজ, রেসকোর্সের মাঠ, পুলিশ লাইন, কিং সাহেবের ঘাট, লোহার ব্রিজ, হাকিমপাড়া, কাছারি—এইসব তখন নারায়ণবাবুর গল্পের পরিবেশ পরিস্থিতি। আমরা সেই গল্পগুলি পড়ে এই জায়গাগুলোকে দেখতাম। মিনুর কাকা যেমন কেন্দ্রে বসে থাকতেন, আমরা ছুটোছুটি করতাম, তেমনি, নারায়ণবাবু এই পথগুলোতে বেড়াতেন, বিকেলে,—তাঁর পেছু পেছু আমরাও দুপুরে-বিকেলে। তখন বুঝতে পারিনি। আজ পারি। নারায়ণবাবু যদি জলপাইগুড়ি নিয়ে গল্প না-লিখতেন, দেখতে শিখতাম কি, এই কাছের শহরটিকে।

আর একদিনের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পালাও প্রায় শেষ। এক-একদিন এক-একজনের ক্লাশ শেষ হয়ে যাচ্ছে। সে-সবের তোয়াক্কা না করে আমরা চার বন্ধু এক বন্ধুর বাড়িতে তিনদিন তিনরাতের ম্যারাথন আড্ডা দিয়ে যাচ্ছি। বেলা সাড়ে এগারোটায় খেয়াল হলো সেদিন নারায়ণবাবুর শেষ ক্লাশ। বাস ধরে, ট্রাম ধরে, ট্যাকসি পাকড়ে কোনোরকমে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছনো গেল। ছোটগল্পের ক্লাশ। নারায়ণবাবুর আলোচ্য কী ছিল, আজ মনে নেই। মনে আছে তাঁর সেই অসামান্য ভাষায় ভবিষ্যতের ছোটগল্প নিয়ে বলছিলেন, বাঙলাভাষার ভবিষ্যতের ছোটগল্প নিয়েও।

সেটাই ছিল আমাদের ছাত্রজীবনের শেষ ক্লাশ।

কে জানতো সেটাই হবে আমার স্মৃতিকথার প্রথম খসড়া।

পুস্তক পরিচয়

সামাজিক চুক্তি, জাঁ জাক রুশো, অনুবাদ—ননীমাধব চৌধুরী। সাহিত্য অকাদেমী, মূল্য ছয় টাকা

প্রচলিত উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যে যখন নতুন উৎপাদনব্যবস্থার অঙ্কুর মাথা তুলতে শুরু করে, উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটতে থাকে, তখন পুরাতন সমাজে ধরে ভাঙন আর তখনই মানুষের ভাবজগতে জাগে নতুন চিন্তা, নতুন ভাবনা। মনীষী ও বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের নতুন চিন্তা-ভাবনার বন্যা বহিয়ে দেন পুরাতন সমাজের চিন্তা-ভাবনার পঙ্কিল জলায়, মানুষের মনে জাগিয়ে তোলেন নতুন ভাবাদর্শ। নতুন ভাবাদর্শে উদ্দীপ্ত মানুষ অচলায়তন চূর্ণ করে গড়ে তোলে তুন সমাজ।

ইয়োরোপে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে প্রথম ভাঙন ধরে ইংলণ্ডে। নানা কারণে ইংলণ্ডেই প্রথম বুর্জোয়া বা মধ্যশ্রেণী প্রবল হয়ে ওঠে। অভিজাত সামন্তবর্গ এবং তাদের শিরোমণি রাজার সঙ্গে উদীয়মান ধনিকশ্রেণীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হয়। ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে বিপ্লব, রাজা চার্লসের মৃত্যুদণ্ড এবং শেষ পর্যন্ত অভিজাত সামন্তশ্রেণী ও ধনিকশ্রেণীর মধ্যে আপসের মধ্যে দিয়ে এই সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি ঘটে। ধনিকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার হয়। ইংলণ্ডে যে-বিপ্লব টছিল তার ফলে ধনিকশ্রেণী ক্ষমতা লাভ করলেও সামন্ততন্ত্র আপস করে টিকে গেল এবং কালক্রমে ধনিকশ্রেণীরই অঙ্গীভূত হলো। সামন্ততন্ত্র ইংলণ্ডে চূড়ান্ত আঘাতে চূর্ণ হয়ে গেল না, ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার প্রভাব দূরপ্রসারী ; পারল না।

সামন্ততন্ত্রকে চূড়ান্ত আঘাত হানল ফ্রান্সের মানুষ। ফরাসী-বিপ্লব মন্ততন্ত্রের মূলোৎপাটন করে প্রতিষ্ঠা করল বুর্জোয়া-গণতন্ত্র, মধ্যশ্রেণী ধনিক-শ্রণী রূপে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলো, গড়ে উঠল নতুন সমাজব্যবস্থা যা মাদের কাছে পুঁজিবাদ নামে পরিচিত। ফরাসী-বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে পড়ল জগতে এমনকি সামন্ততন্ত্র শাসিত ভারতবর্ষেও।

ফরাসী-বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্ব শুরু হয়েছিল অনেকদিন আগে থেকেই। লক্ষ ব্যবসায়ী ও বণিকেরা বিরক্ত, রুষ্ট ; কারিগর ও কৃষক নিপীড়িত ও ক্ষুব্ধ। বসা-বাণিজ্যের অবাধ প্রসার পদেপদে ব্যাহত, কৃষকদের জমির ক্ষুধা অতৃপ্ত। শুধু সামন্ততন্ত্র তাই সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের আগুন মায়িত হতে থাকল। বুর্জোয়া বা মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধিজীবীরা এই

অসন্তোষ ও বিক্ষোভকে ভাষা দিলেন। আবির্ভূত হলেন ফিজিওক্র্যাট অর্থনীতিবিদরা, মঁতাস্কু, ভলতেয়ার, দিদরো, রুশো, এনসাইক্লোপিডিষ্ট গোষ্ঠী। নতুন ভাবধারা ফ্রান্স তথা সারা ইয়োরোপকে প্লাবিত করল।

২

ফরাসী-বিপ্লবের মতাদর্শগত প্রস্তুতিতে যাঁরা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে ছিলেন তাঁদের তিনটি প্রধান গোষ্ঠীতে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রথম গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেন, ভলতেয়ার (আসল নাম ফ্রাঁসো মারি আরুয়েত, (১৬৯৪-১৭৭৮) ও চার্লস লুই মঁতাস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫)। ভলতেয়ারের তীব্র শ্লেষাত্মক রচনা স্বৈরতন্ত্রের মুখোস খুলে দিয়েছিল, অভিজাত শ্রেণীর বিশেষ সুবিধাভোগের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল, ক্যাথলিক চার্চের কুসংস্কার ও অন্ধ গোড়ামির বীভৎস রূপকে লোকের চোখের সামনে তুলে ধরে ছিল।

মঁতাস্কু সামন্ততন্ত্রের তীব্র সমালোচনা করে শ্রেষ্ঠ সমাজব্যবস্থা হিসাবে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানিয়েছিলেন। ভলতেয়ার ও মঁতাস্কু উভয়েই ছিলেন বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। এঁরা কেউই রাজতন্ত্র উৎখাৎ করতে চাননি। এঁদের সাম্যের দাবীর অর্থ ছিল বুর্জোয়া ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সাম্য। স্বাধীনতা বলতেও এঁরা বুঝেছিলেন বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বাধীনতা। কিন্তু এঁদের রচনা অচলায়তনের ভিত্তিমূল টলিয়ে দিয়েছিল।

ভলতেয়ার ও মঁতাস্কুর ভাবাদর্শতে আরও চরমপন্থী রূপ দিলেন দ্বিতীয় গোষ্ঠী। এঁদের মধ্যে ছিলেন জাঁ জাক রুশো (১৭১২-১৭৭৮) এবং এনসাইক্লো-পিডিষ্টরা (দিদরো, হেলভেতিউস, দ্যলেমবার্ত প্রভৃতি)। এঁরা ছিলেন মাঝারি ও ক্ষুদে বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি। এঁরা জনগণের সম্মতিক্রমে গঠিত ("সামাজিক চুক্তির" বলে) নির্যাতনহীন ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

তৃতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেন জাঁ মেসলিয়ের (১৬৬৪-১৭১৯ মোরেলি প্রভৃতি। এঁরা ছিলেন গরিব চাষী, শহরের দরিদ্র জনতা এবং মুটে-মজুরদের প্রতিনিধি। এঁরা বিপ্লবের মাধ্যমে শোষণ সমাজব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ করতে এবং শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। শোষণ ও গোষ্ঠীর কাল্পনিক কমিউনিজমের ভাবধারাকেই তাঁদের রচনায় প্রকাশ করেছিলেন।

ফরাসী-বিপ্লবের প্রস্তুতিপর্বে নিঃসন্দেহে প্রথমোক্ত দুটি গোষ্ঠীর দানই সর্বাধিক। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তিনটি নাম সবার আগে মনে পড়ে, এঁরা হলেন ভলতেয়ার, মঁতাস্কু ও রুশো।

ভলতেয়ার তাঁর অজ্ঞাতসারেই যে অচলায়তনকে টলিয়ে দিয়েছিলেন রুশো সেই অচলায়তনকে চূর্ণ করার কাজ শুরু করেন। একজন বুর্জোয়া ঐতিহাসিক লিখেছেন: "ভলতেয়ার যেখানে শেষ করলেন রুশো সেখানে যেতে আরম্ভ করলেন; শেষোক্ত জন যুক্তির অশ্বদের জুতেছিলেন, প্রথমোক্ত জন শিকল খুলে দিলেন আবেগের ব্যাঘ্রদের।"

অবশ্য সকল বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীই এই ধরনের মত পোষণ করেননি। মরলি লিখেছেন: "চিন্তা-ভাবনা যাঁরা করেছিলেন রুশোই ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবী। আর বিপ্লব কোনো-না-কোনো সমাধানের দ্বারা যে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিল রুশোই প্রথম সাহসের সঙ্গে সেইসব সামাজিক অবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন।"

যাইহোক ফরাসী-বিপ্লবের পূর্বাহ্নে রুশোর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ কঁত্রা সোসিয়াল বা সামাজিক চুক্তি সমগ্র ইয়োরোপে যে অচিন্তনীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিল এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিহাসের দিক থেকে রুশোর তত্ত্ব প্রমাণিত হবে না, তাঁর যুক্তিও সবক্ষেত্রে অকাট্য নয়। স্ববিরোধিতাও তাঁর লেখায় খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু সেদিন মানুষ তাঁর বক্তব্যকে পরিপূর্ণভাবেই উপলব্ধি করেছিল, সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের টিকে থাকার কোনো অধিকার নেই। মানুষ যে সামন্ততন্ত্রের শৃঙ্খলে বাঁধা রয়েছে তা চূর্ণ করে স্বাধীনতা অর্জনের অধিকার মানুষের রয়েছে। মানুষের সভ্যতার যাত্রাপথে ফরাসী বিপ্লব যেমন চিরস্মরণীয় দিকচিহ্ন হয়ে আছে, মানুষের রাষ্ট্রদর্শনের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসেও রুশোর 'সামাজিক চুক্তি' তেমনই চিরস্মরণীয় দিকচিহ্ন হয়ে রয়েছে।

৩

বাঙলাদেশে ফরাসী-বিপ্লব নিয়ে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা কিছুটা মাতামাতি করলেও রুশো, ভলতেয়ার, দিদরো প্রমুখ ফরাসী মনীষীদের সম্পর্কে বাঙলা ভাষায় আলোচনা বিশেষ হয়নি, মূল গ্রন্থাদির অনুবাদ তো দূরের কথা। প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) ফরাসী ভাষা জানতেন, ফরাসী সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগও

ছিল প্রগাঢ়। তাঁর রচনাতেই আমরা প্রথম ফরাসী রচনাভঙ্গির স্বাদ পেয়েছি। তিনি এবং প্রখ্যাত সমালোচক অতুল গুপ্ত উদ্যোগী হয়ে ননীমাধব চৌধুরীকে কঁত্রা সোসিয়াল মূল ফরাসী ভাষা থেকে বাঙলায় তর্জমা করতে অনুরোধ করেন। দুই বছর কঠোর পরিশ্রম করে অনুবাদক তাঁর কাজ শেষ করেন কিন্তু এই পোড়া বাঙলাদেশে তাঁর প্রকাশক জোটেনি। শেষ পর্যন্ত অনুবাদক নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে অনুবাদটি অল্পসংখ্যায় প্রকাশ করেন।

এও অনেকদিন আগের ঘটনা। লোকে এই অনুবাদের কথা ভুলেই গিয়েছিল। ইতিমধ্যেই ১৩৩৯ সাল বা তার কিছু আগে 'যশোর খুলনা যুব সমিতি' নামে একটি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী সংগঠনের অন্যতম নেতা ও 'প্রদীপ' সম্পাদক অতুলকৃষ্ণ ঘোষ 'ফরাসী বিপ্লবে রুশো' নামে একটি চটি বই রচনা ও প্রকাশ করেন। এরও অনেকদিন পরে ১৩৫৪ সালে নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রচিত 'রুশো' প্রকাশিত হয়। বাঙলা ভাষায় (সাময়িক পত্র-পত্রিকাদি বাদ দিলে) রুশো সংক্রান্ত রচনার ইতিহাস বোধহয় এই কয়খানি বইএর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

এতদিন পরে ননীমাধব চৌধুরী অনূদিত দুষ্প্রাপ্য 'সামাজিক চুক্তি' সাহিত্য অকাদেমী কর্তৃক পুনঃপ্রকাশিত হওয়ায় প্রমথ চৌধুরী, সবুজ পত্র গোষ্ঠী এবং ননীমাধব চৌধুরীর কাছে আমরা ঋণমুক্ত হলাম। এর জন্য সাহিত্য অকাদেমীকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

'কঁত্রা সোসিয়ালে'র মতো দুরূহ গ্রন্থ অনুবাদ করতে ননীমাধববাবুকে কি কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় ছত্রে ছত্রে। সমালোচকের ফরাসী ভাষায় কোনো জ্ঞান নেই। কিন্তু ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা গেছে অনুবাদ শুধু সঠিক নয় সাবলীলও বটে। আজকের দিনে তো কিছুটা সেকেলে ঠেকবে, কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে ননীবাবু আজকের তরুণ নন এবং রুশোর ভাষা আজকের ফরাসী ভাষা নয়।

প্রথমেই উদ্ধৃত করি সেই বিখ্যাত লাইনটির অনুবাদ: "মানুষ জন্মে স্বাধীন হইয়া, কিন্তু দেখা যায় যে সর্বত্র শৃঙ্খলে আবদ্ধ"। সমগ্র গ্রন্থটির অনুবাদ এমনই সহজ ও সাবলীলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মূল ফরাসী বাক্যাংশ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে, এতে ফরাসী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মিলিয়ে দেখার সুবিধে হবে।

অনুবাদে ব্যবহৃত পরিভাষা নিয়ে আজকের দিনে মতভেদ হতে পারে,

কিন্তু অনুবাদের গুরুত্ব তাতে কিছুমাত্র লাঘব হবে না।

রুশোর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনাবলীর পরিচয় গ্রন্থের গোড়াতেই দেওয়া হয়েছে। এতে গ্রন্থের মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে, তবে এই অংশ আরও একটু বিস্তারিত হোলে ভালো হতো। গ্রন্থের শেষে প্রতিশব্দের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে।

পরিচ্ছন্ন ও সুমুদ্রিত এই অনুবাদ গ্রন্থ প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারে স্থানলাভ করবে বলে আশা করি। এ-ছাড়া আজ রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান যখন বাঙলা ভাষাতেও শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তখন এই সুন্দর অনুবাদ গ্রন্থটি ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য তালিকাতেও স্থান লাভ করবে। এমন আশা করা বোধহয় অন্যায় নয়। এতে ভিন্ন ভাষার রচনাবলীর জন্য ইংরাজি ভাষার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকার প্রবণতা কমবে।

সুকুমার মিত্র

ধূর্জটিপ্রসাদ : জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী, অলোক রায়। বাগর্থ, পাঁচ টাকা

আমার তরুণবন্ধু অধ্যাপক অলোক রায় সম্প্রতি ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি জীবনচরিত রচনা করেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন লখ্‌নৌ ও পরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব তথা অর্থনীতির প্রথিতনামা অধ্যাপক, 'রিয়ালিস্ট' (গল্পের বই) ও 'অন্তঃশীলা'র (উপন্যাস) লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ। মাত্র দুটি বইয়ের নাম করলাম, প্রকৃতপক্ষে তাঁর রচিত বাঙলা ও ইংরাজী গ্রন্থের সংখ্যা কুড়ি হবে। এ-তিনগ্রন্থ বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হওয়া ছাড়া তিনি দেশী ও বিদেশী বিদ্বৎসমাজে, ছাত্র ও বন্ধুমহলে তাঁর বিস্তীর্ণ অধ্যয়নের জন্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ইংরাজী বাঙলা নতুন বই বার হোলেই কলকাতা লখ্‌নৌ ও বম্বের প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতারা তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। স্বয়ং দোকানে গিয়েও তিনি বই সংগ্রহ করতেন। নাটক, উপন্যাস, গল্প, জীবনী, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, পুরাতত্ত্ব, আর্ট ইত্যাদি বিষয়ে বই তিনি যা কিনেছিলেন ও উপহার পেয়েছিলেন তাদের সংখ্যা অন্যূন চার হাজার হবে। তাঁর প্রীতিভাজন লেখক, বন্ধু ও ছাত্র সংখ্যা অগণিত হবে। একজন ছাত্র তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন, "D. P.'s greatness as a teacher lay in the fact that he was not merely a teacher ; his influence on most of his students was total". প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন প্রবুদ্ধকারী

শিক্ষক। তেমনি ছিলেন একজন প্রতিভাবান আলাপচারী। প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় লেখক, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীর সমাগমে তাঁর বসার ঘর ভরে উঠত।

গুটিকয়েক কারণে আমি শ্রী অলোক রায়ের বইটির সমালোচনা লিখতে সঙ্কোচ বোধ করছি। অনেককাল—ত্রিশ বছরের উপর,—আমি সমালোচনা লিখিনি। এই হেতু আমার প্রধান সঙ্কোচ। দ্বিতীয় কারণ হলো, ঠিক সহপাঠী না হোলেও ধূর্জটিপ্রসাদ ছিলেন কলেজে পাঠকালে আমার সমবর্তী ও আমার পরম শ্রদ্ধেয় অন্তরঙ্গ সুহৃদ। তাঁর অকালমৃত্যুর (১৯৬১) পরেই সদ্য আমি 'অমৃত' পত্রিকায় তাঁর বিয়োগ-প্রশস্তি লিখেছিলাম। তারপর অপেক্ষাকৃত এই অল্পকালের মধ্যে তাঁর একটি তথ্যসমৃদ্ধ সুরচিত জীবনরচিত প্রকাশিত হলো, আমার কাছে এ এমন আনন্দের বিষয় যে তার সমালোচনা লিখতে সঙ্কোচ বোধ করছি। আধুনিক পাঠকদের কাছে বইটির পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ভার আধুনিক কোনো সমালোচক গ্রহণ করলে ভালো হতো। তাছাড়া বইটিতে একাধিক স্থানে গ্রন্থকার আমার নাম উল্লেখ করে আমাকে সম্মানিত করেছেন।

এ-অবস্থায় ঠিক গ্রন্থের সমালোচনা নয়, আমি এখানে বইটির উল্লেখযোগ্য অংশগুলি উপস্থিত করছি।

প্রথমেই পাঠকের কাছে নিবেদন করি যে, ধূর্জটিপ্রসাদের জীবনচরিতটি আমার সবিশেষ ভালো লেগেছে। গ্রন্থকার যথোচিত যত্ন অধ্যবসায় অনুসন্ধিৎসা সহযোগে দরদ ও শ্রদ্ধা দিয়ে তথ্য সম্বলিত করে বইটি রচনা করেছেন। আমার বিশ্বাস যাঁরা বইটি পড়বেন, তাঁরা সকলেই আমার সঙ্গে একমত হবেন।

এখানে একটা কথা উল্লেখের ইচ্ছা করি। আমাদের দেশে অন্য সব রচনার তুলনায় জীবনচরিত লেখা হয় কম। মহৎ-জন, কবি, লেখক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সমাজসংস্কারক, শিক্ষাব্রতী, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, গায়ক প্রভৃতির জীবনচরিত লেখা হয়েছে স্বল্পই। এই স্বল্পসংখ্যার মধ্যে কিছু আত্মজীবনী, কিছু বিদেশীর লেখা জীবনী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী (১৮৯৮) বাঙলাসাহিত্যের একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। বিদ্যাসাগর তাঁর স্বরচিত জীবনচরিত (১৮৯১) সম্পূর্ণ না করলেও যেটুকু লিখেছেন তা একান্ত সুখপাঠ্য। কবি নবীনচন্দ্র সেন পাঁচ খণ্ড-ব্যাপী বিরাট আত্মজীবনী (১৯০৮-১৯১৪) লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম বয়সের আত্মজীবনী লিখেছেন (জীবনস্মৃতি ১৯১২); তাছাড়া তাঁর নানা ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তাঁর জীবনের কথা ছড়িয়ে আছে। বুদ্ধজাতক রচনা করেছিলেন বুদ্ধ শিষ্যরা। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত এক মহাকাব্য। অশোকের জীবনীকার Vincent

smith। শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীকার আছেন। রামমোহনের জীবনী লিখেছেন মিস ক'লেট (১৯০০) ও তার পূর্বে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৮১)। বিদ্যাসাগরের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখেন তাঁর ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন (১৮৯১), পরে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়(১৮৯৫) ও বিহারীলাল সরকার(১৮৯৫)। মধুসূদনের জীবনচরিত লেখেন যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৬) ও নগেন্দ্রনাথ সোম (১৯২০)। রমেশচন্দ্রের জীবনী লিখেছেন ইংরাজীতে তাঁর জামাতা জে. এন. গুপ্ত (১৯১১)। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আত্মজীবনী আছে ইংরাজীতে। 'বাঙলার মহাপুরুষ'—ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য রচিত শ্রীঅরবিন্দের জীবনী। বাঙলাদেশে যিনি স্কুল শিক্ষার প্রবর্তন করেন সেই মহামতি ডেভিড হেয়ারের জীবনী লিখেছেন আমাদের বন্ধু রাধারমণ মিত্র। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রজীবনী (চার খণ্ড) শুধু বাঙলাসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ নয়—অন্য ভাষায় অনূদিত হোলে সে-ভাষারও সম্পদ হবে। কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে হয়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (গল্পলেখক), প্রমথ চৌধুরী, মনোমোহন ঘোষ, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি অনেকেরই পূর্ণাঙ্গ নির্ভরযোগ্য জীবনী এখনও লেখা হয়নি। বাঙলাসাহিত্যের এত উন্নতি ও বিবর্তন সাধিত হোলেও জীবনচরিতের স্বল্পতা নিতান্ত পরিতাপের কথা। খতিয়ে দেখলে সব মিলে সংখ্যায় কুল্লে বিশ-পঁচিশটি হবে। এ-হেন ক্ষেত্রে ধূর্জটিপ্রসাদের মতো একজন সর্বপ্রিয় শিক্ষাব্রতী, বিশ্রুত সঙ্গীতজ্ঞ ও বাঙলা কথাসাহিত্যে এক নতুন ধারার প্রবর্তকের জীবনচরিত রচনা করে বাঙালি পাঠকের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন গ্রন্থকার।

উপন্যাস রচনায় ধূর্জটিপ্রসাদ এক নতুন আঙ্গিকের প্রবর্তক, যাকে বলা হয় চেতনাপ্রবাহ ;—চেতনা ও স্মৃতিপ্রবাহ,—Stream of consciousness। ধূর্জটিপ্রসাদ বলেছেন, এ তিনি নিয়েছেন প্রুস্ত ও উল্‌ফ থেকে। গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ঠিক অনুকরণ করেননি, কেননা এ-চেতনা ও স্মৃতিপ্রবাহে ধূর্জটিপ্রসাদের আঙুলের ছাপ আছে।

আমি এক সময়ে বলেছিলাম বাঙলা উপন্যাসে এ-ধারা এই প্রথম নয় ; বলা চলে বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলে (সুমতি কুমতির দ্বন্দ্ব) ও রজনীতে এ-ধারার উন্মেষ দেখা যায়। সে যাহোক 'অন্তঃশীলা' বার হবার অল্পকালের মধ্যেই এ ধারা আর এক লেখকের এক উপন্যাসে অনুবর্তিত হলো। আধুনিক কালে

বাঙলা উপন্যাস ও গল্পে এ-পদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠিত। এ-আঙ্গিক প্রবর্তনের সুনাম অবশ্যই ধূর্জটিপ্রসাদের প্রাপ্য।

'অন্তঃশীলা', 'আবর্ত', 'মোহানা'—একসূত্রে গাঁথা উপন্যাস-এয়ী। এ-তিনটিকে যদি সম্পূর্ণ এক উপন্যাস বলে ধরা যায় তবে এর সার কথা হলো একদিকে ভাবানুষঙ্গ, অন্যদিকে জীবনধারণের ক্রূরতা জৈবিক আকর্ষণ ও দৈন্য থেকে একজন পরিমার্জিত বুদ্ধিজীবীর মুক্তিসন্ধান। এ-মত ধূর্জটিপ্রসাদের নিজেরই। আমার মনে হয় উপন্যাস-এয়ীর নায়ক খগেনবাবুর মতো ঐকান্তিক বুদ্ধিজীবীর মানসিক সংগ্রামের চিত্র আজ পর্যন্ত অন্যকোনো বাঙলা উপন্যাসে উপস্থিত করা হয়নি।

এই উপন্যাস-এয়ীতে ধূর্জটিপ্রসাদ যে-শৈলী অবলম্বন করেছিলেন, তিনি বলেন তা 'ডায়ালেক্‌টিক'; এবং এ-বিষয়ে তিনি নিজেকে 'Marxologist' আখ্যা দিয়েছিলেন। মার্কসবাদীরা তাঁর এ-দাবী কতদূর সঙ্গত বিচার করে দেখবেন।

শ্রীঅলোক রায় এই উপন্যাস তিনটির প্রসঙ্গে এ-সকল কথা সম্যক আলোচনা করেছেন। তাছাড়া ধূর্জটিপ্রসাদের 'রিয়ালিস্ট' পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সমালোচনা সূচক যে-চিঠি লেখেন এবং 'অন্তঃশীলা' পড়ে ১৩৪১ সালে 'চিত্রালী'তে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী যে-সমালোচনা প্রকাশ করেন ও তার প্রত্যুত্তরে ধূর্জটিপ্রসাদের বক্তব্য গ্রন্থের পরিশিষ্টে উদ্ধৃত করে শ্রী অলোক রায় বই ক'খানির উপর উজ্জ্বল আলোকপাত করেছেন। শ্রীরায়ের মত সমর্থিত করে বলতে ইচ্ছা করি যে আত্মপক্ষ সমর্থনে ধূর্জটিপ্রসাদের ব্যাখ্যা অধিক সারবান।

ভারতীয় সঙ্গীত পদ্ধতি নিয়ে কবিগুরু ও ধূর্জটিপ্রসাদের মধ্যে পত্র বিনিময় হয়। সেগুলি একত্রিত করে 'সুর ও সঙ্গীত' নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুগ্মভাবে গ্রন্থাকারে ছাপাবার অসামান্য সৌভাগ্যলাভ করেন ধূর্জটিপ্রসাদ। ছোট আকারের হোলেও নানা কারণে এই বইটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং অলোক রায় বইটি সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রাবলীর মাধ্যমে এই কথা স্পষ্ট করতে চেয়েছিলেন যে, ভারতীয় রাগরাগিণী তার সুরসংযোগের নৈষ্ঠিক সমাবেশ, তান বিস্তার, শ্রুতি মিড় প্রভৃতিতে সজ্জিত হয়ে তার কৈশোর যৌবনের সার্থকতা সুসম্পাদিত করে সম্প্রতি কতকগুলি নিয়ম বন্ধনের খাদে পড়ে গিয়েছে। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রশস্ত খাতে প্রবাহিত করে তাদের

স্রোতস্বতী করতে হবে। এর আগেও কবিগুরু 'সবুজ পত্রে' 'সঙ্গীতের মুক্তি' নামে প্রবন্ধে ভারতীয় রাগরাগিণীর বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, বিশ্বসৃষ্টিতে যে নিত্যরস আছে এতদিন ভারতীয় সঙ্গীত তার বাহক হয়ে এসেছে। এখন সময় এসেছে তাকে মানব-হৃদয়ের বেদনার বাহক করে দেবার। সঙ্গীতে কাব্যের আবেদন সংযুক্ত করতে হবে। এ-কাজ করতে হবে রাগরাগিণীর প্রাথমিক সুর-বন্ধগুলি শুধু বজায় রেখে ও তাদের নতুন করে সুসংযোজিত করে, যাতে মানুষের হৃদয়বেদনা রূপায়িত হয়।

অপর পক্ষে ধূর্জটিপ্রসাদ এই পত্রবিনিময়ের মাধ্যমে ভারতীয় সঙ্গীতের আর একদিকের,—যথা, তার বন্দেশ, আলাপ ও স্থাপত্যের ব্যাখ্যা করে সঙ্গীতের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদের পত্রগুচ্ছ পরস্পরবিরোধী নয়, সম্পূরক। সঙ্গীত বিষয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ আরও দুটি বই লেখেন, যথাক্রমে 'কথা ও সুর' এবং 'Indian Music'। এই বই দুটির কথাও সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন অলোক রায়।

ধূর্জটিপ্রসাদের সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি সম্বন্ধে বইগুলি, প্রবন্ধ ও বিদেশে প্রদত্ত ভাষণের কথাও গ্রন্থকার বিশদ করে আলোচনা করেছেন। এ-বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা আমার সাধ্যাতীত ; বিষয়টি আমার এলাকার বাইরে।

ধূর্জটিপ্রসাদের আর একটি গ্রন্থের কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। এটি হলো 'Tagore A Study' ; তাঁর রচিত ক্ষুদ্র এক পুস্তিকা। যাঁর রচনার ব্যাপকতা সাগরতুল্য, যাঁর সৃষ্টির মহিমা আকাশস্পর্শী তাঁর কথা কি একটা ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বিধৃত করা যায়! অথচ ক্ষুদ্রেরও নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার সামর্থ্য থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের অনতিকাল পরে রচিত পুস্তিকাটি সে-সামর্থ্যের স্পর্ধা রাখে। খুশি হতাম, যদি অলোক রায় পুস্তিকাটি সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু বিবরণ বা রায় দিতেন। বইটি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে।

'ঝিলিমিলি' ও 'মনে এলো' ধূর্জটিপ্রসাদের দুটি আলোকরশ্মি ঠিকরানো বই ; রোজনামচা স্টাইলে লেখা। একটি চিন্তাশ্রিত অপরটি পঠনাশ্রিত। এই বই দুটি সম্বন্ধেও গ্রন্থকার আরও কিছু বেশি করে লিখতে পারতেন।

পরিশিষ্টে ধূর্জটিপ্রসাদের যে-গ্রন্থপঞ্জী এবং গ্রন্থাকারে অসঙ্কলিত রচনার তালিকা সংগৃহীত হয়েছে তা গ্রন্থকারের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় বহন করে।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

হাজার বছরের বাংলা গান : প্রভাতকুমার গোস্বামী সম্পাদিত। সারস্বত লাইব্রেরী, পনর টাকা

'হাজার বছরের বাংলা গান' একটি সঙ্কলন-গ্রন্থ। বিভিন্ন সময়ের গীতকারদের রচিত বিভিন্ন প্রকারের বাঙলা গান এই সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে। একসময় এই ধরনের সঙ্কলন-গ্রন্থের খুব চল ছিল। কাঙালীচরণ সেন-এর 'ব্রহ্মসঙ্গীত' সঙ্কলন প্রায় ঘরে ঘরে দেখা যেত। বিভিন্ন গীতকারদের গান নিয়ে বৃহদাকার সঙ্কলন তারপরেও ছড়িয়েছে অনেক। সেগুলো প্রায়শই ছিল সে-কালের জনপ্রিয় গানগুলোর সঙ্কলন—যেমন, রেকর্ড-সঙ্গীত (ঐ নামেই বোধহয় একখানা বইও ছিল), বহুল প্রচারিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলো, শ্যামাসঙ্গীত, রঙ্গমঞ্চের গান, শহুরে পল্লীগীতি, ব্যঙ্গ-তামাসা ইত্যাদি। ফুটপাথে পরোনো বই-এর দোকানে দশ-বিশ-ত্রিশে প্রকাশিত এই ধরনের বই মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়, বসে বসে পাতা উলটে প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়, উপকারেও আসে, অপ্রত্যাশিত-ভাবে দু-একটা দুষ্প্রাপ্য গানের কথা পাওয়া যেতে পারে। এইসব গ্রন্থের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ব্যাপারটা হলো গানের সংখ্যা এবং বৈচিত্র্য। এত এত গান একসঙ্গে হাতের কাছে পাওয়াটাই লাভ। স্বরলিপি সমেত যেসব সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে, বাস্তব কারণে সেগুলোতে গানের সংখ্যা অল্প। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বা কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্যই ব্যতিক্রম। তাছাড়া ও-সব বই বোধহয় সঙ্গীতের গম্ভীর ছাত্রদের হাতেই মানায়। আ-পামর বাঙালির আনন্দ প্রাপ্তি ঘটাতে প্রয়োজন, ও যথেষ্ট স্বরলিপি ছাড়া শুধু গানের কথার সঙ্কলন। 'হাজার বছরের বাংলা গান' ঠিক এই ধরনের একখানা বই।

পূর্বে যেসব সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলো দুষ্প্রাপ্য। বর্তমান সঙ্কলনটি প্রকাশের সপক্ষে এই একটা যুক্তিই যথেষ্ট। প্রভাতকুমার গোস্বামী অবশ্য আরো কিছু চিন্তা করেছেন। ভূমিকায় বলা আছে 'তা ছাড়া গত হাজার বছরের মধ্যে রচিত বিভিন্ন ঢং এর গানের একটা প্রতিনিধিত্বমূলক সংকলন গ্রন্থের অভাব অনুভব করেছি।' এই দিক দিয়ে পূর্বের সঙ্কলনগুলোর সঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের একটা তফাৎ রয়েছে। কাঙালীচরণ সেন-এর সঙ্কলনটি একান্তভাবেই ব্রাহ্ম উপাসনাদির সঙ্গে যুক্ত, বাঙলা গানের প্রতিনিধিত্ব করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। রেকর্ড-সঙ্গীত জাতীয় বইগুলোতে 'জনপ্রিয়' গানগুলোকেই স্থান দেওয়া হতো, গানগুলোর বাণিজ্যিক মূল্যই ছিল বড় কথা। এসবের প্রতিতুলনায় 'হাজার বছরের বাঙলা গান'-এর একটা স্পষ্ট সাঙ্গীতিক উদ্দেশ্য

আছে। ঐটাই বর্তমান সঙ্কলনের গৌরব। অবশ্য উক্ত উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত কতদূর সাধিত হয়েছে, সেটা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। প্রথমেই তর্ক উঠতে পারে গানের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে। হাজার বছর-ব্যাপী বাঙলা গানের যে বিস্তৃতি তাকে গানের বিষয়-অনুযায়ী (অবশ্যই কথা বা কাব্যের বিষয়, বাঙলা গানের ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব খুবই বেশি) ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে। যেমন 'সাধন-ভক্তি-উপাসনা'—এই শিরোনামায় একত্রিত হয়েছে ৭৯টি গান। চাটিল-কম্বলাম্বরের চর্যাপদ থেকে শুরু করে নজরুল-গোপেশ্বরবাবু রচিত ভক্তি ভাবনার গান পর্যন্ত এই পরিচ্ছেদের অন্তর্গত। 'দেশপ্রেম' বিষয়ক ৬২টি গান, 'প্রেম' বিষয়ক ৭২টি, 'ঋতু ও প্রকৃতি' শিরোনামায় ২৭টি গান ইত্যাদি পৃথক পৃথক পরিচ্ছেদে রাখা হয়েছে। বিষয়-অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগের চল রয়েছে বিভিন্ন গীতকারের একক সঙ্কলনগুলোতে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতান' প্রকাশের পর থেকে একক সঙ্কলনের ক্ষেত্রে এইটাই আদর্শ রীতি হিসাবে গৃহীত। এর সপক্ষে যুক্তিও আছে। একক সঙ্কলনের গানগুলো একজন ব্যক্তির রচনা বলেই ফর্ম, মেজাজ ইত্যাদির দিক থেকে তাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা থেকেই যায়। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত গীতকারদের রচনার মধ্যে সে ব্যাপারটা না-ও থাকতে পারে। এর ফলে 'মঞ্জু বিকচ কুসুম-পুঞ্জ' এবং 'দীনতারিণী বলে মা ডাকি গো তোরে' এক শ্রেণীতে রাখার উদ্দেশ্যটা সহজবোধ্য হয় না। এদের মধ্যে সাঙ্গীতিক যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ, মেজাজের তফাৎ এত বেশি যে 'দুটোই ভক্তিভাবনার গান' বললে কিছুই বলা হয় না। হয়তো এমন বলা যায় যে বিষয়-অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগের সাহায্যে বাঙলা গানের বিষয়-বৈচিত্র্য সহজেই জনসমক্ষে তুলে ধরা যায়। এর প্রয়োজন ছিল না। বাঙলা গানের বিষয়-বৈচিত্র্য এমনিতেই কারো নজর এড়ায় না, বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতির এটুকু জটিলতা সম্পর্কে তরুণতম শিক্ষার্থীও অল্পবিস্তর সচেতন। অন্যদিক দিয়ে বরং ক্ষতি হয় বেশি। 'ভবনই গহন গম্ভীর বেগে বাহী' আর 'ওরে ডুব্ছে নাও ডুবাইয়া যাও' এদের মধ্যে মিলটা চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। আবার 'তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম' যদি ভক্তি বিষয়ক গান হয়, 'শ্যাম তব অদর্শনে কাঁদি অহরহ' কেন প্রেম বিষয়ক গান হতে যাবে? সবচেয়ে বিপজ্জনক কাজ হয়েছে 'রঙ্গিলা ভাসুর গো' গানটিকে প্রেমের গান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করাটা। গানটি পূর্ববঙ্গের সারিগান শ্রেণীর, নৌকাবাইচের গান বলা যায়, যার মধ্যে প্রাণোচ্ছল রঙ্গ-তামাসার আধিক্য ঘটে কোনো কোনো সময়। যাঁরা এ-গান গেয়ে থাকেন, সিরিয়াস প্রেমের

গান হিসাবে কখনো তাঁরা এ-গানকে দেখেন না। 'যেদিন হইতে দেখেছি, বন্ধু/তোমায়/মৈষালের বাড়ী' ইত্যাদির সমগোত্রীয় করে দেখলে গানটির প্রতি নিদারুণ অবিচার করা হবে। বিষয়-অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগের ফলেই হয়তো এসব গোলমালের হাত এড়ানো যায়নি। এর চেয়ে প্রয়োজনীয় ছিল কালানুক্রমিক বিন্যাস, এক-একজন গীতকার ধরে এবং একটা অঞ্চল ধরে। এতে বাঙলা গানের হাজার বছর ব্যাপী বিবর্তনের চেহারাটা হয়তো খানিকটা ফুটে উঠত।

এছাড়া তর্ক উঠতে পারে কোনো কোনো গানের অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে। 'গীতগোবিন্দ'র ছটি অংশ উদ্ধৃত করার অর্থ কী? ওগুলো কি বাঙলা গানের উদাহরণ? শুধু ভাষার দিক থেকেই নয়, সামগ্রিক চরিত্রের দিক থেকেই একে আলাদা করে বাঙলাদেশের বলে চিহ্নিত করা অনুচিত। গীতগোবিন্দ-রচয়িতা বাঙালি হতে পারেন, এমনকি এও হতে পারে যে বাঙলাদেশে গীতগোবিন্দ খুবই জনপ্রিয় ছিল, বা বাঙলা গানের ওপর এর যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল, কিন্তু গীতগোবিন্দ বাঙলা গানের উদাহরণ নয়। আরো অবাক লাগে 'নমামি মহিষাসুর-মর্দিনী' গানটির উপস্থিতি দেখে। এই গানের রচয়িতা 'গুরুগুহ'র পরিচয় দেওয়া হয়েছে পরিশিষ্টে—'দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত গীতিকার মথুবস্বামী দীক্ষিত 'গুরুগুহ' এই ছদ্মনামে রচনা করেন।' এ-স্থলে রচয়িতাও বাঙালি নন। বাঙলা গানের প্রতিনিধিত্ব এই গান কিভাবে করে বোঝা যায় না। অন্যপক্ষে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গান বাদ পড়ে যাওয়াটা বিস্ময়কর। রচয়িতাদের তালিকায় দেওয়ান রঘুনাথ রায় বা গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপস্থিতি সঙ্কলনের গৌরব অনেকখানি নষ্ট করেছে। বরং যদুভট্টের হিন্দী ধ্রুপদ না থাকলেও চলত। ত্রিপুরার রাজবাড়িতে যেসব গানের সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষত ঝুলনোৎসবের গান, তার কিছু নিদর্শন থাকলে অনেক কাজ হতো। টুসু ছাড়া মানভূম অঞ্চলের অন্য শ্রেণীর গান অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা খুবই বাঞ্ছনীয় ছিল। সেইসঙ্গে সঙ্কলনের ভালো কাজ হয়েছে উৎসব ও আনুষ্ঠানিক গানের পরিচ্ছেদেই। বিয়ের গানের উদাহরণগুলো অত্যন্ত সুনির্বাচিত।

গ্রন্থের প্রথমাংশে একটি দীর্ঘ পরিচিতি আছে। এ-ধরনের সঙ্কলনের আগে বাঙলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর গানের পরিচয় প্রদানের পরিকল্পনাটা খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে যে-পরিচিতি দেওয়া হয়েছে তাতে একদিক থেকে উদ্দেশ্যহীনতা যেমন প্রকট, তেমনি বহু বাক্যই অত্যন্ত দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। যেমন 'জয়দেবের সময় বাংলা দেশে যে গীতধারা জনসাধারণের মধ্যে

প্রচলিত ছিল তা অপভ্রংশ বা প্রাচীন বাংলায় গীত হ'ত। এই জন্যই জয়দেবের গানে কিছু প্রাকৃত বা প্রাচীন বাংলার সুর অনুরণিত হয়।' এখানে 'সুর' বলতে কি কাব্যের মেজাজ বোঝানো হচ্ছে? নাকি গানের সুরের কথা বলা হচ্ছে? উভয় অর্থেই এই উক্তি প্রমাণিত করার মতো জয়দেবের সমসমায়িক বা পূর্ববর্তী বাঙলা গানের নিদর্শন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেছে কি? সঙ্কলন থেকে অন্তত সে-রকম মনে হয় না। আবার 'এই কীর্তনের সুরু যদিও চৈতন্যদেবের সময় থেকে' অথবা 'শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্তিত কীর্তনের ধারা বাঙলাদেশে বিশেষভাবে প্রচলিত হয়' ইত্যাদি কথাগুলো বারবার বলার ফলে নরোত্তম দাসের ভূমিকাটা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। বস্তুত কীর্তনের ব্যাপারে নরোত্তম দাসের অবদান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা থাকাটা একান্তই প্রয়োজন ছিল। তথ্যের দিক থেকে গোলমাল সৃষ্টি করে 'এই বাংলা দেশেই প্রায় একশত বৎসর আগে মেটিয়াবুরুজে সেদিনের নির্বাসিত নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দরবারে ঠুংরীর জন্ম হয়।' মেটিয়াবুরুজে আনাগোনা করেছেন এমন অনেক গুণী ঠুংরী গান রচনা করে থাকতে পারেন। ওয়াজেদ আলী শাহ স্বয়ং প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন, নিজে বহু বিখ্যাত ঠুংরী গান বেঁধেছিলেন। কিন্তু ঠুংরীর মতো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটি গীতরীতি একজন নবাবের দরবারে একটি বিশেষ সময় সৃষ্ট হয়েছিল, এ-রকম কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বস্তুত ঠুংরীর ইতিহাস যথেষ্ট জটিল। একদিকে লোকসঙ্গীতের কিছু কিছু উপাদানের প্রতি দরবারী গায়কদের মনোযোগবৃদ্ধি, অন্যদিকে টপ্পারীতির প্রভাববৃদ্ধি, বরাবর-কি-আস্থাই থেকে পূরব-অঙ্গের বিলম্বিত ঠুংরী—এ-এক দীর্ঘ পথযাত্রা। সময়ের দিক থেকেও কিছু গোলমাল থেকে যাচ্ছে। একদিকে লেখক বলছেন 'প্রায় এক শত বৎসর আগে···ঠুংরীর জন্ম হয়', আবার 'অথচ এর আগে (রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগে) বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদ এসেছে। এই কলকাতায় মেটিয়াবুরুজে ঠুংরী সৃষ্টি হয়েছে' ইত্যাদি। এসব তথ্যের ভ্রান্তি অনায়াসেই এড়ানো যেত।

দুঃখের বিষয়, পরিচিতি লিখতে গিয়ে অনেকগুলো পাতা খরচ হয়েছে, কিন্তু বাঙলা গানের প্রকৃত সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোনো ধারণা দেওয়ার চেষ্টা নেই। বাঙলা গানের বৈশিষ্ট্য বলতে ঘুরে ফিরে সেই বাঁধা বুলিই উচ্চারিত হতে থাকে, কাব্যের গুরুত্ব, কথা ও সুরের মিলন ইত্যাদি। বাঙলা গানে টপ্পা-অঙ্গ গৃহীত হলো, অথচ পূরব-ঠুংরীর রঙ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত কেন? বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে যাত্রা-থিয়েটার বরাবরই বেশ প্রাধান্য পেয়েছে। বাঙলা

গানের সুরের দিক থেকে যেসব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়, রাগ-রাগিণীর ব্যবহারে যে-বাঙালিয়ানা নজরে পড়ে, সে-সবের পেছনে যাত্রা-থিয়েটারের ভূমিকা কী? এই ধরনের প্রশ্নগুলোর জবাব পাওয়া যেতে পারে, সামগ্রিকভাবে বাঙলা গানের স্বরূপটি চিনতে পারলে; অথবা, হয়তো এসব প্রশ্নের উত্তর পেলে বাঙলা গানের একটা সামগ্রিক চেহারা পাওয়া যেত।

গ্রন্থের টিকা-টিপ্পনী অংশটি মূল্যবান। 'মিলে সবে ভারতসন্তান' গানটি মূল গ্রন্থে অসম্পূর্ণভাবে রাখা হয়েছে, টিকা-টিপ্পনীতে পুরো গানটি দেওয়া আছে। 'রঙিলা ভাস্বর গো' গানটিও অসম্পূর্ণ। এ-রকম আরো বেশ কয়েকটা গান অসম্পূর্ণ আছে। এই ধরনের সঙ্কলনে সম্পূর্ণ গানগুলোই দেওয়া উচিত ছিল, পাঠান্তর সহ। কিছু কিছু পাঠান্তর টিকা-টিপ্পনীতে রয়েছে বটে, কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ পাঠান্তর সম্পর্কে লেখক নীরব আছেন। অনেকেই যেমন 'সোহাগ চাঁদ বদনী' গানটির উদ্ধার সম্পূর্ণ ভুল বলে গণ্য করতে পারেন। অনেক গানের সঙ্গে সুরের উল্লেখ আছে, সেগুলো সম্পর্কে আরো সাবধান হওয়া উচিত ছিল। পূর্বের সঙ্কলনগুলোতে অনেক সময় সুরের নামে ভুলভ্রান্তি থেকে গেছে। সেগুলো এই সঙ্কলনে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে সংশোধন করে নেওয়ার সুযোগ ছিল। দু-একটা গানের ক্ষেত্রে অন্য সুরে রেকর্ড বেরিয়ে গেছে, সেখানে সুরান্তরের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হতো। যেসব গানের প্রকাশিত স্বরলিপি আছে, সেখানে স্বরলিপি গ্রন্থের উল্লেখ থাকলে অনেক শিক্ষার্থীর উপকার হতো এরকম আরো কয়েকটা ছোটখাট কাজের সাহায্যে গ্রন্থটির গুরুত্ব বাড়িয়ে দেওয়া যেত।

পদ্মনাভ দাশগুপ্ত

মলচন্দ্র ঘোষের ষাট বছর

-বছর বারোই ডিসেম্বর কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের ষাট বছর পূর্ণ হলো। ধুনিক বাঙালি কবিদের মধ্যে বিমলচন্দ্র ঘোষ একজন শ্রুতকীর্তি কবি। দীর্ঘ কবিজীবনে তিনি প্রগতিশীল কবিতা ও সংস্কৃতি চিন্তাকে তাঁর সৃষ্টির ধ্যমে অগ্রসর করেছেন। আন্তর্জাতিক মানবমুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে জাতীয় ক্তির সাধনা তিনি একসূত্রে গ্রথিত করতে পেরেছেন। তাঁর 'দক্ষিণায়ন' াব্যগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাঙলাদেশের প্রথম সারির কবির মর্যাদায় ভিষিক্ত হন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর কাব্যসৃষ্টির জন্য আশীর্বাদ জানান, বং তাঁর কবিতার ক্রমাগত উন্নততর বিকাশের ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

আধুনিকতার ব্যাখ্যা নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। পশ্চিমী জীবনের অবক্ষয়, তা ও ব্যক্তির অনন্বয়ের ফলে জাত ব্যক্তিকেন্দ্রিক কবিতাকে এক অর্থে াধুনিক কবিতা বলা হয়। এ-ব্যাখ্যায় কবি-ব্যক্তিত্ব অনেকখানি সমাজ-নিরপেক্ষ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতচ্যুত। আমাদের দেশের াধুনিক কবিদের মধ্যে অনেকেই আধুনিকতা বলতে চূর্ণ-ব্যক্তিত্বের আত্মগত নুসঙ্গভিত্তিক, এই ব্যক্তিমনস্কতার কথাই মুখ্য বলে মনে করেন।

এ-শতাব্দীর গোড়ার দিকে পশ্চিমী শিল্পবিকশিত দেশগুলিতে ব্যক্তিগত ালিকানা-বিধৃত সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিসাপেক্ষ উৎপাদনে সঙ্কট দেখা দেয়। স-সমস্যা নিরাকরণের জন্য তারা প্রথম মহাযুদ্ধ ডেকে আনে। আর মূলধনতন্ত্রের সঙ্কটে সমাজের অন্তঃসার বিষয়ে অনিশ্চিত ও ধারণাবিহীন মধ্যশ্রেণীর কবিদের ধ্যে বহু প্রশ্ন দেখা দেয়। সেই আত্মিক ও সামাজিক সঙ্কটের মধ্যে সমাজের সম্পর্কে অনবহিত শিল্পসৃষ্টির এক আন্দোলন শুরু হয়। পুঁজিবাদের নিয়ন্ত্রিত বিকাশের যুগে এই মধ্যশ্রেণীতে জন্ম নেওয়া কবিদের কাছে জীবন নকখানি সুনির্ধারিত ও সুনিশ্চিত ছিল। কিন্তু মূলধনতন্ত্রের সঙ্কটের ফলে সে াশ্চিন্ততা আর রইল না। নতুন কবিকুল পুরনো পদ্ধতির নিশ্চিন্ত নিসর্গ, ঈশ্বর প্রশাস্তি বর্ণনাকে চ্যালেঞ্জ করলেন। কিন্তু যে-মূলধনতন্ত্রের জন্য আসলে ্যক্তিমানুষের জীবনে সঙ্কট দেখা দিল, সে-বিষয়ে মনস্কতা অকৃত্রিম হলো না। নতুন কবিতাও 'আধুনিক' কবিতা—আসলে এ-কবিতা অনেকাংশেই ময়িক' কবিতা। আমাদের দেশেও এই আধুনিকতার ছাপ পড়েছিল।

এখনও এ-দেশে ঐ সমাজবিচ্ছিন্ন আত্মস্বাতন্ত্র্যভিত্তিক কাব্যপ্রস্থানকেই আধুনিকতা বলা হয়।

কিন্তু সত্যিকারের আধুনিকতা অন্যদিকে ছিল। সমাজের অন্তঃসার ঐ বিশ্বমূলধনের সঙ্কটের সময় ছিল সমাজতান্ত্রিকতার পথে ক্রমোন্মোচিত। ১৯১৭ সালের মহাবিপ্লবে সে-আধুনিকতার জাজ্বল্যমান অভ্যুদয় ঘটলো রুশদেশে, মহাসোভিয়েতে। আর সে-আধুনিকতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেয়ে ব্যক্তিত্বকে বড় করে দেখে। সমাজপরিবর্তনের প্রাগ্রসর শ্রেণী শ্রমজীবীমানুষের মুক্তির লক্ষ্যে গোটা শোষণভিত্তিক সমাজটাকেই বদলে দেওয়ার রাস্তাটাই ছিল সেই আধুনিকতার পথ। আর এ-আধুনিকতা হলো, যাকে বলে প্রগতিশীলতা। ব্যক্তিমানুষ যখন সমাজের এই মুক্তির মূল সারসত্যটি ধরতে পারেন বা ধরবার জন্য অন্বেষণ চালান, এবং সেই অভিজ্ঞতা শিল্পে বিধৃত করেন তখন গড়ে ওঠে শিল্পী-ব্যক্তিত্ব। এক আধুনিকতা বলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা। অন্য আধুনিকতা বলে ব্যক্তিত্বের কথা।

বিমলচন্দ্র ঘোষ এই দ্বিতীয় আধুনিকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাই তাঁর কবিতার স্বদেশের মুক্তিপিপাসু মানুষের সঙ্গে—আন্তর্জাতিক মুক্তিকেও তিনি অঙ্গীকৃত করেছেন। তাঁর 'উদাত্ত ভারত' বাঙলাসাহিত্যে এক বিশিষ্ট অবদান।

সম্প্রতি বিমলচন্দ্র ঘোষ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মৈত্রীভিত্তিক রচনা কর্মের জন্য নেহরু পুরস্কার পেয়েছেন। এ-বছর রুশদেশ থেকে প্রকাশিত রুশ তর্জমায় লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা বিশ্বের নানা বিশিষ্ট কবির কবিতার একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। বাঙালি কবিদের মধ্যে কেবলমাত্র বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতা তাতে আছে। এ তাঁর আন্তর্জাতিক মনুষ্যত্বের পক্ষে সংগ্রামী কাব্যসাধনারই অন্যতম স্বীকৃতি।

বিমলচন্দ্র ঘোষের সম্পাদিত 'এষা' ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি বিমলচন্দ্রের কবিতা ও বিচিত্র চিন্তার সাক্ষ্য বহন করে। আমরা বর্ষীয়ান এই কবির দীর্ঘ জীবন কামনা করি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিমলচন্দ্র ঘোষের 'ষাট বছর পূর্তি' উপলক্ষ্যে বাঙলাদেশের বিশিষ্ট সংস্কৃতিসেবী, কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতীরা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন। কিছু অর্থসংগ্রহ করে তাঁরা অসুস্থ কবিকে সহায়তা জানাতে চান। লক্ষ্য, তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ।

বিমলচন্দ্র ঘোষ শতায়ু হোন।

তরুণ সান্যাল

সখারাম গণেশ দেউস্কর

বাংলা তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সামগ্রিক চরিত্র ও দ্বন্দ্ব বিষয়ে আমাদের অজ্ঞানতা অপরিসীম ; এবং এই পটভূমিকায় জাতীয় নেতৃত্ব ও তারই পরিমণ্ডলে ব্যক্তিজীবনের যথাযথ বিশ্লেষণেও আমাদের অনীহা অধিকতর। খণ্ডিত এক একটি ঘটনাকে কোনও-না-কোনও আকর্ষণে আমরা মহনীয় করে তুলেছি এবং মূল্যমান বিবেচনায় তারই কর্মযজ্ঞকে দিয়েছি বিসর্জন। তদুপরি একান্ত স্বাভাবিকতায় এবং অ-স্বাধীন চিন্তাচর্চায় বাঙালি তথা ভারতীয় জীবনে তাৎক্ষণিকের মূল্যে জীবন তার সামগ্রিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হতে ক্রমশ পরিণতি পেয়েছে ক্ষণকালের সীমারেখায়। ত্যাগীকে আমরা বরণ করি মাল্যে ; বিসর্জিতপ্রাণকে মহত্ব দিই মূর্তি নির্মাণে ; কিন্তু সেই মুহূর্তে বিস্মৃত হই সত্তার অপর অস্তিত্বের চলমানতাকে ; এবং স্বভাবত তজ্জনিত প্রক্রিয়ায় সেই বিশেষ ব্যক্তিসত্তা জনগণের পূজিত হন, সন্দেহ নেই ; পক্ষান্তরে ইতিহাস হারায় বস্তুনিষ্ঠাকে যার অভাবে একজন উৎসর্গিত মানুষের সমগ্র জীবন ও কর্মকাণ্ডই ঐতিহাসিক পটভূমি শেষাবধি হারায়।

উনিশ শতকের শেষ দশকে ভারতবর্ষে ইতালীয় কার্বোনারির ছাঁচে গুপ্ত-সমিতি স্থাপনে সর্বপ্রথম চেষ্টিত হন বালগঙ্গাধর তিলক ; বলা বাহুল্য তৎপ্রবর্তিত শিবাজী ও গণপতি উৎসবের তাৎপর্য হলো গণচেতনার উদ্বোধন তথা জাতীয়তা-বোধের জাগরণ। প্লেগের দৌরাত্ম্যে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে শিবাজীর জন্মদিনে উদ্‌যাপিত না হয়ে তাঁর রাজ্যাভিষেক দিনে তা অনুষ্ঠিত হলো। এক হিসেবে এই দিন নির্ধারণের বিষয়টিও বলা চলে, অর্থবোধক। উৎসব উপলক্ষে তিলকের সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতা তথা 'কেশরী' কাগজে উক্ত উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ এবং উৎসবে ঠিত একটি সংক্রমক কবিতা প্রকাশিত হয় (১৮ জুন ১৮৯৭)। এই ঘটনার চার-দিনের মধ্যে পুনার কালেকটর্ র‍্যান্ড্ সাহেব ও অপর একজন পদস্থ কর্মচারী লেফটেন্যান্ট অ্যায়্যার্স্ট অতর্কিতে নিহত হলেন চপেকার ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক। কার্যত শহরের অধিবাসীরা প্লেগের পীড়ন অপেক্ষা প্লেগ নিবারণে নিযুক্ত ইংরেজ নিকদের উৎপীড়নে অধিকতর ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে তিলক তাঁর 'মরাঠা'য় এমতো নৈরাজ্যের তীব্রসমালোচনা করেন। যথানিয়মে উক্ত হত্যাকাণ্ডের জন্যে তিলক, পরোক্ষভাবে দায়ী বিবেচনায়, ধৃত হলেন, এবং তিলকের এই দেড় বছরের সশ্রম কারাবাসই সম্ভবত দেশোদ্ধারের জন্যে

প্রথম কারাবরণ। এই ঘটনাতে শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রই ক্ষুব্ধ হলো না, সুদূর বাঙলা দেশেও ক্ষোভ প্রতিধ্বনিত হলো; তিলকের মকদ্দমা পরিচালনার জন্যে অর্থ সংগ্রহে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা তৎপর হলেন। এবং এ-বিষয়ে যে উদ্যোগী পুরুষ বাঙালি চৈতন্যকে সচেতন করলেন তিনিই সখারাম গনেশ দেউস্কর।

সখারাম মহারাষ্ট্রের এক বিদ্যানুরাগী সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান তাঁর পৈতৃক বাস ছিল রত্নগিরি জেলায় শিবাজীর মালবন নামীয় দুর্গের নিকটবর্তী দেউস গ্রামে। সখারামের পিতামহ সদাশিব বিটঠল বিবাহসূত্রে বৈদ্যনাথের নিকটস্থ করোঁ গ্রামটি পান। সদাশিবের ছিল এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র গণেশ সদাশিব বারাণসীতে বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন করার পর গিধোড়ের রাজা জয়মঙ্গল সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর তাঁর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন, তিনিই আমাদের স্বনামখ্যাত সখারাম। মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকেই বলা যায়, তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে দুর্মর প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের সূত্রপাত। মাতৃবিয়োগের পর তাঁর পিতৃস্বসার তত্ত্বাবধানে তিনি লালিত হন। মরাঠী সাহিত্য ও ইতিহাসে এই বিদুষীর প্রবেশ ছিল; এবং সখারামের চরিত্রগঠনে তাঁর বুদ্ধিমতী পিতৃস্বসার প্রভাবের কথা বলাই বাহুল্য। উপনয়নের পর সখারামকে কিছুকাল বেদচর্চায় মনোনিবেশ করতে হয়; তারপর তিনি দেওঘর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন। সখারামের ছাত্রাবস্থায় উক্ত বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক ছিলেন মধুসূদন দত্তের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু। যোগীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও উদ্দীপনাই বাঙলা ভাষাচর্চায় সখারামের অনুরাগের মূল। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে এন্‌ট্রান্‌স্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর দেওঘর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যায়তনেই সখারাম সেকেণ্ড পণ্ডিতের পদে, পনেরো টাকা বেতনে কর্মজীবন শুরু করেন (১৮৯৩)। এবং এই সময় থেকেই বস্তুত তাঁর সাহিত্যানুরাগ সম্ভাবিত হয়; অবসর পেলেই তিনি রাজনারায়ণ বসুর বাসস্থানে যেতেন এবং তাঁর সঙ্গে নানাবিষয়ে আলোচনা করতেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন, রাজনারায়ণের বাড়িতেই সখারামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয় (আর্যাবর্ত, অগ্রহায়ণ ১৩১৯)। ইতিমধ্যে সখারাম লিখিত যুগকাল সম্পর্কে শাস্ত্রীয় বিচার বিষয়ক এক প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে (১২৯৯)। সখারামের সাহিত্যসাধনা ও ইতিহাসচর্চা সম্ভ্রান্ত সাময়িক পত্রপত্রিকার মাধ্যমে যখন তাঁকে খ্যাতিমান করে তুলছে সেই সময় এক অতর্কিত আবর্তনে তিনি জড়িয়ে পড়লেন। দেওঘরের ম্যাজিস্ট্রেট হার্ড

সাহেবের অন্যায় আচরণ সম্পর্কিত যেসব লেখা 'হিতবাদী'তে প্রকাশিত হয়েছিল সখারামই সেগুলির লেখক অনুমান করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ (স্কুল কমিটির সভাপতি যেকালে স্বয়ং হার্ড সাহেব) তাঁকে কর্মচ্যুত করলেন। আর নিছক কর্মচ্যুত নয়, অচিরে দেওঘরে বসবাস তাঁর পক্ষে অসম্ভব বুঝেই, সপরিবারে সখারাম কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হলেন ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে; যে-বছরে পূর্বেই বলা হয়েছে, তিলক (যাঁর স্বদেশভাবনা তথা দেশাত্মবোধ সখারামকে যথার্থই প্রাণিত করেছিল) দেশের জন্যে প্রথম কারাবরণ করেন।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সে-সময়ে 'হিতবাদী'র সম্পাদক; তাঁর সহৃদয়তা সখারামের সহায়ক হলো। ত্রিশ টাকা বেতনে 'হিতবাদী'র প্রুফসংশোধকের পদে নিযুক্ত হোলেন সখারাম; অবশ্য আপন কর্মদক্ষতায় সে-বেতন বৃদ্ধি পায়। ইতিমধ্যে নানাবিষয়ে সখারাম আপন প্রতিভাকে প্রসারিত করলেন,—বাঙলাদেশে শিবাজী উৎসব প্রবর্তন (১৯০২-৬) এবং তদুপলক্ষে 'শিবাজীর মহত্ব' (১৩১০), 'শিবাজীর দীক্ষা' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিবাজী উৎসব' কবিতাসহ ১৩১১) ও 'শিবাজী' (১৩ ৩) নামীয় তিনটি পুস্তিকা তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করেন; উত্তর কলকাতায় যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসস্থান 'সংলগ্ন ভূমিতে' যে বিপ্লবধর্মী আখড়া স্থাপিত হয় (১৯০২) সখারাম সেখানে নিয়মিত ছাত্রদের বক্তৃতা দিতেন; কার্জনী বিধানে বঙ্গচ্ছেদ কার্যকরী করার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে কলকাতা তথা সমগ্র বাঙলাদেশে যে উত্তাল বিক্ষোভের জন্ম তার পটভূমিকায় সখারামের সুবিখ্যাত 'দেশের কথা'র (১৩১১) ঐতিহাসিক গুরুত্ব; অনুশীলন সমিতির নেতৃত্ব এবং 'যুগান্তর' গোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য লেখক হিসেবেও সখারাম স্মর্তব্য। স্বাস্থ্যান্বেষণে জাপান যাত্রাকালীন কাব্যবিশারদ নির্দ্বিধায় সখারামের সবল হাতে 'হিতবাদী'র পরিচালনভার অর্পণ করেন; এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় সমুদ্রবক্ষে বিশারদের মৃত্যুর (৪ জুলাই ১৯০৭) পর 'হিতবাদী' কর্তৃপক্ষ মাসিক নব্বুই টাকা বেতনে সখারামকেই স্থায়ী সম্পাদক নিয়োজিত করলেন। কিন্তু ছ-মাস না পূর্ণ হতেই সুরাট কংগ্রেসে (ডিসেম্বর ১৯০৭) নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধিতা চরম পর্যায়ে পৌঁছয়; এবং 'হিতবাদী'র সত্বাধিকারীরা সখারামকে চরমপন্থীদের বস্তুত তিলকের বিরুদ্ধে কলমবাজিতে প্ররোচিত করেন। আপন আদর্শকে বেমালুম বিসর্জন দিয়ে গুরুকে সমালোচনা করার অভিপ্রায় আদৌ তাঁর ছিল না; পক্ষান্তরে কর্তৃপক্ষের এমতো অন্যায় অনুরোধে জ্বলে উঠে এই তেজস্বী মরাঠী ব্রাহ্মণ কর্মে ইস্তফা দিলেন।

'হিতবাদী'র সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পর সখারাম জাতীয় বিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। যদিচ নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনের স্বাদ সখারাম কোনোকালেই পেলেন না ; 'দেশের কথা' এবং 'তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত' (১৩১৫) বাজেয়াপ্ত হলে (১৯১০) সরকারের রোষভাজন ব্যক্তিকে নিয়ে জাতীয় পরিষৎ কিঞ্চিৎ বিব্রতবোধ করলেন। অবশ্য অচিরে পরিষদের সংশয় দূর করার জন্য সখারামই স্বয়ং সচেষ্ট হোলেন—অধ্যাপক পদ থেকে আপনাকে অব্যাহতি দিয়ে। তারপর আবার কিছুকাল 'হিতবাদী'র সম্পাদনাকর্মে নিজেকে নিরত করেন তিনি। ইতিমধ্যে পুত্র ও পত্নীকে হারিয়ে হৃতসর্বস্ব সখারাম কলকাতা ছেড়ে করোঁ গ্রামে গেলেন। এবং সেখানে দারিদ্র্য তথা দুরন্ত ব্যাধির দৌরাত্ম্যে ক্ষতবিক্ষত হয়ে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের ২৩ নভেম্বর মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।

বস্তুত সাংবাদিকতার বিরলপ্রাপ্ত অবসরেই সখারাম সাহিত্য ও ইতিহাসচর্চা করতেন ; 'এটা কোন্ যুগ ?' ব্যতিরেকে তাঁর প্রকাশিত প্রায় সমস্ত গ্রন্থই,—'মহামতি রানাডে' (১৩০৭ ?), 'ঝাঁসীর রাজকুমার' (১৩০৮), 'বাজী রাও' (১৩০৮), 'আনন্দী বাঈ' (১৩০৯?) এরূপ অবসরকালে রচিত। 'তিলকের মোকদ্দমা' ও 'বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখ ?' (১৩১৭) তাঁর জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-কর্মে নিরত থাকার সময় লিখিত। ইতিহাস অনুশীলনে তাঁর অনন্যসাধারণ অনুরাগ অনুভূত হয় ; আর্থিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও সখারাম ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণে যত্নবান ছিলেন। কিন্তু দেশবাসীকে এই প্রবল পরিশীলনের পরিপূর্ণ ফলভাগী করে যাওয়ার অবসর তাঁর মেলেনি ; প্রচণ্ড প্রয়াসে তিনি মহারাষ্ট্রের ইতিহাস তথা শিবাজীর বৃহৎ জীবনচরিত রচনার তথ্যাদি সংগ্রহ করছিলেন। আয়াসসাপেক্ষ গবেষণাতেই যে তাঁর অধিকতর আগ্রহ ছিল সে-কথা বলা বাহুল্য। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনার পরিমাণও সখারামের কম নয়,—'মহারাষ্ট্রীয় ভাষার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব' (সাহিত্য, বৈশাখ ১২৯৯), 'যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল' (ভারতী, ভাদ্র ১৩০০), 'শিবাজীর স্বার্থত্যাগ, (ধরণী, ফাল্গুন ১৩০১), 'আফজল খাঁর অভিযান' (সাহিত্য, আশ্বিন ১৩০২), 'বালুকেশ্বর : ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের বিলাতযাত্রা' (ভারতী, বৈশাখ ১৩০৪), 'মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উপকরণ' (সাহিত্য, পৌষ ১৩০৪), 'বঙ্গীয় শব্দোৎপত্তি রহস্য' (ভারতী, চৈত্র ১৩০৬), 'ঐতিহাসিক কাগজপত্র' (সাহিত্য, কার্তিক ১৩০৭), 'গ্রীকজাতির স্বাধীনতালাভ' (প্রদীপ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮), 'শিবাজী

প্রসঙ্গ' (সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩১২), 'ভারতীয় ইতিহাসের উপকরণ' (বঙ্গদর্শন [নবপর্য্যায়], বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩১৭), 'বাজী রাও ও মস্তানী : বাজী রাওয়ের কলঙ্কমোচন' (আর্য্যাবর্ত্ত, বৈশাখ ১৩১৭) প্রভৃতি বহু মূল্যবান রচনা আজও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। সৌভাগ্যক্রমে সম্প্রতি ডঃ মহাদেব-প্রসাদ সাহা সম্পাদিত 'দেশের কথা'র (১৩৭৭) মুখবন্ধ পাঠান্তে পাঠক উৎফুল্ল হবেন : "আমরা সখারামের সমগ্র বাঙলা ও মারাঠী রচনাবলী সংগ্রহ করেছি। এগুলি যথাসময়ে তিন খণ্ডে প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে।"

সখারামের সার্থক অবদান 'দেশের কথা' রচিত হয় জাতীয় মহাসমিতির আরব্ধ কাজে সহায়তা করার তাগিদে ; তাঁর ভূমিকা পাঠে আরও জানা যায়, উইলিয়ম ডিগবীর The Prosperous British India, দাদাভাই নৌরজীর Poverty and un-Britsh rule in British India ও রমেশচন্দ্র দত্তের The Economic History of British India প্রধান অবলম্বন হলেও নানাবিধ সরকারী রিপোর্ট এবং গ্রন্থ থেকেও উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। তৎসত্ত্বেও উপরোক্ত বিখ্যাত গ্রন্থগুলির তুলনায় 'দেশের কথা'র বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় : "আমাদের আন্দোলন ভিক্ষুকের আবেদন মাত্র। আমাদিগের দাতার করুণার উপর একান্তই নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়।" এ-মতো আবেগকম্পিত মন্তব্যে তাঁর বিপ্লবীচেতনা স্পষ্টতর ; সখারাম বলা বাহুল্য আদৌ নরমপন্থী ছিলেন না। ব্রিটিশ শাসনে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা নৈতিক অধোগতির চমকপ্রদ বিবরণী, সর্বজনবোধ্য ভাষায় তিনি উপস্থাপন করলেন। দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন : "কোন সাধুপুষ্পিত সুন্দর উদ্যান দাবদগ্ধ হইয়া গেলে কিংবা কোন সুদর্শন পরিচিত বন্ধুর হঠাৎ কঙ্কাল দেখিলে মনের যেরূপ অবস্থা হয়, বর্তমান চিত্রে অঙ্কিত ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যাদির অবস্থা দর্শনে সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইবে, অথচ দেউস্কর মহাশয় কোন উত্তেজিত বক্তৃতা প্রদান করেন নাই,—কতকগুলি সংখ্যাবাচক অঙ্ক এবং সেন্সাস্ ও ষ্ট্যাটিষ্টিক্ হইতে সমুদ্ধৃত কথা নিঃশব্দে একটি মর্ম্মচ্ছেদী দৃশ্য উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইবে।" (বঙ্গদর্শন [নবপর্য্যায়], শ্রাবণ ১৩১১) তারপর পাঁচ বছরের (১৩১১-১৫) মধ্যে 'দেশের কথা'র পাঁচটি সংস্করণে মোট তেরো হাজার কপি মুদ্রিত হয় ; অতএব এরূপ বিস্ময়কর জনপ্রিয়তায় ইংরেজ সরকার সবিশেষ শঙ্কিত হন এবং পূর্বেই বলা হয়েছে, বাজেয়াপ্তকরণে বাধ্য হলেন। 'হিতবার্ত্তা'র নির্দেশমতো সখারাম সরকারী স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে আদালতে বিচারপ্রার্থী হন সন্দেহ

নেই ; কিন্তু শুনানি শুরু হওয়ার আগেই তিনি মারা যান। উল্লেখ করা যেতে পারে যে পরবর্তী সংস্করণগুলিতে 'দেশের কথা'র কলেবর উপর্যুপরি বৃদ্ধি পেলেও সখারাম সাধারণের সুবিধের জন্যে মূল্য হ্রাসেরই পক্ষপাতী ছিলেন।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের লেখায় সখারামের ব্যক্তিত্বের আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় : 'বাঙ্গালার রাজনৈতিক জটিলতাজড়িত স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্বে রানাডে প্রমুখ অর্থনীতিবিশারদের চেষ্টায় বোম্বাই অঞ্চলে ভারতীয় শিল্পের উন্নতিচেষ্টা হইতেছিল। তখন বোম্বাই অঞ্চলের কলে যে বস্ত্র উৎপন্ন হইত তাহার পাড়ের বর্ণ পাকা হইত না, ··সখারাম সেই মোটা কাপড় ব্যবহার করিতেন। আপনার মতামত কার্য্য করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হয়েন নাই।' (আর্য্যাবর্ত্ত, অগ্রহায়ণ ১৩১৯)

উপসংহারে তাই বলা যায়, বিশ শতকের এই শেষার্ধে আমাদের অস্তিত্বে যখন কর্ম ও চিন্তার ভেদ প্রায় মেরুপ্রমাণ তখন কোনও কর্মযোগীকে উক্ত প্রভেদ ঘোচাতে সর্বস্ব বিসর্জনের প্রয়াসকে আমরা ঘটনা বলে চিহ্নিত করি; কিন্তু ক্রমপরিণতির মূল্যকে কদাচ বিবেচনায় আনি। একজন সখারাম সহজেই জীবনকে মেলাতে পেরেছিলেন কর্মের প্রবহমানতায় এবং চিন্তাকে দিয়েছিলেন যথার্থ মূল্য তারই অংশভাক্‌রূপে। তাঁর জীবন ও কর্ম, ব্যক্তিত্ব ও আত্ম-নিবেদন, শ্রদ্ধা ও আহুতিদান সমগ্রভাবে একটি সত্তারই জন্ম ও বিকাশ এবং যার দ্বারা তিনি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন এক বৃহত্তর জাতিকে এক বিশাল যজ্ঞভূমির প্রাঙ্গনে।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

রাষ্ট্রপুঞ্জের ২৫তম জন্মজয়ন্তী

২৪এ অক্টোবর ১৯৭০ রাষ্ট্রপুঞ্জের ২৫তম বার্ষিক দিবস উদ্‌যাপিত হলো। ১৯৪৫ সালে ৫১টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে যে-বিশ্ব সংস্থার জন্ম, আজ তার সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২৭। পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন দেশ স্বাধীনতা লাভ করলে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির টানাপোড়েনে দ্বিখণ্ডিত দেশগুলির স্বতন্ত্র রাষ্ট্রিক মর্যাদার ব্যাপক স্বীকৃতি ঘটলে, দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলির আনুমানিক সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১৫০টিতে। সে-ক্ষেত্রে ১২৭ জন সদস্য নিয়ে আজকের রাষ্ট্রপুঞ্জ নিজেকে একটা প্রায় বিশ্বজনীন সংস্থা বলে দাবি করতে পারে। কিন্তু সারা পৃথিবীর

মানুষদের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিণত হয়েছে কিনা, প্রশ্ন এভাবে উত্থাপিত হোলে, নিঃসন্দেহে জবাব হবে 'না'। পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যা আনুমানিক ৩২০ কোটি হোলে, মনে রাখা দরকার যে, প্রায় ১০০ কোটি মানুষের প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রপুঞ্জ বাইরে রেখে দিয়েছে। এই রূঢ় বাস্তবতাকে কোনো হিসেবের কারচুপি দিয়ে চাপা যায় না।

জন্মের পরবর্তী পঁচিশ বছর একজন মানুষের জীবনে যতো গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা সংস্থার জীবনে। সেই সংস্থা যদি আন্তর্জাতিক হয়, তাহলে তার গুরুত্বের ব্যাপকতা ও গভীরতা আরো বেড়ে যায়। স্বভাবতই তখন প্রশ্ন ওঠে, যে-প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনা নিয়ে এর প্রতিষ্ঠা বিগত পঁচিশ বছরে তার কতোটা পূরণ হলো ?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এক চরম সঙ্কটময় পর্বে, জাতিসঙ্ঘের ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে, রাষ্ট্রপুঞ্জের জন্ম হয়েছিল। ফ্যাসিবাদ ও অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সে-সব দেশ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিল, তারাই হলো এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে যেহেতু ফ্যাসিবাদ ও অক্ষশক্তিকে পরাজিত করার দায় দায়িত্ব সবার সমান ছিল না, তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবিরোধী শিবিরের নেতৃস্থানীয় যাঁরা, তাঁদের স্বতন্ত্র গুরুত্ব ও ভূমিকা স্বীকার করে রাষ্ট্রপুঞ্জের জন্ম। এই নেতৃস্থানীয় দেশ ছিল পাঁচটি, যথা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন, চীন ও ফ্রান্স। এই পঞ্চশক্তি হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ও রাষ্ট্রপুঞ্জের ভরকেন্দ্র। ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে যুদ্ধমুক্ত রাখতে, সমস্ত আন্তঃরাষ্ট্র সমস্যার, বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব করে তুলতে এই পঞ্চশক্তির পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা, বোঝাপড়া, সহযোগিতা হবে মূল বনিয়াদ। তাই এই ধারণার উপরে ভিত্তি করে রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে যে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা হয়েছিল তার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বজায় রাখা।

পঁচিশ বছর পরে রাষ্ট্রপুঞ্জের মূল্যায়ন আজ যখন প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন দেখা যাচ্ছে এই বহু-বিঘোষিত নীতির সঙ্গে বাস্তবের গরমিলটা একটা বিরাট প্রশ্নের আকারে মানুষের সামনে হাজির। কেন এমন হলো এ-প্রশ্ন আজ দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে সবখানেই সাধারণ মানুষের মনে দেখা দিয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সক্রিয়তার আন্তর্জাতিক পটভূমির দিকে নজর দিলে এই প্রশ্নের জবাব মিলবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে পঞ্চশক্তির মধ্যে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ধনে-জনে, শিল্পে-সমৃদ্ধিতে রয়ে গেল প্রায় অক্ষত ও বিরাট শক্তিমান দেশ। তার উপরে তার হাতে তখন পারমাণবিক ক্ষমতার একচেটিয়া মালিকানা। ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রাম, ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বা দুই পরস্পর বিরোধী সমাজব্যবস্থার যে লড়াই মুলতুবি রাখতে বাধ্য করেছিল, যুদ্ধ শেষে তা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। এবারে দুই প্রতিপক্ষ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। পশ্চিম দুনিয়ার বহু বিচক্ষণ যুদ্ধ বিশারদরা দাবি করেছিলেন যে, আমেরিকার একচেটিয়া পারমাণবিক ক্ষমতার সুযোগেই সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ রাষ্ট্র সোভিয়েতকে ঘায়েল করা হোক। কিন্তু যুদ্ধ-বিধ্বস্ত পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে তখন আর নতুন করে যুদ্ধের উদ্যোগ করা সম্ভব ছিল না। বরং তারা জানতো যে দুর্ধর্ষ লালফৌজ পশ্চিমী মিত্রপক্ষের অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রায় একক শক্তিতে হিটলারের ফ্যাসিবাহিনীকে পরাস্ত করে বার্লিন অবরোধ করেছে, এবারে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হোলে আমেরিকার আণবিক বোমা কার্যকর হওয়ার আগেই সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ লালফৌজের পদানত হবে। আবার পশ্চিম ইউরোপের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া, শুধু নিজের শক্তির জোরে সোভিয়েতের মোকাবিলা করার সাহস আমেরিকার ছিল না। তাই সোভিয়েতকে কোণঠাসা করে রাখার নীতি হিসেবে চালু হলো ঠাণ্ডা লড়াইয়ের। এতে পশ্চিম ইউরোপকে আর্থিক ও কারিগরী সাহায্য দেওয়ার নামে সেখানে আমেরিকার ডলার সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ গড়ে তোলা যাবে, আর যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি এড়িয়ে আমেরিকার শিল্পসমৃদ্ধিকে অক্ষুণ্ণ রেখে ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার নেতৃত্বও করায়ত্ত হবে। তারপর সময় সুযোগ মতো সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সুরু করা যাবে যুদ্ধের আয়োজন। তখন থেকেই আমেরিকার নেতৃত্বে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ভিত্তিতে সোভিয়েতকে কোণঠাসা করে একটা বিপুল সমরায়োজন করাই হয়ে দাঁড়ালো পশ্চিম দুনিয়ার আন্তর্জাতিক নীতি।

রাষ্ট্রপুঞ্জের জন্মকাল থেকে আমেরিকার নেতৃত্বে পশ্চিম-দুনিয়া এই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের রাজনীতি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তীব্র সোভিয়েত বিরোধিতায় অনুসরণ করতে থাকে। যুদ্ধকালীন ফ্যাসিবিরোধী মোর্চা যে-সহযোগিতার কর্মসূচীকে যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় স্থায়ী শান্তির বনিয়াদ বলে গ্রহণ করেছিল, যুদ্ধ শেষে সেই অবস্থার একটা গুণগত পরিবর্তন সূচিত হলো ঠাণ্ডা লড়াইয়ের কার্যক্রমে। বলা বাহুল্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সক্রিয়তা এতে ব্যাহত না হয়ে পারেনি। কিন্তু তখন এদিকে

নজর দেওয়ার মতো মর্জি ও মেজাজ মার্কিনী নেতাদের ছিল না। তাঁরা তখন উঠে পড়ে লাগলেন রাষ্ট্রপুঞ্জকে একটা মার্কিনী সংস্থায় পরিণত করে, আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে। পশ্চিম ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির সাহায্যে সে-কাজ চলতে থাকে ভালোভাবেই। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপ ও দুই আমেরিকার বাইরে সারা দুনিয়ার চেহারা তখন বদলাতে সুরু করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরাধীন জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রিক মর্যাদা অর্জন, চীন-বিপ্লবের সফল সমাপ্তি, পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন, এবং পঞ্চাশের দশকের শেষে আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে জাতীয় মুক্তি-সংগ্রাম ও আন্দোলনের সাফল্যে পৃথিবীর রাজনীতির ভারসাম্য দ্রুত বদলে গেল। ১৯৪৫ ও ১৯৬০ সালের পৃথিবীর মধ্যে ঘটল বহু যুগের ব্যবধান। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিকতাবাদ এই বিরাট পরিবর্তনের সামনে দাঁড়িয়েও প্রাণপণে নিজের স্বার্থের ঘাঁটি আগলে রাখার চেষ্টা করেছে। সমাজতান্ত্রিক মহাচীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জে তার ন্যায়সঙ্গত দাবি থেকে আইনের কূট-কৌশলে বঞ্চিত করে, উত্তর কোরিয়া, কোরিয়া, কঙ্গো এবং একালে ভিয়েতনামের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উপর পৈশাচিক হামলা চালিয়ে বিশ্ব-রাজনীতির পরিবর্তনশীল ভারসাম্য জবরদস্তি করে নিজের অনুকূলে রাখার চেষ্টা করেছে। সাম্রাজ্যবাদীস্বার্থের এই নগ্ন আত্মপ্রকাশের প্রতীক রাষ্ট্রপুঞ্জ। এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো যোগই নেই।

রাষ্ট্রপুঞ্জ চেয়েছিল যুদ্ধ বন্ধ রেখে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে। পঞ্চশক্তির যৌথ দায়িত্ব ছিল সেই শান্তি বজায় রাখার পূর্বশর্ত। কিন্তু কার্যত যৌথ দায়িত্বের বিকল্প হিসেবে চালু করা হয়েছিল মার্কিনী প্রভুত্বের কাছে আত্মসমর্পণ, তার তাঁবেদারিত্ব। যুদ্ধের কারণগুলি দূর করার দিকে উদ্যোগ আয়োজনের ব্যাপক প্রস্তুতি রাষ্ট্রপুঞ্জ করেনি, করতে পারেওনি। যুদ্ধ বন্ধ রেখে শান্তি বজায় রাখা অর্থাৎ শান্তি রক্ষার এই নীতিবাচক মানসিকতা যে, যুদ্ধের সম্ভাব্য কারণগুলি দূর করে শান্তি সুনিশ্চিত করা অর্থাৎ শান্তিরক্ষার ইতিবাচক মানসিকতার তুলনায় কমজোরী সে-কথা রাষ্ট্রপুঞ্জের জন্মের পঁচিশ বছর পরে সর্বজন স্বীকৃত। তাই রাষ্ট্রপুঞ্জের বাইরে শান্তি আলোচনা চালাতে হয় রাষ্ট্রনেতাদের বৈঠকে। রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রথম সাধারণ

অধিবেশনে এই আন্তরদুর্বলতা ধরা পড়ে যায়। তারপরেও যে পঁচিশ বছর কেটে গেছে এটা নিছক কোটি কোটি মানুষের শান্তির সপক্ষে সুদৃঢ় মনোভাবের ক্রমবর্ধমান প্রকোপের জোরে। না হলে এলিয়টের সেই বিখ্যাত লাইনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায় যে, "In my beginning is my end" যে-বিশ্ব সংস্থার ললাটলিপি, পঁচিশতম জন্ম বার্ষিকীতে তার মূল্যায়নের কোনো সুযোগই থাকতো না।

বাসব সরকার

'এ. আই. টি. ইউ. সি'র পঞ্চাশ বছর

৩১এ অক্টোবর ১৯৭০ সারাভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো।

এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে সারা বিশ্বে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণী একের পর এক জয়লাভ করেছে, পরাধীন দেশগুলি জাতীয় মুক্তি আন্দোলন মারফৎ স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে, বিশ্বের এক তৃতীয়াংশে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতন্ত্র। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'এ. আই. টি. ইউ. সি'র পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সস্তা কাঁচামাল, সস্তা মজুরের অফুরন্ত যোগান ও অবিশ্বাস্য মুনাফার সুযোগ পেয়েছিল বৃটিশ পুঁজিপতিরা। এ-দেশে চা, কয়লা ইত্যাদি শিল্পের সূত্রপাত হলো। উদ্ভব হলো ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর। সিপাহী বিদ্রোহের পর উনিশ শতকের শেষের দিকে বৃটিশ সরকার ভারতের উপর তার কর্তৃত্ব প্রসারিত করল। কুটির ও হস্তশিল্প ধ্বংস করা হলো সুপরিকল্পিতভাবে। জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টি হলো। জমিচ্যুত ছিন্নমূল কৃষকের সর্বহারায় রূপান্তর ঘটল। তাছাড়া ভূমি থেকে উৎখাত চাষীদের আড়কাঠির মারফৎ চা-বাগান, কয়লাখনি এমনকি দূর দ্বীপে গিরমিটিয়া কুলী হিসাবে চালান দেওয়া চলছিল। দেশী পুঁজিপতিরাও পত্তন করলেন সূতাকল শিল্পের। শোষণের মাত্রাও বেড়েই চলল। একদিকে সামাজিক অসম্মান অন্যদিকে অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা ও শোষণের চূড়ান্ত চাপের ফলে স্বভাবতই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধল। ১৮২৭ সালে কলকাতার বেহারাদের পাল্কী ধর্মঘট ১৮৬২ সালের

াওড়ার রেল ধর্মঘট ও ১৮৭৭ সালে নাগপুরে সূতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘটের াধ্যমে এই বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটল।

ফ্যাক্টরি আইন চালু হলো ১৮৮১ সালে। এই আইনের ফলে কাজের উর্ধতম সীমা নির্ধারিত হলো ও বৃটিশ-শ্রমিকদের অনুরূপ কিছু সুযোগ সুবিধা ভারতের শ্রমিকশ্রেণীও লাভ করলেন। এর পেছনে অবশ্য ভারতীয় বস্ত্র উৎপাদনকারীদের সঙ্গে খোদ বৃটেনের পুঁজিপতিদের অসম প্রতিযোগিতায় উৎখাতের উদ্দেশ্যই ছিল সক্রিয়, কেননা ভারতীয় উৎপাদনকারীরা কম মজুরী দিয়ে বেশি খাটিয়ে প্রতিযোগিতার বাজারে খোদ বৃটেনের মিল-মালিকদের বেকায়দায় ফেলছিল। অবশ্য ভারতবর্ষে ফ্যাক্টরি আইনের সবগুলো ধারা চালু করা হলো না, শোষণের মাত্রাও কমল না। ১৮৯৫ সালে বজবজের চটকল ও আমেদাবাদের সূতাকল শ্রমিকরা ধর্মঘট করলেন। ১৯০৮ সালে বোম্বাই-এ লোকমান্য তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ধর্মঘট ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকার সুস্পষ্ট তাৎপর্যের প্রকাশ। লেনিন এ-ধর্মঘটকে বিশেষ তাৎপর্য দিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন।

১৯১৭র অক্টোবর বিপ্লব চরম আঘাত হানল বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদকে। দেশীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার্থে গঠিত নিয়মতান্ত্রিক, আপোষপন্থী জাতীয় কংগ্রেসেরও চরিত্রের খানিকটা পরিবর্তন ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। এবারে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করল কংগ্রেস। আইনসম্মত স্বীকৃতি না পাওয়া সত্ত্বেও সারাদেশে গড়ে উঠল অসংখ্য ট্রেড ইউনিয়ন। শ্রমিক আন্দোলন নিয়মতান্ত্রিকতার ভেতর সীমিত রাখার প্রয়াসে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উদ্যোগে গঠিত হলো আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন আই. এল. ও। এই সংগঠনে প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রশ্নে ৩০এ অক্টোবর ১৯২০ বোম্বাইয়ে ভারতবর্ষের ৬৪টি ইউনিয়নের ১ লক্ষ ৪১ হাজার সদস্যের প্রতিনিধিরা মিলিত হলেন। ৩১এ অক্টোবর ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর জাতীয় সংগঠন সারাভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলো। সম্মিলন থেকে উচ্চারিত হলো সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বের পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের শপথ। এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন লালা লাজপত রায়।

গত পঞ্চাশ বছরে 'এ. আই. টি. ইউ সি'তে ভাঙন এসেছে বারবার। একদিকে শ্রেণীসমন্বয়কামী নিয়মতান্ত্রিক দক্ষিণপন্থী আক্রমণ ও অন্যদিকে অতিবাম

গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা-দুষ্ট বিভেদপন্থা—এই দুই প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে' এ. আই. টি. ইউ. সি'র নেতৃত্বে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে অর্থনৈতিক দাবি ও রাজনৈতিক অধিকার আদায় করেছে, পুঁজিবাদ ও প্রতিক্রিয়াকে পর্যুদস্ত করেছে বারবার।

অক্টোবর বিপ্লবের পর পরাধীন দেশগুলিতে সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ বুদ্ধিজীবীরা রাজনৈতিক মঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে লাগলেন। ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম ঘটল না। সংস্কারপন্থীরা স্বভাবতই শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বাম ও দক্ষিণপন্থীর বিরোধ-এর প্রতিফলন ঘটল 'এ. আই. টি. ইউ. সি'তেও। ১৯২৯ সালে দশম অধিবেশনে বিরোধ বাধল রাজনৈতিক প্রস্তাব নিয়ে। 'এ. আই. টি. ইউ. সি' ভাঙল। ভাঙন আনল দক্ষিণপন্থীরা। এ-রাজনৈতিক বিরোধে বামপন্থীদের পক্ষ নিলেন সুভাষচন্দ্র ও নতুন 'এ. আই. টি. ইউ. সি'র সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ১৯৩১ সালে বামপন্থী হঠকারিতা বিভেদ আনল আবার। 'সাচ্চা' কমিউনিস্টরা গঠন করলেন 'রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'। ১৯৩২ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে এই বামপন্থী গোঁড়ামির তীব্র সমালোচনা করা হলো। ১৯৩৫ সালে 'সাচ্চা' কমিউনিস্টরা আবার মূল সংগঠনে ফিরে এলেন।

পরবর্তী ভাঙন এল ১৯৪০ সালে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির লেনিনীয় নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে যুদ্ধের স্বপক্ষে শ্রমিকশ্রেণীকে সামিল করার উদ্দেশ্যে 'ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবার' গঠন করলেন এম.এন. রায়। এ-সংগঠনের প্রভাব ও অস্তিত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৪৭ সালের মে মাসে ভারতের বুর্জোয়াশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় গঠিত হলো 'আই. এন. টি. ইউ. সি'। শ্রমিকশ্রেণীকে সাম্যবাদী আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রেখে শ্রেণীসমন্বয়ের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে গঠিত এ-সংগঠন স্বাধীনতা-উত্তরকালে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়নি। 'এ. আই. টি. ইউ. সি'র সর্বশেষ ভাঙন ঘটল ১৯৭০ সালে। মাথায় হাঁটা বুকনিসর্বস্ব রাজনীতিবাদীরা 'শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা' করার কাজে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসকে দু-টুকরো করল। অথচ কর্তব্য ছিল, আরও বৃহৎ ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্মের গড়ে তোলার কাজ। ১৯৩১এর মতো বামপন্থী হঠকারিতার পুনরাবৃত্তি ঘটল। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর বামপন্থী সঙ্কীর্ণতাবাদ ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া এই দ্বিমুখী আক্রমণ সত্ত্বেও 'এ. আই. টি. ইউ. সি'র নেতৃত্বে শ্রমিক

শ্রেণী সমাজতন্ত্রের স্বপক্ষে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অবিচল থেকেছে। ১৯২১ সালে শ্রমিকশ্রেণী অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছে স্বরাজ-এর দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯২৩ সালের সম্মিলন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর মনোভাব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে 'এ. আই. টি. ইউ. সি'র নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী যেমন তার যোগ্য ভূমিকা পালনে পশ্চাৎপদ ছিল না তেমনি স্বাধীনতা-উত্তরকালে একচেটিয়া পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামেও যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

১৯৭০এর প্রান্তে যখন সাম্রাজ্যবাদ কোণঠাসা হয়ে মরীয়া হয়ে উঠেছে, সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির অধিকাংশ অপুঁজিবাদী বিকাশের পথে যখন সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথে সংগ্রামরত, জাতীয় ক্ষেত্রে একচেটিয়া পুঁজিবাদের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণপন্থীরা যখন জোটবদ্ধ, বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্যের প্রয়োজন যখন সর্বাধিক, ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাও এই সন্ধিক্ষণে অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ-যুগ সমাজতন্ত্রের যুগ। সমাজতন্ত্রী শিবির, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদকে চূর্ণ করার কাজে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা আমাদের দেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে অগ্রণী ভূমিকাসাপেক্ষ। সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে অতীতেও বহুবার বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করেছে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে তারা যথাযথ ভূমিকাই পালন করবেন। 'এ. আই. টি. ইউ. সি'র পঞ্চাশ বছরের প্রান্তে এ-কথা অনেকটা বিশ্বাসের সঙ্গেই উচ্চারণ করা যায়।

তরুণ সেন

অন্তর্বর্তী সাধারণ নির্বাচন

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে সারাভারত জুড়ে লোকসভার অন্তর্বর্তী সাধারণ নির্বাচন ডাকা হয়েছে। এ-নির্বাচনের গুরুত্ব আজ ভারতের জাতীয় জীবনে সর্বাধিক। এই নির্বাচনে ভারতে প্রগতিশীল শক্তি জয়ী হয়ে স্বনির্ভরতার দ্রুত ফলপ্রসূ কাজে হাত দেবে কিনা, অথবা দক্ষিণপন্থা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার অন্ধকারের শক্তিগুলি ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনা করার অধিকার পেয়ে

এ-দেশে নয়া ঔপনিবেশিকতার চাপ সৃষ্টি করবে কিনা—এ-দুটি প্রশ্ন আজ নির্বাচনের মুখোমুখি আমাদের সবারই মনে হচ্ছে। আর বিশেষভাবে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের প্রশ্ন আরো জটিল। এ-রাজ্যে বিধানসভারও অন্তর্বর্তী নির্বাচন একই সঙ্গে হবে মার্চের প্রথম দিকে। এ রাজ্যে বিভেদপ্রবণ তথাকথিত বামপন্থীরা সর্বাত্মক বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবিরোধী হয়ে সর্বভারতীয় দক্ষিণপন্থার মদত যোগাচ্ছে। বাঙলাদেশে এখন বামপন্থার মধ্যে সুযোগসন্ধানী ও বিভেদপ্রবণ দলীয় সঙ্কীর্ণতার মতান্ধ দলবাগিশ চণ্ড চমূর অভ্যুদয় ঘটেছে। দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার জোট ও বামপন্থী শিবিরে বিভ্রান্তিকর মোর্চার বিরুদ্ধে এখানে তাই গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল দল ও ব্যক্তিদের লড়তে হবে। তাছাড়া সন্ত্রাস ও প্রতিসন্ত্রাসের মধ্যে পড়ে ত্রস্ত নাগরিকের ভোটের অধিকার ব্যবহারের সুযোগ সম্পর্কে নিরপত্তা আনারও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

এ-নির্বাচন যখন হতে যাচ্ছে তখন ভারতের রাজনীতি এক উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে এসে পৌছেছে। ভারতের অর্থনীতিতে একদিকে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও সামন্ততান্ত্রিক ভগ্নাবশেষের চাপ রক্ষণশীলতার দিকে দেশের রাজনীতিকে ঠেলে দিতে চাইছে। অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের জন্য আগ্রহী ও সামন্ততন্ত্রের শেষাংশকে চিরকালের জন্য কবরে পাঠাতে উদগ্র বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি নতুন স্বনির্ভর ও গণতান্ত্রিক ভারত রচনার কাজে ক্রমশ অধিকতর ভূমিকা গ্রহণ করতে উন্মুখ। রক্ষণশীলতার পোষকতায় ও তদ্বিরে সারাক্ষণ উপদেশ ও সহায়তায় সদাপ্রস্তুত রয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। এই দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলতার স্তম্ভস্বরূপ হয়ে আছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দলছুট অংশ সিণ্ডিকেটপন্থীরা, স্বতন্ত্র দল ও জনসংঘ। সিণ্ডিকেটপন্থীরা ভারতে একচেটিয়া পুঁজিবিকাশের ও কৃষিতে সামন্ততান্ত্রিক অবস্থা অব্যাহত রাখায় সচেষ্ট। স্বতন্ত্র দল প্রকাশ্যেই বলছে এ-দেশে স্বনির্ভর শিল্পবিকাশের বদলে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী ও বেসরকারী বিদেশী মূলধন ভারতে আমদানী করে অন্তর্বর্তী দ্রব্য উৎপাদনকারী নয়া উপনিবেশের ব্যবস্থা পত্তন করাই 'স্বাধীন শিল্পবিকাশের নীতি' হওয়া উচিত। এজন্য তাঁরা রাঘব বোয়াল ব্যবসায়ী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশের ব্যক্তিগত পুঁজির সঙ্গে হাত মেলাতে আগ্রহী একচেটিয়া মূলধন, সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী ও বড়বড় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি। সম্প্রতি রাজন্যবর্গের ভাতা বিলোপ-কারী কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশের বিরুদ্ধে সিণ্ডিকেট, জনসংঘের সঙ্গে এরাই সবচেয়ে হৈচৈ সৃষ্টি করতে চেয়েছে। কেননা এই রাজন্যবর্গ জনগণের উপরে

আরোপিত কর থেকে যে বিপুল পরিমাণ মাসোয়ারা পেয়ে থাকে সেই কর পরিমাণের টাকা দিয়ে বিদেশী বিলাসদ্রব্য ব্যবহার করে, তারা সেই টাকা বিদেশী দ্রব্য আমদানীকারী ভারতের রাঘব বোয়াল ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেবে। মোটা অংশটাই চলে যাবে বিদেশে। তা ছাড়া একচেটিয়া মূলধনের সঙ্গেও গাঁটছড়া বেঁধে এই রাজন্যবর্গ একদিকে দেশে সামন্ততান্ত্রিক বন্ধনের দাপট অব্যাহত রেখে সস্তা কাঁচামাল ও মজুরের যোগানদার হতে চায়, অন্যদিকে পণ্যউৎপাদনে একচেটিয়ার মূলধনে অংশীদারী চায়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এ-দেশ লুট করার জন্য ঠিক এমনিধারা কাজই করেছিল। বিপুল পরিমাণ ভূমি-রাজস্ব তুলে, তা দিয়ে একদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ক্রীত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দিত, অন্যদিকে তারা সেই টাকায় এ-দেশী কাঁচামাল কিনে বিলাতে শিল্পদ্রব্যে রূপান্তর করে ফের এ-দেশেই তা বিক্রি করত। ফলে বিধ্বস্ত দেশী শিল্পের শ্মশানে এ-দেশী সামন্তপ্রভুরা চাষীর উপর অমানুষিক খাজনা বাড়িয়ে ক্রমবর্ধমান বৃটিশ রাজস্বের খাঁই মেটাত। সস্তা কাঁচামাল যোগাত খাজনা ঋণ প্রভৃতিতে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা চাষী। সিণ্ডিকেট স্বতন্ত্র জনসংঘ মোর্চার মূলনীতিও প্রায় একই। তবে এবার বৃটিশ প্রভু নয়। মার্কিন প্রভুদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার এবং স্বল্প দামে শ্রমমূল্য ও কাঁচামাল কেনার বাজার হিসাবে তাঁরা ভারতকে ব্যবহার করতে দিতে উন্মুখ। একদা সিণ্ডিকেট নেতা অশোক মেহতা তো প্রকাশ্যেই বলেছিলেন—ভারতের জরায়ু বিদেশী মূলধনের বীজে গর্ভিনী হতে সদা উন্মুখ রাখা প্রয়োজন। ভারতীয় জনগণের পশ্চাদপদ অংশের মধ্যে যে কুসংস্কার ধর্মান্ধতা প্রভৃতির প্রভাব রয়ে গেছে, তাকে ব্যবহার করে জনসংঘ এই রাজনীতিকে চমৎকারভাবে উগ্র জাতীয়তার নামে প্রয়োগ করে এই নয়া-ঔপনিবেশিক উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়। অর্থাৎ বিদেশী পণ্যের স্বদেশী সওদাগর, বিদেশী মূলধনের সঙ্গে দেশী একচেটিয়ার মুনাফা ভাগাভাগির ভাগীদার, রাজন্যবর্গ ও সামন্তপ্রভুদের অনুগত এই দলগুলি ভারতকে আবার নয়া-ঘরানার পরাধীনতার দিকে ঠেলে দিতে উন্মুখ। আর এই ত্র্যহস্পর্শের সঙ্গে যোগ দিয়েছে সম্প্রতি সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের সুবিধাবাদী নেতৃত্বের অংশ। এই বাত্-সমাজতন্ত্রীরা অন্ধ কংগ্রেস বিদ্বেষের নামে ভুলেই গেছেন সিণ্ডিকেটও কংগ্রেসেরই সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ও দলছুট অংশ। এস. এস. পি. দলের মধ্যে শ্রমিক-অভিজাত ও সামন্ততন্ত্রের উচ্চঘরানার সন্ততি যারা বামপন্থী ভেক নিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই এই নেতৃত্বের অংশীদার।

তাঁরা এখন সাম্রাজ্যবাদ প্রভাবিত খোঁয়াড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসতে চাইছেন।

গত তেইশ বছর ধরে ভারতের রাজনীতিতে মেরুপ্রস্থান বড় কম হয়নি। ভারতীয় পুঁজিপতিদের রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা আসার প্রথম থেকেই পুঁজিপতিদের আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা গেছে। মহাত্মা গান্ধী তো স্বাধীনতার প্রাক্কালেই উপদেশ দিয়েছিলেন, কংগ্রেসের মধ্যেকার রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার দুই শক্তি যথাক্রমে প্যাটেল ও নেহরুর নেতৃত্বে দুটি দলে ভাগ হয়ে গিয়ে পার্লামেণ্টারী দ্বি-রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটাক। কিন্তু জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের রাজনৈতিক বিজয়ের অব্যবহিত পরেই নয়া ঔপনিবেশিকতার প্রতি আগ্রহী, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিরা জনগণের ক্রোধের ভয়ে পাল্টা দল গড়ে তুলতে পারেননি। তাঁদের বিক্ষুব্ধ দলছুট অংশগুলি একে একে মূলমাতৃদেহ থেকে সরে যেতে শুরু করে। এভাবেই স্বতন্ত্র ও জনসংঘ দলের উদ্ভব ঘটে। দ্বিতীয় দলটির মধ্যে ছিল উগ্র জাত্যন্ধ হিন্দু রক্ষণশীলতার জঙ্গী অংশগুলিও। অবশ্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিত্বের সবল উপস্থিতি একচেটিয়া পুঁজিপতি ও সামন্ত প্রভুদের পাল্টা দলের দিকে চলে যাবার পথে বাধা হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। আর এরাই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্বে প্রবর্তিত ভূমি-সংস্কার আইনগুলিকে অকার্যকরী করে অকেজো করে তুলেছেন, পার্লামেণ্ট ও মন্ত্রীসভায় বাইরে ও ভেতর থেকে চাপ সৃষ্টি করেছে মার্কিন ধনকুবেরদের বশংবদ ভৃত্য হবার মনোভাব নিয়ে। ফলে জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ততন্ত্রীদের স্বার্থরক্ষকদের প্রগতিবিরোধিতার চাপেও অনেক ব্যক্তি দল থেকে বেরিয়ে যান ও একাধিক বামপন্থী ও মধ্যপন্থী দল গঠন করেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসদল প্রবর্তিত আর্থনীতিক পরিকল্পনা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের তাৎপর্যে একচেটিয়া ব্যবসাকে আঘাত করে সাম্রাজ্যবাদকেই আঘাত দিয়েছে। অন্যদিকে পুঁজিবাদবিকাশের ভ্রান্ত নীতি ভারতের আর্থনীতিক বিকাশে জড়ত্ব এনেছে। এবং এই জড়ত্ব আনার মূলে সাম্রাজ্যবাদীদের চাপ, জাতীয় কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার শক্তি, জাতীয় বুর্জোয়াদের অনুসৃত কালোচিত্যহীন আর্থনীতিক বিকাশের পন্থা ও দোদুল্যমানতাই দায়ী।

ভারতের অর্থনীতির বিকাশোন্মুখ চাপের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলতার ভঙ্গুর বর্ম আজ শেষ প্রতিরক্ষায় ব্রতী। উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদনশক্তির বিরোধ আজ

তুঙ্গ শীর্ষে। শিল্প অর্থনীতিতে ব্যাপক জাতীয়করণবিধৃত সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা মাফিক উৎপাদনের দিক এবং বেকার মানুষের কাজের আকাঙ্ক্ষাকে অবরুদ্ধ করে রাখতে চাইছে একচেটিয়া পুঁজি। উৎপাদনশক্তিকে ধরে রাখতে চাইছে উৎপাদন সম্পর্ক। কিন্তু বিস্ফোরণ ধূমায়িত হতে শুরু করেছে। কৃষির ক্ষেত্রেও তাই। একচেটিয়া ভূমিমালিকানা ও অ-আর্থনীতিক বন্ধনের বিরুদ্ধে ভূমিসংস্কারের সংগ্রাম, আড়তদারী মহাজনী জোতদারী ও জমিচুরির বিরুদ্ধে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন, বিকাশোন্মুখ উৎপাদন শক্তি ও মান্ধাতা আমলের অথচ পরিবর্তমান ভূমি সম্পর্কের মধ্যে লড়াই তীব্র শীর্ষে পৌছেছে। আর এ পরিপ্রেক্ষিতেই প্রতি-ক্রিয়া ও প্রগতির মধ্যে তীব্রতম দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। এই বিপুল চাপের ফলে জাতীয় বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক দল জাতীয় কংগ্রেস খাড়াখাড়ি-ভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে, এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও দলছুট কংগ্রেস যথাক্রমে স্বনির্ভর জাতীয় অর্থনীতি ও মার্কিন প্রভাবিত বশংবদ নয়া ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মৌল দ্বন্দ্বে প্রকাশ্যভাবে উভয়ের সম্মুখীন। এ দ্বন্দ্বগুলির চিহ্ন কিছু দিন ধরেই ভারতের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিল। ভি. ভি. গিরির রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও রাজন্যভাতা বিলোপের আদেশ ক্রমাগত এই সংকটকে প্রকাশ্য ফাটলে রূপান্তরিত করেছে। অনেকে এই চিহ্নগুলিকেই ব্যক্তি স্বার্থের সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট ব্যাধি বলে ভ্রম করছেন। আসলে যে বিরোধ একচেটিয়াবিরোধী ও একচেটিয়াপন্থী বুর্জোয়াদের বিভক্ত করছে, সেটাই কংগ্রেস দলের আভ্যন্তরীন দ্বন্দ্বের মূলভিত্তি, উল্লিখিত চিহ্নগুলি তারই ব্যাধিলক্ষণ মাত্র।

সারাভারত জুড়ে বুর্জোয়া বিকাশের দ্বন্দ্ব—বেকারী, দারিদ্র্য, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বামপন্থী শিবিরেও আঘাত করেছে। বামপন্থী শিবিরে যেমন ঐক্য গড়ে উঠেছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক শক্তি-গুলির ঐক্যকে গড়ে তোলবার রাজনৈতিক রণনীতি বহুক্ষেত্রে পথভ্রষ্টও হয়েছে। এবং বুর্জোয়াদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব বিষয়ে অনীহ হয়ে অবৈজ্ঞানিকভাবে ভারতের আর্থনীতিক তাৎপর্য সম্পর্কে বিশ্লেষণ ক'রে, শ্রমিকশ্রেণীর বকলমে সঙ্কীর্ণতাবাদী 'কমিউনিস্ট'দের নেতৃত্ব ব্যতীত আর ফ্রণ্ট গঠন অসম্ভব বিবেচনা ক'রে, কমিউ-নিস্টদের মধ্য থেকে দলছুট একাংশ পাল্টা কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে। ভারতের যে-সব অঞ্চলে মধ্যশ্রেণীগুলির আর্থনীতিক ভূমিকা খর্ব হচ্ছে, সেই সব অঞ্চলে পেটি বুর্জোয়াশ্রেণীর যুবকদের মধ্যে দ্রুত ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনার কথা প্রচার

ক'রে এবং এই মুহূর্তেই সশস্ত্র বিপ্লব জয়ী হতে পারে এমত রণকৌশলের কথা বলে, তাঁরা নানাধরণের বাক্-স্ফুলিঙ্গের সহায়তায় দলভারী করতে চেয়েছেন। কখনো বা পরিস্থিতির চাপে বাধ্য হয়ে ব্যাপক যুক্ত ফ্রণ্টের সামিল হয়েও তাঁরা অতঃপর পার্টি আধিপত্য বিস্তার করার প্রচেষ্টা চালবার ফলে ফ্রণ্টের পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দিয়েছেন এবং রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যেকার রক্তক্ষয়ী সরিকী সংঘর্ষকে তাঁরা শ্রেণীসংগ্রাম বলে দাবি করেছেন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্করহিত এই পার্টি, ব্যক্তি ও দলসন্ত্রাসের মধ্যদিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আজ সন্ত্রাস, হত্যা ও চণ্ড রাজনীতির আমদানী ঘটিয়েছেন। এবং কিছুদিন ধরে স্বদলত্যাগী তরুণকুলের উপরে চড়াও হয়েছেন। এই দলত্যাগীরা ঐ পার্টির বিপ্লবী বাক্স্ফুলিঙ্গের বিচ্ছুরণে মুগ্ধ হয়ে একদা পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিয়েছিলেন। শেষে দেখা গেল, গর্জনই আছে বটে, কিন্তু শরত মেঘের মতো তা বর্ষণহীন ও সম্ভাবনা শূন্য। এখন এঁরা দলছুট হয়ে অন্য দল গঠন করায়, বিপ্লবের ঠিকাদার ঐ পার্টির জঙ্গীবাহিনী এই তরুণদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। বাঙলাদেশের এই সন্ত্রাস ও পাণ্টা সন্ত্রাসের চাপে রাজনৈতিক জীবন বিঘ্নিত হতে চলেছে। বামপন্থী শিবিরে বিভ্রান্তিকারী এই পার্টি ভারতের রাজনীতির তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম। কোথাও সিণ্ডিকেটের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে, কোথাও রাজ্যসঙ্কীর্ণতার ধুয়ো তুলে এঁরা ভারতের রাজনীতির ঘূর্ণিজল ঘুলিয়ে তুলছেন।

এ অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তরুণ উগ্রপন্থীদের নৈরাজ্যবাদী তাণ্ডব। এঁদের রাজনৈতিক কর্মপন্থা এখন সন্ত্রাস ও হত্যার পথে পা বাড়িয়েছে। আর এই উগ্রপন্থাকে ইন্ধন দিচ্ছে পুলিশ ও পাণ্টা 'কমিউনিস্ট' পার্টির যুগপৎ আক্রমণ ও সন্ত্রাস। এঁদের নেতৃত্বের ক্যাডারদের প্রতি নির্মমতা এবং প্রয়াত জাতীয় নেতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষব্রতী, অপর রাজনৈতিক দলের কর্মী এবং দেশের শ্রেণী অবস্থান ও রাষ্ট্রশক্তি এবং আন্তর্জাতিক তাৎপর্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ও অন্ধ মূল্যায়ণ এঁদের এক অন্ধগলির পথে নিষ্ফলা আত্মহননের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এর ফলে সৃষ্ট রাজনীতিহীন পাশব প্রতিহিংসা দেশে দক্ষিণপন্থী শক্তি ও বিভেদপন্থী 'বামপন্থার' হাতই শক্ত করছে।

আজ তাই স্পষ্টভাবে রাজনীতির নতুন করে মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তা আছে। "দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি দ্রুত সংহত হয়ে সিণ্ডিকেট, জনসংঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির মহাজোটে সামিল হয়েছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল জোটের লক্ষ্য

হলো কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল—যা কিনা এদেশে গণতান্ত্রিক প্রগতির চূড়ান্ত পরিপন্থী। একচেটিয়া পুঁজিপতি, ভূ-স্বামী ও রাজন্যবর্গের জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীল অংশ আর তাদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ এই প্রতিক্রিয়াশীল মোর্চাকে মদত দিচ্ছে।" আর এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতে মধ্যবর্তী সাধারণ নির্বাচন হতে চলেছে। সুতরাং "এ নির্বাচনে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে পরাস্ত করতে হবে যাতে তারা কেন্দ্রক্ষমতা দখল করতে না পারে। নতুন লোকসভায় বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক মতাবলম্বীদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে হবে।" একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য সামাজিক ও আর্থনীতিক সংস্কারের প্রয়োজনে সংবিধানে বদল আনতে হবে। এজন্য ব্যাপক ঐক্যের প্রয়োজন। কেবল বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলির প্রতিনিধি-সংখ্যা বৃদ্ধি নয়, এমন কি ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের মধ্যেকার গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদেরও এই বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্যবদ্ধ মোর্চায় আনতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ও সুবিধাবাদী জোটগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের মধ্যেকার প্রতিক্রিয়াশীলদেরও এ নির্বাচনে পরাস্ত করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে সিণ্ডিকেট-স্বতন্ত্র-জনসংঘ চক্র। খর্ব করতে হবে বামপন্থী শিবিরে বিভ্রান্তিপন্থী দলবাগিশ ট্রোজান হর্সদের যারা দুই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করার নামে আসল লড়াই কেন্দ্রীভূত করছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, ঝুঁকে পড়ছে দলছুট নিজলিঙ্গাপ্পাপন্থীদের দিকে। দলছুটে ও দলছুটে এক অশুভ সুবিধাবাদী ঐক্য গড়ে উঠছে। এস. এস. পি'র প্রভাবশীল নেতৃত্বাংশতো দক্ষিণপন্থী শিবিরে গিয়ে সবার সামনে মাথা মুড়িয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে মার্চ মাসে লোকসভা ও বিধানসভার অন্তর্বর্তী নির্বাচন। এরাজ্যে একই সঙ্গে প্রগতিশীল শক্তিকে লড়তে হবে, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল মোর্চা ও বামপন্থী দলবাগিশ সুবিধাবাদী রাজনৈতিক সন্ত্রাসপন্থীদের বিরুদ্ধে একযোগে। আমরা আশা করব বিপ্লবমুখী, বিপ্লবী রক্তসূর্য বিকচোন্মুখ সময়ে প্রগতিই জয়ী হবে। বাঙলাদেশে আট পার্টির জোট সেই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সৈনিক। আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা রাখব ব্যাপক বামপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তিগুলির ঐক্য—প্রতিক্রিয়া ও অশুভ দক্ষিণপন্থার বিরুদ্ধে।

শুভব্রত রায়

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

বিশ শতকের প্রথমদিক থেকেই বাঙলাদেশের গ্রামগুলি নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতার প্রবল টানে ভেঙে পড়তে থাকে। দারিদ্র্যে অনুৎপাদনে ও সামন্ত-তান্ত্রিক শোষণে গ্রামের অর্থনীতিতে প্রচণ্ড বিপর্যয় দেখা যায়। স্বভাবতঃই এই বিপর্যয় সামগ্রিকভাবে জাতীয় সঙ্কটের আকার নিয়ে আসে ও সমাজ কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ মানুষেরা গ্রামে প্রত্যাবর্তনের আন্দোলন শুরু করেন। গ্রাম-পরিত্যাগের অকাল সঙ্কটের দিন থেকে কুমুদরঞ্জন মল্লিক একটি মুগ্ধ হৃদয় ও উষ্ণ আসক্তি নিয়ে তাঁর চিরকালের বাস্তুভিটে ও আজন্মের গ্রামজীবনকে সবল মুষ্টিতে আকর্ষণ করে কবি-কণ্ঠে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করার আবেদন প্রচার করে আসছিলেন। সুপ্রবীণ বয়সের মৃত্যু এসে এই পল্লীপ্রেমিক কবিকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

সত্যেন্দ্রনাথ, করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন ও কালিদাস রায়ের মতো কুমুদ-রঞ্জনও রবিশস্যে লালিত কবি। পরন্তু প্রাচীন বাঙলা কাব্যসাধনার ঐতিহ্যটি তাঁর মধ্যে সযত্নে প্রবাহিত ছিল। তাঁর কাব্যের বাদী সুর পল্লীজীবনের প্রীতি ও মাধুর্য প্রচার এবং সংবাদী সুর প্রাচীনভারতীয় ইতিহাস পুরাণ শাস্ত্র ও সংস্কৃতির সশ্রদ্ধ পরিবেশনা। বস্তুত তাঁর কাব্যে তেমন কোনো গভীর জীবনদর্শন, অনুভূতির সূক্ষ্ম প্রকাশ বা সুমহান জীবন প্রত্যয়ের পীনদ্ধ বেদনা নেই। 'খানিকটা বাউলের মত বৈরাগ্য, গৃহীর মত আসক্তি, বৈষ্ণবের মত বিনয়, শাক্তের মত মাতৃব্যাকুলতা, শিশুর মত মুগ্ধতা, প্রৌঢ়ের মত ধ্যানস্থ দৃষ্টি এবং কবির মত রসতন্ময়তা'—এ সব মিলিয়েই ছিলেন কুমুদরঞ্জন। নাগরিকতা তাঁকে ঈষন্মাত্র বিচলিত করেনি, বিশ্বসাহিত্যের ব্যাপকতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন অনাগ্রহী, ভাষা ও ছন্দের কারুকাজে তিনি বিব্রত ছিলেন না। স্বাদেশিকতা তাঁর নামাবলী, কিন্তু বিশশতকের অহিংস আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদ বা উত্তেজক দেশভক্তিবাদের দ্বারা তিনি তাঁর স্বাজাত্যবোধকে দীক্ষিত করেন নি। যা কিছু দীন ও বিরলসৌষ্ঠব, অপাংক্তেয় ও বিনীত, সে মানুষই হোক বা সামান্য পদার্থই হোক, তার প্রতি কবি সুগভীর আত্মীয়তা বোধ করেছেন। জটিল জীবনাচার ও আন্তর্জাতিক চিন্তার তপ্ত প্রবাহ থেকে নিজেকে নিঃসম্পর্কিত রেখে এরকম পরিতৃপ্ত পল্লীমুগ্ধ জীবনপ্রেমের নম্র সাধনা বাঙলা সাহিত্যে যে বর্তমান কালেও সম্ভব, কুমুদরঞ্জন তারই সাক্ষী। ১৯০৬ থেকে তিনি কাব্যরচনায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির নাম শতদল, বনতুলসী, উজানি, একতারা, বীথি, বনমল্লিকা, নূপুর, রজনীগন্ধা, অজয়, তূণীর, চূনকালি ও স্বর্ণসন্ধ্যা। তাঁর মৃত্যু বাঙলা কবিতার একটি অধ্যায়কে ম্লান উপান্তে টেনে নিয়ে এল।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

পরিচয়
বর্ষ ৪০ । সংখ্যা ৬
পৌষ । ১৩৭৭

সূচিপত্র

সম্পাদক
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ সান্যাল

প্রচ্ছদ
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

পরিচয়
বর্ষ ৪০। সংখ্যা ৬
পৌষ। ১৩৭৭

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও সৃজনাত্মক শিল্পকলা

সরোজকুমার ভৌমিক

বহু নন্দনতাত্ত্বিক পণ্ডিত শিল্পসাহিত্যমূলক সৃষ্টিধর্মী কাজের জন্য কেবলমাত্র স্রষ্টার প্রতিভাকেই দায়ী করেন। পক্ষান্তরে মার্কসবাদী শিল্প-সাহিত্য সমালোচকেরা বলে থাকেন শিল্প-সাহিত্য ও চারুকলা ইত্যাদি সৃষ্টির পেছনে রয়েছে উৎপাদনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশ। একাধিক তার্কিক প্রতিবাদে বলেন, শিল্প-সাহিত্য-চারুকলা সৃষ্টির পেছনে উৎপাদনাত্মক অর্থনীতির কোনোরূপ সম্পর্ক নেই, শিল্পসৃষ্টির পেছনে অর্থনীতিবাদ সম্পূর্ণ বাজে কথা। তাঁরা মনে করেন, শিল্প-সাহিত্য-চারুকলা বা কোনও বিশেষ প্রতিভা সম্পূর্ণভাবেই প্রকৃতিদত্ত শক্তির প্রকাশ স্বয়ম্ভু নিরালম্ব আকাশে ফোটা ফুলের মতো। কিন্তু আমরা জানি আকাশে ফুল ফোটে না। তেমনি আকাশ বা শূন্য থেকে শিল্প-সাহিত্য, ধ্যান-ধারণা ও চিন্তন-মননের জন্ম হয় না। শিল্প-সাহিত্য চেতনা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তন ও মনন মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত। আর সেগুলির উৎস মানুষের সমাজ-জীবন ও প্রকৃতিলোক। কোনো একটি স্তম্ভ যেমন শূন্যে অবস্থান করতে পারে না, তার অবস্থানের জন্যে প্রয়োজনীয় ভিত্তি একান্তই অপরিহার্য; তেমনি শিল্প-সাহিত্য চেতনা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তন ও মনন প্রয়োজনীয় ভিত্তিসাপেক্ষ। সেই অপরিহার্য ভিত্তি হলো শ্রমশীল মানুষের মূর্ত সমাজ-জীবন। মানুষের শিল্প-সাহিত্য প্রতিভা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তন ও মননকে এইভাবে বোঝবার চেষ্টাকে বলা হয়েছে ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা। নানাজনে নানাভাবে ইতিহাসের এই বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন।

বিপক্ষ তার্কিকদের কথা হলো—প্রতিভা, শিল্প-সাহিত্য চেতনা, শিল্প-

সাহিত্য, ধ্যান-ধারণা, চিন্তন ও মনন উৎপাদনাত্মক অর্থনৈতিক প্রভাব নিরপেক্ষ; দৃষ্টান্ত, শেক্‌স্‌পিয়ার বা রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভার আবির্ভাব আজকাল আর হচ্ছে না। কারণ শিল্প-সাহিত্য-প্রতিভা, ধ্যান-ধারণা, চিন্তন ও মননের জন্ম সম্পূর্ণভাবেই মানুষের মগজের গঠনে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী বিগত তিন-চার হাজার বছরের মধ্যে মানুষের মগজের মাপ বা গড়নে কোনো দিক থেকেই মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তথাপি মানুষের চিন্তন-মনন, ধ্যান-ধারণায় দুস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা গেছে। কেন এমন হলো? উত্তরে বলা যায়—যদিও মানুষের চিন্তা-চেতনা চিন্তন-মনন ধ্যান-ধারণা তার স্নায়ুতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল, তথাপি এই স্নায়ুতন্ত্রের উপরই সামাজিক পারিপার্শ্বিকের অবিশ্রান্ত ঘাত-প্রতিঘাত চলছে। তার কথা বাদ দিয়ে স্নায়ুতন্ত্রের স্বরূপটাই অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এই মতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্পর্কে যাঁরা সন্দেহ পোষণ করেন, তাঁদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন পাভলভের রচনাবলী পড়ে দেখেন।

বিষয়টির সম্যক আলোচনার জন্য মানব সমাজের বিকাশের কাহিনীটি সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক। মানব সমাজের বিকাশের ধারাকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়: প্রথম পর্ব—আদিম প্রাক-বিভক্ত সমাজ, দ্বিতীয় পর্ব—বর্তমান শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ, তৃতীয় পর্ব—আগামী কালের শ্রেণীহীন সমাজ। প্রাক-বিভক্ত সমাজে, অর্থাৎ যাকে আমরা বলি আদিম সমাজ, কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব ছিল না, ছিল না কোনোরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থা। শোষক-শোষিত, শাসক-শাসিত বলে সেখানে কিছু ছিল না। সকলেই স্বাধীন ও সমান। হয়তো অনেকেই প্রশ্ন তুলবেন—এরকম সমাজ যে ছিল, এ যে একেবারে কল্পনাপ্রসূত নয়, তার সত্যতার প্রমাণ কোথায়? তার উত্তরে বলা যায়, দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের পদ্ধতির মধ্যে প্রবেশ না করেও, একেবারে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এরকম সমাজ শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সভ্যতার আওতার বাইরে এখনও বিরাজ করছে। লুইস হেনরি মর্গান জীবনের অধিকাংশ সময়ই এ-ধরনের সমাজে গবেষণার কাজে অতিবাহিত করে বিচিত্র বৈজ্ঞানিক তথ্য ও অভিজ্ঞতা আহরণ করেছেন। শুধু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ই নয়, তিনি প্রমাণ করেছেন যে পৃথিবীর সমগ্র মানুষ—যেখানেই তারা থাকুক এবং সভ্যতার যত উচ্চস্তরেই আরোহণ করে থাকুক না কেন—কোনো সুদূর অতীতে এইরূপ সমাজেই তারা একদা সবাই বাস করেছিল।

এই প্রাক-বিভক্ত সমাজ অর্থাৎ প্রাচীন আদিম সমাজ সাম্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু কেন? কারণ সমাজ বিবর্তনের ঐ পর্যায়ে সামাজিক মানুষের উৎপাদন-শক্তি অত্যন্ত অনুন্নত অবস্থায় ছিল, ফলে সকলে সমবেতভাবে প্রাণপাত পরিশ্রম করে গোষ্ঠীর অন্তর্গত সকল মানুষের জন্য কোনোক্রমে নেহাৎ প্রাণধারণের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য উৎপাদনগুলি প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে আহরণ করতে পারত। পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে উৎপাদনের যন্ত্র যদি উন্নত হয় তবে মানুষের পক্ষে অল্প সময়ে অধিক পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করা সম্ভব। আর যদি উৎপাদনের যন্ত্র অনুন্নত বা স্থূল হয় প্রত্যেক ব্যক্তি প্রাণপণ পরিশ্রম করে যে পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী উৎপন্ন করতে সক্ষম হয় তার সাহায্যে অতি কায়ক্লেশে কেবলমাত্র নিজের জীবন বাঁচানো সম্ভব। প্রাক-বিভক্ত সমাজের এই অবস্থায় মানুষের শ্রম প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত উপাদান উৎপাদনে সক্ষম হয়নি। ফলে ঐ সমাজে অপরের দ্বারা উৎপাদিত উদ্বৃত্তের উপর নির্ভর করে পরান্নজীবী বা উদ্বৃত্তিজীবী পরগাছা কোনো শ্রেণীর উদ্ভব সম্ভব হয়নি। মানুষে মানুষে সম্পর্কে অসাম্য ছিল না। আবার পক্ষান্তরে এই আদিম সাম্য সমাজে কোনো মানুষের পক্ষেই এককভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টাও আদৌ সম্ভব ছিল না। বৈজ্ঞানিক জেমস জিনস্-এর গবেষণা থেকে আমরা অবগত হই যে প্রকৃতি জীবনের প্রতি বিরূপ ("nature is hostile to life")। জীবনে প্রতি মুহূর্তে প্রতি পদক্ষেপে নানা বিপর্যয় ও বহুবিধ বিঘ্ন অপেক্ষমান। উৎপাদনে অপটু এবং আত্মরক্ষার সম্বল-হীন দুর্বল মানুষের একমাত্র অবলম্বন হলো সংখ্যা। সুতরাং সমাজ-বিকাশের ঐ পর্যায়ে মনুষ্য-চেতনার ঝোঁকটা ব্যক্তিমানুষ বা ব্যষ্টির উপরে নয় বরং সমষ্টির উপরে ছিল। সমবেত মানুষের যৌথ প্রচেষ্টায়ই এ-অবস্থায় বেঁচে থাকা সম্ভব। সেই কারণেই উৎপাদনাত্মক শ্রমে অংশ গ্রহণ ও শ্রমজনিত উৎপাদন বণ্টনেও সমতা প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃতির প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মানুষের অবিরাম সংগ্রামের ফলে উৎপাদনের যন্ত্র অনুন্নত ও স্থূল অবস্থা থেকে ক্রমশই উন্নত হতে থাকল। প্রকৃতি ও মানুষের এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ফলে উৎপাদন যন্ত্রের এই ক্রমোন্নতি এমন একটা পর্যায়ে উপনীত হলো যে মানুষ বেঁচে থাকার পক্ষে অপরিহার্য ন্যূনতম উপকরণের অতিরিক্তও কিছু উপকরণ উৎপাদনে সক্ষম হলো। উৎপাদনের এই অবস্থায় পৌঁছে মানুষ শ্রমবিভাগের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে। এলো শ্রম-বিভাগ। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে অপরিহার্য খাদ্যোৎপাদনের জন্যে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আর সকল

মানুষকে বহন করতে হলো না। এই অবস্থায় পৌঁছে মানুষ উপলব্ধি করল খাদ্যবস্তু ছাড়াও বেঁচে থাকার পক্ষে প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপাদানের আবশ্যকতা; এলো বিভিন্ন কারিগরি শিল্পের উৎপাদনের তাগিদ। দেখা দিল ক্রমে ক্রমে সমস্ত উৎপাদনব্যবস্থাকে যথাযথ পরিচালনার জন্য সাংগঠনিক প্রয়োজনীয়তা। শ্রম ও উৎপাদনব্যবস্থায় ক্রমোন্নতির এই পর্যায়ে উৎপাদন-প্রক্রিয়া ও শ্রম-বিভাগে এলো মৌলিক গুণগত পরিবর্তন। উৎপাদনের যন্ত্র, প্রক্রিয়া ও উৎপাদনব্যবস্থার উন্নততর পর্যায়ে উত্তরণ ও পূর্বোক্ত মৌলিক গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে মানুষের ভাষা, সঙ্গীত ও নৃত্য-কলার বিকাশ।

জন্তু-জানোয়ার একান্তভাবেই জন্তু-জানোয়ার। তারা তাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ উৎপাদনে সক্ষম নয়, কারণ তারা উৎপাদনের যন্ত্র তৈরি করতে পারে না। প্রাকৃতিক উপকরণকে শ্রম-যন্ত্র ও শ্রমের সাহায্যে মানুষের ব্যবহার্য সামগ্রীতে রূপান্তরণকে আমরা উৎপাদন বলব। এ-উৎপাদনে কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রম উভয়ই প্রয়োজন। সামাজিকভাবে বিমূর্ত বা abstract শ্রম ঐ সামগ্রী উৎপাদনে কংক্রিট রূপ ধারণ করে। পৃথিবীতে একমাত্র মানুষই উৎপাদনের নিমিত্ত শ্রম-যন্ত্র তৈরি করতে পারে এবং জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সেই যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন করতে পারে। এই উৎপাদন শ্রমসাধ্য। শ্রমশীল এই মানুষের সত্তা আরিস্টটলের মত অনুসারে "man is social animal" আজ আর গ্রহণযোগ্য নয়। মার্কসের ভাষায় সহজাত ও অর্জিত বহুবিধ গুণাবলী সমন্বিত মানুষ হলো সামাজিক মনুষ্যসত্তা—'social being'। তাঁর মতে সচেতন সামাজিক মানুষের ভিত্তি তার জীবনবিকাশের কর্মধারায়, যা মানুষ নিজে উৎপন্ন করে এবং যেভাবে উৎপন্ন করে তা-ই নির্ধারণ করে তার স্বরূপ। প্রথম দিকে কোনো মানুষের পক্ষেই একক ও বিচ্ছিন্নভাবে উৎপাদন ক্রিয়া সম্পন্ন করা আদৌ সম্ভব হয়নি। একই কাজ সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় সম্পন্ন হয়েছে। সমবেতভাবে শ্রমদানের মাধ্যমেই প্রত্যেক মানুষকেই চিন্তার বিনিময় করতে হয়েছে। এই চিন্তা ও ভাব বিনিময়ের তাগিদেই মানুষের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে অর্থ এবং এই অর্থেরই বাহন হিসেবে ভাষার সৃষ্টি করেছে মানুষ। তাই উৎপাদনাত্মক কাজের সঙ্গে প্রথম থেকেই ভাষার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। অধ্যাপক টমসন বলেছেন—গ্রে, স্মাইথ, রস্ট্রে, ও বুশের প্রভৃতি

বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, উৎপাদন যন্ত্র ব্যবহারের ফলে মানুষের পেশীগুলিতে যে-চাপ পড়ে তারই প্রতিবর্তী ক্রিয়া হিসেবে স্বরযন্ত্রের প্রতিক্রিয়াটি থেকেই মানুষের কণ্ঠে ভাষার স্ফুরণ হয়েছিল।

অর্থনৈতিক উৎপাদনাত্মক শ্রমের সঙ্গে ভাষার মতো সঙ্গীতের যোগসূত্রটিও শ্রম-সঙ্গীতের মধ্যে ধরা পড়ে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমার ছোটবেলার কথা। পূর্ববঙ্গের মাঠে মাঠে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পাটক্ষেত ও আউস ধানের ক্ষেতে কৃষকদের ঘাস নিড়ানির কাজের সময় সমবেত কণ্ঠে জারিগান। আকাশে তখন প্রচণ্ড খর রোদ। সেই গানের 'কলি' আমার মনে নেই, কিন্তু সেই সুর এখনও আমার কানে বাজে। আবার দেখেছি, নদীপথে নৌকো চলেছে খড় পাট ধান বা আখ বোঝাই করে— কেউ-বা গুণ টেনে, লগি মেরে, আবার কেউ-বা দাঁড় টেনে—সঙ্গে নৌকো বাওয়ার প্রাণ মাতানো ভাটিয়ালী সুরে গান। আবার দেখেছি বিগত ১৯৫৪-৫৫ সালে জলপাইগুড়িতে তিস্তা নদীর বাঁধ তৈরির সময় বাঁধের ভিত্তি স্থাপনের জন্য অপরিহার্য ৩০ থেকে ৪০ ফুট লম্বা শালের খুঁটি মাটিতে পুঁততে গিয়ে শ্রমিকরা সমবেত কণ্ঠে গান ধরেছে। কেন? একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে উৎপাদনাত্মক কাজ শুধু হাত ও হাতিয়ার সাপেক্ষই নয়, ভাষা ও সুর সাপেক্ষও বটে; আর সেই ভাষা ও সুর উৎপাদনাত্মক কাজকে সহজ ও স্বাভাবিক করে তোলে। সেক্ষেত্রে শ্রম, উৎপাদন ও শ্রমিকের মধ্যে কোনোরূপ বিরোধ নেই, এবং রয়েছে একাত্মতা ও স্বাধীনতা। প্রাক-বিভক্ত আদিম সাম্য সমাজে শ্রম, শ্রমিক ও উৎপাদনের মধ্যে ছিল একাত্মতা। পরবর্তী-কালে দাস-সমাজ, সামন্ত-সমাজ ও পুঁজিবাদী-সমাজের আবির্ভাবের ফলে শ্রম, উৎপাদন, উৎপন্নদ্রব্য ও শ্রমিকের মধ্যে একাত্মতা ও আত্মীয়তার বিলোপ ঘটে। এইভাবে মানুষের ব্যক্তিসত্তা 'Commercial object'-এ পরিণত হয়; ফলে মানুষে মানুষে এমনকি মানুষের স্বীয় স্বাধীন চেতনার সঙ্গে বিযুক্তি ঘটে। সামন্ত সমাজে, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক একদিকে যেমন তার স্বাধীন ব্যক্তি সত্তায় উন্নীত হয় না, তেমনি স্বীয় শ্রমজাত উৎপন্ন দ্রব্যের কাছেও পরাধীন হয়ে ওঠে। কারণ অ্যালিয়েনেশনের ফলে শুধু তার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গেই বিরোধ ঘটে না, অধিকন্তু নিজের শ্রমের দ্বারা উৎপন্ন বস্তুর উপরও স্বত্ব-স্বামিত্ব নষ্ট হয়। প্রাক-বিভক্ত সমাজে যতদিন মালিক গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেনি ততদিন পর্যন্ত অ্যালিয়েনেশনের উদ্ভব হয়নি। কাজের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই ভাষা সংযোজিত হয়েছে, আর ক্রমে সংযোজিত হয়েছে সুর। এভাবেই

সঙ্গীতের জন্ম ; এ-সঙ্গীত অবসর বিনোদন নয় একান্তভাবেই কাজের অপরিহার্য অঙ্গ। সর্দার-শ্রমিক গোটা গানটি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঙ্গ-ভঙ্গি সহযোগে, আর সকল শ্রমিক সেই গানে সুর মিলায় ও কাজ করে ; লাঘব হয় শ্রমের, কাজ হয় সহজ। পণ্ডিতপ্রবর বুশের প্রমাণ করেছেন উৎপাদনাত্মক কাজের মাধ্যমেই ভাষা এবং ক্রমে কাজের তাল থেকেই ভাষার ছন্দ জন্ম নিয়েছে।

আদিম সমাজে পশ্চাদপদ মানুষের মধ্যে কাজের সঙ্গে শুধু গানেরই সম্পর্ক নয়, নাচেরও অতি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে। বস্তুত আদিম সমাজে নাচ-কাজ-গান পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে একাকার অভিন্ন হয়ে রয়েছে। সেই পর্যায়ে উৎপাদন কাজের পক্ষে গান ও নাচ অনিবার্য কারণেই উদ্দেশ্যমূলক ও একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। প্রকৃতির সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষের ফলে আদিম মানুষের উৎপাদন যন্ত্র হয়েছে ক্রমেই অধিকতর ধারালো, উৎপাদন-পদ্ধতি হয়েছে অধিকতর উন্নত, আর সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে সামাজিক কাঠামো ; আর সেই পরিবর্তনের বাঁকে বাঁকে ঐতিহাসিক-সামাজিক মানুষের সযত্ন সাধনায় সৃষ্টি হয়েছে শিল্প-সাহিত্য-দর্শন ও বিজ্ঞানের। এ-প্রসঙ্গে এঙ্গেলসের উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য মনে করি। তিনি বলেছেন :

> "With each generation, labour itself became different, more perfect, more diversified. Agriculture was added to hunting and cattle breeding, then spinning, weaving, metal working, pottery and navigation. Along with trade and industry there appeared finally art and science. From tribes there developed nations and states. Law and politics arose, and with them the fantastic reflection of human things in human mind : religion···"[১]

বংশ-পরম্পরায় শ্রমের রূপান্তর হতে লাগল ; শ্রম আরও নিখুঁত আরও বিচিত্র হতে লাগল। শিকার পশুপালনের সঙ্গে যুক্ত হলো কৃষি ; তারপর সুতো কাটা, কাপড় বোনা, ধাতুর কাজ, মৃৎশিল্প, নৌ-চালনা। বাণিজ্য ও শিল্পের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যোগ হলো শিল্প-চারুকলা ও বিজ্ঞানের। গোষ্ঠী রূপান্তরিত হলো জাতি ও রাষ্ট্রে। আবির্ভাব হলো আইন ও রাজনীতির, আর সেই সঙ্গে জন্ম নিল মানব-মনে মানব-ব্যাপারেরই কাল্পনিক প্রতিবিম্ব—ধর্ম।···

শ্রমের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পকলা বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন কৌশল অতি দ্রুত উন্নত হতে লাগল ; কারণ একদল লোক খাদ্যোৎপাদনের

প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেল; তখন তারা অধিকতর উন্নত উৎপাদন যন্ত্র উদ্‌ভাবনে এবং অবস্থার পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে উৎপাদনের গুণগত মৌলিক পরিবর্তনের দিকে নজর দিল; তখনই দেখা দিল উৎপাদনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার সাংগঠনিক প্রয়োজনীয়তা। ফলে একদল লোক উৎপাদনের সংগঠন পরিচালনায় মনোনিবেশ করল। এরই ফলে প্রাক-বিভক্ত সমাজের সাম্যের ভিত্তি ভেঙে গেল এবং দেখা দিল শ্রেণী-বিভক্ত সমাজ যেখানে একদল লোক শারীরিক পরিশ্রম করে উৎপাদনের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পালন করবে, অপর একদল লোক মাথা খাটিয়ে প্রয়োজন অনুসারে উৎপাদনব্যবস্থা পরিচালনা করবে। এইভাবেই ক্রমে ক্রমে শ্রম ও কর্মের সঙ্গে চিন্তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। শ্রমের সঙ্গে চিন্তার বিচ্ছেদের মাধ্যমেই ঘটে শারীরিক শ্রমের সঙ্গে মানসিক শ্রমের বিচ্ছেদ। উৎপাদন কৌশল উৎপাদনের যন্ত্র ও উৎপাদনব্যবস্থা যতই উন্নত হতে লাগল কায়িক শ্রম ও মানসিক শ্রমের মধ্যে বিচ্ছেদও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকল। যে-অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির ফলে প্রাক-বিভক্ত সাম্যসমাজ শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে রূপান্তরিত হলো সেই উৎপাদনের গুণগত রূপান্তরের অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য ফল হিসাবে এল কায়িক ও মানসিক শ্রমের ক্রমিক বিচ্ছেদ। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, প্রত্যক্ষ উৎপাদন ক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গেছে ভাষা, নৃত্য ও সঙ্গীতকলার আত্মপ্রকাশ। উৎপাদন প্রক্রিয়া যত উন্নত হয়েছে, তত রূপান্তরিত হয়েছে মানুষের ভাষা, ভাষার প্রকাশক্ষমতা, সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য-গানও উন্নততর রূপ পরিগ্রহ করেছে। এই উন্নততর রূপান্তরের ফলে মানুষের ভাষা-সাহিত্য-সঙ্গীত নৃত্যকলা এমন একটা পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যখন স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে ভাষা-সাহিত্য-সঙ্গীত-নৃত্যকলার উন্নততর বিকাশের সঙ্গে অর্থনৈতিক উৎপাদনব্যবস্থার কোনোরূপ সম্পর্ক নেই। কিন্তু সত্যিই কি তাই? বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনা করা যাক। মাটি থেকে প্রাণরস আহরণ করে গাছ বড় হয়; সেই গাছে ফল ধরে, ফল পাকে; তারপর গাছের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে। মাটি, প্রাণরস, গাছ—কোনো কিছুই অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত কিছু নয়। এই সবকিছুকে বাদ দিয়ে ফলের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কি? মাটি, মাটির অন্তর্নিহিত প্রাণরস যা বস্তুর বিশেষ গুণ বস্তুর মধ্যেই একাত্ম হয়ে আছে—তারই প্রকাশ গাছে, যার পরিণতি ফলে। অতএব ফলের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। ফলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আপাতদৃষ্টিতে আছে মনে হয়।

যেমনি ভাষা-সাহিত্য-শিল্প-কলাও অর্থনৈতিক উৎপাদনব্যবস্থা প্রসূত। এবং এইসব শিল্পকলার ঐতিহাসিক সামাজিক মানুষের সমাজ-জীবন নিরপেক্ষ কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীতকলা গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক মানুষের সামাজিক পটভূমিকার যোগে এবং কোনো সংস্কৃতির অঙ্গ রূপে এবং সেই সামাজিক পটভূমি ও সাংস্কৃতিক অঙ্গ অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থারই অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য ফল মাত্র। যাঁরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী তাঁরা শিল্প-সাহিত্যের সামাজিক ভিত্তি স্বীকার করেও তার উৎপাদনব্যবস্থা-প্রসূত সমাজ নিরপেক্ষতা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদীদের মধ্যে অন্যতম টোমার্জ। তিনি বলেছেন—"সারস্বত বিধি সামাজিক বিধির উপর নির্ভরশীল নয়, তারা সামাজিক বিধির অংশ পর্যন্ত নয়।" এসব নেহাতই কূটতর্ক যার মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির একান্তই অসদ্ভাব। শিল্প-সাহিত্য বিচারের এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের সন্ধান দিয়েছে মার্কসবাদ। মার্কসবাদই প্রথম সামাজিক মানুষের শিল্প-কর্মকে স্থান, কাল এবং ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্রে স্থাপন করেছে। উৎপাদনাত্মক অর্থনীতি-প্রসূত রাজনৈতিক ও সামাজিক পারম্পর্যে মানুষের শিল্পকর্মের প্রতিষ্ঠায় মার্কসীয় দর্শন আমাদের নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। বিগত শতকে ১৮৪৪ সালে মার্কস ও এঙ্গেলসের সাক্ষাৎকারে এবং 'দ্য জার্মান ইডিওলজি' রচনার মধ্য দিয়েই প্রথম মার্কসীয় শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের সূত্রপাত ঘটে।

গতিশীল জীবন-প্রবাহের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক উৎপাদন-ব্যবস্থার মুখ্য ভূমিকা মার্কস ও এঙ্গেলসের দার্শনিক চিন্তার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব। আবার এঙ্গেলস বলেছেন—"চূড়ান্ত বিচারে ইতিহাসে নিয়ামক শক্তি বাস্তব জীবনের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন। মার্কস বা আমি এর অধিক কিছু বলিনি। অতএব কেউ যদি আমাদের কথাকে বিকৃত করেন, বলেন যে অর্থনৈতিক উৎপাদনই একমাত্র নিয়ন্ত্রণী শক্তি, তখন তিনি আমাদের সিদ্ধান্তকে এক অর্থহীন বস্তুবিচ্ছিন্ন নির্বোধ উক্তিতে পর্যবসিত করেন। অর্থনৈতিক পরিস্থিতিই মূল ভিত্তি, কিন্তু তদুপরি নির্মিত সৌধের যাবতীয় বিচিত্র উপকরণ সমূহও…ঐতিহাসিক সংঘাতের ইতিহাসে তাদের প্রভাব প্রয়োগ করে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের রূপ নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এই যাবতীয় উপাদানেরই মিথস্ক্রিয়া (inter action) ঘটে। এই মিথস্ক্রিয়ার কথা মার্কস পুনঃপুনঃ বলেছেন।"[২]

মার্কসীয় শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের ভিত্তি বাস্তব জীবন ও মানুষের মনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্বন্ধ। মার্কস বলেছেন—"ভাব, ধারণা ও চেতনার উপাদান প্রথমত মানুষের বস্তুগত ক্রিয়াকর্ম ও বস্তুগত ক্রিয়াসম্পর্কের সঙ্গে, বাস্তব জীবনের ভাষার সঙ্গে প্রত্যক্ষত আশ্লিষ্ট। ধারণা গঠন, চিন্তন, মানুষের মনোবিনিময় এখানে মানুষের বস্তুগত আচরণের ক্ষরণরূপে প্রতীয়মান।··· মানুষেরাই ঐ সব ধারণা, ভাব ইত্যাদির উৎপাদক—উৎপাদিকা শক্তি সমূহের বিকাশের বিশেষ পর্যায় এবং এই শক্তিবর্গের সঙ্গে উচ্চতম স্তরে সঙ্গত ক্রিয়া-কর্মের দ্বারা নিরূপিত বাস্তব ক্রিয়াশীল মানুষ।"[৩] মার্কসের এই উক্তিতে জীবন ও মানুষের মনন ক্রিয়ার মধ্যে জৈব সংযোগের স্বাক্ষর স্পষ্ট প্রতীয়মান এবং এখানে স্বভাবতই গতিশীল জীবনের চলমান প্রক্রিয়া ও মিথস্ক্রিয়ার ধারণা অনুস্যূত। 'দ্য জার্মান ইডিওলজি'র প্রথম খণ্ডের প্রথমাংশে জীবন্ত সামাজিক মানুষের অস্তিত্ব থেকে জীবন বিচার আরম্ভ হয়েছে মার্কসের। জীবন্ত, সজীব মানুষের অস্তিত্বের প্রকৃত রূপটি বোঝা যায় ব্যক্তি মানুষের শারীর সংগঠন এবং ফলস্বরূপ অবশিষ্ট প্রকৃতিলোকের সঙ্গে তার সম্বন্ধ থেকে। আগেই বলেছি, মানুষ জন্তুজগত থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে নির্দিষ্ট করে তার বেঁচে থাকার অবলম্বনকে স্বীয় প্রচেষ্টায় উৎপাদন করতে গিয়ে। যদিও মৌমাছি, পিঁপড়ে নিজেদের প্রচেষ্টায় জীবনধারণের উপকরণ উৎপাদন করে তথাপি একথা স্বীকার করতেই হবে, পশুদের জীবনধারণ একান্তভাবেই প্রকৃতিনির্ভর। কিন্তু মানুষ আপন সাধনায় ঐ প্রকৃতিনির্ভরতা জয় করে, সক্রিয় শ্রমসাধ্য সৃষ্টিশীল ভূমিকা পালন করে; প্রকৃতিকে জয় করে স্বমহিমায় আপন পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই সক্রিয়, শ্রমসাধ্য ও সৃষ্টিশীল ভূমিকা পালনে যে বিশেষ একটি জীবন প্রক্রিয়ার উন্মেষ ঘটেছে, সেই জীবন প্রক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই জন্মলাভ করেছে ও বিকশিত হয়েছে মানব-চেতনা। বস্তুবাদী চিন্তায় চেতনা বস্তুও জীবনসম্ভূত; অতএব সাহিত্য, শিল্প-কলা, নীতিবোধ, দর্শন, কোনো কিছুই আকাশে ফোটা ফুলের মতো নিরালম্ব স্বয়ম্ভু অস্তিত্বের অধিকারী হতে পারে না, তাদের কোনোও স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ইতিহাস থাকা সম্ভব নয়। "মানুষ তাদের বস্তুগত উৎপাদন ও বস্তুগত ক্রিয়াকর্মের বিকাশ ঘটাবার সঙ্গে সঙ্গেই, তাদের বাস্তব অস্তিত্ব পরিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের চিন্তন ও চিন্তনজাত সম্পদকে পরিবর্তন করে। চেতনা দ্বারা জীবন নিরূপিত হয় না। চেতনাই জীবন দ্বারা নিরূপিত হয়।"[৪] ১৮৫৯ সালে 'ক্রিটিক অব পোলিটিকাল ইকনমি'র

ভূমিকায় এই প্রাথমিক সিদ্ধান্তই মার্কস স্পষ্ট করে বলেছেন, "জীবনের সমাজগত উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মানুষ তাদের ইচ্ছার পরিধির বাইরেই নির্দিষ্ট ও আবশ্যক এমন সম্পর্কে, এমন উৎপাদন সম্পর্কে প্রবেশ করে, যা তাদের উৎপাদনের বস্তুগত উপায়ের বিকাশের বিশেষ স্তরের সঙ্গে সঙ্গত। এই উৎপাদনী সম্পর্কের সমগ্রতাই সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, যার আসল ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে আইনগত ও রাজনৈতিক এক সৌধ, এবং এরই সঙ্গে সঙ্গত হয় চেতনার বিশেষ রূপসমূহ।···অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বিশাল সৌধটিও রূপান্তরিত হয়, অল্পাধিক দ্রুততায়।"[৫]

ইতিহাসের মানুষ শ্রমশীল। এই শ্রমশীল মানুষের সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি কোনো দৈবশক্তির ইঙ্গিতে তৈরি হয়নি। মানুষ নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছে। এই সৃষ্টির কাহিনীই তার ইতিহাস। এই ইতিহাস বলতে বোঝায় মানুষের সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি যার মধ্যে তার গোষ্ঠী ও ব্যষ্টিজীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষের শ্রমই আছে তার সৃষ্টিশক্তির মূলে। এই শ্রমের মাধ্যমেই সে লাভ করেছে তার দুটি হাত যা তার উৎপাদনাত্মক কর্মের মূল হাতিয়ার।[৬] এই শ্রমশীল মানুষের যে-সকল গুণাবলী রয়েছে সেগুলোকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ গুণ বর্তমান, যেগুলিকে বলা যায় সহজাত মানবপ্রকৃতি, যেমন যৌনবোধ, ক্ষুধা। এগুলিকে মার্কস বলেছেন স্থায়ী 'নোদনা' বা 'fixed drives', এবং এই সকল গুণ যে-কোনো অবস্থায় বর্তমান থাকে। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের দ্বারা এদের যেটুকু পরিবর্তন ঘটে তা কেবলমাত্র রূপ (form) ও রীতির (direction) ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, কতকগুলি গুণ আছে যেগুলি বিশেষ ধরনের সামাজিক অবস্থার ফলে গড়ে ওঠে। এই গুণগুলি সামাজিক অবস্থার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়। এই অর্জিত গুণগুলিকে মার্কস নাম দিয়েছেন 'আপেক্ষিক নোদনা' বা 'relative drives'।[৭] এই দ্বিবিধ গুণের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মানুষ হলো সামাজিক মানুষ। পূর্বেই বলেছি মার্কসের এই সামাজিক মানুষ অ্যারিস্টটলের 'social animal' নয়। সচেতন ও উৎপাদনক্ষম সামাজিক মানুষের ভিত্তি তার জীবন-বিকাশের কর্মধারায়। অর্থাৎ সচেতন উৎপাদনক্ষম সামাজিক মানুষ যা উৎপন্ন করে এবং যেভাবে সে উৎপন্ন করে তা-ই স্বরূপ নির্ধারণ করে। ব্যক্তিমানুষের প্রকৃতিকে মার্কস এভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন; উৎপাদন-ক্রিয়া নির্ধারণকারী বাস্তব অবস্থার উপরই মানুষের প্রকৃতি নির্ভর করে।[৮] তারই ফলে আমরা প্রত্যক্ষ করি

ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে সাধারণ মানবপ্রকৃতি বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। এ-প্রসঙ্গে সৃষ্টিশীল সামাজিক মানুষের মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে মার্কসের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য : "The whole of what is called world history is nothing but the creation of man by human labour and emergence of nature of man ; he therefore has the evident and irrefutable proof of his self creation, of his own origins."[৯] ইতিহাসের স্রষ্টা সামাজিক মানুষ মূলত স্বাধীন, আত্মবশ। এই স্বাধীন, আত্মবশ মানুষ পারস্পরিক অবিচ্ছিন্নতায় সামাজিক জীবনে ব্যক্তিমানুষ হিসেবে অবস্থিত। গোষ্ঠী-জীবন থেকে মানুষের ব্যক্তি-জীবন পৃথক নয়। মানুষ তার সমাজ-জীবনকে মূর্ত করে তুলেছে তার গোষ্ঠী-চেতনা দ্বারাই। অতএব কোনো মানুষ যদি এককভাবেও কিছু করে তখনও সে তার সমাজ-চেতনা ও গোষ্ঠী-চেতনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত। কারণ ভাষা, ভাব, কর্মক্রিয়া পদ্ধতি ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ের অপরিহার্য উপাদান সে সংগ্রহ করেছে সমাজ জীবন থেকে। তাই ভাবতীয় 'চিরন্তন মানবতা'র আত্মচর্চার ধারণার সঙ্গে মার্কসের স্বাধীন, আত্মবশ সামাজিক মানুষের কোনোরূপ সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাববাদীরা যে-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মহিমা-গান করেন, ইতিহাস সৃষ্টিকারী সচেতন সামাজিক মানুষ সে-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কামনা করেনি। মানব-সম্পর্ক-বন্ধন জড়িত আপন ক্রিয়া-কর্মের মাধ্যমে ইতিহাসের মানুষ আবিষ্কার করেছে নিজেকে, সৃষ্টি করেছে সভ্যতার বিচিত্র উপকরণ। মানব-সম্পর্ক-বন্ধন জড়িত আপন ক্রিয়া-কর্মের সঙ্গে মানুষের আত্মোপলব্ধি নিবিড় অঙ্গাঙ্গী বন্ধনে বদ্ধ। মানুষের আপন কর্মের সঙ্গে আত্মোপলব্ধির যখন বিচ্ছেদ ঘটে তখনই মানুষ তার গোষ্ঠী-চেতনা থেকেও বিযুক্ত হয় ; শুধু তাই নয়, তখন সে-মানুষ হারায়। আত্মোপলব্ধির সঙ্গে যে-মানুষের বিচ্ছেদ ঘটেছে সে-মানুষ মানবসত্তায় খণ্ডিত, সে অপরিপূর্ণ, সৃষ্টির আনন্দযজ্ঞে সে-মানুষ আপন অস্তিত্বের স্বাক্ষর থেকে বঞ্চিত ; সে-মানুষ অশান্ত, কারণ ক্ষয়িষ্ণু ভাবনাগুলি অহরহ তার খণ্ডিত সত্তাকে তাড়না দিচ্ছে। তাই সে কখনও অস্থির, আবার কখনও অলস বা বিষণ্ণ। মানুষের জীবনের এই অবস্থাটাকেই মার্কস বলেছেন 'অ্যালিয়েনেশন' (alienation)। এই অ্যালিয়েনেশনের ফলে কিভাবে মানুষের আপন সৃষ্টবস্তুর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে, বিচ্ছেদ ঘটে কর্মীর সঙ্গে কর্মপদ্ধতির এবং বিচ্ছেদ ঘটে সচেতন মানুষের বিশ্বানুগ গোষ্ঠী-চেতনার সঙ্গে, মার্কস তার

ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[১০] শ্রেণী-বিভক্ত দাস-যুগে, সামন্ত-যুগে এবং বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে এই অ্যালিয়েনেশনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং মানবিক সত্তায় দারুণ বিপর্যয় নেমে আসছে। ভাববাদীরা রাষ্ট্রের মহিমা, নাগরিক অধিকার মূলক নানাবিধ সামন্তযুগীয় এবং বুর্জোয়া চিন্তা এবং তথাকথিত ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে ওকালতিতে পঞ্চমুখ। অর্থাৎ বাস্তব অবস্থাকে চেপে রাখার একটা প্রাণপণ প্রচেষ্টা চলছে। ফলে মানুষের আত্মিক জগতে এমনকি শিল্পীর শিল্প-চেতনায় অ্যালিয়েনেশনের প্রতিচ্ছবি মূর্ত হয়ে ওঠে। এ-অবস্থায় মানুষের মধ্যে বস্তুজগত থেকে পলায়নের মনোবৃত্তি জাগে, শিল্প-চেতনা বাস্তবতা বর্জিত কল্পনালোকে বিহার করে। শিল্পে, সাহিত্যেও জীবনযাপনের সমুদয় রীতিতে অ্যালিয়েনেশনের সুদূরপ্রসারী ছায়া প্রকটিত। ঔপন্যাসিক কাফকার একটি উক্তিতে প্রমাণিত যে কিভাবে শিল্পী-সাহিত্যিকের চেতনাকে অ্যালিয়েনেশন প্রভাবিত করছে, "I am separated from all things by a hollow space, and I do not even reach to its boundaries." অতএব আমরা বলতে পারি, আজকের শিল্পী-সাহিত্যিক আত্মবশ নয়, পরাধীন। বস্তুত, সত্যিকার সৃষ্টি মহৎ সৃষ্টি তখনই সম্ভব যখন মানুষ স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করে—আপন সৃষ্টির মুখোমুখী স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে পারে। আজকের মানুষের সে-স্বাধীনতা নেই, শিল্পী-সাহিত্যিক হারিয়েছে তার স্বাধীনতা, তাই আজ মহৎ বা যথার্থ সৃষ্টির সম্ভাবনা কম।

বিরুদ্ধবাদীরা আরও একটি প্রশ্ন তুলেছেন। রামায়ণ-মহাভারতের মতো মহৎ কাব্য-সাহিত্য আজ আর সম্ভব হচ্ছে না কেন? উত্তরে বলা যায়, যে-অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় রামায়ণ-মহাভারতের সৃষ্টি হয়েছিল সেই সামাজিক অর্থনৈতিক পটভূমি পরিবর্তিত হয়েছে। তাই আজকে যদি কেউ রামায়ণ-মহাভারতের অনুরূপ মহাকাব্য রচনার চেষ্টা করেন তবে তা হবে এ-যুগের সমাজ-চেতনা ও গোষ্ঠী-চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন এক কাল্পনিক পদার্থ। মার্কস তাঁর 'দ্য জর্মন ইডিওলজি'র ৩৮ পৃষ্ঠায় বলেছেন,—"মানুষ তাদের বস্তুগত উৎপাদন ও বস্তুগত ক্রিয়া-কর্মের বিকাশ ঘটাবার সঙ্গে সঙ্গেই, তার বাস্তব অস্তিত্ব পরিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গেই, তার চিন্তন ও তার চিন্তন-জাত সম্পদকে পরিবর্তন করে।..."[১১] রামায়ণ-মহাভারতের যুগে মানুষের উৎপাদন ও বস্তুগত ক্রিয়াকর্মের বিকাশ যে-পর্যায়ে ছিল আজ এ[illegible] শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বস্তুগত উৎপাদন ও ক্রিয়াকর্ম বিকাশের সে-পর্যা[illegible]

ফলে বস্তুগত উৎপাদন ও ক্রিয়াকর্মের মৌলিক গুণগত পরিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত মানুষের চিন্তন ও চিন্তনজাত সম্পদেরও রূপ, রীতি ও গুণগত শৈল্পিক রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। বিরুদ্ধবাদীরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারবেন যে রূপ, রীতি, গুণগত রূপান্তর ও শৈল্পিক উৎকর্ষ ও অপকর্ষের মানদণ্ডের বিচারে আজকের কাব্য-নাটক-শিল্পকর্মের রূপ, রীতি ও শৈল্পিক গুণগত রূপান্তর রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়াড-ওডিসীর ভাষা, রূপ, রীতি অপেক্ষা অধিকতর উন্নত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'র কথা। রামায়ণে কৃষিসভ্যতা ও যান্ত্রিক সভ্যতার যে-দ্বন্দ্বচিত্র অঙ্কন করেছেন বাল্মীকি, সেই কৃষি ও যান্ত্রিক সভ্যতার দ্বন্দ্ব চিত্রটিই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতি ক্ষুদ্রপরিসর সাঙ্কেতিক নাটক 'রক্তকরবী'তে অতিশয় নিপুণভাবে চিত্রিত করেছেন। একই কাহিনীকে রূপায়িত করতে গিয়ে হাজার হাজার বছর আগে বাল্মীকি যে-রূপ ও রীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন, হাজার হাজার বছর পরে রবীন্দ্রনাথ সেই একটি কাহিনীকে রূপায়িত করতে সম্পূর্ণ ভিন্ন শিল্পরূপ ও শিল্পরীতির আশ্রয় নিয়েছেন। বলা বাহুল্য বাল্মীকি ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই রূপ, রীতি নিজ নিজ যুগের উৎপাদনব্যবস্থা ও সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিযুক্ত। তথাপি এ-কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে 'রক্তকরবী'র আঙ্গিক, রূপ, রীতি রামায়ণের আঙ্গিক, রূপ, রীতি অপেক্ষা অধিকতর শৈল্পিক ব্যঞ্জনার অধিকারী। মোট কথা শিল্পকর্মের বিকাশে রূপ, রীতি ও গুণগত রূপান্তরকে শিল্পগত উন্নতি-অবনতি বা উৎকর্ষ-অপকর্ষের মান-বিচারে ঠেলে না দিলেই অসঙ্গতি এড়ানো যায়। রামায়ণ-মহাভারতে এবং গ্রীক মহাকাব্যে কল্পনার যে-প্রবল প্রাণময়তা দেখা যায়, তার উৎস সন্ধান করা আবশ্যক। বাস্তব জীবনকে বদলাবার আবেগই সেই কল্পনার প্রবল প্রাণময়তার উৎস। মহাকাব্যের সেই যুগে বাস্তব জীবনে উপকরণের যে-স্বল্পতা ও দীনতা ছিল, তাকে কল্পনায় ছাপিয়ে যাবার প্রবণতা বাস্তব জীবন ও কল্পনার দ্বন্দ্ব থেকে জাত। বাস্তব জীবনে উপকরণের যে-দীনতা সেই যুগে লক্ষ্য করা যায়, আজকে সেই দীনতা নেই। বরং উৎপাদনব্যবস্থা ও উৎপাদনকৌশল ও উৎপাদন-যন্ত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের উপকরণও সংগৃহীত ও সঞ্চিত হয়েছে বিপুল পরিমাণে; তবে সে-সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের কুক্ষিগত। তাই আজকের মানুষ, আজকের শিল্পী-সাহিত্যিকের প্রবণতা জীবনের উপকরণের দীনতাকে কল্পনায় ছাপিয়ে যাওয়া নয় বরং মুষ্টিমেয় মানুষের কবলে কুক্ষিগত বিপুল জীবনোপকরণকে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর ভোগ্য পণ্যে পরিণত করা। এই প্রবণতাই এ-যুগে

শিল্পী-সাহিত্যিকের শিল্প-কর্মের রূপ-রীতির নিয়ামক। এই প্রসঙ্গে মার্কসের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য : "পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গত মননজাত উৎপাদনের প্রকৃতি মধ্যযুগীয় উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গত মননজাত উৎপাদনের প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। বস্তুগত উৎপাদনের চরিত্র তার নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক আধারে উপলব্ধি না করলে, তার সঙ্গে সঙ্গত মননজাত উৎপাদনের বাস্তব প্রকৃতি এবং উভয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া অনুধাবন করাও অসম্ভব।"[১২]

অতএব পুঁজিবাদী সমাজে অনিবার্য অর্থনৈতিক কারণে ও জীবনযাত্রার মৌলিক গুণগত রূপান্তরের ফলে রামায়ণ-মহাভারতের মতো মহাকাব্যের সৃষ্টি সম্ভব নয়। সম্ভব নয় শেক্স্পীরিয় ঢঙের নাটক রচনাও। এর জন্যে কোনোরূপ আক্ষেপের কারণ আছে বলে মনে হয় না। পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে এ-কথা সুস্পষ্ট যে অর্থনৈতিক উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন হয় এবং সেই পরিবর্তনের ফলে মানুষের চিন্তন-জাত সৃষ্টির রূপ-রীতির মৌলিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

গ্রন্থপঞ্জী

১. F. Engels DN. 288-89

২. F.Engels, জে ব্লককে লেখা চিঠি, ২১এ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০

৩. Marx ও Engels, 'The German Ideology' (উদ্ধৃতি Literature and Art by Marx and Engels, সিডনি, ১৯৪৯, পৃষ্ঠা ১৪) মস্কো, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ৩৭

৪. Marx, 'Preface to the Critique of Political Economy', Selected Works, vol. I, মস্কো, ১৯৪৬, পৃষ্ঠা ৩০০-৩০১

৫. Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844

৬. F. Engels, The Part played by labour in the Transition from Ape to Man

৭. Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844

৮. Marx, the German Ideology

৯. Marx, Economic and Philosophic Manuscripts of 1844

১০. Roger Garaudy, Karl Marx: The Evolution of His Thought

১১. Marx ও Engels, The German Ideology (১৮৪৫-৪৬) মস্কো, ১৯৬৪, পৃষ্ঠা ৩৮

১২. Marx, Theorien ueber den Mehrwert, Vol. I, পৃষ্ঠা ৩৮০-৮৫ (উদ্ধৃতি Literature and Art, পৃষ্ঠা ২৫)

উল্লিখিত গ্রন্থাবলী এবং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'লোকায়ত দর্শন'-এর নিকট ঋণ অবশ্যস্বীকার্য।

নাটকের রবীন্দ্রনাথ

দেবেশ রায়

শঙ্খ ঘোষের সিদ্ধান্ত হচ্ছে[১]—রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে নতুন 'পুরাণ'-এর জন্ম দিয়েছেন; লোকস্মৃতি, যাত্রার ধরনধারণ আর সংস্কৃত নাটকের আঙ্গিক ও আরো অনেক কিছুই এই 'পুরাণ' নির্মাণের উপাদান; ফলে শেষ পর্যন্ত "রবীন্দ্রনাথের নাটকও জন্মায় এই ত্রিলোকে। একটি অনতিনির্দেশিত স্থানকালে বিন্যস্ত তার ঘটনাজগৎ, কিন্তু সে পৌঁছে দেয় নিবিড় কোনো আত্মিক চেতনায়। আত্মভূমি বস্তুভূমি এইভাবে দুই প্রান্ত টান করে ধরে, তার মধ্যবর্তী যোগের পথ তৈরি রাখে লোকস্মৃতি।"

রবীন্দ্রনাথের নাটকের চরিত্র সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তের পক্ষে দরকারি প্রতিজ্ঞা-বাক্য গঠন করেছে অন্যান্য প্রবন্ধগুলি। এই মুখবন্ধে এবং নাটক অভিনয় ও পরিশিষ্ট এই তিন ভাগে যথাক্রমে ছ, তিন ও দুটি রচনায় শঙ্খ ঘোষ নানা প্রচলিত ধারণা ভেঙেচুরে, দেশীয় ও বিশ্ব নাটকের নানা ধারার নানা কথা বলে শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করেছেন রবীন্দ্রনাথই একমাত্র আধুনিক নাট্যকার।

আমার অন্তত জানা নেই, রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই সিদ্ধান্তে এর আগে কেউ লিখিতভাবে পৌঁছেছেন। অত্যন্ত কৃশকায়, মাত্র ১৬৯ পাতার, এই গ্রন্থটিতে শঙ্খ ঘোষ প্রায় আতশকাঁচ লাগিয়ে পাঠগত (textual) আলোচনায় লেগেছেন। এমন বিশদ পাঠগত আলোচনা রবীন্দ্র-নাট্যসমীক্ষার ধারায় সম্পূর্ণতই নতুন। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা বিষয়ে মোহিতলাল মজুমদার যে পাঠগত সমীক্ষা একসময় করেছিলেন, শঙ্খ ঘোষের প্রয়াস একমাত্র তারই তুলনীয়। বরং রবীন্দ্রনাথের নাটকের ব্যাপারে সমালোচকের নিজের ব্যাখ্যার সমর্থনে প্রয়োজনমতো রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি তুলে আর দরকার মতো অংশ চেপে একটা তত্ত্ব খাড়া করে দেয়াটাই তো এতোদিন চলে এসেছে। শঙ্খ ঘোষ সেই ধারা থেকে সরে এসেই নিজের মৌলিকতা প্রমাণ করলেন।

---

১ কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক। শঙ্খ ঘোষ। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। সাড়ে ছ-টাকা

রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয়, অভিনয়-যোগ্যতা এবং সমস্যাও ইতিপূর্বে নাট্য-আলোচনার বিষয় হয় নি। রবীন্দ্রনাথের পদ্য, গদ্য, গীতি ও নৃত্য নাট্যকে নাট্য আলোচনা ও রবীন্দ্রনাথের সূত্রে এর আগে কেউ গাঁথেন নি।

অথচ বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যে এতগুলো প্রথম কাজ শঙ্খ ঘোষ সেরেছেন এমন অনায়াস ভঙ্গিতে, এমন ফুটনোটবিহীনতায়, অথচ নানা প্রসঙ্গে নানা রচনার এমন চকিত উল্লেখে, রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র স্মৃতিকথা ও সংলাপের প্রসঙ্গের এমন ব্যবহারে, সামগ্রিকতার তত্ত্বের সঙ্গে প্রায় কোণায় কোণায় মিলিয়ে পাঠগত সমালোচনাকেও এমন একটা পালিশ দিয়েছেন যে, এ-কথা আর না বলে উপায় নেই অজিত কুমার চক্রবর্তীর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক দুটি গ্রন্থের পর রবীন্দ্রনাথের রচনা বিষয়ে এমন মৌলিক বই আর বের হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা ভবিষ্যৎবাণী করতেও সাধ যায় বিষ্ণু দে-র 'আধুনিকতার সমস্যা ও রবীন্দ্রনাথ' আর শঙ্খ ঘোষের 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক'—বাঙলাসাহিত্যে রবীন্দ্র প্রতিভা ও রবীন্দ্র রচনা আলোচনার নতুন ধারা সৃষ্টি করবে।

এ-প্রবন্ধের লক্ষ্য গ্রন্থটিতে উত্থাপিত সব প্রসঙ্গের আলোচনা নয়, কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে সামান্য প্রতিবেদনমাত্র—যা সর্বত্রই প্রশ্ন, ক্বচিৎ পাদপূরণের দুর্বিনয়ও হয়তো বা।

১। রবীন্দ্রনাটকের গড়নের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে শঙ্খ ঘোষ এতো বেশি ব্যস্ত যে বিষয়টিকে বাঙলা নাটকের প্রচলিত ধারার ঐতিহাসিক বিকাশের মাঝখানে দেখাবার জন্য বেশি শব্দ খরচ করতেও চান নি। মুখ-বন্ধের প্রবন্ধটির প্রথম অনুচ্ছেদটুকুতে এটুকু বলেই তিনি ক্ষান্তি দিয়েছেন যে উনিশ শতকের বাঙালি নাট্যকাররা "নতুন পাওয়া বিদেশী আঙ্গিককেই ধরতে চাইছিলেন সবলে। কেবল উপকরণবিন্যাসের জন্য, বৈচিত্র্যইচ্ছায় অথবা কখনো নিছক আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তাঁরা হাত বাড়াচ্ছিলেন দেশীয় ঐতিহ্যের দিকে।" এ-বইয়ের পক্ষে এটা যেন একটু বেশি সরলীকরণ হয়ে গেল। নাটকই বোধহয় সাহিত্যের একমাত্র ফর্ম যার উপর জনসাধারণ খুব সরাসরি হাত চালাতে পারে। বাঙলাদেশে নাটকের রূপ বদলেছিল জনরুচির তাগিদে খানিকটা। বিষয়ের সামাজিক আচারের পরিবর্তনের ফলে নয়। ইংরেজি সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে একটা নতুন দৃষ্টি দিয়েছিল। তারা তাই পুরনো বিষয়কে

নতুন দৃষ্টিতে দেখছিলেন। এ-ক্ষেত্রে বিষয়টা আগে জন্মায়নি, অথচ শেকস্পীয়রের ট্রাজেডির ফর্মটা হাতের মধ্যেই পাওয়া গেল। ফলে পুরনো বিষয়ের পাত্রপাত্রীকে নতুন কর্মে চলাবলা করতে হয়। অথচ যে দর্শকের সামনে নাটকটাকে উপস্থিত করা হচ্ছে বিষয়ের পুরনো সামাজিকতায় সে অভ্যস্ত তো বটেই হয়তো অনেকখানি বিশ্বাসীও। তাই জনা যতই না ম্যাকবেথ বা কোরিওলেনাসের মতো হয়ে উঠুক শেষতর দৃশ্যে তাকে বৈকুণ্ঠে দেখাতেই হয়। কিন্তু এটা শুধু দর্শকেব তাগিদে, শঙ্খ ঘোষের ভাষায় "জনরুচিকে কিছু যৌতুক" দেয়া নয়। নাট্যকারও যে বিষয়ের সামাজিকতার অংশ। এলিজাবেথের যুগে নতুন দুনিয়ার দিকে ছুটে যাওয়া বাণিজ্যতরণীর বাতাসে বাঁচা শেকস্পীয়রেব বাঙালি চেলা যে শেষে দক্ষিণেশ্বরে মাথা মোড়ান।

অর্থাৎ উনিশ শতকের বাঙালির নাট্যচেষ্টার ধরনটাই ছিল ইংরেজি নাটকেব, ভেতরটা ছিল যাত্রার। এই দ্বিধা বাঙালি নাট্য আন্দোলনেব জন্ম লক্ষণ। আর এই দুই উপাদানের দ্বন্দ্ব থেকেই রবীন্দ্রনাটকের জন্ম। তাই ববীন্দ্রনাথের নাটকেব ধরনটায় দিশি ভাব আব ভেতবটা আন্তর্জাতিক— উনিশ শতকি বাঙালি নাট্যকারদের একেবারে বিপরীত ব্যাপার। শঙ্খ ঘোষ এই সিদ্ধান্তেই এসেছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের পেছনের ঐতিহাসিক শক্তিগুলির দ্বন্দ্ব, বিকাশ, পরিণতি আলোচনা করেন নি।

২। ফলে যে-কোনো বিষয় সম্পর্কেই তিনি যেমন খুঁতখুতে, এই খুব জরুরি ব্যাপারে তাঁর তেমনি যেন তাড়াহুড়ো। ফলে এমন মন্তব্যে আমার মতো হীনবল পাঠককে হোঁচট খেতে হয় —"যাত্রা আর নাটক একটা সময়ে এসে দাঁড়াচ্ছিল প্রতিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে।" কোন সময়ের কথা বলছেন তিনি। আঠারো শতকের শেষ ভাগ, নাকি উনিশ শতকেব শেষভাগ। নাকি আমাদের সময়ের অভিজ্ঞতাই স্মৃতি হিসেবে প্রক্ষিপ্ত হলো। সময়টা জানা গেলে বোঝা যেত যাত্রা বা নাটক বলতে তিনি কি বোঝাতে চাইছেন। আঠারো শতকের শেষে পুরনো গানসম্বল কৃষ্ণ আর কালী যাত্রার গড়ন বদলানো শুরু হয়। মাত্র ৫০ বছরের মধ্যে ভেঙেচুরে নানা বৈঠকি গানের নাটকের অস্থায়ী সব ধরন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। পরে উনিশ শতকের শেষদিকে ইংরেজি কায়দায় বাঙলা নাটকের কাছ থেকে পদ্যসংলাপ, আরো পরে গদ্যসংলাপ নিয়ে নিল। তখন, মানে এখনকারও, যাত্রা আর উনিশ শতকের বাঙালি নাটকের চলনে-বলনে কিন্তু খুব একটা পার্থক্য নেই।

৩। কিন্তু গাননির্ভর কৃষ্ণযাত্রা আর কালীযাত্রার নানা বৈঠকি গানের নাটকের সঙ্গে মিশে যাওয়ার একটা যে ধারা তৈরি হলো তার মধ্যে বিলিতি অপেরাও ছিল। 'নাচ গান নাটক' ও 'নাটকে গান' প্রবন্ধ দুটিতে রবীন্দ্রনাটকের সঙ্গে সেই ধারার সম্পর্ক নিয়ে শঙ্খ ঘোষ যে বিশ্লেষণ করেছেন তার ফলে এই বিষয়গুলি এতদিনে ক্যাটালগি থেকে আলোচনার উপাদানে উন্নীত হলো। সেই বিশ্লেষণ থেকে বেরিয়ে এসেছে রবীন্দ্রনাথের নাটকের মূল কাঠামোটা "সাংগীতিক কাঠামো" আর জীবনের শুরুতে যে গানকে তিনি নাটকের ভাষা হিসেবে খুঁজ-ছিলেন, জীবনের শেষেও সেই গানকেই তিনি নাটকের ভাষা হিসেবে ব্যবহার করলেন। গীতি, গদ্য, পদ্য, নৃত্যনাট্যের নানা ধরনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাটকের নাট্যমুহূর্ত ও ভাষার সন্ধানের ব্যাপারটা এই প্রথম জানা গেল। শঙ্খ ঘোষ সমগ্রভাবেই নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধার করলেন। কিন্তু এই বিস্তৃত আলোচনাতেও রবীন্দ্রনাথের একেবারে আদিকালের কাব্যনাট্যগুলি সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নি বা রবীন্দ্র নাটকের বিকাশের ধারার সঙ্গে এগুলিকে মেলান নি। শঙ্খ ঘোষ তাঁর আলোচ্যবিষয়ের কোনো প্রসঙ্গই যেখানে বাদ দিতে চান না, সেখানে এই রচনাগুলিকে বাদ দেয়ায় এ-অনুমান হয়তো অসঙ্গত হবে না তিনি এগুলিকে নাটক হিসেবে মেনে নিতে ততটা প্রস্তুত নন।

কিন্তু এগুলিকে নাটকের আলোচনার মধ্যে টেনে না আনলে নাট্যকার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের গড়নটা কি ঠিক ধরা পড়বে বা এই প্রশ্নের সদুত্তরই কি মিলবে কেন রবীন্দ্রনাথ সাঙ্গীতিক কাঠামোকেই তাঁর নাটকে বেছে নিলেন।

৪। রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনার ক্রম শঙ্খ ঘোষ দেখছেন এইভাবে "গীতিনাটক থেকে মুক্ত হবার প্রাথমিক পদ্ধতি হিসেবে পুরনো প্রথাকেই তিনি বরণ করলেন নাটকে।" পদ্যভাষা কেন গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ, সে-বিষয়ে কতকগুলি ইঙ্গিত দিয়ে শঙ্খ ঘোষ ভাষাব্যবহারের পাঠগত আলোচনায় ঢুকেছেন।

এই আলোচনার বিশদ ও গভীর শেষার্ধের তুলনায় প্রথমার্ধ যে খানিকটা অনুমান নির্ভর ঠেকে তার প্রধান কারণ আদিযুগের এই কাব্যনাট্যগুলিকে প্রসঙ্গে টেনে না-আনা।

শঙ্খ ঘোষের মতো আমারও ধারণা ছিল শেকস্পীয়রীয় ধরনের বাঙলা নাটকের রীতি ('রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন') থেকে পদ্য নাটিকা ('চিত্রাঙ্গদা', 'মালিনী'), কাব্যনাট্য ('কাহিনী'), ও দশ বৎসরের নীরবতা পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ

গদ্যনাটককে খুঁজে পেয়েছিলেন। শম্ভু ঘোষ ধরিয়ে দেবার পর এখন থেকে গীতি ও নৃত্য নাট্যগুলিকেও এই ধারাবাহিকতাতে ভাবব। কিন্তু এখন আমার মনে হয় যে প্রথম ক্রমটি থেকে প্রথমযুগের কাব্যনাট্যগুলি বাদ দেয়া যেতে পারে না। কেন, তা একটু বলছি।

৫। 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'নলিনী'—এই চারটি রচনার দিকে তাকালে বোঝা যায় সেই ১৮৮১ সাল। রবীন্দ্রনাথের কুড়ি বছর বয়স থেকে হিমালয়-আহ্‌মদাবাদ-বিলাত-মুসৌরি-চন্দননগর, মাতৃশোক-নতুন বৌঠান-আন্না তড়খর—এই সব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে একটা এমন লিরিকে তিনি সমাচ্ছন্ন ছিলেন যাকে কোনো এক ধরনের নাট্যআঙ্গিকে ছাড়া আকার দেয়া যাচ্ছিল না। যখন একটা পূর্বনির্দিষ্ট আকার পূর্বনির্দিষ্ট কাহিনী তিনি পেয়ে যাচ্ছিলেন তখন 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'ভানুসিংহের পদাবলী'র মতো সার্থকতা তিনি অনায়াসে আয়ত্ত করে ফেলছিলেন। বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা এতটা পরিণত। কিন্তু যখনই গঠন করতে হয়েছে শিল্পের আধার তখনই 'ভগ্নহৃদয়', 'রুদ্রচণ্ড', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর কাব্যনাট্যে বা 'কবিকাহিনী', 'বনফুল'-এর আখ্যানকাব্যে বা এমন-কি 'নলিনী' গদ্যনাট্যেও তাঁকে মাথা ঠুকতে হয়েছে।

লিরিকের সেই অগ্নিবাষ্পের আলোড়ন নাটকীয়তা চাইছিল তার একটি কারণ নিশ্চয়ই তাঁর নবযৌবনের ভেতরের ব্যাপারটা।

কোনো প্রভাব বা তত্ত্ব তাঁর লিরিক-আবেগকে ঘিরতে পারেনি যখন-ও, প্রিয়তমার আত্মহত্যা আর নতুন বিবাহ জীবন, ব্রাহ্মসমাজ আর জমিদারি—এই দ্বন্দ্ব থেকে উৎসারিত আবেগমুক্তির মাত্র তিরিশ-একতিরিশ বয়স থেকেও যখন তিনি প্রায় একদশক দূরে—তখন, বিহারীলালের সাগরেদি সত্ত্বেও, নাটকীয়তা ছাড়া তাঁর আলোড়িত আবেগ নিশ্চিত হচ্ছিল না, সে আখ্যানকাব্যই হোক আর নাট্যকাব্যই হোক আর গদ্যনাট্যই হোক। (রবীন্দ্রনাথের লিরিকের এই অন্তরশায়ী নাটকীয়তাই তাঁর কবিতাগুলিকে আখ্যান বা চরিত্রের, পরিস্থিতির বা সংলাপের, ক্ষীণতম হলেও, একটা আশ্রয় দেয়।)

এ-কথাটা মনে রেখে যদি তাঁর নাটকের তালিকার দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে ১৮৮১ থেকে ১৮৯৭ পর্যন্ত এই প্রথম পর্যায়ে 'রাজা ও রাণী' আর 'বিসর্জন' এই তিনি শুধু মাত্র দুবার তখনকার প্রচলিত শেক্স্‌পীয়রীয় ধরনের বাঙলা নাটকের ফর্মকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, তা-ও, এ-দুটির মাঝখানেও,

'চিত্রাঙ্গদা'র নাট্যকাব্যের প্রয়াস ছিল, এ-ছাড়া প্রায় সম্পূর্ণ এই ১৮ বছর ধরে তিনি কাব্যনাট্য আর নাট্যকাব্যের ধরনটাকেই নানাভাবে পরীক্ষা করছিলেন। এটা যদি সত্য হয়, তাহলে শেকস্পীয়রীয় ধরণের বাঙলা নাটকের ঢঙে 'রাজা ও রাণী' আর 'বিসর্জন'-এর পর তিনি নাট্যকাব্যের ধরনটাকে ধরেছিলেন এ-সিদ্ধান্ত আর টেঁকে না। তাহলে এই সিদ্ধান্তে আসতেই হবে যে শেক্সপীয়রীয় ধরনের বাঙলা নাটকটাই ছিল এই ১৬ বছর ব্যাপী নাট্যপ্রয়াসে মাত্র দু-বারের একটা ঘটনা। 'রাজা ও রাণী' আর 'বিসর্জন'-এর তথাকথিত মঞ্চসাফল্য ও জনপ্রিয়তাই কি এই রচনা দুটিকে একটু বেশি স্পষ্ট করে তুলেছে।

৬। প্রথম যুগের এই রচনাগুলিকে বিচারে আনার দ্বিতীয় একটি যুক্তি আছে। 'কালের যাত্রা' রচনাটিতে অভিজিৎ প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষের মনে এসেছে "জয়সিংহের আতুরতা"। নাটকের চরিত্র-সংলাপ-ঘটনার ভেতর থেকে চোখ তুলে একটু ওপর থেকে সবগুলো নাটকের দিকে যদি একসঙ্গে তাকাবার একটা চেষ্টা করা যায় তাহলে দেখা যাবে ১৯০৭ সাল থেকে রচিত নাটকগুলির প্রধান পাত্রপাত্রীরা যে আগে থেকেই অনেকখানি পরিমাণে আবেগগ্রস্ত হয়ে নাটকে প্রবেশ করছে তার মূল নিহিত আছে এই প্রথম যুগের আবেগবিহ্বল গদ্য, পদ্য বা গীতি নাট্যগুলিতে। প্রথম যুগের চরিত্রগুলি প্রেম আর আবেগকে পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, আর ১৯০৭ সালের পরবর্তী নাটকগুলিতে আবেগগ্রস্ততা পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে অন্বিত হয়েছে। তবু এটা ধরা পড়ে লক্ষেশ্বর, পঞ্চক, অমল, অভিজিৎ, নন্দিনী প্রত্যেকেই নাটক শুরু হবার আগে থেকেই একটা নিজস্ব আবেগের জগতের বাসিন্দে হয়ে আছে। সেই জগতের সঙ্গে পরিপ্রেক্ষিতের অন্বয়ের দ্বন্দ্বটাই নাটকগুলির অন্তরগত দ্বন্দ্ব। —আমার মতো পাঠকের পক্ষে এ-টুকু অনুমান করাটাই দুঃসাহস। তবু শঙ্খ ঘোষের বিচারশক্তি আর দৃষ্টিশক্তি পেলে এটা একটা প্রমাণিত সত্য হয়ে যেতে পারে—এই ভরসা।

৭। প্রথম যুগের এই নাটকগুলিকে আলোচনার অন্তর্গত করার আরো একটি তৃতীয় কারণ আছে। 'নাট্যমুহূর্ত ও ভাষার সন্ধান' রচনাটিতে শঙ্খ ঘোষ এই তথ্য সম্পর্কে আমাদের কৌতূহলী করেছেন যে ইবসেন থেকে শ, সিঙ্গ, মেটারলিঙ্ক পর্যন্ত নাট্যাদর্শের বৈপরীত্য সত্ত্বেও গদ্যই এ-যুগের নাট্যভাষা। "কিন্তু এই সব রচনার প্রায় সমকালে নাট্যভাষা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নির্বাচন করে নিলেন পদ্য।" আবার "গদ্যকে যখন নির্ভরযোগ্য ভাবলেন রবীন্দ্রনাথ,

ইয়োরোপে তখন কাব্যনাট্যের পুনর্জাগরণ।"

উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে ইয়োরোপের নাট্যভাষা কি গদ্যই? রূপকথা আর অতীত আখ্যানের ব্যবহারে শঙ্খ ঘোষ কথিত নতুন পুরাণ সৃষ্টির প্রয়াসে যিনি রবীন্দ্রনাথকে মনে এনে দেন সেই হাউপ্টমান তো পদ্যকে আশ্রয় করেছিলেন। আবার বিশ শতকের প্রথম দিকে যখন নাট্যকাব্যের প্রয়াস শুরু হলো তখনো তো চেহভ বা ওনিল গদ্যভাষা ছাড়েন নি।

আসলে ১৮৯০ সালের পর, ইবসেনের তৃতীয় পর্যায়ের নাট্যাবলীর পরবর্তী কালে আর চতুর্থ পর্যায়ের রচনাকালেই, নতুন ধারায় নাট্য আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। প্রতীকের ব্যবহারে, নাট্যভাষাকে সুরান্বিত করার মধ্য দিয়ে সেই নাট্য আন্দোলন তার ভাষা খুঁজে ফিরছিল।

শঙ্খ ঘোষ যদি ১৮৮১ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করতেন তাহলে হয়তো এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতেন যে চলিত বাঙলা নাটকের ভাষা ছেড়ে এক আবেগে অন্তর্সত্বা নাট্যভাষা তিনি বিশ বছর বয়স থেকেই হাতড়াচ্ছিলেন। 'পথ: প্রতীক ও পটভূমি' বিষয়ক আলোচনায় শঙ্খ ঘোষ 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-এর প্রসঙ্গ এনে সেই সূত্রে 'বিসর্জন' 'অচলায়তন' আর 'রক্তকরবী' পর্যন্ত পৌঁছেছেন। সেখানেই তিনি দেখতে পেতেন 'ভগ্নহৃদয়' থেকে 'রক্তকরবী' পর্যন্ত ভাষারও পরিণতির সাধনা চলছে। সেই পরিণতির সাধনায় গদ্য আর পদ্য ব্যাপারটার একটা মূল্য আছে নিশ্চয়ই কিন্তু শুধুমাত্র "গদ্য" আর "পদ্য" বলে উল্লেখ করলে নাট্যভাষার জটিলতাটুকু অনাবশ্যক সরল হয়ে পড়ে।

অর্থাৎ আমি আরো একটা অনুমান করার দুঃসাহস করছি: রবীন্দ্রনাথও এই সময়ে আন্তর্জাতিক নাট্য আন্দোলনের শরিক হিসেবে সেই নাট্যভাষার সন্ধান করছিলেন যা ইবসেনের শেষপর্যায়কে প্রতীকের কাছে এনে দিয়ে বা দৈনন্দিন কথ্যভাষার নিকটতম হওয়া সত্ত্বেও চেহভের নাটককে কাব্য করে তুলে ইয়োরোপের নাটকের উনিশশতকি দায়-দায়িত্ব অস্বীকার করছিল আর বাঙলা নাটককে কৃত্রিম নাট্যভাষা ও নাট্য-সিকোয়েন্সের হাত থেকে বাঁচাচ্ছিল।

শঙ্খ ঘোষের অভিনিবেশ যদি এই অনুমানের উপর পড়ে তাহলে ১৮৮১ থেকে ১৮৯৭ পর্যন্ত রচিত রবীন্দ্রনাটকগুলি নতুন মর্যাদা পেতে পারে ও সেগুলির সঙ্গে ১৯০৭ সালের পর রচিত নাটকগুলির সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

৮। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' বা 'হাস্যকৌতুক'র কথা মনে রেখেও শঙ্খ ঘোষ বলেছেন "পরিহাসিকতার নিরাপদভূমি ছেড়ে গদ্যকে এখনো" অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ কাল পর্যন্ত, "রবীন্দ্রনাথ আনতে পারছেন না গূঢ়তর নাট্য প্রয়োজনে।" —এ-সিদ্ধান্তে আমিও একমত। কিন্তু এই প্রহসনগুলি সম্পর্কে আরো একটু বলবার আছে।

উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে সংস্কৃত আর ইংরেজি আদর্শের মধ্যে বাঙলা নাটক দুলছিল. অথচ তখন থেকেই প্রহসনেব ধাবায় খাঁটি বাঙালি নাট্যবিষয় তার নাট্য ভাষা নিযে তৈবি হচ্ছিল। মধুসূদনেব হস্তক্ষেপে ইংবেজি আদর্শ যদি জিতে না যেত আর তাবপবই যদি প্রায় সব বাঙালি নাট্যকাববাই রোমান্টিক ট্রাজেডি রচনায় লেগে না যেতেন তাহলে এই প্রহসনেব ধারা থেকে সামাজিক বাঙলা নাটকেব একটা ধারা যে তৈবি হতে পারত দীনবন্ধুব সাফল্য অন্তত সেই ইঙ্গিতই করছে। একমাত্র প্রহসনগুলোই খাঁটি বাঙালি বিষয় বলেই কি রবীন্দ্রনাথ সেই সময় 'গোড়ায় গলদ', 'বৈকুণ্ঠেব খাতা' লিখেছিলেন ও পরবর্তীকালে 'চিরকুমার সভা' 'বাঁশবী'কে তাহলে কি এই ধারাতেই বিচাব করা উচিত। রবীন্দ্রনাথের সব নাটকেই যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-প্রহসনেব একটা অংশ আছে তার কারণ কি এখানেই নিহিত? তাহলে ববীন্দ্রনাট্যভাষায় খাঁটি বাঙালি অন্যান্য উপাদানের মতো এই প্রহসনের ভাষারও কি একটা ভূমিকা আছে?

৯। রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাষা বিশ্লেষণ করার সময়ে শঙ্খ ঘোষ "অতি-অলঙ্কৃত" ধরনের উর্ধ্বগামিতা, "চাপহীন গদ্যের শিথিলতা", "বিপরীতক্রমে তুচ্ছতা-তুঙ্গতা" ও "স্তরান্বিত গদ্যের" ছবি এঁকে বলেছেন "সার্থকতাব চাবি লুকোনো আছে" শেষতম পথে। এই অতিপ্রয়োজনীয় অথচ এতোকাল উপেক্ষিত বিষয়টিকে আরো একটু বিস্তৃত কবার সুযোগ নিয়ে শঙ্খ ঘোষ যদি চেহভের নাটক প্রসঙ্গে স্তানিসলাভস্কি কথিত সাবটেক্সট বা উপপাঠের সূত্রটিকে এক্ষেত্রে ব্যবহার করতেন তাহলে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব নাটকেই প্রকৃতিপুঞ্জের যে একটি মুখর অংশ আছে তার ব্যাখ্যা মিলত। সেই সংলাপগুলোতেই তাঁর নাটক চরিত্র বা কাহিনীর বাইরে, মঞ্চের বাইরে একটা বিস্তৃতি পায়। শুধুমাত্র স্তরান্বিত গদ্যের মানে তারা উতরোবে না অথচ নাটকে গতিসঞ্চারে তাদের ধাক্কাটা নেহাতই প্রয়োজনীয়।

১০। 'কালের যাত্রা' প্রবন্ধটিতে শঙ্খ ঘোষ রবীন্দ্রনাটকে সময়ের ব্যবহার

নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ-আলোচনার মূল্য যে কতো বেশি তা মূল প্রবন্ধটি না পড়লে বোঝা যাবে না। কিন্তু নাট্যকালের মুক্তি প্রসঙ্গে আধুনিক নাট্যকারদের বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সার্ত্রের 'কন্‌ডেমড্ অব আলতোনা' নাটকটিকে একটু ব্যাখ্যা করেই যখন বলেন—"সময়ের দুই চলন একত্র জড়িয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক জটিল বিন্যাস. .এর মধ্য দিয়ে সার্ত্র বুঝে নিতে চাইছিলেন ব্যক্তি ও তাব পরিবেশের ডায়ালেকটিক্‌স—তখন কেমন যেন একটু সন্দেহ হয় নাটকেব আঙ্গিকেব এই আলোচনায় নাৎসীবাদের শিকার ফ্রান্‌ৎসের কাছে সময়ের অচলতা আব স্বাভাবিক বহতা সময়ের বৈপরীত্যকে কোনো ইতিহাস-নিবপেক্ষতায় নিয়ে যেতে চাইছেন কি তিনি। সার্ত্রর নাটকে সময়েব সমস্যাটা রবীন্দ্রনাটক থেকে একটু ভিন্ন ধরনেব নয় কি। প্রিস্ট্‌লেব বিখ্যাত 'টাইম-প্লেজ' এব একবার নামোল্লেখও যে কবলেন না শঙ্খ ঘোষ তার কাবণ নিশ্চযই প্রিস্ট্‌লের সময়েব ব্যবহার নিয়ে নাটুকে পবীক্ষা ববীন্দ্রনাথেব নাটকের বিষয়কে বিশেষ দেশকালের গণ্ডি ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার মানসিক অভিযানের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

মনের দিক থেকে তো রবীন্দ্রনাথ চিবকালই আন্তর্জাতিক আন্দোলনের শরিক, অভিজ্ঞতার দিক থেকে এই সময়েব বিদেশভ্রমণ তাঁকে ইয়োরোপীয় নাট্য আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ করে তুলেছিল। ফলে ১৯২০ সালেব পব বিশেষত জার্মানিতেই, নাৎসীবাদের অভ্যুত্থানের আগে, যন্ত্র-যান্ত্রিকতা-সর্বস্ব ধনিক-সভ্যতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ নাটকে এক্সপ্রেশনিজম ইম্প্রেশনিজম ইত্যাদি নানা আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে—স্বীকৃত সমালোচকদের মতেই তার সামান্য লক্ষণ ন্যাচারালিজমের বিরুদ্ধে "a profound view of life" আর "a different medium of expression". রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী'র পেছনে এই বিশেষ সময়ের তাগিদটাই ছিল প্রবল। 'কালের যাত্রা' আলোচনাটির অতুলনীয় ঐশ্বর্য সত্ত্বেও তাই আবার দুঃখ থেকে যায় এমন দুর্লভ সুযোগেও আমার জানা হলো না "যাতে সৃষ্টির সীমা নির্দেশ করে দেয়" সেই দেশ আর কালের কোন অপ্রতিরোধ্য চাপে রবীন্দ্রনাট্য সৃষ্টির সীমা নির্দিষ্ট হলো 'শারদোৎসব' থেকে 'রক্তকরবী'তে।

এই দেশ আর কালে কিভাবে যে একটি বিশেষ সময়ে তাঁর সৃষ্টির সীমা নির্দেশ করেছিল তার পক্ষে সামান্য একটি অনুমান নিবেদন করছি।

'ফাল্গুনী' নাটক কবি রচনা করেন ১৯১৫তে। ১৯১৬ সালের যে মাসে তিনি

জাপান ভ্রমণে রওনা হন। রবীন্দ্রনাথের নাট্যআঙ্গিকের উপর এই ভ্রমণের প্রভাব সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষ সিদ্ধান্ত করেছেন, "জাপানের অভিজ্ঞতা রবীন্দ্র-সাহিত্যে উদ্দীপক" "পরবর্তী নাট্যাবলিতে" ('মুক্তধারা', 'রক্তকরবী') "শিল্পীর সচেতন দৃঢ়মনস্কতায় গড়ে নিলেন সংহতি।"

আমি এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত। একমত নই জাপানের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষের অভিমত সম্পর্কে। শঙ্খ ঘোষ বলছেন জাপানের "জীবন-যাত্রা ও শিল্পনির্মাণের পরিমিত সংযমে" রবীন্দ্রনাথ "গভীর অভিভূত ছিলেন।" আমি অনুমান করি জাপানের সাম্রাজ্যবাদী লোভ, চীনের প্রতি তার ব্যবহার, বর্বর জাতীয়তাবাদ আর তারই বিপরীতে জাপানের "জীবনযাত্রা ও শিল্প-নির্মাণের পরিমিত সংযম" যে-ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত করেছিল, সেই যাত্রাতেই আমেরিকা সফর জাপানের সেই অভিজ্ঞতাকেই সমর্থন যুগিয়েছিল। দেশের ভেতরেও ১৯১৫ সনে পাওয়া স্যর উপাধি রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ সনেই ফিরিয়ে দিলেন।

অর্থাৎ জঙ্গি জাতীয়তাবাদের লোভের ভিতে দাঁড়ানো দুনিয়া জোড়া একটা যুদ্ধ যে দেড়শ বছর ধরে দেশকালের ক্রমঘনিষ্ঠতার সুযোগে সেই দেশকালকেই হাতের মুঠোয় রাখবার ষড়যন্ত্র আঁটছে আর তা যে ষড়যন্ত্রকে আরো বাড়িয়েই দিচ্ছে, ষড়যন্ত্রকেই মানবনীতির মর্যাদা দিচ্ছে—জাপান আর আমেরিকা ভ্রমণের এই অভিজ্ঞতাই, সনাতন জীবনাদর্শ যা মানবনীতিরই আর এক নাম, জঙ্গি জাতীয়তাবাদী জীবনাদর্শের সঙ্গে দ্বন্দ্বে মেতেছে এই বোধই ১৯১৬ সালের 'ফাল্গুনী'র পথ-ঘাট মাঠ-গুহার চতুর্বিধ দৃশ্যকে ১৯২২-এর 'মুক্তধারা'র পথে বা তারপর 'রক্তকরবী'র জালের বাইরে মিলিয়ে দেয়।

নইলে ব্যাখ্যা করা যাবে না মৌলিক নাট্যরচনায় ১৯১৬ থেকে ২২ এই দ্বিতীয় বিরতিকে—যে-বিরতির উল্লেখ শঙ্খ ঘোষ করেন নি। আমার অনুমানটি শঙ্খ ঘোষের আলোচনার পরিপূরণ হতে পারে মাত্র—এ-কথাটি বাহুল্য হলেও বলে রাখা নিরাপদ। কারণ রবীন্দ্রনাথের মতো শিল্পীর ক্ষেত্রে চর্চিত শিল্পরূপের কর্ম শিল্পগত ভাবে বিকাশের ব্যাপারটা (যে-ভাবে শঙ্খ ঘোষ দেখেছেন) ও ইতিহাসগত কালের স্বধর্মের দাবি পরস্পর সাপেক্ষ।

'অভিনয়' অংশটিতে শঙ্খ ঘোষ যে-আলোচনা করেছেন সে সম্পর্কে কোনো কথা বলবার-বা তুলবার অধিকার আমার নেই। মফঃস্বল বাসের অন্যতম

দুর্ভাগ্যে এই প্রযোজনাগুলি উপযুক্তভাবে দেখতে পাইনি। শঙ্খ ঘোষ নাটকের এ্যাকাডেমিক আলোচনায় অভিনয়কে যে মর্যাদা দিয়েছেন, কোনো যোগ্য সমালোচক সে-বিষয়ে তাঁকে যথার্থ স্বীকৃতি নিশ্চয়ই দেবেন।

শঙ্খ ঘোষ এমন একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন যা আমার মতো দুর্বল ও হীনশক্তি পাঠককেও উত্তেজিত করে ফেলতে পারে। আমরা তো শুধু আশাই করতে পারি শঙ্খ ঘোষ রচনাসংখ্যায় আরো অকৃপণ হন। তাঁর অকৃপণতা আমাদের পক্ষে যেমন আশীর্বাদস্বরূপ, বাঙলা সমালোচনা সাহিত্যের পক্ষেও তেমনি গৌরবজনক।

দুই

শ্রীঅশ্রুকুমার সিকদার রবীন্দ্রনাথের নাটকেব বিভিন্ন পরিবর্তনের তুলনামূলক আলোচনাব ভিত্তিতে 'রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তব ও ঐক্য' গ্রন্থটি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের নাটকের নানা রূপান্তর সম্পর্কে এতোদিন আমাদের একমাত্র ভরসা ছিল বিশ্বভারতী প্রকাশিত রচনাবলীর বা বিশেষ সংস্করণের গ্রন্থ-পবিচয় অংশ। অথচ রূপান্তরের ধরন সময় ও বিষয়বিশ্লেষণ ব্যতীত আমাদের পক্ষে ধারণা করাই অসম্ভব তিনি কোন অভিপ্রায় দ্বারা চালিত হচ্ছিলেন. কোন ইষ্ট তাঁর উদ্দিষ্ট ছিল। রবীন্দ্ররচনার ভেরিয়োরাম সংস্করণ প্রকাশেব উদ্যোগও কেউ নেন নি। নেবেন, এমন সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। কর্তাদের এমন সমবেত অকর্ম-কে অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর নিজের চেষ্টায় শোধরাতে চেয়েছেন। তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

গ্রন্থটিতে দুটি অংশ আছে। ২০৪ পাতা জুড়ে রবীন্দ্রনাটকের নানা রূপান্তরের পরিচ্ছেদে ভাগ করা আলোচনা আর ৫০ পাতার একটু বেশি জুড়ে রবীন্দ্র-নাট্যের ঐক্যসূত্রের অন্বেষণ।

সূচিপত্রের এই বিন্যাস থেকেই বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাট্য আলোচকদের কাছে ভবিষ্যতে বইটি কতো জরুরি।

জরুরি এই কারণে যে পাঠান্তরের এমন সঙ্কলন ইতিপূর্বে আর হয় নি। কিন্তু আমার একটু সন্দেহ হচ্ছে লেখক শুধু এই প্রয়োজনীয়তাটুকুই সাধন করতে চান নি। রূপান্তরের কারণও ব্যাখ্যা দেবার অতিরিক্ত দায়িত্বও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। ফলে বইটিতে একই সঙ্গে রূপান্তরের উদাহরণ ও বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য। অশ্রুকুমার সিকদার। গ্রন্থনিলয়। দশ টাকা

জায়গা পেয়েছে। তার ফল সব সময় ভালো হয় নি। দুটোর একটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লেখক যদি রূপান্তরের উদাহরণ ও পদ্ধতিটুকুই আলোচনা করতেন তাহলে সেই আলোচনা থেকেই রূপান্তরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য জরুরি সূত্রটা বেরিয়ে আসত। কিন্তু বর্তমান আলোচনার কোথাও কোথাও তিনি ব্যাখ্যা করে আমাদের সাহায্য করলেও কোনো সামান্যসূত্র তা থেকে বের হয় নি। (চতুর্দশ অধ্যায়েও হয় নি।)

ব্যাখ্যার সূত্র ছাড়া বিশ্লেষণ করতে গেলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় এর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। 'শেষের রাত্রি' গল্প আর 'গৃহপ্রবেশ' নাটকের সংলাপের তুলনীয় অংশ উদ্ধার করে অশ্রুকুমার সিকদার "একটি দুটি বাক্যে"র বর্জন বা "উচ্চারণ সৌকর্য" বা "কবিত্বের স্পর্শ" বা "মূল রচনার সংলাপ অংশের বিস্তার" ইত্যাদি দেখিয়েছেন। ফলে তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে নাটকে ডাক্তারের মতো তৃতীয় ব্যক্তির উল্লেখমাত্র নেই আর মাসি তাঁর দ্বিতীয় সংলাপেই একটা আয়রনি সঞ্চার করে দিতে পেরেছেন—যার জোরে মণির "নিজের অধিকার সম্বন্ধে" সচেতনতা ও "মাসির মিনতি"ও নাটকীয় সংঘাতের বিষয় হয়ে গেছে।

রূপান্তরের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অশ্রুকুমার সিকদার যখন বলেন "মুক্তধারার রণজিৎ ও বিভূতি একত্রে প্রায়শ্চিত্তের প্রতাপ" তখন বাক্যটির গঠন অন্যরকম হলেই মানাত ভালো ('প্রায়শ্চিত্ত'-এর প্রতাপ 'মুক্তধারা'য় রণজিৎ ও বিভূতি — এ-কথা ভেবেও চমকিত হই এই ইশারায় যে আসলে কি সাম্রাজ্যবাদের বেয়নেটের মাথায় উড্ডীন শিল্পবিপ্লবের গৌরব পতাকা— ভারতের ব্রিটিশ শাসনের এই চেহারাটা বোঝাবার চেষ্টাই চরিত্রকে ভাঙছে আর জুড়ছে আর ভাঙছে আর জুড়ছে। ঠিক তেমনি মনে হয়, 'প্রায়শ্চিত্ত'-এ যার পূর্বাভাসও ছিল না সেই শিক্ষার দৃশ্যটি 'মুক্তধারা'য় জুড়ে দেবার পেছনে অশ্রুকুমার সিকদার কথিত কারণগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষার আসল অভিজ্ঞতার তাড়া ছিল। ইতিহাসকে অশ্রুকুমার সিকদার রূপান্তর ব্যাখ্যার সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেন নি বলেই 'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'মুক্তধারা'র একটি বিশেষ অংশের সংলাপ তাঁর কাছে মনে হয়েছে "প্রায় অপরিবর্তিত", "মুক্তধারার এই সংলাপ প্রায়শ্চিত্তের সংলাপেরই প্রায় অবিকৃত রূপ" (পৃঃ ৫৩-৫৪)। অথচ এই অংশেই বৈরাগী 'প্রায়শ্চিত্ত'-এ বলছে "আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়" আর 'মুক্তধারা'য় তার সঙ্গে যোগ করছে "আমার উদ্বৃত্ত অন্ন তোমার, ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়।" প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা, উদ্বৃত্ত অন্নের

অধিকার নিয়ে ব্যক্তি আর সমাজের নব কুরুক্ষেত্রের লোকশ্রুতি ছাড়া বৈরাগীর মুখ দিয়ে 'মুক্তধারা'য় কি অবধারিত ঐ অংশটি বেরতে পারত।

'রাজা' থেকে 'অরূপরতনে'-র পেছনে অশ্রুকুমার সিকদার একটি কারণের উল্লেখ করেছেন — "সংক্ষিপ্ত অভিনয়যোগ্য রূপ" (৬১ পৃষ্ঠা)-এর প্রয়োজন। 'রাজা'র দৃশ্যগুলি কি ভাবে 'অরূপরতন'-এর দৃশ্যে পরিণত হয়েছে তারও একটা তালিকা তিনি দিয়েছেন। এই "পুনর্বিন্যাস কি শুধুমাত্রই অধিকতর রূপকপ্রবণতার দিকে নজর রেখে" করা? একটা কারণ এটা তো বটেই। আরো একটা কারণ বোধহয় এই যে রাজা সর্বাতিশায়ী ও সর্বব্যাপ্ত ছিলেন, 'অরূপরতন'-এ সুদর্শনার সঙ্গে সম্পর্কটাই তার প্রধান কেন্দ্র। তাই জনতার বা গানের দলের বা মেয়েদের কথাবার্তায় 'রাজা'তে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পেরেছে 'অরূপরতন'-এ তা পুষিয়ে দিতেই ভাষার স্পন্দন দ্রুততর।

এই প্রসঙ্গেই বলে রাখা ভালো 'রাজা' নাটকের পরবর্তী রূপান্তর 'শাপমোচন' গদ্যকবিতা ও 'কথিকা'র ভাষাগত যে-আলোচনা (৬৭ পৃষ্ঠা) অশ্রুকুমার সিকদার করেছেন তা আমি ভালো বুঝে উঠতে পারি নি। 'শাপমোচন' গদ্যকবিতার পর্ব যেমন করে তাঁর কানে ধরা পড়েছে তেমনি করে 'কথিকা'র গদ্যের পর্বভাগও কি ধরা পড়তে পারে না, বা রবীন্দ্রনাথের প্রায় যে-কোনো গদ্যরচনার। মনে হয় ঠিক এভাবে বুঝি কবিতা ও 'কথিকাটি'র পার্থক্য ধরা যাবে না। যেমন এই একই প্রসঙ্গে ৬৮ পৃষ্ঠায় একটি স্তবকের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে লেখক উত্তম ও প্রথম পুরুষের ব্যবহার পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন, "দেখা যায়" ক্রিয়াপদটির ধ্বনিসাম্য কী ভাবে রক্ষিত হয়েছে তাও বলেছেন — কিন্তু দৃষ্টান্ত-অলঙ্কারের আড়াল দেয়া কবিতার দুটি স্বতন্ত্র বাক্য 'কথিকা'য় কী অবলীলায় একবাক্যে ক্ষিপ্র নিদর্শনা হয়ে ওঠে আর শেষে উৎপ্রেক্ষার চমক আনে সেটি তিনি ব্যাখ্যা করেন নি।

তার কারণ আলোচনার মেথডটা আগে ঠিক হয়নি। তাই রূপান্তরের উদাহরণ আছে কিন্তু রূপান্তরের ফলে সামগ্রিক আঙ্গিকের কী পরিবর্তনটা ঘটল তা সমালোচক আলোচনা করেন নি। তাতে আমাদের কতকগুলি জিজ্ঞাসার উত্তর পাব আশা সৃষ্টি হয়, কিন্তু উত্তর মেলে না।

চতুর্দশ অধ্যায়ে লেখক রূপান্তরের সূত্রের সন্ধান করেছেন বটে কিন্তু সেখানে নাটকের সমগ্রতা নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌছেছেন বলেই স্বতন্ত্র নাটকগুলির বিশ্লেষণের ওপর তার একটা গভীর প্রভাব পড়ে নি।

বিভিন্ন আলোচনা থেকে পৌঁছানো সিদ্ধান্তের বদলে ওখানে আমরা অন্ত পরিচ্ছেদগুলির সংক্ষিপ্তসার পাই। রূপান্তরের ফলে "পরবর্তীরূপে আকারগত পুনর্বিন্যাস এবং সংক্ষিপ্তির ফলে এসেছে ঘনত্ব এবং সংহতি, ফলে পরবর্তী রূপে আঙ্গিকগত উন্নতি ঘটেছে নিঃসন্দেহে।" বা "রবীন্দ্রনাট্যের রূপান্তরের অর্থ, পরবর্তীরূপে রূপক বা প্রতীকধর্মের, তাত্ত্বিকতার, বিমূর্ততার প্রাধান্য লাভ" — এই ধরনের সিদ্ধান্ত অশ্রুকুমার সিকদারের এতো তথ্য ও ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ বইয়ের পক্ষে একটু সরল। আমরা বরং চাইছিলাম প্রতিটি নাটকের প্রতিটি রূপান্তরের বিষয় ও আঙ্গিক ব্যবহারের পার্থক্যের বিশ্লেষণ থেকে কোনো সিদ্ধান্তের দিকে আমাদের তিনি উন্মুখ করে দেবেন।

তাঁর গ্রন্থটি পাঠ করে অশেষ উপকৃত আমি আজ নিঃসন্দেহ হয়েছি ছাত্র-পাঠ্যতার চৌহদ্দি পেরিয়ে রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনা তাঁদেরই হাতে সাবালকতা পাবে। পাবেই।

সার্থক জনম মাগো

নবারুণ ভট্টাচার্য

অনেকক্ষণ সিগারেট না খেলে মুখটা কেমন টক টক লাগে। কাঠের পুল পার হয়েই বাস স্টপের কাছের পানের দোকান থেকে সে একটা চারমিনার কিনল। তারপর দড়িটা থেকে ধরাল। দুটো ফুলকি উড়ে যেতে দেখল আর মুখটা তুলে ধোঁয়া ছাড়তেই চোখ পড়ল বিরাট কৃষ্ণচূড়ার আকাশ ঢাকা মাথায়। এই গাছটাকে সে অনেকবার দেখেছে। বৃষ্টি পড়লেই কেন জানিনা গাছটার কথা মনে পড়ে। রুক্ষ লালচে একমাথা চুল ভিজছে। গত রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়নি। কারণ একই ঘরে অন্য বিছানায় দাদা সারারাত কেশেছে। গত বছর নিউমোনিয়া হয়েছিল। জ্বর কমে যাবার পর দেখা গেল দুটো হাত উঠছে না, গেলাস ধরতে পারছে না। হাতদুটো দিন দিন সরু হয়ে যাচ্ছে। গত দু-মাস ধরে দাদাকে রোজ সকালবেলা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। ওখানে ওরা ইলেকট্রিক শক দেয়। দিনচারেক যাওয়া হয়নি। অল্প অল্প জ্বর আর কাশি। তার ওপর শহরতলীর যা অবস্থা।

রায়দের ইঁট-সুরকির দোকানের সামনে বাঁশের ওপর দরমার গায়ে পার্টির কাগজ লাগানো আছে। একবার দাঁড়িয়ে দেখল। ফুলের মালা গলায় একটা লোকের ছবি। তার পাশে আরো কয়েকজনের মুখ। লোকটা হাসছে। জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। নিচে আর একটা ছবি, মিছিলের। ছাপার কালি কম-বেশি হয়ে গেছে। ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া মুখ। ফেস্টুনটার ওপরে কি লেখা তাও পড়া যাচ্ছে না। আর পড়তে ভালো লাগল না। সামনের দিকে হাঁটতে লাগল। ছায়াটা সামনে রাস্তায় লুটোচ্ছে। ইস্কুলের গলির মোড়ে একটা ভ্যান দাঁড়িয়ে। ফুটবল মাঠে গত পরশুদিন সকালে বিনয়বাবুর ছেলে যতীনের লাশ পাওয়া গেছে। স্ট্যাব করে রাত্তিরে ফেলে দিয়ে গেছে। হিমে পড়ে থাকার জন্যে জামাটা নাকি সপসপে ভিজে ছিল। সে ভাবল, যতীনকে সে কতটা চিনত? বন্ধুকে লোকে যতটা চেনে। কারা মেরেছে কিছুতেই ভেবে পায় না। নিজের পার্টি মারলে ও জানতে পারত। নিজের পার্টির সব খবরই ওর জানা। পয়সা

তোলার ক-টা টিন থেকে ক-খানা পাইপগান—সবকিছু। যতীনকে কারা মারল তবে? কেন?

পুলিশভ্যানটা একদম চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভ্যানটার সামনে বাঁদিকের দরজাটা খোলা। বাইরে পা-দানির ওপর বুট পরা পা বার করে একটা সার্জেন্ট খবরের কাগজ পড়ছে। বেল্টের সঙ্গে ঝোলানো রিভলভার। পেছনের জানালা দিয়ে একটা বন্দুকের নল আকাশের দিকে বেরিয়ে আছে। কয়েকটা শুকনো মেঘ। রাস্তায় শুকনো ধুলো। দু-একটা মাছি বসে আছে রোদ্দুরে, ওর পা দুটো এগিয়ে যেতে উড়ে গেল। সিগারেটের শেষের দিকে তামাকটা হু হু করে জ্বলে যায়। কৃষ্ণচূড়া গাছের উল্টোদিকে যতীনদের পার্টি অফিস। তালা লাগানো। এখানেও একটা দরজার ওপর ওদের কাগজ লাগানো আছে। ভালো করে আঠা লাগায়নি বলে ওপরের কোণটা খুলে লটকে রয়েছে। ওর একটু মজা লাগল। রাস্তাটা বড় খালি খালি। ধারে সাইকেল-রিক্সাগুলো দাঁড় করানো আছে। কৃষ্ণচূড়ার নিচে চায়ের দোকানের গায়ে একটা সাইকেল দেখল। অজয়দার সাইকেল। অজয়দা ওকে ডাকল।

—"খোকন, তর দাদায় কেমন আছে রে?"

—"ভালই।"

—"আইজ একবার সন্ধ্যাকালে পার্টি অফিসে আসিস, কাম আছে।"

অজয়দা সাইকেল চালাতে শুরু করেই হঠাৎ পা বাড়িয়ে সাইকেল থামিয়ে দেন।

—"আর শোন, যতীনের বদলা হিসাবে অরাও একটা ধান্দায় আছে। সাবধানে থাকিস।"

অজয়দার সাইকেল তর তর করে চলে গেল। ফাঁকা রাস্তায় বেল বাজাবার দরকার হয় না। কলোনির দিক থেকে বেলের শব্দ ভেসে এল।

বদলা? রেশন অফিসের দেওয়াল জুড়ে বিরাট পোস্টার "কমরেড যতীন সরকারের হত্যার বদলা আমরা নেবোই।" ও একবার তাকাল। ওদের পার্টির কাউকেই সকাল থেকে চোখে পড়েনি। যতীন তারও বন্ধু ছিল। এই তো সেদিন দাদাকে দেখতে এসেছিল। যাবার সময় বলে গেল হাসিমুখে—"তগো পার্টিতে এইবার টাটা-বিড়লা জয়েন দিব রে খোকন।"

—"কেন? তগো পোলিটবুরোতে আর রাখবি না?"

সেই শেষ দেখা। যতীনের নামে এখন কত পোস্টার, কত ভয়। যারা

চিনত না তারাও জেনে গেল। নিজেই দেখে যেতে পারল না।

রাস্তায় শুকনো কাদার ওপর জিপের চাকার খোবলানো দাগ। আজকাল খুব পুলিশ যাতায়াত করছে। গতকাল বাজারের মোড়ে পুলিশ পিকেটের ওপর বোমা পড়ে, পুলিশ দু-রাউণ্ড গুলিও চালিয়েছে। বড় অস্থির সময়। রোজ শালা একটা না একটা কিছু লেগেই আছে। দোকান-পত্তর খোলার কোনো ঠিক নেই। একবার ভাবল মিঠুদের বাড়িটা ঘুরে যাবে, বলে যাবে পড়াতে আসবে না। আবার মনে হলো, থাকুক। মিঠুকে দেখতে ওর একটু ইচ্ছে করল, আর সেই সঙ্গে একটু লজ্জাও লাগল। না গেলেই বুঝতে পারবে কোন কারণে আসেনি। মিঠুর মা দাদার কথা রোজ জিজ্ঞেস করে! দাদাই তো আগে মিঠুকে পড়াত। দাদাটার কথা ভাবলেই বুকের মধ্যে ভারী ভারী ঠেকে। হাতদুটো পড়ে যাবার পর থেকে কথা বলাও কেমন থামিয়ে দিয়েছে। সারাক্ষণ ছাতের বা দেওয়ালের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সকালবেলা হাসপাতালে যাবার সময় হাতদুটো বুকের কাছে জড়ো করে একটা চাদর দিয়ে জড়িয়ে ঝুলিয়ে বেঁধে দেয়। দাদাকে সবাই ভালোবাসত। মা বলে—"ভাল যে, হে-ই শুইয়া থাকলো। আর এইডার মুখখান একবার দেখ—কি? না পার্টি করে! পার্টি করে! উড়নবাইড়্যা ছাওয়াল, তরে দিয়া পার্টির কি হইব?" ডাক্তার বলে ভালো ভালো জিনিস খেতে দিতে। কোথা থেকে আনবে ভালো ভালো জিনিস? অথচ বাজারে, দোকানে, থরে থরে সাজানো আছে। স্টেশনে, বাসে, ট্রামে সব জায়গায় বিজ্ঞাপন। পাঁউরুটি, মাখন, দুধ, ওষুধ—কত রকমের ছবি! বুক ভরা শুকনো ধোঁয়া। নিজের হাতদুটো দাদার মতো সরু সরু না হলেও কেমন পিছমোড়া করে বাঁধা আছে। একটা বিরাট আগুন জ্বলে উঠতে পারে না? বাতাসে ছাই উড়ছে। চিতাভস্ম। মনে পড়ে অনেক দিন আগে স্বচক্ষে দেখা একটা ঘটনা। কলোনিতে একটা লোক তিনমাস ছাঁটাই হয়ে থাকার পর নিজের দুটো বাচ্চাকে বিষ দিয়েছিল। বৌটা আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। বাচ্চা দুটোকে আবছা দেখা যায়। মুখের কষ বেয়ে নীলচে ফেনা, আর শক্ত হয়ে গিয়েছিল। লোকটাকে যখন পুলিশ ঘর থেকে টেনে বার করল তখন সে হা হা করে হাসছিল। এক বুড়ো স্টেশনে লেভেল ক্রসিং-এর কাছে ইঁদুর-আরশোলা মারা বিষ বিক্রি করে। খিনখিনে গলায় একটানা চেঁচিয়ে যায়—"খাবে মরবে, খাবে মরবে, খাবে মরবে···।" চিৎকারটা শুনলেই বাচ্চা দুটো ভেসে ওঠে। লোকটার জেল হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার

গরাদের আড়ালে বোধহয় এখনো সে বীভৎস গলায় হাসছে। স্পষ্ট শোনা যায়।

মাথা নিচু করে চলতে চলতে দোকানটা ও ভুল করে ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। দোকানটা বন্ধ। দোকানের রকে দুটো লোক ঘুমোচ্ছে। বড় গরম। ড্রেন দিয়ে কালো জল ভেসে যাচ্ছে, আর জমাট কালো শ্যাওলা। সেই দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থাকল। নিশ্বাস থমকে থাকে কিছুক্ষণ। যতীনটা···

সন্ধ্যেবেলা পার্টি অফিসে যাবার সময় বাজারের বড় ওষুধের দোকানে একবার খোঁজ নেবে ঠিক করল। কি কাজ জানা নেই, তাড়াতাড়ি শেষ হলে মিঠুদের বাড়িটাও একবার ঘুরে যাওয়া যাবে। খুব খিদে পেয়েছে। তবু একটু ভালো লাগছে। ফিরে যেতে ভালো লাগছে। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

উঃ কি রোদ্দুর! ঘামে শার্টটা ভিজে পিঠে আটকে যাচ্ছে। পুজোর আগে যে করে হোক একটা চটি কিনতে হবে। জিভটা শুকনো। পাশ দিয়ে একটা সাইকেল গেল। লোকটা সাদা জামা পরা। সন্ধ্যেবেলা মিঠুকে দেখলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। কেমন করে?

কাঠের পুলে উঠতে নিজের পায়ের শব্দটা জোরে বাজে। জলে স্রোত আছে, খুব কম। ঘোলা জলে রোদ্দুর চিকমিক করছে। কানা খাল।

এত রোদ্দুরে লোহার রেলিং-এ হেলান দিয়ে কারা দাঁড়িয়ে? এগিয়ে যেতেই রাস্তা আড়াল করে তিনটে ছেলে দাঁড়ায়। রোদ্দুর আছড়াচ্ছে মাথার ওপর। কাঠের পুলটা দুলছে। তিনজন একটু এগিয়ে আসে। মুখোমুখি। তিনজন পকেটে হাত দেওয়া, আর ও একা। দাঁত দিয়ে অসম্ভব ভয়টাকে আটকে রাখা যায় না।

—"যাইতে দে লক্ষ্মণ, ভাল হইব না"

—"যতীনরে একা পাইয়া খুব মারলি"

—"আমি মারি নাই"

—"তুই না মারস, তর পার্টি মারছে"

পার্টি? সামনের রোদ্দুরের মধ্যে একটা ঝিলিক দেখা যায়। হাতদুটো নিজের অজান্তেই খালি পকেটের দিকে ছিটকে যায়। হাতদুটো সরু সরু আর পিছমোড়া করে বাঁধা।

আ —া —া —া —

পেটের এ-পাশ থেকে ও-পাশ একবারে টেনে দিয়েছে। সমস্ত শরীরে ধাতব মৃত্যুর স্বাদ। রক্তমাখা একটা চিৎকার আকাশে লাফিয়ে ওঠে। দেহটাকে

রেলিং টপকে কারা জলের মধ্যে ছুঁড়ে দেয়। দৌড়বার শব্দ অস্পষ্ট হয়ে যায়। কাঠের পুলটা দুলছে। ঘোলাজল বিচিত্র লাল হয়ে যায়। অনেক তরঙ্গ বৃত্ত আলোগুলোকে ছুঁতে ছুঁতে মিলিয়ে গেল।

একটি মানুষের দেহে পাঁচ লিটারের কিছু বেশি রক্ত থাকে। বিকেলের আগে তারই কিছু চিহ্ন লোকে কাঠেব পুলেব ওপর দেখেছিল। একটু ক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল নিচের জলে উপুড় হয়ে ভাসছে। কচুবিপানা আর পঞ্চাননের মন্দিরের ভেসে আসা ফুলের মধ্যে। বাঁশ দিয়ে ঠেলে ঠেলে লাশটাকে ধারে আনে পুলিশ। কাঠের পুল, খালপাড় ভেঙে পড়ল লোকে।

পরদিন সকাল্ বেলাই সবাই দেখল বেশন অফিস, ইস্কুলের পাঁচিল, বাজার সব পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেছে।

"কমরেড খোকন দাসের হত্যার জবাব নয়, বদলা চাই"।

যারা চিনত না, তারাও জেনে গেল! নিজেই শুধু দেখে গেল না।

ভারতে কৃষি-অর্থনীতির বিবর্তনের সমস্যা প্রসঙ্গে

রণজিৎ দাশগুপ্ত

শারদীয় 'পরিচয়'-এ শ্রীকল্যাণ দত্তর 'ভারতে কৃষি-অর্থনীতির বিবর্তনের সমস্যা' শীর্ষক নিবন্ধটি পড়লাম। তিনি যে আমার 'অর্থনৈতিক বিবর্তনের সমস্যাবলী: ভারত-বিষয়ক আলোচনা' বইটি মনোযোগের সঙ্গে পড়ে তার অন্যতম একটি দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন এজন্য আমি তাঁর কাছে ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ।

তবে কল্যাণবাবু শুধু আমার নয়, ভারতের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিতে যাঁরা আগ্রহান্বিত তাঁদের সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রকৃতি বিচারে এবং বিপ্লবী সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত নির্ণয়ে মার্কসবাদী মহলে গুরুতর রকমের মতভেদ, বিতর্ক ও বিভ্রান্তি রয়েছে। এই অবস্থায় কল্যাণবাবু মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষি-অর্থনীতির প্রসঙ্গে এমন কতকগুলি বিষয়ের অবতারণা করেছেন যা শুধু কৃষি-অর্থনীতির নয়, সমগ্রভাবে ভারতীয় অর্থনীতিরই সুষ্ঠু মূল্যায়নের প্রসঙ্গে খুবই মূল্যবান। আর এই-জাতীয় আলোচনায় মার্কসীয় চিন্তাধারা ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতিকে ব্যবহার ও প্রয়োগ করলে আমরা যে খুবই লাভবান হতে পারি সেটাও তাঁর রচনা থেকে স্পষ্ট।

আমি নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সজাগ থেকেও বইটি লেখার কাজে হাত দিতে সাহসী হয়েছিলাম এই কথা ভেবে যে এটি এ-বিষয়ে আলোচনা, আরও চর্চা, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, তর্ক-বিতর্ক ও মতামত বিনিময়কে উদ্দীপিত করবে। এরকম আশা করাটা যে অযৌক্তিক হয়নি শ্রীকল্যাণ দত্তর লেখা তার প্রমাণ। এই সঙ্গে একথাও নিশ্চিতভাবে আশা করা যায় যে, এই সব আলোচনা আমাদের চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে আরও নির্দিষ্টতা ও স্বচ্ছতা এনে দেওয়ার ব্যাপারে খুবই সহায়ক হবে।

২। বাস্তবিকপক্ষে কল্যাণবাবু আমার কাজের কয়েকটি ত্রুটিকে খুব যুক্তিসঙ্গতভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন। এক, আমার বইতে Otrabotki প্রথার বিষয়ে

লেনিন যা বলেছেন তার কোনো উল্লেখ নেই এবং হাল-বলদ ও চাষের অন্যান্য উপকরণের মালিক এমন বর্গাদার ও কোনো উৎপাদন-উপকরণেরই মালিক নয় এমন বর্গাদার—এ-দুয়ের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্যকে না দেখিয়ে একাকার করে দেখানো হয়েছে।

দুই, খাদ্যশস্য দাদন দেওয়ার ফলে বাজার সঙ্কুচিত হচ্ছে—আমার এই বক্তব্য সম্পর্কেও কল্যাণবাবুর সমালোচনা ন্যায়সঙ্গত।

তিন, লেনিনের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি ভোগের পরিমাণ আর ক্রয়ের পরিমাণের মধ্যে যে-পার্থক্যের কথা বলেছেন, তাও আমার কাছে গ্রহণযোগ্য।

চার, তাঁর মূল বক্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ দ্বিমত পোষণ করা সত্ত্বেও আমার পক্ষ থেকে একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, ভারতীয় কৃষিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের মাত্রা ও গুরুত্ব আমার লেখায় যথোপযুক্ত স্বীকৃতি পায়নি।

৩। কিন্তু কল্যাণ দত্ত তাঁর প্রবন্ধে যে মূল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থিত করেছেন তার সঙ্গে আমার মতভেদ মূলগত প্রকৃতির। তিনি মার্কস ও লেনিনের উদ্ধৃতির সাহায্যে ও নানা তথ্য সংগ্রহ করে যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তার সারকথা হলো, এদেশের কৃষি-অর্থনীতিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশ শুধু যে ঘটছে তা নয়, সে-বিকাশ কার্যত ঘটে গেছে। প্রবন্ধটির গোড়ার দিকে তিনি অবশ্য সতর্কতার সঙ্গে বলেছেন "... এখনও বলার সময় হয়নি যে ভারত পুরোপুরি একটা পুঁজিতান্ত্রিক দেশে পরিণত হয়েছে।" কিন্তু তিনি আসলে যে-কথা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন তা হলো এর বিপরীত অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক বিকাশ মূলত সম্পূর্ণ হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে তাঁর বাইশ পৃষ্ঠার প্রবন্ধে প্রাক-ধনতান্ত্রিক শোষণের অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক ব্যাপারী ও মহাজনী শোষণের অবশেষগুলির কোনো তাৎপর্যের স্বীকৃতি তো দূরের কথা এরকম অবশেষ যে আদৌ রয়েছে তার সামান্যতম উল্লেখও নেই। বস্তুতপক্ষে এঙ্গেলসের অনুসরণ করে বলা যেতে পারে, কল্যাণবাবুর ভুল হচ্ছে এই যে, তিনি 'historical tendency' অর্থাৎ এক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রবণতা আর 'accomplished fact' অর্থাৎ এই প্রবণতার সম্পূর্ণ পরিণতিলাভ —এ দুয়ের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ সীমারেখা রয়েছে তা লক্ষ্য না করে এদের গুলিয়ে ফেলেছেন। ভারতের কৃষি-অর্থনীতি যে বর্তমানে একটি পরিবর্তনশীল বা transitional পর্যায়ে রয়েছে তারও কোনো পরিচয় তাঁর লেখায় নেই।

৪। শুধু তাই নয়, কল্যাণবাবু যে-বক্তব্যটিকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন তা

হলো, ভারতের কৃষিতে ধনতন্ত্রের কোনো বিকাশ ঘটছে না, এখানে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক, বিশেষত সামন্ততান্ত্রিক শোষণ অক্ষুন্ন রয়েছে, এমন কি তা শক্তিশালী হচ্ছে। কিন্তু সুস্পষ্টভাবেই আমি বলতে চাই যে, এটি অন্য কারুর বক্তব্য হতে পারে, তবে অন্তত আমার নয়। আমি সবিনয়ে উল্লেখ করতে চাই যে, কল্যাণবাবু আমার বক্তব্যকে যথাযথভাবে উপস্থিত করেননি। এ-কারণেই আমার মূল বক্তব্যটিকে সংক্ষিপ্ত আকারে 'পরিচয়'-এর পাঠকদের কাছে পেশ করার প্রয়োজন আমি বিশেষভাবে বোধ করছি।

আমার মূল বক্তব্যটি তাহলে কি? ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি একটি পরিবর্তন প্রক্রিয়ার বা Transition-এর মধ্যে দিয়ে চলেছে। স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে যে, আধা ঔপনিবেশিক, প্রাক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে উত্তরণের স্তরে ভারত রয়েছে এবং এই উত্তরণ প্রক্রিয়া এখনও তার পরিণতি লাভ করতে পারেনি। সমগ্রভাবে ভারতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে মজুরী-শ্রম শোষণের ভিত্তিতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন বন্দোবস্ত এখনও তার সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। সে কারণেই ভারতীয় অর্থনীতির বর্তমান অসুবিধা ও সঙ্কটকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-বন্দোবস্তের সঙ্কট বলে অভিহিত করা যায় না। বাস্তবিকপক্ষে যে-সঙ্কট আমরা প্রত্যক্ষ করছি তা হলো পশ্চাৎপদতা থেকে উত্তরণ প্রক্রিয়াজাত সঙ্কট, তবে এই উত্তরণ ঘটছে ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে।

তবে, ধনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটছে শুধু এইটুকু বলা যথেষ্ট নয়। কল্যাণবাবু অবশ্য কেবলমাত্র এইটুকুই বলেছেন। কিন্তু ভারতে ধনতন্ত্রের বিকাশ প্রাক-ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক ও সামন্ততন্ত্রকে কি আংশিকভাবে ক্ষুণ্ণ করছে, না, পুরোপুরি ভেঙে ফেলছে? ধনতন্ত্রের বিকাশ কি যথেষ্ট প্রবল, দ্রুত ও সতেজভাবে চলছে? এখানে ধনতান্ত্রিক বিকাশের নিজস্ব কোনো বৈশিষ্ট্য রয়েছে কি? ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশের পাশাপাশি প্রাক-ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক বা তার অবশেষ টিকে থাকছে না তো, এবং তা টিকে থাকলে ধনতান্ত্রিক বিকাশকে কতটা ও কিভাবে প্রভাবিত করছে? এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ব্যাপারে মার্কস কথিত ধনতান্ত্রিক বিকাশের 'দুই পথ' সংক্রান্ত তত্ত্ব বিশেষ সহায়ক। মার্কসের তত্ত্বটি কি? ব্রিটেনে ধনতন্ত্রের বিকাশ আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কস 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয় ভল্যুমে সিদ্ধান্ত করেছেন: "The transition from feudal mode of production is two fold The producer becomes merchant

and capitalist·· .This is the really revolutionary way. Or else, the merchant establishes direct sway over production....This system presents everywhere an obstacle to the real capitalist mode of production.. without revolutionizing the mode of production, it only worsens the condition of the direct producers, turns them into the wage-workers and proletarians under conditions worse than those under the immediate control of capital, and appropriates their surplus labour on the basis of the old mode of production".

প্রথম পথের অর্থ হচ্ছে প্রাক-ধনতান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপগুলির forms) ও বণিকী অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অবসান কিংবা চূড়ান্ত ধ্বংস সাধন এবং শিল্প-পুঁজি কর্তৃক মজুরি-শ্রম শোষণের ভিত্তিতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন বন্দোবস্তের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা।

আর দ্বিতীয় পথের সারকথা হচ্ছে শোষণের অর্থাৎ উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাৎ করার একাধিক রূপ ও পদ্ধতির সংমিশ্রণ। এগুলি হলো: (ক) অর্থনীতি বহির্ভূত অর্থাৎ সামাজিক-রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ও জবরদস্তি প্রয়োগ করে absolute rent আদায়ের সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতি, (খ) profit-on-alienation অর্থাৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাইরে, পণ্য ও অর্থ সঞ্চালন প্রক্রিয়ার ভিতরে বাজার, দাম ও ঋণদান ব্যবস্থার নানা মারপ্যাঁচ করে বণিকী (mercantile) ও মহাজনী (usurious) শোষণ, এবং (গ) উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করার ধনতান্ত্রিক রূপ। এই দ্বিতীয় পথে ধনতান্ত্রিক বিকাশের অন্তর্বস্তু হলো উদ্বৃত্ত শ্রম আহরণের এই তিনটি রূপের সঙ্গে জড়িত স্বার্থ সমূহের প্রতিক্রিয়াশীল মৈত্রীবন্ধন।

প্রথম পথের, নিচের থেকে উৎপাদক-মালিকদের উদ্যোগে প্রাক ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক ও একচেটিয়া বণিকদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে একেবারে গোড়া ঘেঁষে বুর্জোয়া বিপ্লব এবং এরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রাজনৈতিক গণতন্ত্রের বিকাশের দৃষ্টান্ত ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর প্রাক-ধনতান্ত্রিক সম্পর্ককে অংশত বজায় রেখে, তার সঙ্গে আপস করে, উপর থেকে একচেটিয়া বণিকদের উদ্যোগে শিল্পের বিস্তার ও সামন্ত-জমিদারদের ধনতান্ত্রিক জমিদারে রূপান্তরের এবং প্রথম পথের তুলনায় অনেক বেশি মন্থর, যন্ত্রণাদায়ক, স্বৈরাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল এই দ্বিতীয় পথে ধনতান্ত্রিক বিকাশের দৃষ্টান্ত মেইজি বিপ্লব

পরবর্তী জাপান, বিসমার্কের জার্মানি ও স্টালিনের রাশিয়া। আমাদের দেশের ধনতান্ত্রিক বিকাশের ক্ষেত্রেও এই দ্বিতীয় পথের অনেক লক্ষণ ও উপাদান প্রবলভাবেই বর্তমান।

৬। অবশ্য এই দ্বিতীয় পথের লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য সব দেশে হুবহু এক নয়—কেননা এগুলি নির্ভর করে সে-দেশের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিস্থিতির উপর। তাই ভারতের ক্ষেত্রে যা লক্ষণীয় তা হলো যে উপরে উল্লিখিত তিনটি শোষণ-রূপের সঙ্গে চতুর্থ আর একটি রূপ—পরিণত ধনতান্ত্রিক অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী বা নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ যুক্ত হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ভারতের বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সামান্যীকরণ করে আমার বইতে বলা হয়েছে, "The socio-economic situation contains an amalgam of pre-capitalist—semi-feudal and mercantile-usurious—, capitalist, and mature or highest stage of capitalist (i.e.imperialist) methods of exploitation. At the same time, the interests and forces corresponding to the pre-capitalist and mature capitalist methods of exploitation on the one hand and the capitalist on the other are struggling to establish their respective supremacy over the socio-economic life of the country. Planning has strengthened some of these forces, given birth to new types of privileged interests and intensified the clash of interests . In the process new alliances are being forged and wider social conflicts are arising. The resultant is the collapse of the capitalist path of development leading to acute tension and cleavages as well as political instability within the Indian society." (পৃষ্ঠা ১১৩)। অর্থনৈতিক বিকাশের এই জটিল প্রক্রিয়াটির বিশদ আলোচনা ও নানা দিক থেকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে আমার বইতে।

৭। উপরে উল্লিখিত এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারতে কৃষি-অর্থনীতিরও বিবর্তনের প্রকৃতিকে বোঝার ও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। কল্যাণবাবুর লেখাতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে আমি কৃষিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশ যে ঘটেছে তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছি। কিন্তু এ-রকম অস্বীকৃতির প্রশ্ন আদপেই

ওঠে না এই কারণে যে আমার বিবেচনায় কৃষিতেও প্রধানত 'দ্বিতীয় পথে' বা লেনিন কথিত 'প্রুশীয় পথে' অর্থনৈতিক বিবর্তন ঘটছে। কিন্তু 'দ্বিতীয় পথ' বা 'প্রুশীয় পথ' তো ধনতান্ত্রিক বিকাশেরই পথ, এই পথের অর্থ তো কখনোই প্রাক-ধনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকা কিংবা সাধারণভাবে আরও শক্তিশালী হওয়া নয়। তবে ভারতের বিশিষ্ট পরিস্থিতিতে **এই 'দ্বিতীয় পথে' ধনতান্ত্রিক বিকাশের অন্তর্বস্তু হলো প্রাক-ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের নানা অবশেষে—সামন্ততান্ত্রিক ভূমি সম্পর্কের ব্যাপক ও শক্তিশালী অবশেষ এবং ব্যাপারী ও মহাজনী শোষণ পদ্ধতি—এবং প্রসারমান ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের সংমিশ্রণ**। কল্যাণবাবু মনে হয় 'দ্বিতীয় পথ'-এর এই অর্থটিই ধরতে পারেন নি। আর তার ফলেই তিনি কৃষির ক্ষেত্রে পরিবর্তন সম্পর্কে আমার বক্তব্যকে বুঝতে পারেননি।

কংগ্রেস সরকার কর্তৃক অনুসৃত কৃষিনীতি ও তার পরিণাম সম্পর্কে আমার বইতে আসলে কি বলা হয়েছে? বিভ্রান্তি নিরসনের জন্য উদ্ধৃতি দেওয়াই ভালো। "It turned out to be a programme for capitalist evolution on the basis of utmost preservation of landlord economies tenant farming and rackrenting—a reactionary, conservative programme resembling, to an extent, the Stolypin proggramme The result has been the retardation of the development of the productive forces and multiplication of misery for the bulk of rural population" (পৃষ্ঠা ১২৫)। কল্যাণবাবু আমার বক্তব্যকে যেভাবে উপস্থিত করেছেন ও তার যে-ধরনের ব্যাখ্যা পেশ করেছেন একেবারে সেই বিষয়েই সতর্কতা জানিয়ে বইতে লেখা হয়েছে, "The preceding analysis may convey the idea that during the post-independence period only the pre-capitalist relations have extended and been strengthened. But that would be a wrong understanding In the specific Indian situation while the pre-capitalist mode of production persists widely and powerfully, capitalist mode of production employing hired labour is also emerging and expanding" (পৃঃ ১৪৭)। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমার এই বক্তব্যের পটভূমিতে কল্যাণবাবুর কাছে আমি বিনীতভাবে এই

প্রশ্ন করতে চাই যে, তিনি যে-বক্তব্যটিকে আমার বলে খাড়া করেছেন ও খণ্ডন করেছেন সেটি কি অন্য কারুর নয় বা তাঁর মনগড়া নয়?

বাস্তবিক পক্ষে একথাও আমার বইতে উল্লিখিত হয়েছে যে স্বাধীনতাপূর্ব কালেই গ্রামাঞ্চলে ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটতে শুরু করে। তবে সে-বিকাশ ছিল খুবই ধীরগতিতে এবং মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ (পৃষ্ঠা ১৪৭)। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী কালে, বিশেষত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরুর সময় থেকে, সরকারী নীতির দৌলতে এবং বাস্তব সামাজিক-অর্থনৈতিক শক্তির চাপে এই ধনতান্ত্রিক বিকাশ নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ব্যাপকতর হয়েছে, দ্রুততর হয়েছে (পৃষ্ঠা ১৪৮)। সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ অংশের (পৃষ্ঠা ১৪৬-১৫৯) শিরোনামাই হলো 'A Modern Evil Capitalist Farming'। গত কয়েক বছরে অনুসৃত নয়া কৃষি রণনীতি বা 'সবুজ বিপ্লব' কৃষি-ধনতন্ত্রের এই বিকাশকেই সাহায্য করছে (পৃষ্ঠা ১৫৭-১৫৯)।

৮। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের direction বা ঝোঁকটা ধনতান্ত্রিক বিকাশের দিকে—শুধু এইটুকু বলা মোটেই যথেষ্ট নয় এবং সঠিকও নয়। এই ধরনের সিদ্ধান্ত আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের বিচিত্র ও জটিল শ্রেণী-সম্পর্ককে ও শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশকে যথাযথভাবে বুঝতে একেবারেই সাহায্য করে না। বরং তাতে একপেশে ও স্বভাবতই ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়।

কল্যাণবাবু অবশ্য তাঁর একপেশে অভিমতের সমর্থনে বলেছেন যে "natural economy এ দেশে নেই" এবং অন্য অর্থনীতির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। কিন্তু এই বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা কোথায় তা আমি বুঝতে পারছি না। ভারতে natural economy অটুট রয়েছে এটা কারুর বক্তব্য বলে আমার জানা নেই। আমার বইতে তো একাধিক জায়গায় "monetisation and commercialisation of agriculture"-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে (পৃষ্ঠা ৩৬, ১৪৭, ১৫৯-১৬০ ইত্যাদি)।

অবশ্য কল্যাণবাবুর বিচারে natural economy-র ভাঙন ও মুদ্রা ও পণ্য অর্থনীতির বিস্তৃতি এবং ধনতন্ত্রের বিকাশ সমার্থক। কিন্তু সব ক্ষেত্রে এই দুটি প্রক্রিয়া যে একই সঙ্গে চলে না এবং ক্ষেত্রবিশেষে মুদ্রা-অর্থনীতি ও বাজারের জন্য উৎপাদনের প্রসার যে প্রাক্ ধনতান্ত্রিক সম্পর্ককে শক্তিশালী করতেও সাহায্য করে এমন কথা মার্কস ও এঙ্গেলস একাধিক জায়গায় বলেছেন (Capital, Vol. III, পৃঃ ৩২২)। এ-বিষয়ে সব থেকে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলো

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে পূর্ব-ইয়োরোপে বাজারের জন্য উৎপাদনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই সামন্ততন্ত্রের পুনরুজ্জীবন—এঙ্গেলস একে অভিহিত করেছিলেন 'second serfdom' বা 'দ্বিতীয় ভূমিদাসপ্রথা' হিসেবে (The Peasant War in Germany গ্রন্থে On the History of the Russian Peasantry শীর্ষক রচনা, পৃঃ ১৮৩-১৮৫ , মার্কসের নিকট এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত পত্র, ডিসেম্বর ১৫ ও ১৬, ১৮৮২, পৃষ্ঠা ২০৩-২০৫ , এ-বিষয়ে আরও দ্রষ্টব্য মরিস ডবের Studies in the Development of Capitalism, পৃষ্ঠা ৩৮-৪২। আমার বইতেও এ-বিষয়ে কিছু সাক্ষ্য পেশ করা হয়েছে—পৃষ্ঠা ৭-৮)।

৯। তবে কল্যাণবাবুর প্রশ্ন হলো, natural economy ভেঙে গিয়ে থাকলে প্রাক-ধনতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণ কেমন করে ঘটতে পারে ? কিন্তু একথা তো তিনি জানেন যে, সামন্তশোষণ যে ঘটে তার শুধু অর্থনৈতিক কারণ নেই —**এটা ঘটতে পারে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের বিশ্লেষণ অনুসারে জমির ওপর ব্যক্তিগত একচেটিয়া মালিকানার সুযোগে extra-economic coercion বা অর্থনীতি-বহির্ভূত বাধ্যবাধকতার জোরে।** কল্যাণবাবুর মতে "ভারতে এই ধরণের উৎপীড়ন বহুলাংশে…কমে গেছে। এই অবস্থায় জমির মালিক ও ধনী কৃষকদের শোষণ চালানোর কেবলমাত্র একটি উপায় : তা হলো কৃষকদের জমি ও উৎপাদনের উপকরণ থেকে বঞ্চিত করে তাদের শ্রমক্ষমতা বিক্রি করতে বাধ্য করা। Extra economic coercion নেই · " (শারদীয় 'পরিচয়', পৃষ্ঠা ৮৯)।

কল্যাণবাবুর এবম্বিধ মতামত পড়ে বিস্মিত হচ্ছি। উপরোক্ত উদ্ধৃতিটুকুর মধ্যেই পরস্পর বিরোধিতা লক্ষণীয়। একবার তিনি বলছেন, সামাজিক-রাজনৈতিক উৎপীড়ন কমে গেছে। পরমুহূর্তেই বলছেন, এরকম উৎপীড়ন নেই এবং সুতরাং শোষণ চালানোর একটিমাত্র উপায়—ধনতান্ত্রিক উপায়—রয়েছে। আমার বক্তব্য হল :

(ক) আনুষ্ঠানিকভাবে আইনের চোখে শ্রমজীবী কৃষক রাজনৈতিক-সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত নয়।

(খ) সামাজিক-রাজনৈতিক উৎপীড়ন বা extra-economic coercion অনেক পরিমাণে কমে গেলেও এখনও দেশের অনেক অঞ্চলে ব্যাপকভাবে রয়ে গেছে।

(গ) এই extra-economic coercion বা অর্থনীতি বহির্ভূত জবরদস্তি

প্রধানত তিনটি কারণে সম্ভবপর হচ্ছে। (১) কৃষিসংস্কার সংক্রান্ত নানা আইনকানুন সত্ত্বেও ভূস্বামী বা জমিদার ও জমির বড় বড় মালিকদের **কৃষি উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপকরণ জমির ওপর একচেটিয়া মালিকানা এখনও বর্তমান। (২) ভারতের কৃষি-অর্থনীতি হচ্ছে labour surplus economy** এবং ফলস্বরূপ গ্রামাঞ্চলের গরিব জনসাধারণ ব্যাপক বেকারীতে জর্জরিত। স্বভাবতই প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির, যা হচ্ছে 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম ভল্যুমের মডেল, অর্থনৈতিক নিয়মগুলি এখানে যথাযথভাবে কাজ করতে পারে না। বাস্তবিকপক্ষে এমন অর্থনীতিতে শ্রমজীবি কৃষকদের আয় ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক নিয়মের দ্বারা পুরোপুরি নির্ধারিত হয় না। এমন কি কৃষি-শ্রমিক বা গ্রামীণ সর্বহারার মজুরীও পুরোপুরি এই নিয়ম অনুসারে স্থির হয় না। বহু বছর ধরে চলে আসা প্রথা বা custom, ভূস্বামী ও জমির বড বড মালিকদের খেয়ালখুশি ও সামাজিক-রাজনৈতিক চাপ ইত্যাদির দ্বারা শ্রমজীবী কৃষকদের আয় এবং ক্ষেত মজুরদের মজুরী বেশ কিছু পরিমাণে নির্ধারিত হয়। অবশ্য ভুল ধারণা এড়ানোর জন্য একথাও বলা প্রয়োজন যে, এই labour surplus economy এবং ব্যাপক গ্রামীণ বেকারী ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক বিকাশেরও ভিত্তি। **গ্রামীণ জনসাধারণের, বিশেষত শ্রমজীবী কৃষকদের ও কৃষি-শ্রমিকদের একটা বিরাট অংশই নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।** গ্রামাঞ্চলের সামাজিক পরিস্থিতির এটা তো একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক যে, একদিকে জমির বৃহৎ মালিক ও কায়েমী স্বার্থগোষ্ঠীর অধিকাংশই হলো তথাকথিত উচ্চবর্ণভুক্ত, আর অন্যদিকে ভাগচাষী, গরিব চাষী, inferior tenant বা স্বত্বহীন প্রজা ও ক্ষেতমজুরদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হচ্ছে তফশীলী জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীগুলির অন্তর্ভুক্ত (এ প্রসঙ্গে আমার বইয়ের ১৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। আইনের চোখে এদের formal বা আনুষ্ঠানিক অবস্থান যাই হোক না কেন কার্যত ও সারবস্তুর দিক দিয়ে এরা এখনও সম্পূর্ণ না হলেও যথেষ্ট পরিমাণে সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। বর্বরতম পন্থার অস্পৃশ্যতা, নিষ্ঠুর নির্যাতন এমন কি সরাসরি হত্যার নানা কাহিনী খবরের কাগজের পাতায় হামেশাই চোখে পড়ে। **এদের এই নিম্ন সামাজিক অবস্থাই extra-economic coercion বা অর্থনীতি-বহির্ভূত বাধ্যবাধকতার জোরে শোষণকে সম্ভবপর করে তুলছে।**

এইসব কারণের ফলে সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণের দিন এখনও শেষ হয়ে যায়নি, তার নানা অবশেষ এখনও বর্তমান। জমিদার ও জমির বৃহৎ মালিকেরা জমির ওপর একচেটিয়া মালিকানার সুযোগে ছোট ছোট চাষীদের নিজস্ব যন্ত্রপাতি দিয়ে নানা পদ্ধতিতে জমি চাষ করিয়ে নিচ্ছে এবং বাড়তি শ্রম নিংড়ে নিচ্ছে। ঋণের দায়ে বাঁধা থাকা বা ঋণ-দাসত্ব, বাধ্যতামূলক মজুরি খাটা, বেগার প্রথা, ভাগচাষী ও অন্যান্য স্বত্বহীন প্রজা ও স্বেচ্ছাধীন প্রজাদের (tanants-at-will) নিজেদের যন্ত্রপাতি দিয়ে জমি চাষ ইত্যাদি সবই হলো প্রাক-ধনতান্ত্রিক শোষণের — শ্রম খাজনা, ফসলে খাজনা ও টাকায় খাজনা আত্মসাৎ করার — ভগ্নাবশেষের নানা রূপ। ভাগচাষী ও অন্যান্য স্বত্বহীন চাষীরা অবশ্য আইনগত দিক দিয়ে জমিব সঙ্গে বাঁধা নয়। কিন্তু জমির ওপর একচেটিয়া মালিকানা, প্রচণ্ড বেকারী এবং নিম্ন সামাজিক অবস্থানের দরুন এরা ইচ্ছামত জমি ছেড়ে যেতে পারে না, বা বলা যেতে পারে, কার্যত এরা জমির সঙ্গেই বাঁধা।

উপরে উল্লিখিত পবিস্থিতির পটভূমিতে আমি মোটের উপরে যা বলতে চাই তা হচ্ছেঃ কল্যাণবাবু উল্লিখিত শোষণের উপায় অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক শোষণ পদ্ধতি বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রেব অন্যতম শোষণ পদ্ধতি এবং এই পদ্ধতিতে শোষণ প্রসাবমান। কিন্তু শোষণের 'কেবলমাত্র একটি উপায়' রয়েছে—এ-কথা সম্পূর্ণ ভুল। **ধনতান্ত্রিক শোষণের পাশাপাশি সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণ চলছে এবং তা ধনতন্ত্রের বিকাশকে ব্যাহতও করছে।**

কল্যাণবাবু যথার্থই বলেছেন যে, খাজনায় জমি বিলি করা মাত্রই সামন্ত শোষণের নিদর্শন নয়। কিন্তু এ-কথাটি আমার বইতেও কোনো অস্পষ্টতার আভাস না রেখেই বলা হয়েছে (পৃষ্ঠা ১৩৯)। শুধু তাই নয়, বাস্তবে ধনতান্ত্রিক অর্থেও জমি লীজে বিলি করা হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে ভারতে সামন্ততান্ত্রিক অর্থে খাজনায় জমি বিলি-বন্দোবস্তের যে অতি শক্তিশালী ও ব্যাপক অবশেষ রয়ে গেছে তা কেমন করে অস্বীকার করা চলে? (এ-বিষয়ে আমার বই-এর সপ্তম অধ্যায়ে ১৩৫-১৪৬ পৃষ্ঠায়, বিশেষত 'Tenant Farming; Feudal and Capitalist Categories' ও'Prevalence of Rack-renting of Feudal Varicty' শীর্ষক অংশগুলিতে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে)। কল্যাণবাবু ঠিকই দেখিয়েছেন যে, যারা খাজনায় জমির বন্দোবস্ত বা লীজ নিচ্ছে তারা অনেকেই বেশি জমির মালিক এবং নিজেদের operational area বাড়ানোটা

এদের উদ্দেশ্য। কিন্তু লীজ নিচ্ছে এমন কৃষকদের মধ্যে এদের অনুপাত কতটুকু? ১৯৬১ সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে মোট tenancyর শতকরা ৮২ ভাগই হলো এমন প্রজা যাদের গণ্য করা হয় inferior tenant হিসেবে—ভাগচাষী উঠ্‌বন্দী প্রজা ইত্যাদি হরেক রকমের স্বত্বহীন প্রজা হিসেবে। এদের যে capitalist tenant হিসেবে গণ্য করা যায় না তা খুবই স্পষ্ট।

কিন্তু এদের সবাইকে কি গ্রামীণ সর্বহারাব অংশ বলে গণ্য করা যায়? এই সব বর্গাদার ও স্বত্বহীন প্রজাদের একাংশ সব বকমের উৎপাদন-উপকবণের মালিকানা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত এবং এদের সঙ্গে গ্রামীণ সর্বহারার সারবস্তুগত পার্থক্য কম। কিন্তু এই সঙ্গে এ-কথাও অনস্বীকার্য যে, দেশের অনেক অঞ্চলেই বর্গাদার ও স্বত্বহীন প্রজাদেব একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কিছু-না-কিছু উৎপাদন-উপকরণের—চাযেব যন্ত্রপাতি, লাঙ্গল, বলদ ইত্যাদিব মালিক। আর otrabotki প্রথা সম্পর্কে লেনিনের রচনা থেকে কল্যাণবাবু যে-অংশটুকু তুলে দিয়েছেন সেই উদ্ধৃতি অনুসারে এ-কথা কি অস্বীকার করা চলে যে শেষোক্ত ধরনের ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক শোষণেরই অঙ্গ? বস্তুতপক্ষে, 'প্রচ্ছন্ন প্রজাস্বত্ব'কে হিসেবের মধ্যে নিলে এমন অনুমান করার মতো তথ্য রয়েছে যে এখনও সমস্ত চাষযোগ্য জমিব শতকবা ৩৫-৪০ ভাগ কোনো-না-কোনো ধরনের আধা-সামন্ত তান্ত্রিক ভূমি-সম্পর্কের আওতায় রয়ে গেছে (পৃষ্ঠা ১৩৫-১৩৭)।

১০। উপরে যা বলা হলো তার অর্থ এই নয় যে, গ্রামীণ অর্থনীতি অপরিবর্তিত রয়ে যাচ্ছে। আগেই বলা হয়েছে, ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশ সন্দেহাতীতভাবে ঘটছে, প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বের তুলনায় অনেক দ্রুত তালে। এই বিকাশের প্রকৃতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা দরকার।

সেটি হলো যে **কৃষি-অর্থনীতিতে যে-সব ধনতান্ত্রিক উপাদান ও অংশ নজরে পড়ে তাদের সকলে একই গোত্রভুক্ত নয়।** এদের মধ্যে একটি অংশ হলো ধনতান্ত্রিক জমিদারে রূপান্তরিত পূর্বতন সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক জমিদার। ধনী চাষীদের অনেকেও এই ধনতান্ত্রিক জমিদারের স্তরে উন্নীত হয়েছে। বিরাট বিরাট খামারের মালিক এইসব ধনতান্ত্রিক জমিদার মজুর লাগিয়ে, ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করে, পুঁজি খাটায়, তদারকি করে—কিন্তু নিজেরা কখনোই ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে চাষবাসের কাজে অংশ নেয় না। এদেরই নিকট গোত্রের হলো বিড়লাদের মতো একচেটিয়া ধনিক যারা

কৃষি-অর্থনীতিতে অনুপ্রবেশ করছে। বীজ খামার, ফলের বাগান, আঙুরের ক্ষেত—এইসব হলো এদের অনুপ্রবেশের বিশেষ রূপ। আর এইসব জমিদার (সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক উভয়বিধই) এবং একচেটিয়া ও বৃহৎ ধনিকদের মধ্যে এক মৈত্রী গড়ে উঠেছে। বলা যেতে পারে যে এরা সকলে মিলে লেনিন উল্লিখিত প্রুশীয় বা যুঙ্কার পথেব প্রতিনিধি (পৃষ্ঠা ১৪৮)।

এই সঙ্গেই লক্ষণীয় হলো যে একটা ধনী চাষীর স্তরও বিকাশ লাভ করেছে ও করছে। সম্পন্ন চাষী, স্বত্ববান রায়তী চাষী, এমন কি মধ্য-চাষীদেরও মধ্যে থেকে এদের উদ্ভব। কংগ্রেস সরকারের ভূমি-সংস্কারের ফলে এই অংশ বিশেষ-ভাবে লাভবান হয়েছে—এদের জমির একটা বড অংশই এসেছে প্রাক্তন মধ্য-স্বত্বাধিকারীদের কাছ থেকে। এই ধনী চাষীগোষ্ঠী পুঁজি লগ্নী করে, উৎপাদনের দায়িত্ব ও ঝুঁকি বহন করে, চাষের জন্য মজুরীভিত্তিক শ্রমের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে, আবার নিজেরাও প্রত্যক্ষভাবে কৃষিশ্রমে বা চাষের কাজে অংশ নেয়। উৎপন্ন ফসলে এদের সারা বৎসর শুধু চলে যায় তাই নয়, বিক্রযযোগ্য উদ্বৃত্ত ফসলের একটা বড অংশ এদের কাছ থেকেই আসে। এ-কথা বললে বোধহয় ভুল হবে না, এই ধনী চাষীগোষ্ঠীর বিকাশ মার্কস কথিত প্রথম পথে ধনতান্ত্রিক বিকাশের নিদর্শন। স্পষ্টতই আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে একই সঙ্গে দুই ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটছে।

১১। এইসব ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ভিন্ন রয়েছে নানা অংশে বিভক্ত অধনতান্ত্রিক শ্রমজীবী কৃষক সমাজ। এরই একটি স্তর হচ্ছে বহুবিস্তৃত বৃহৎকলেবর মধ্যচাষী গোষ্ঠী। এরা এদের জমি চাষের জন্য মজুরীভিত্তিক শ্রমের উপর কিছু পরিমাণে নির্ভব করলেও প্রধানত নিজস্ব যন্ত্রপাতি দিয়ে নিজ শ্রমেই এরা চাষ-বাস করে থাকে। বাজারে বিক্রির উদ্দেশ্যে এরা উৎপাদন করে, কিন্তু এরা স্বচ্ছল নয়, পুঁজি বিনিয়োগেব উপযোগী যথেষ্ট উদ্বৃত্ত এদের থাকে না। এই মধ্য-কৃষকদের অর্থনীতি নিঃসন্দেহেই সঙ্কটগ্রস্ত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এই মধ্য-কৃষক অর্থনীতি বিলুপ্তির পথে। এখন পর্যন্ত এই মধ্য-কৃষকরা গ্রামীণ সমাজের একটি বড অংশ। গোটা দেশের হিসেবে মোটামুটিভাবে ৫ একরের বেশি কিন্তু ১০ একরের কম জমির মালিক পরিবারগুলিকে মাঝারি চাষী পবিবার হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। আর এ-তথ্যটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ যে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার সপ্তদশ পর্যায়ের সমীক্ষা (১৯৫৯-৬১) অনুসারে এই ধরনের পরিবার হলো জমির মালিক পরিবারগুলির ১৯·৮০ শতাংশ।

এ-ছাড়া রয়েছে ৫ একরের কম জমির মালিক যাদের গরিব চাষী হিসেবে গণ্য করা যায়। এরা নিজস্ব যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের সাহায্যে পুরোপুরি নিজস্ব শ্রমে চাষ করে। চাষবাসের উপকরণ, গৃহস্থালির সরঞ্জাম ও অন্যান্য নানা সামগ্রী কেনার তাগিদে উৎপাদনের একটা বড় অংশ এরা পণ্য হিসেবে বিক্রি করে, আবার নিজেদের খাদ্যের প্রয়োজনের একটা অংশ কিনে মেটায়। এই গরিব চাষীরা হলো জমির মালিক পরিবারগুলির ৬১.৬৯ শতাংশ।

কল্যাণবাবু যথার্থই বলেছেন যে মাঝারি ও গরিব চাষীদের অর্থাৎ ক্ষুদে অন্ন উৎপাদকদের অর্থনীতি সঙ্কটগ্রস্ত। কৃষিতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের অঙ্গ হিসেবে কৃষক সমাজের মধ্যে পার্থক্যীকরণ প্রক্রিয়া কাজ করছে, উচ্ছেদ ও নিঃস্বতা-বৃদ্ধির ফলে মধ্য ও গরিব কৃষকেরা জমি হারাচ্ছে। কিন্তু তিনি এ-বিষয়টিকে বিবেচনার যোগ্য বলেই গণ্য করেননি যে এ-সবটাই ঘটছে এ-রকম একটা দেশে যেখানে অন্যান্য সব ক্ষেত্রের মতো কৃষিতেও ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটছে মন্থর গতিতে এবং মাঝারি ও গরিব কৃষকদের মধ্যে বাস্তব সম্ভাবনা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে না হলেও গণতান্ত্রিক চেতনা ও সংগঠিত গণতান্ত্রিক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছে। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে আঠারো শতকের শেষ দিকে ও উনিশ শতকের গোড়ায় সাধারণভাবে ইউরোপে কিংবা উনিশ শতকের শেষ দিকে ও বিশ শতকের প্রথম দশকে রাশিয়ায় পার্থক্যীকরণ প্রক্রিয়া যে মাত্রা ও ব্যাপকতার সঙ্গে কাজ করেছে ভারতে তা করতে পারছে না। তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির দুই দশক পরেও ক্ষুদে পণ্য উৎপাদকেরা বেশ ব্যাপকভাবেই টিকে রয়েছে ও থাকছে। **সাধারণত ক্লাসিকাল ধনতান্ত্রিক বিকাশ যে ধরনের polarisation বা মেরু-বিভাজন ঘটায় তা ভারতবর্ষে হয়নি। আর এই বৈশিষ্ট্য ভারতে কৃষি-বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত, কর্মসূচি ও কৌশল নির্ধারণের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।**

১২। বহুবিধ বৈশিষ্ট্য সম্বলিত এই ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের ব্যাপক অবশেষ ভিন্ন অন্য প্রধান বাধা হলো প্রাক্‌-ধনতান্ত্রিক ব্যাপারী (mercantile) ও মহাজনী শোষণ। এই দু-রকম শোষণের তিনটি প্রধান শর্ত হলো অর্থপুঁজির concentration বা কেন্দ্রীকরণ, বিক্রয়যোগ্য ফসলের কেন্দ্রীকরণ এবং ব্যাপারী ও মহাজনী পুঁজির আধিপত্য প্রতিরোধে অক্ষম একটি বিস্তৃত petty production বা ক্ষুদে উৎপাদন ব্যবস্থা। আর তিনটি শর্তই ভারতে বিদ্যমান। বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করেও এটুকু

বলা যায় যে, যে-ধরনের মজুতদারী, ফাটকাবাজী, কালোবাজারী কার্যকলাপ গ্রামাঞ্চলের ফড়ে থেকে শুরু করে একচেটিয়া কারবারী পর্যন্ত সকলেই লিপ্ত এবং যে-কার্যকলাপ শুধু কৃষি-অর্থনীতিকে নয়, গোটা ভারতীয় অর্থনীতিকেই সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে সেসব কিছু, আর যাইহোক, প্রতিযোগিতামূলক ধনতন্ত্রের নিয়মকে প্রতিফলিত করে না (পৃষ্ঠা ১৫৯-১৬৯)।

১৩। কল্যাণবাবু তাঁর আলোচনায় এটা প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মতো ধরে নিয়েছেন যে, জমি ও অর্থপুঁজির মালিক চাষের জন্য পুঁজি লগ্নী করবে, কৃষি-শ্রমিক নিয়োগের উপর বেশি বেশি নির্ভর করবে, উৎপাদনের উত্তরোত্তর অধিকতর দায়-দায়িত্ব নিচ্ছে ও নেবে, চাষের পদ্ধতির উন্নতির বিষয়ে বেশি বেশি মনোযোগী হচ্ছে ও হবে। কিন্তু এমনটা কেন যে ঘটবে তা কল্যাণবাবু বলেননি। বাস্তব অর্থনীতির কোন্ নিয়ম অনুসারে এ-রকম হবে তা তিনি ব্যাখ্যা করেন নি। কৃষি-অর্থনীতির এ-রকম বিকাশ অর্থনৈতিক বিবর্তনের কোন্ logic অনুসারে দেখা দেবে যে-বিষয়ে তিনি কোনো বক্তব্য হাজির করেননি।

কল্যাণবাবু কৃষি-অর্থনীতির বিকাশের বিষয়ে যে ছকটিকে উপস্থিত করেছেন বাস্তবে কিন্তু ঐ রকম বিকাশের বিরুদ্ধে নানা শক্তি কাজ করছে। আসলে অবস্থাটা কি? অর্থ পুঁজি বা money capital-এর যে মালিক তার সামনে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পুঁজিকে একাধিকভাবে ব্যবহারের, বিকল্প নানা কাজে নিয়োগ করার সুযোগ খোলা রয়েছে। এই অর্থকে ব্যবহার করা যায় বেশি বেশি জমি, যে-জমির দাম মুদ্রাস্ফীতির চাপে পীড়িত অর্থনীতিতে ঊর্ধ্বমুখী এবং যে-জমির থেকে অতি চড়া হারে খাজনা আদায় সম্ভব (অনেক ক্ষেত্রে তো চাষের জন্য এক পয়সাও খরচা না করে খাজনা আদায় ঘটছে), হস্তগত করার উদ্দেশ্যে। বিকল্পে, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য পণ্য ও সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্যও নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থকে কাজে লাগানো যেতে পারে—আর এর থেকে return বা প্রতিদানের হারও রীতিমতো চড়া। এই অর্থকে আবার তেজারতি কারবারেও নিয়োগ করা চলে—এতে সুদের হার শতকরা ২৫ থেকে শতকরা ২০০ পর্যন্ত। কিন্তু এসব অনুৎপাদক কাজের পরিবর্তে কৃষির উৎপাদন প্রসারের উদ্দেশ্যে উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার ও অন্যান্য উপকরণ ক্রয়, জলসেচের প্রসার এবং বিনিয়োগের কাজেও এই পুঁজির ব্যবহার সম্ভবপর। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে, লীজে জমি বিলি করা, ফসলের কেনা-বেচা এবং নগদ অর্থ ও ফসলে কর্জ দেওয়ার থেকে পাওয়া

খাজনা, ব্যাপারী-মুনাফা ও সুদরূপী প্রতিদান বা return-এর হার জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ ও ক্ষেতমজুর নিয়োগ থেকে পাওয়া ধনতান্ত্রিক মুনাফার হারের থেকে অনেক বেশি অনেক নিশ্চিত, অনেক নিরাপদ। স্পষ্টতই, সামন্ততান্ত্রিক খাজনা, মহাজনী সুদ ও ব্যাপারী মুনাফার এই বৈশিষ্ট্য বা, অন্য কথায়, অনুৎপাদক কার্যকলাপ থেকে পাওয়া প্রতিদানের এই কাঠামো উৎপাদনমূলক পুঁজি বিনিয়োগ ও উৎপাদনী সুযোগ সমূহের প্রসারের পথে প্রবল অন্তরায় (পৃষ্ঠা ১৭৬-১৭৭)। এই পরিস্থিতিতে কৃষিতে ধনতন্ত্রের অবাধ বিকাশের যে-চিত্রটি কল্যাণবাবু তুলে ধরেছেন সে-রকম বিকাশ কেন ও কেমন করে ঘটছে ও ঘটবে সে-সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নীরব।

বাস্তবিকপক্ষে গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম মুখ্য বৈশিষ্ট্য হলো সামন্ততান্ত্রিক এবং ব্যাপারী মহাজনী—এই দুই প্রাক্‌-ধনতান্ত্রিক শোষণপদ্ধতির সঙ্গে ধনতান্ত্রিক শোষণপদ্ধতির মিশ্রণ। উদ্বৃত্ত শ্রম আত্মসাৎ করার এই যে তিনটি পদ্ধতি এদের গ্রন্থি বন্ধন ও সংমিশ্রণের ভিত্তিতে একটি নতুন ধরনের সুবিধাভোগী স্বার্থ—গ্রামীণ conglomerate-এর উদ্ভব হয়েছে। এই conglomerate গোষ্ঠীভুক্তরা একই সঙ্গে বড় জোতের মালিক, ফসলের একচেটিয়া কারবারী প্রধান মহাজন, ধান-ভাঙা কলের মালিক, সরকারী ঠিকাদার, রেশন দোকানের মালিক, মুখ্য সমবায়কর্মী ও গ্রাম্য কর্মচারী। জমির বড় মালিক হিসেবে এরা অনেক ক্ষেত্রে জমির কিছুটা খাজনায় বন্দোবস্ত দিচ্ছে, আবার কৃষি-শ্রমিক নিয়োগ করে বাকি জমিটুকু নিজেদের তদারকিতে চাষ করছে। এরা অর্থ ও বাজারের উপর আধিপত্যকে কাজে লাগাচ্ছে যোগান ও ফসলের দরব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করে দিয়ে মুনাফা লোটার জন্য। এরাই আবার মহাজনী কারবারে লিপ্ত।

এদের প্রসঙ্গে আমার বইতে বলা হয়েছে, " [these conglomerates] utilize their grip over the life of the working peasantry and the landless labourers to squeeze out surplus through the simultaneous wielding of the mode of extraction of feudal absolute rent, the mode of exploitation through profit on alienation and the mode of exploitation through profit on production of surplus value" (পৃষ্ঠা ১৭১)।

১৪। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আমাদের দেশের গ্রামীণ জীবন

প্রবল বিরোধে বিদীর্ণ। কিন্তু এ-বিরোধ শুধুমাত্র ধনতান্ত্রিক জোতের মালিক আর গরিব চাষী গ্রামীণ সর্বহারার মধ্যে নয়। শ্রী কল্যাণ দত্ত-র অতি সরলীকৃত বিশ্লেষণ অনুসারে bipolar division বা দুই বিপরীত মেরুতে বিভাগ এখানে অনুপস্থিত। বাস্তব পরিস্থিতি হলো অনেক বেশি বিচিত্র ও জটিল।

অবশ্য ভূমি-সংস্কারের নানা আইন-কানুন সত্ত্বেও এ-দেশের গ্রামাঞ্চলে বিরোধের কেন্দ্রীয় বিষয় হলো উৎপাদনের প্রধান উপকরণ জমির ওপর জমিদারদের—সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক এই দুই ধরনের জমিদারদেরই প্রায় একচেটিয়া মালিকানা। এই একচেটিয়া মালিকানা ভেঙে ফেলা এবং উদ্বৃত্ত জমি গরিব চাষী, ভূমিহীন চাষী, স্বত্বহীন প্রজা ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে বণ্টন করা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম ও সবথেকে জরুরী ধাপ। শুধুমাত্র এই কাজ কোনো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা না, কিন্তু এই কাজ সম্পূর্ণ না করে সমাজতন্ত্রের পথে এগুনো যায় না।

স্বভাবতই এ-ক্ষেত্রে কৃষি বিপ্লবের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হলো একই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক জমিদার এবং ধনতান্ত্রিক জমিদার। উপরন্তু ফসল, বাজার, ঋণ-ব্যবস্থা, সারের বণ্টন, সেচের সুযোগ-সুবিধাদি, কৃষিখাতে সরকারী খরচ ইত্যাদির উপর প্রাক্-ধনতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শোষণ পদ্ধতির সংমিশ্রণের ভিত্তিতে উদ্ভূত গ্রামীণ conglomerateদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য চূর্ণ করার কাজও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। **স্পষ্টতই ভারতে কৃষি বিপ্লব হচ্ছে সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, প্রাক্-ধনতন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লব।**

কিন্তু এ-বিপ্লব যে কেবলমাত্র সামন্ততন্ত্র বিরোধী তা নয়। সাধারণভাবে ধনী চাষী সমেত সমস্ত ধনতান্ত্রিক উপাদানের সম্পূর্ণ উৎসাদন এ-বিপ্লবের লক্ষ্য নয়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ভূস্বামীদের ও কৃষিতে একচেটিয়া পুঁজির অনুপ্রবেশের সঙ্কোচন সাধন ও পুরোপুরি উচ্ছেদ সাধন এই বিপ্লবের অন্যতম লক্ষ্য। আর সে কারণেই, কল্যাণবাবু যে-অর্থে বলেছেন সেই অর্থে না হলেও, **একটি বিশেষ অর্থে এই বিপ্লব ধনতন্ত্র-বিরোধী বিপ্লব।**

বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করেও বলা যেতে পারে যে বিং শতকের শেষভাগে ভারতের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ও সামাজিক অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতিতে কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির অগ্রগতির জন্য ধন-তান্ত্রিক বিকাশের দুটি পথই—'প্রতিক্রিয়াশীল' ও 'বিপ্লবী' পথ—সম্পূর্ণ অচল। **সচেতনভাবে বেছে নেওয়া যেতে পারে এবং কৃষি-অর্থনীতির দ্রুত,**

সর্বাঙ্গীন, সঙ্কটমুক্ত বিকাশ নিশ্চিত করতে পারে এই অর্থে একটিমাত্র বিকল্পই রয়েছে সেটি হলো অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ।

অবশ্য এখানে আপত্তি উঠতে পারে এই কথা বলে যে, যে-দেশের কৃষিঅর্থনীতিতে ইতিমধ্যেই ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের বেশ কিছুটা বিকাশ ঘটেছে সে-দেশে অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশ কেমন করে সম্ভব? কিন্তু এই প্রসঙ্গে এটি বোঝা দরকার যে ভারতের মতো ক্ষেত্রে অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের অর্থ ধনতান্ত্রিক বিকাশকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে যাওয়া নয়। আবার, এ-কথাটিও উপলব্ধি করা দরকার যে অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশ একটি স্বতন্ত্র সামাজিক-অর্থনৈতিক বন্দোবস্তও নয়। এটি হলো সমাজতন্ত্রে উত্তরণের জন্য একটি transitional বা পরিবর্তমান অর্থনীতি। জোতের সর্বোচ্চ সীমা হ্রাস করে ভূমি-বণ্টনের বর্তমান কাঠামোটির আমূল পরিবর্তন এবং ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের জমির ওপর অধিকার দান এই নতুন কৃষি-বিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। জমির ব্যবহার, উৎপন্ন ফসল বিক্রয় ও চাষের নানা উপকরণ ক্রয়, সার ও বীজ বণ্টন, কৃষি-ঋণের সরবরাহ ইত্যাদি চাষবাস সংক্রান্ত নানা কার্যকলাপের ক্ষেত্রে সমবায়মূলক প্রয়াস ও তৎপরতার প্রসার, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্য ব্যবস্থার বিস্তার এবং ক্ষেতমজুরদের জন্য উপযুক্ত মজুরীর নিশ্চয়তা সৃষ্টি করাও এই কৃষি-বিপ্লবের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক। সংক্ষেপে বলা যায়, আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের বিশেষ পরিস্থিতিতে অ-ধনতান্ত্রিক রূপান্তরের মর্মকথা হলো সামন্ততন্ত্র-বিরোধী ও ব্যাপারী শোষণ—সুদখোরি মহাজনী শোষণ-বিরোধী কর্তব্যগুলি সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে ধনতান্ত্রিক শোষণের যেসব দিক গ্রামীণ সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের উপর চেপে বসে আছে (যেমন, ধনতান্ত্রিক ভূস্বামীদের আধিপত্য ও একচেটিয়া পুঁজির চাষবাসে ও কৃষিজাত পণ্যের বাজারে বর্ধমান অনুপ্রবেশ) সেইসব কিছুর একেবারে সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন এবং সমবায়মূলক নানা তৎপরতার প্রসার, রাষ্ট্রের সক্রিয় হস্তক্ষেপ ও ক্ষেতমজুরদের স্বার্থ রক্ষার- উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক শোষণের অন্যান্য দিকের ক্রমসঙ্কোচন সাধন।

১৫। এই নতুন কৃষি-বিপ্লব সম্পাদনের জন্য গ্রামাঞ্চলের কোন কোন শক্তিকে পাওয়া যাবে? কল্যাণবাবুর অভিমত হলো: "শহরের শ্রমিক ও গ্রামের **গরিব কৃষক (সব-কৃষক নয়)** এদেরই মিলিত হয়ে গ্রাম ও শহর থেকে পুঁজিবাদের উচ্ছেদ ঘটাতে হবে" (বড় হরফ বর্তমান লেখকের)। কিন্তু আমার বক্তব্য হলো যে, **সামন্ত-ব্যাপারী-মহাজনী-শোষণ-বিরোধী ও উপরে**

উল্লিখিত সীমাবদ্ধ অর্থে ধনতন্ত্র-বিরোধী কৃষি-বিপ্লবে ভাগচাষী, নানা ধরনের স্বত্বহীন প্রজা, গরিব চাষী ও মাঝারি চাষী সমেত সকল অ-ধনতান্ত্রিক শ্রমজীবী কৃষকদের এবং ক্ষেতমজুর বা গ্রামীণ সর্বহারাদের ঘনিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ। সেই কারণে এরা সকলেই হচ্ছে এ-দেশের কৃষি-বিপ্লবের মূল চালিকা শক্তি। অবশ্য এদের সকলের মধ্যে ভূমিহীন ও গরিব চাষী ও গ্রামীণ সর্বহারারা হচ্ছে কৃষি-বিপ্লবের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তম চালিকা শক্তি এবং কৃষি-বিপ্লবী শক্তিসমূহের প্রধান বাহিনী।

এ-বিষয়ে অবশ্য সচেতন থাকা প্রয়োজন যে ক্ষেতমজুর ও গরিব কৃষকের সঙ্গে মধ্য-কৃষকের স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গিগত বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। মধ্য-কৃষক বিশেষ বিশেষ সময়ে ক্ষেতমজুর নিয়োগ করে, তার সব সময়েই নজরও হচ্ছে ধনী কৃষকের স্তরে উন্নীত হওয়া। কিন্তু এই পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়াটা হবে ভুল। গ্রামীণ অর্থনীতিতে তার অবস্থান ও কার্যকলাপের বিচারে **মধ্য কৃষকের চরিত্র মূলত, শোষকের নয়, ভূস্বামী, একচেটিয়া পুঁজি, ফাটকাবাজ ব্যাপারী ও সুদখোর মহাজন কর্তৃক শোষিত শ্রমজীবী কৃষকের।** ধনতান্ত্রিক বিকাশের বর্তমান পথ অনুসরণের পরিণামে তার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, মধ্য-কৃষক অর্থনীতি নানাভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে। উপরন্তু, মধ্য-কৃষক হলো গ্রামীণ জনসাধারণের একটি রীতিমত বৃহৎ, যথেষ্ট বিস্তৃত, খুবই প্রভাবশালী অংশ। ভারতে বিপ্লবের বর্তমান স্তরে এরা হলো শ্রমিকশ্রেণীর অতি নির্ভরযোগ্য মিত্র এবং অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথকে গ্রহণ করাটাও হচ্ছে এদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক।

এই বিপ্লবে ধনী কৃষকের অবস্থান ও ভূমিকা কি? **ধনতান্ত্রিক বিকাশের 'প্রথম পথ'-এর প্রতিনিধি, শ্রমজীবী কৃষকদের মধ্যে থেকেই উদ্ভূত ধনী কৃষককে ভারতীয় বিপ্লবের বর্তমান পর্যায়ে গণতান্ত্রিক কর্তব্যগুলি সম্পাদন করার পর্যায়ে সম্ভাব্য মিত্র হিসেবে গণ্য করা যায়। উপরন্তু,** ধনী কৃষকের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রভাব গরিব কৃষক সমেত গোটা শ্রমজীবী কৃষক সমাজের মধ্যে বিদ্যমান।

অবশ্য ধনী কৃষক হচ্ছে পল্লী অঞ্চলের ধনতান্ত্রিক উপাদানগুলির একটি বড় অংশ এবং তার শোষক চরিত্র তর্কাতীত। তদুপরি, ধনিকশ্রেণীর একটি অংশ হিসেবে ধনী কৃষক রাষ্ট্রক্ষমতারও অংশীদার। এই ধনী কৃষকের শোষণের

বিরুদ্ধে অবশ্যই সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু তাহলে ধনী কৃষককে কেমন করে বিপ্লবের সম্ভাব্য মিত্র হিসেবে বিবেচনা করা যায়? এই প্রশ্ন নিঃসন্দেহেই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে জমির মালিকানা, ফসলের কেনা-বেচা, কৃষি-ঋণ ব্যবস্থা, সেচসংক্রান্ত সুযোগাদির ব্যবহার, সার ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের বণ্টন, কৃষিখাতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়, সমবায়ের পরিচালনা ইত্যাদি গ্রামীণ জীবনের নানাদিকের উপর প্রাক্‌-ধনতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শোষণ পদ্ধতির সংমিশ্রণের ভিত্তিতে উদ্ভূত ভূস্বামী-ব্যাপারী-মহাজন জোটের প্রায় একচেটে নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব। স্বভাবতই এ-সব বিষয়কে কেন্দ্র করে এই জোটের সঙ্গে ধনী কৃষকদের গুরুতর বিরোধ বর্তমান। ধনী কৃষক রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার। কিন্তু রাষ্ট্র-ক্ষমতাকে কে কতটা ব্যবহার করবে সেই প্রশ্নে শাসক জোটের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য শক্তির সঙ্গে—বিশেষত একচেটিয়া পুঁজিপতি ও গ্রামাঞ্চলের ত্রিমূর্তির জোটের সঙ্গে ধনী কৃষককে সর্বদাই সংগ্রাম করতে হচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মতো তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থা অথবা কংগ্রেসের ভাঙনের মতো সুদূরপ্রসারী ঘটনার পিছনে এই দ্বন্দ্ব বিরোধের তীব্রতাবৃদ্ধি যে কাজ করছে তা অনস্বীকার্য। এই পরিস্থিতিতে গ্রামাঞ্চলের প্রতি-বিপ্লবী জোটটির বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামকে পরিচালিত ও কেন্দ্রীভূত করণে ধনী কৃষককে নিরপেক্ষ করে দেওয়া অথবা এমন কি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মিত্র রূপে পাওয়া সম্ভবপর।

কৃষি-বিপ্লব সম্পর্কে কল্যাণবাবুর প্রস্তাবিত কর্মসূচী ও রণনীতি একান্তই একপেশে, সঙ্কীর্ণতা-দোষে দুষ্ট ও হঠকারী প্রকৃতির। ঐ নীতির অনুসরণ গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদী শক্তি গরিব চাষী ও ক্ষেত-মজুরদের তাদের মিত্রদের থেকে বিচ্ছিন্ন করবে, শুধু ধনী চাষী নয়, মধ্য-চাষীকেও শত্রু শিবিরে ঠেলে দেবে এবং প্রতিক্রিয়াশীল জোটটির সামাজিক ভিত্তি ও সমর্থনকে ব্যাপকতর করবে।

এই পরিস্থিতিতে সবদিক বিবেচনা করে আমাদের বক্তব্য হলো, ভূস্বামী বৃহৎ ব্যাপারী-সুদখোর মহাজনদের জোটটির বিরুদ্ধে প্রধান আঘাত হানতে হবে, আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে। এই জোটটির বিরুদ্ধে কৃষি-বিপ্লবের মূল চালিকা শক্তিগুলিকে—মাঝারি কৃষক সমেত সমগ্র শ্রমজীবী কৃষক সমাজ ও ক্ষেতমজুরদের সংহত করতে হবে এবং ব্যাপকতম সমাবেশ ঘটাতে হবে। এই লক্ষ্যকে সফল করে তোলার জন্য একই সঙ্গে ধনী কৃষক কর্তৃক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে এবং ধনী কৃষকের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ কাজ ও তৎপরতার সব রকম সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। উপরে উল্লিখিত ত্রিমূর্তির জোটটির সঙ্গে ধনী কৃষকের এখন পর্যন্ত যে আঁতাত রয়েছে এই নীতির সুষ্ঠু ও উপযুক্ত প্রয়োগের ফলে তা ভেঙে দেওয়া যাবে, ঐ জোটটিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও চূর্ণ করা যাবে এবং কৃষি-বিপ্লবকে জয়যুক্ত করা সম্ভবপর হবে।

কিছুই ভুলিনি, তবু

অনন্ত দাশ

কিছুই ভুলিনি, তবু মনে হয় বহু কিছু ভুলে যাচ্ছি
হাতে হাত রেখে কথা, স্মিতহাসি, মনুষ্যত্ব প্রেম—
সূর্যের রক্তিম মুখে প্রাণের ফসল
সবকিছু জলমগ্ন সিঁড়ি যেন
নেমে যাচ্ছে
পাতালের দিকে
শিমূলের হাওয়া আর জ্বালে নাকো আকাশে আগুন

•

কোন খুনে অপরাধী নই
তবু প্রতিটি খুনের রক্ত এই হাতে, এই মুখে
সন্ত্রস্ত ব্যাধের ছায়া ওঠানামা করে
বিবেকদংশনে যেন প্রতিরাত্রে নির্বাসন হয়।

বিদীর্ণ পথের মোড়ে এত ঘৃণা স্তূপীকৃত!
রক্তে ভেজা চোখে কোন দূর ট্রাফিকের আলো
কার বুকে ভেসে উঠছে ডুবন্ত পাহাড়
আমার চোয়াল ভেঙে শ্রাবণের শুষ্ক নদী
দূরের সমুদ্র খুঁজে ফেরে।

কিছুই ভুলিনি, তবু
মনে হয় বহু কিছু ভুলে যাচ্ছি
স্মিতহাসি, মনুষ্যত্ব, প্রেম
পাহাড়ের গুহাগুলি ফেটে যায়
আদিম রক্ত ও হাওয়া আকাশের রঙ
জিঘাংসায় লাল হয়ে ওঠে।

অথচ আশ্চর্য এই

সত্য গুহ

আবহসঙ্গীত নেই নেপথ্যেও সাড়াশব্দ নেই
নিভুনিভু মোম আগলে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে মর্মান্তিক ম্লান আলোরেখ
ঘরের ভেতরে এই,—বুকের ভেতরে
অল্প লইয়া আশা, আর কিছু নয়, শুধু বেঁচেবত্তে থাকা
উৎপন্ন মুখের গন্ধ শুঁকে সন্তানের, না, আর কিছু নয়

কিভাবে যে রাতগুলো দিনগুলো আসে চলে যায়
প্রকৃত প্রস্তাবে নেই বোধের ভেতরে তার ছাপ
ন্যাড়া ঝোগড়া কুয়াশায় গাছের নিকটে গাছ, কোথাও সবুজে
বাসাভরা পাখি আর আছে কিনা বোঝা যায় না, অথচ সবাই
এখনো বিশ্বাস করে রোদ্দুর করেছিল ; পাখিরা ভুবন ভরে গান বেঁধেছিল

সমস্ত কেমন যেন হয়ে গেছে পোড়া দেশগাঁয়ে
নাট্যকারের সঙ্গে ছটি চরিত্রের কারো ক্বচিৎ কখনো দেখা হলে
মূকাভিনয়েও থাকে যে-টুকু-যা অভিব্যক্তি তাও নেই—উত্তেজনা জোনাকীতে শুধু
তার শীতল আলোয় চোখে ভেসে যায়, ও চাঁদ, জোয়ারে
লাশ লাশ লাশ এবং লাশ আর কিছু নয়

আবহসঙ্গীত নেই নেপথ্যেও জীবনের সাড়াশব্দ নেই
নারী দুই বাহুমূলে পুরুষের সেরকম শঙ্খ তাঁর শঙ্খিনীর সত্তার ভেতরে
পৌছোনোর আপ্রাণ প্রয়াসে খোঁজে দোর আর পত্রপতনের শব্দে ফিরে চলে আসে
বিবর্ণ ইচ্ছার মতো আপন বিবরে যেন বারবেলা লেগেছে
ঘনজনবসতিতে মড়া জেলে হাত সেঁকছে মুখোমুখি সন্ন্যাসী ও ডোমে
সাংঘাতিক কান্নাকালবেলা, কাঁদে চব্বিশঘন্টাময় রাতে
ঘাস মা নিজেরই লাশ বুকে করে 'কার বাছা, আহা,
কোন বকুলের ফুল সন্ত্রাসী বসন্তে ভাঙল তরু তছনচ্ ক'রে এরকম ভাবে'
নেপথ্যে সারসার জমা বাদ্যযন্ত্রে প্রতিধ্বনি তেমন পুরোনো বাড়ি ভরে
ধুলোর হিমক্ষীণ শব্দ সারাক্ষণ বাজে আহা—হায়, মানুষের দিন চলে যায়

অথচ আশ্চর্য এই বিয়োবার বেলা বাড়ছে রমলার ঠিকঠিক ভাবে।

জ্বলে উঠতে চাই

রেখা দত্ত

পৃথিবীতে কোনোখানে যেন কেউ নেই, কিছু নেই।
মাথার ওপরে কিছু নক্ষত্রের বিচ্ছিন্ন নিবাস ;
হাওয়া ছুটে আসে বুকে মুখে—
এ-হাওয়ায় অপমৃত আত্মার বিলাপ ;
আত্মার বিলাপ শুনে, আত্মার বিলাপ শুনে শুনে
দিন প্রায় শেষ।

মাথার ওপরে কিছু নক্ষত্রের বিচ্ছিন্ন নিবাস—
ষড়যন্ত্র মূলক মিট্‌মিট্‌—
আমি যা বুঝি না, আমি একা।
অথচ সবাই ছিল পাশে, এই পৃথিবীর ঘাসে
পায়ের গভীর চিহ্ন আজো আছে ইতস্তত। ওহে, মহাকাল-
বুকের কপাট খোলো, আগুনের তীব্রতায় জ্বলে উঠতে চাই।

প্রবাসেও স্বস্তি নেই

অরুণাভ দাশগুপ্ত

প্রবাসেও স্বস্তি নেই, দৃষ্টিতে নিয়ত ভাসে
অনিদ্র শহরতলী
পোড়াঘর
পড়োশির রক্তাক্ত চাতাল !

অথচ নিজেই এসব এড়াতে আসি
দোমোহানী—যেখানে গরখাই
স্বর্ণরেখার বুকে বুক রাখে,
ঝিরঝির ঝিরঝির শব্দে

বিচূর্ণ উপলখণ্ডে আবহময়তা······
টিলার আড়ালে কি সুন্দর দেহ ধুয়ে
নিতে জানে ওঁরাও রমণী,
ইস্পাতনগরী থেকে ভেসে আসা লোহাচুরে গৈরিকসুষমা···
প্রেক্ষাপট জুড়ে
পাহাড়তলীর শান্ত শালবন ছুঁয়ে যায়
সূর্যাস্তের প্রলম্বিত রেশ···
এই অতুলন চিত্রকল্প,
শান্ত পায়ে ঘরে ফেরা মহুয়ায় আচ্ছন্ন মানুষ
তোমাদের এত কাছে এসে
কেন যে আবার ফিরি—
অনিদ্র শহরতলী পোড়াঘর রক্তাক্ত চাতালে !

ফুল-ফসলে ক্ষুধার সন্তান

শিশির মজুমদার

আমার হাত উঠল আকাশে
সেখানে ফুলের সমারোহ
আমার নিশ্বাস পড়ল বাতাসে
সেখানে ফসলের আঘ্রাণ
বন্যায় মহামারী শ্মশান শ্মশান।

আমাদের ফুল ফসলে ঈপ্সিত ক্ষুধার মিছিল
পৃথিবী এসো, আমরা ফসল আর ফুলে
ক্ষুধার সন্তান গড়ে তুলি।

প্রকৃত পুরুষ

অজয় সেন

এখন অনেক কিছু ছেড়ে দিয়ে নিতান্ত অবহেলায়
চলে যাব নির্জন গভীর অরণ্যে,
দিনের সূর্য যেখানে খণ্ড
সেখানে প্রকৃত পুরুষ নিঃসঙ্গ অথচ আত্মস্থ।
আমি তার কাছে নতজানু হবো
একান্ত বিশ্বাসে ভূমিস্পর্শ ;
ব্রোঞ্জ কপালে অদৃশ্য রেখা
পুলকিত ধূপের গন্ধে আলোড়িত চতুর্দিক
গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণে থমথমে, নিবিড়।

নিশুতি রাতে প্রাচীন দেবতাগণ যখন অতন্দ্র প্রহরী
প্রকৃত পুরুষ ধীর পদক্ষেপে হেঁটে যান নদী
অথবা সবুজ শস্যক্ষেতের দিকে।
প্রত্যূষে দুই তীরে সোনালী শস্য
উচ্ছল নদীর কলধ্বনি, অরণ্য জুড়ে উৎসব উৎসব।

প্রকৃত আত্মস্থ অথবা বোধ কি হতে পারে ?
অনায়াস করায়ত্ব বিবিধ কৌশল, জানা আছে
প্রকৃত পুরুষের।

আমি সেই প্রকৃত পুরুষের কাছে যেতে চাই
যেখানে বল্কলের পোযাক পরিহিত অদৃশ্য পুরুষ
কবির আশে পাশে প্রদক্ষিণ করে প্রত্যেক প্রহরে
সে-সময় কবির চিবুক পর্যন্ত ধ্যানস্থ
গাঁথা থাকে চিবুক প্রাচীরে।

প্রতিদিন, প্রতিদিন কলকাতায়

বিপ্লব মাজী

প্রতিদিন, প্রতিদিন কলকাতায় লাঞ্ছিত যৌবন মারা যায়।
চতুর্দিকে হায় হায় দগ্ধ কারবালায় তীব্র নিশীথ ফাটায়।

প্রতিদিন, প্রতিদিন কলকাতায় সন্ত্রস্ত যৌবন জাগে, চোখে চূর্ণ ঘুম
প্রতিদিন পাড়ায় পাড়ায় উষ্ণ রঙের কুঙ্কুম, হিংস্র পুলিশ জুলুম।

প্রতিদিন, প্রতিদিন কলকাতায় জায়া-জননীর অশ্রুপাত
গারদে, কুটিল কালো ভ্যানে মৃত্যুপ্লাবিত তরঙ্গে করাঘাত

প্রতিদিন, প্রতিদিন কলকাতায় যৌবনের মৃত্যু আসে যায়
লোনা বাতাসের উষ্ণ রক্তগন্ধী যন্ত্রণায় যৌবন হারায়।

ইচ্ছার অঞ্জলি চিতাগ্নিতে

তরুণ সান্যাল

আর কোনো ইচ্ছা নেই, সাধ নেই, শোনো ইচ্ছামতী, ইচ্ছাবতী,
ঢের হলো কথা চালাচালি বজ্রে, ফালাফালা মেঘ চিরে ছুরি
বিপ্লব কেবলই রক্ত? চুলের কাঁটার মতো পথসন্ধিবাঁকে হত্যাব্রতী
আততায়ী? না আদর্শপূত? মৃত্যু ফুলসাজে রক্তপদ্মে ঢলোঢলো আপাত চাতুরি?

মাঠ ছিঁড়ে দেয় খরা, আ জল, হে বৃষ্টি এসো আনন্দবিপ্লব শুদ্ধিস্নানে,
নদীর ঘোলায় পলি, হাড় মাংস চূর্ণভস্ম, হিমানীপ্রবাহে চূর্ণ উপল প্রস্তর
আমি সেই মাঠে চেপে বসা ফাল লাঙলের, মনে হতো, আমি সে নিড়ানে
স্তূপ আগাছার পুঞ্জ, শোলা-ধঞ্চে, সার হয়ে রসসেচনের দায়ে মৃত্তিকার স্তর।

কেবল পায়ের তলে পথের ঘূর্ণিত ফিতা, খোয়া তোলা এবড়ো খেবড়ো পিচ,
কেবল হাতের তলে খাদ্য ও পানীয়, শব্দ, ইশতেহার, মসৃণতা, অথবা বাতাস
এই প্রাণযাপনের এই প্রাণধারণের অস্তিত্বচারণে কোন জীবনের বীজ
মাঠে না পাথরে ফেলে চলে যাই

হায় হাতে লেগেছিল শিশুর ত্বকের মতো কোমল কেশরে মাঠে কাশ
শিশিরে প্রসন্ন ঠোঁট উদ্ভিন্ন গাঁদার,
যেন যন্ত্রণার চাপে হীরা হয়ে উঠেছিল অঙ্গার খনিজ
মানুষের বেদনায়, মানুষীর প্রেরণায়
কবিতায় ফুটেছিল নীলমণি রেণুফুলে পায়ে দলা ঘাস

ইচ্ছাগুলি অঞ্জলিতে
হে হব্যবাহন অগ্নি, প্রজ্জলন
হে তীব্র ইস্পাতনীল
সে ইচ্ছা এখন যেন
অঙ্গারমালিকা হয়ে ঘিরে থাকে তীক্ষ্ণ জিহ্বা শিখার কিরিচ

এখন সমস্ত সাধ চোখ ফেটে অশ্রু খোঁজে, আয় বৃষ্টি,
অশ্রুবিন্দুগুলি এই খরা মাঠে ঘোচায় সন্ত্রাস ?

বিধি কি হৈল রে…

অমিতাভ দাশগুপ্ত

বিধি কি হৈল রে বিধি কি হৈল রে

আইস আইস কামার ভাইরে
খাওরে বাটা পান
ভাল কইর‍্যা বাইন্ধ্যা দিও
ত্যাশের কপাল খান
বিধি কি হৈল রে…

সোনার থালায় পান অরে
রূপার থালায় চূণ
ভাঙা বাঙলার ললাটলিখন
অতি নিদারুণ
বিধি কি হৈল রে…

লড়াইয্যা ছাওয়ালগুলি
কি ক'মু বিধাতা
এ উয়াবে খতম কইব্যা
মাটি কৈল বাতা
বিধি কি হৈল রে ··

উঠ উঠ বিপুলারে
কত নিদ্রা যাও
বেবাক কাটল হিংসা-নাগে
চক্ষু মেইল্যা চাও
বিধি কি হৈল রে ·

পঞ্চ কোটি পুত তোমার
না গুনান যায় নাতি
মরণ-আন্ধারে ঢুঁড়ে
জিয়নের বাতি
বিধি কি হৈল রে

চিরাগে রোশনাই ঢাইল্যা
উজলা খাড়াও
বেবাক খাইল কালনাগে
চক্ষু মেইল্যা চাও
বিধি কি হৈল রে

ছড়া

তরুণ সেন

পাহারাদার

হাত তুলেছেন বাঁয়ে তিনি
    চোখটি রেখে ডাইনে
সাবাস্ দাদা কুত্তা রোখো
    আর পাহারা চাইনে।

ডাইনে-বাঁয়ে

বাঁয়ের জল ডাইনে গড়ায়
    ডাইনে বাজে বাঁয়া,
হুজুর-ভজা মজুর সাজেন
    বুঝলে কিছু ভায়া ?

নইলে

ভাবছে গরু গোয়াল ছুট
বাক্সে যদি গজায় শিং
ধরবে কেনারামের খুট
নইলে পাবে ঘোড়ার ডিম।

এখন কেন

ষাঁড়ের ঘাড়ে লটকে লাল
আমায় কেন দিচ্ছ গাল
পাঁচটি পিঁপড়ে বানিয়ে পাখি
আধ-পাকা ধান কোথায় রাখি
বাক্সে জ্বালিয়ে নরককুণ্ড
রাখবে কোথায় নিজের মুণ্ড ?

দোষ দিওনা

দোষ দিওনা খুনীকে
ভোট দিও তার মুনিকে
খেপিয়ো নাক' গাধা
কামড়াবে তার দাদা
বাধলো জবর খুট
দেখছ খালি লুট ?

নির্বাচনী ছড়া

ধনঞ্জয় দাশ

১

যতই তুমি দেয়াল লেখো
শেষের লিখন লিখবে যে
খুন-জখমের দেয়াল ভেঙে
এই ফাগুনে আসছে সে।

২

শীত চলে যায় বসন্ত বায়
ভোটের গরম আসে
'বিপ্লবী'দের বোম্-ছুরিতে
রক্ত গড়ায় ঘাসে।
কিসের রক্ত, কার রক্ত?
মুখ কোরোনা চূন
রঙীন ফাগুন যায় চলে যায়
মনের মানুষ খুন।
আগুন-জলা শিমূল ডালে
শানায় কারা তূণ
খুনীর কালো হাত মুচড়ে
হাসেন নবারুণ।

মেঘের আড়ালে সূর্য

(একাঙ্ক নাটক)

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র

ভবেশ…অধ্যাপক, বয়স পঞ্চাশের কোঠায়

সুচেতা…ভবেশের স্ত্রী, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি

সুখেন…ভবেশের পুত্র, বয়স পঁচিশ

জনার্দন…প্রধান শিক্ষক, ভবেশের সমবয়সী

অরবিন্দ
সোমেন
কমলেশ
শেখর
অনুপম
সুনীত এবং
………সুখেনের সমবয়সী বন্ধু

একদল যুবক

[সকালবেলা। মধ্যবিত্ত পরিবারের শয়ন ঘর। সুচেতা বিছানা তুলছে। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। পেছনের দিকে একটা জানালা। তা দিয়ে দূরের কয়েকটা গাছপালা দেখা যায়। বাঁদিকে অন্যঘরে যাবার দরজা। তাতে একটা পর্দা ঝুলছে]

সুচেতা। না, ভালো লাগে না। ভোর না হতেই কোথায় চলে গেছে! বাড়ির সংগে শুধু খাওয়া আর শোওয়ার সম্পর্ক। দু-দণ্ড যদি বাড়িতে থাকে! কিছু বলার উপায় নেই। বলতে গেলেই লম্বা লেকচার দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে দেবে। ঝামেলা আমার আর ভালো লাগে না। কার জন্মদিন করবো! দুটো পেটে ধরেছিলাম—একটা তো গেছেই, এটাও কবে যাবে ঠিক কি? আমার হয়েছে মরণ।

ভবেশ। [পাশের ঘর থেকে] সকালবেলা আপন মনে কি বকছ ?

সুচেতা। [গলা চড়িয়ে] নিজের সপিণ্ডকরণের মন্ত্র আওড়াচ্ছি।

ভবেশ। তা ভালো—পরকাল ঝরঝরে হবে।

[বাঁদিকের পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করে ভবেশবাবু। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। চুল কাঁচাপাকা ও এলোমেলো। পরণে ধুতি ও গায়ে গেঞ্জি। ঘুম থেকে উঠে এসেছে।]

সুচেতা। ইহকালে যা সুখ পেলাম ! ভাবগতিক দেখে পিত্তি জ্বলে যায়।

ভবেশ। বাষ্প বেশি জমলেই ঢাকনা ঠক্‌ঠক্ করে।

সুচেতা। একজনের দর্শন, আর একজনের বিপ্লব।

ভবেশ। ভারসাম্যের প্রয়োজন আছে বৈকি। জিনিসের ওজন করতে গেলে বিপরীত পাল্লায় বাটখারা চাপাতেই হয়।

সুচেতা। কলেজে পড়িয়ে পড়িয়ে তোমার এমন অভ্যেস হয়ে গেছে যে সবাইকে মনে করো ছাত্র।

ভবেশ। [একটা চেয়ারে বসে] ছাত্র পেলাম কোথায় ? মনে হয় সবই ব্যর্থ।

সুচেতা। হাজার দিন বলেছি ছেলেটার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে অত আলোচনা করো না।

ভবেশ। মনে প্রশ্ন জাগলে তার উত্তর দিতে হবে না ?

সুচেতা। [ঘরের এলোমেলো জিনিস গুছোতে গুছোতে] কই, আমার মনের প্রশ্নের উত্তর তো কখনও দাও না।

ভবেশ। যেহেতু তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজেই খুঁজে পাও। তুমি যে স্বয়ংসম্পূর্ণা।

সুচেতা। হেঁয়ালী।

ভবেশ। না, হেঁয়ালী নয়। তোমার মায়া মমতার কাছে কে না বশ ?

সুচেতা। ওগুলোর এখন কোনো দামই নেই।

ভবেশ। কে বললে তোমাকে।

সুচেতা দেখতেই পাচ্ছি। কাল শুকুটাকে অত করে বললাম, আজ তার জন্মদিন, বাড়িতেই যেন থাকে। ঘুম থেকে উঠে দেখা পাওয়া গেল তার ? চারদিকে খুনোখুনি। আমার কিছু ভাল লাগে না। এত করে বলি ওসবের মধ্যে যাসনে, শত্রু বাড়িয়ে লাভ কী ?

ভবেশ। শত্রু-মিত্র জ্ঞানই নেই।

সুচেতা। ও যা বুঝবে তাই ঠিক। ওর কথায় সায় না দিলেই মাথা গরম।

ভবেশ। কিছু বোঝে নি বলেই মাথা গরম।

সুচেতা। না বুঝে অত লাফালাফি কেন?

ভবেশ। তপ্ত বালুতে পা ফেললেই ছট্‌ফট্ না করে উপায় আছে?

সুচেতা। তোমার কাছে আশকারা পেয়েই···

ভবেশ। যুক্তি দিয়ে বোঝানোকে যদি বল আশকারা···

সুচেতা। তোমার কথা শোনে কই?

ভবেশ। মন্ত্রণায় ওদের স্নায়ুগুলো সর্বদাই উত্তেজিত। তাই কারো যুক্তিই মাথায় ঢোকে না।

সুচেতা। নিজেকে শেষ করা।

ভবেশ। সূর্যের মধ্যে প্রতি নিয়ত চলেছে ধ্বংস আর সৃষ্টির খেলা। যে ধ্বংসে সৃষ্টি নেই তা ব্যর্থ, নিস্ফল আত্মহনন।

সুচেতা। দার্শনিক কচকচি থাক। সংসারটা যেন শুধু আমারই তিনি কখন আসবেন তার তো ঠিক নেই। যাদের খেতে বলা হয়েছে তাদের পাতে যাই হোক কিছু দিতে হবে তো।

ভবেশ। বাজার করার কথা বলছ?

সুচেতা। লজ্জার কথা!

ভবেশ। বাজার তো আমিই করি। তাতে আর লজ্জার কী আছে?

সুচেতা। দশবারো জনকে খেতে বলেছি। এতটা বাজার তো তোমাকেই বয়ে আনতে হবে।

ভবেশ। ছেলে জানে তার বাবার বোঝা বইবার সামর্থ্য এখনও আছে। বলো কী কী আনতে হবে?

সুচেতা। বাসী মুখে এখনও জল দিলে না। চা খেয়ে যাবে তো?

ভবেশ। বেলায় গেলে কিছু পাবো না। বাজারটা সেরে এসেই চা খাবো। তুমি একটা ফর্দ করে রাখো।

[পর্দা সরিয়ে ভবেশের প্রস্থান। একটা কলম নিয়ে সুচেতা ফর্দ লিখতে বসে। খানিকক্ষণ বাদে ভবেশ তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে প্রবেশ করে।]

সুচেতা। শুকু যা যা খেতে ভালবাসে সেগুলোই লিখে দিলাম। কোন্‌টা কত আনলে হবে তুমি নিজেই আন্দাজ করে এনো।

ভবেশ। পুরো ফর্দ করে দিও—আবার যেন বাজারে যেতে না হয়।

[পর্দা সরিয়ে ভেতরে প্রস্থান। সোমেন নামক একটি যুবকের প্রবেশ]

সোমেন। সুখেন কই, মাসিমা?

সুচেতা। কী করে বলবো! বাড়ির সংগে সম্পর্ক তো শুধু থাকা আর খাওয়ার।

সোমেন। রাগ করে লাভ নেই, মাসিমা। আমাদের অনেক কাজ।

সুচেতা। তা বই কী। মিটিং, মিছিল, পোষ্টার—কত কাজ! আমরা সারাদিন নিষ্কর্মা বসে থাকি তো!

সোমেন। আমাদের কাজেও তো আপনারা কতভাবে সাহায্য করে থাকেন।

সুচেতা। তা হলে আমাদের কাজেও তোদের সাহায্য করা উচিত।

সোমেন। তা বলতে পারেন। কিন্তু মাসীমা, ছোট কাজে ডুবে থাকলে বড কাজে মন যায় না।

সুচেতা। তোরা তবে চাস নে সংসারগুলো সুন্দর হয়ে উঠুক?

সোমেন। কটা সংসার সুন্দর বলুন তো? চেষ্টা করেও কেউ সুন্দর করতে পারছে কি?

[পাঞ্জাবী গায়ে ভবেশের প্রবেশ]

ভবেশ। অতএব আরো অ-সুন্দর করে দাও। [সুচেতাকে] দাও, ফর্দটা দাও। [সুচেতা ফর্দ দেয়। তাতে চোখ বুলিয়ে] দু-কেজি মাংসেই তো যাবে চোদ্দ টাকা।

সুচেতা। তার কমে হবে কেন?

ভবেশ। হুঁ! থলে দুটো এনে দাও।

[সুচেতা পাশের ঘরে চলে যায়।]

সোমেন। বুর্জোয়া অভ্যেস ছাড়তে সময় লাগে।

ভবেশ। কি বললে?

সোমেন। এত ঘটা করে জন্মদিন করার কি দরকার?

ভবেশ। খালি পেটে উৎসব হয় না, সোমেন।

সোমেন। জন্ম-মৃত্যু প্রকৃতির নিয়ম। তা নিয়ে উৎসব করার কী আছে!

ভবেশ। তবু মানুষ জীবনের পূজোই করে থাকে চিরদিন। সন্তানের দীর্ঘজীবন কামনা মা-বাপ করবে না?

সোমেন। আমি কি তা অস্বীকার করছি!

ভবেশ। তবে জন্মদিনের উৎসবে তোমার আপত্তি কেন ?

সোমেন। উৎসবে আপত্তি নেই, আপত্তি অপব্যয়ে। কত গরিব আছে যাদের দু-বেলা দু-মুঠো জোটে না।

ভবেশ। বটে! ইলেকশনে জয়ী হয়ে মুহুর্মুহু বোমা ফাটালে বুঝি অপব্যয় হয় না ?

সোমেন। জনতার জয়ে জয়োল্লাশ হবেই।

ভবেশ। মানুষের মনে ত্রাস সৃষ্টি করে ?

সোমেন। জনতার জয়ে দালালরা তো ভয় পাবেই। সাধারণ মানুষ কী বলে জানেন ?

ভবেশ। কী বলে জানিনে, তবে কী ভাবে তা জানি। ভয়ে কেউ মুখ খোলেনা।

সোমেন। বলেন কী! এত শক্তি আমাদের ?

ভবেশ। শক্তি কম বলেই ভয় দেখিয়ে মানুষকে স্তব্ধ রাখতে চাও। কিন্তু জানো অনেক সময় মুখর না হয়ে মৌন মুখই বেশি কথা বলে ?

সোমেন। তাই যদি হবে তবে লোকে আমাদের সমর্থন করে কেন ? বন্ধের একটা ডাক দিলে···

ভবেশ। সব অচল হয়ে যায় ? জন-জীবন অচল করা সহজ, কিন্তু সচল করা বড়ো কঠিন। তোমরা চাও অচলকে আরো অচল করে দিতে—তাই কথায় কথায় বন্ধের ডাক ·····

সুচেতা। আজ আবার বন্ধ নাকি ? [বলতে বলতে সুচেতার প্রবেশ। হাতে দুটো থলে]

সোমেন। না মাসিমা, মেসোমশাইর সঙ্গে একটা accademic discussion হচ্ছিল।

সুচেতা। আর পারি নে, বাবা। তোর মেসোমশাইর দর্শন আর তোদের শ্রেণীসংগ্রাম শুনে শুনে কান পচে গেল। আমরা যে কোন্ শ্রেণীর মানুষ বুঝতেই পারি নে।

ভবেশ। তোমরা ? তোমরা গয়া প্যাসেঞ্জারের তৃতীয় শ্রেণী।

সুচেতা। তার মানে যত আবর্জনা······

(সোমেন হো হো করে হেসে উঠে)

ভবেশ। কিন্তু যাত্রীর ভীড় সেখানেই বেশি।

সুচেতা। বাজারটা হবে, না কী ?

(সোমেন আবার হাসে)

ভবেশ। Yes Madam. Don't mind Somen. I am a Non-partisan. I try to understand all.

[ফর্দটা পকেটে ফেলে থলে দুটো হাতে নিয়ে বাইরে প্রস্থান]

সোমেন। মেসোমশাই ভারী মজার মানুষ। যখন তর্ক করেন তখন মনে হয় আমাদের তিনি সহ্যই করতে পারেন না। কিন্তু মনে মনে আমাদের তিনি সত্যিই ভালোবাসেন।

সুচেতা। আমি কিন্তু তোদের ঘৃণা করি।

সোমেন। তাই আদরের মাত্রা বেশি আর আমাদের আবদারও অশেষ।

সুচেতা। [মৃদু হেসে।] খুব হয়েছে, ভাগ। আমার কাজ আছে।

সোমেন। সুখেনকে আগেই ছেড়ে দেব। ওকে বেশিক্ষণ আটকে রাখবো না।

সুচেতা। আর তুই ?

সোমেন। আসব বই কি।

সুচেতা। বেলা চারটে, না পাঁচটায় ?

সোমেন। না না মাসিমা, বেশি দেরী করবো না। আপনার হাতের রান্না খাবার লোভ আমার যোল-আনার জায়গায় আঠারো-আনা।

[সোমেনের প্রস্থান]

সুচেতা। লক্ষ্মীছাড়ার দল। এগুলোকে দেখলে গা-জ্বালা করে, আবার না দেখলেও পুড়ে মরি।

[ভবেশের বন্ধু জনার্দনের প্রবেশ]

জনার্দন। ভবেশবাবু আছেন তো ?

সুচেতা। না, তিনি বাজারে গেছেন। বসুন।

[জনার্দনের চেয়ারে উপবেশন।]

জনার্দন। কী ব্যাপার সুখেনের মা ? আজ আবার নিমন্ত্রণ কিসের ?

সুচেতা। সুখেনের আজ জন্মদিন।

জনার্দন। ও। তার বন্ধুদের বললেই তো হতো।

সুচেতা। সুখেনের বাবার ইচ্ছে আপনার সঙ্গে বসে আমোদ করে খাবেন।

জনার্দন। ভবেশবাবু আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়েও হাসতে পারেন। সেদিন ওনার কলেজে দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেল পথে আমার সংগে দেখা। হাসতে হাসতে নির্বিকার চিত্তে সব বলে গেলেন, যেন কিছুই হয় নি।

সুচেতা। ওনার কথা ছেড়ে দিন।

জনার্দন। বললেন কি জানেন? বললেন মানুষ যেদিন প্রথম আগুন পেলে সেদিনও বুঝি উল্লাসে এমনি আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। আগুনে যে পুড়ে মরতে পারে সে হুঁশও হয়তো তাদের ছিল না।

সুচেতা। ওনার সব কথাই সৃষ্টিছাড়া। বলেন হাসি কান্নায় তফাৎ নেই।—কেঁদেও মানুষ হালকা হয় হেসেও মানুষ হৃদয়ের ভার লাঘব করে। থাক গে, বসুন। চা করে দিচ্ছি।

[সুচেতার পাশের ঘরে প্রস্থান। টেবিল থেকে একখানা বই টেনে জনার্দন পড়তে থাকে। প্রবেশ করে সুখেন, কমলেশ, অনুপম, শেখর ও অরবিন্দ।]

সুখেন। জনার্দন-কাকার স্কুলের খবর কি?

জনার্দন। আর বলো কেন বাবা! যা অবস্থা……

সুখেন। নতুন কিছু হলো নাকি?

জনার্দন। যে কোনোদিনই হতে পারে। মাষ্টার মশাইদের মধ্যেও তিনটে দল, ছাত্রদের মধ্যেও তিনটে। আমি হেডমাষ্টার কোন দলে যাই?

কমলেশ। যে-দল শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় সে-দলেই থাকবেন।

জনার্দন। তা হলে তো কথাই ছিল না। কোনো দলই চায় না স্কুলটা ঠিক মতো চলুক। তিন দলেরই চলেছে শক্তিপরীক্ষা। ত্রিশূলের ঘায়ে পড়াশুনো বন্ধ। আমি সাক্ষীগোপাল হয়ে সব দেখছি।

অনুপম। আপনি একটু শক্ত হলে।……

জনার্দন। ওরে বাবা! শৈব শাক্তের লড়াই নিরামিষ নয়, আমিষ। এর মধ্যে শক্ত হতে গেলেই জানবার টানাদেবে। তাই অফিস ঘরটা এসে যখন তছনছ করছিল আমি তখন শুধু বসে বসে হাসছিলাম। বিজ্ঞজনের মতো সংযমের বরফ চাপা দিয়ে স্নায়ুগুলোকে ঠাণ্ডা করে রাখলাম। কিছু বললেই তো অমনি বোম—ভোলানাথ। [সবাই হেসে উঠে] হাসবারই কথা বটে! বোমারুদের যুগে একটা বোমা ফাটলে রাজ্যিশুদ্ধ তোলপাড় হতো। এখন হাজার হাজার বোমা ফাটছে, কিন্তু কেউ গ্রাহ্যও করছে না। বুকের পাটা কি আমাদের কম। বৈপ্লবিক গতিবেগে আমরা মহাকাশযানও হার মানাতে চলেছি।

[চায়ের কাপ নিয়ে সুচেতার প্রবেশ]

সুচেতা। মিষ্টিতো আনা হয়নি যে, মিষ্টি মুখ করাবো। শুধু চাই দিতে হলো।
[জনার্দনকে চা দেয়]

জনার্দন। আচমনটা গংগা জলেই হোক। মধ্যাহ্ন ভোজনে ষোড়শোপচার তো আছেই।

সুচেতা। দেখুন আপনার বন্ধুবর কি আনতে কি এনে হাজির করেন।

জনার্দন। দ্রোপদীর হেঁসেলে এলে বিষও অমৃত হয়ে উঠবে।

সুচেতা। ছেলেপিলেদের সামনে কি-যে বলেন।

জনার্দন। আমাদের নিয়ম নাস্তি। উপমায় দোষ নেই। তবে আজকাল হাস্য পরিহাসও করতে হয় সাবধানে। কখন কোন্ কথা বেফাঁস মুখ দিয়ে পড়বে আর অমনি শুনতে হবে—বুর্জোয়ার দালাল, চরম প্রতিক্রিয়াশীল। তাই Expression of Truthএর চেয়ে Suppression of Truthই ভালো।

সুচেতা না যাই, কাজ আছে। আপনার গল্প শোনার সময় এখন নেই।

জনার্দন হ্যাঁ, হ্যাঁ, যান। নারী রন্ধনে আর বন্ধনেই।

সুচেতা রন্ধন না পেলে তো একবেলাও চলে না আপনাদের। শুকু, শুনে যা। তোমরা বসো বাবারা।

[সুচেতা ও সুখেনের প্রস্থান। যুবকদের চৌকিতে উপবেশন]

শেখর। আচ্ছা মাষ্টারমশাই, আপনার স্কুলে সেদিন যাঁরা হামলা করলো তারা কি বাইরের ছেলে?

জনার্দন। না, না, সবাই চেনা।

শেখর। তাদের নাম জানেন?

জনার্দন। জানি। (একটু থেমে) তবে জানলেও বলার উপায় নেই।

অরবিন্দ। ভয়ে?

জনার্দন। যাই বলো। তবে স্নেহ-মমতাও তো একেবারে খোয়াইনি।

অরবিন্দ। এসব সমাজবিরোধীদের প্রতিও আপনার স্নেহ-মমতা আছে।

জনার্দন। তা থাকবে না। জানি, ভুল করছে। এ-ভুল একদিন ভাঙবেই। শিক্ষার মাথায় কুড়োল মারলে, মনীষীদের মূর্তি ভাঙলেই শাসন-ব্যবস্থাটাও ভেঙে পড়বে এটা ওদের মাথায় কারা ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই স্নানের টবের ময়লা জলে ফেলতে গিয়ে বাচ্চাটাকেও ছুড়ে

ফেলে দিচ্ছে। ভুল সেদিন ভাঙবে যেদিন লক্ষ্য স্থির করতে ওদের কষ্ট হবে না।

অরবিন্দ। আপনাদের সহানুভূতি আছে বলেই ওদের সাহস বাড়ছে।

জনার্দন। কি করতে বলো? পুলিশে ধরিয়ে দেব?

কমলেশ। দরকার হলে তাও করতে হবে।

জনার্দন। তোমরা পারো, আমি পারিনে।

কমলেশ। সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দেয়া চলে না।

জনার্দন। তা যদি বলো তাহলে তো অনেককেই ধরিয়ে দিতে হয়।

অনুপম। দেন না কেন?

জনার্দন। দিই নে কেন? থাক, উত্তরটা না দেয়াই ভালো।

শেখর। উত্তর থাকলে তো দেবেন।

জনার্দন। Do you want to provoke me?

কমলেশ। [শ্লেষ দিয়ে] চেপে যা শেখর। দুর্বল স্থানে ঘা দিতে নেই। মাষ্টারমশাই রেগে যাচ্ছেন।

জনার্দন। [ক্ষুব্ধ কণ্ঠে] It's nothing but witch hunting. মতের অমিল হলেই কারো ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেয়া, যেভাবেই হোক তাকে জব্দ করা এখনকার একটা রোগ। এ-রোগ না সারলে আমরা শেষ হয়ে যাব, শেষ হয়ে যাবো।

[চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ মনে হতে ফিরে এসে টেবিলের ওপর রাখলেন ও কারো দিকে না তাকিয়েই প্রস্থান করলেন।]

কমলেশ। বড্ড রেগে গেছেন।

অরবিন্দ। ভালোই হয়েছে। তা না হলে উঠতেন কি? বসে বসে শুধু জ্ঞান দিতেন।

শেখর। পুরোনো কমিটিটা ভেঙে দেবার পর থেকেই আমাদের ওপর হাড়ে-হাড়ে চটা।

অনুপম। ঘুঘুর বাসা না ভাঙলে ওই স্কুলে নাকগলাবার উপায় ছিল?

অরবিন্দ। অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের সঙ্গে কোনোভাবে কোওপারেশনই করলেন না উনি।

অনুপম। নতুন স্কুল কমিটির সঙ্গেও প্রায় ননকোওপারেশন।

কমলেশ। টিচার্স কাউন্সিলে ওরাই মেজরিটি।

শেখর। আর একটু চাপ দিতে পারলেই সব সোজা হয়ে আসবে।

কমলেশ। জনার্দনবাবু ধুরন্ধর। মুখে বলেন তিনি কোনো দলেই নেই, তলে তলে আমাদের বিরুদ্ধে শিক্ষক ও ছাত্রদের উস্কানি দিয়ে গণ্ডগোল পাকান।

অরবিন্দ। বেশি বাড়াবাড়ি করেন তো তাঁকে স্কুল ছাড়া করব।

[সুখেনের প্রবেশ]

সুখেন। তোরা একটু বোস্, আমি ঘুরে আসছি।

শেখর। কোথায় যাবি ?

সুখেন। তোদের মিষ্টিমুখ করাতে হবে না !

কমলেশ। এখন কিরে !

অনুপম। ডবল ডেকার।

অরবিন্দ। বাড়াবাড়ি করিসনে সুখেন।

সুখেন। আমার ইচ্ছেয় তো হবে না। মা চান···

শেখর। আর সুবোধ বালকের মতো অমনি চললি মিষ্টির দোকানে !

কমলেশ। মাসিমার ইচ্ছে পূরণ করতেই হবে।

অরবিন্দ। কমলেশ, তুই এমন পেটুক !

কমলেশ। দ্যাখ অরবিন্দ, তুইও কিছু কম যাসনে পেটে ভুখ মুখে লাজ।

অনুপম। বাড়াবাড়ি অবশ্য কিছুতেই ভালো নয়। তবে যদি মাসিমার ইচ্ছে হয়ে থাকে।—

শেখর। খাসা, অনুপম, খাসা। সত্যি তোর তুলনা নেই।

অনুপম। বেশি বকিস নে শেখর। পাতা চেটে খাওয়া অভ্যাস তার আবার অত কথা।

কমলেশ। [স্লোগানের ভঙ্গিতে] তবে মাসিমার ইচ্ছে পূরণ হোক, তাই হোক।

শেখর। যা সুখেন, নিয়ে আয়। আজ তোর জন্মদিনে খাইয়ে আমাদের একে- বারে ফ্ল্যাট করে দে।

[সবাই হেসে উঠে সুখেন বেরিয়ে যাই।]

কমলেশ। চল্ আজ সন্ধ্যার শো-য় সুখেনকে নিয়ে সবাই সিনেমায় যাই।

অনুপম। প্রস্তাবটা মন্দ নয়।

শিখর। মৃণাল সেনের ছবিটা ফার্স্ট প্রাইজ পেল !

অরবিন্দ। বুর্জোয়া গল্প, পাবেই।

কমলেশ। উৎপল দত্ত অভিনয় করেছে সত্যি চমৎকার!

অরবিন্দ। অতিবিপ্লবীর অবক্ষয়ী বাহার।

অনুপম। মাধবী তবে উর্বশী হলো?

শেখর। সিনেমার স্টাররা সবাই উর্বশী।

কমলেশ। এ-বছরের ফুটবল খেলাটা মাঠে মারা গেল।

অরবিন্দ। শোধনবাদীদের ভূমি দখল আন্দোলনটাও।

শেখর। ওটা স্রেফ ভাঁওতা।

কমলেশ। রাজন্য ভাতা দিয়ে বেশ চাল চেলেছে।

অনুপম। আরব ইসরাল বিরোধটা মিটবে বলে মনে হয় না।

অরবিন্দ। আরে আসলে ওটা ডলার-রুবলের ঝগড়া।

শেখর। মস্কো-বন আতাঁত হয়ে গেল।

অরবিন্দ। শোধনবাদের ওটাই চরিত্র।

কমলেশ। এই, সোনালীর বিয়েতে কি দিবিরে?

শেখন। আজই তা ভাবতে হবে!

কমলেশ। তবু?

অনুপম। সবাই মিলে যা হয় একটা কিছু কিনে দেওয়া যাবে।

[একবাক্স সন্দেশ নিয়ে সুখেনের প্রবেশ]

সুখেন। একটু দেরী হয়ে গেল। দোকানে যা ভিড়।

শেখর। কেন? বিয়ের মতো জন্মদিনেরও লগনশা নাকি?

সুখেন। অন্তত মিষ্টিমুখের লগন যে এক তাতো দেখতেই পাচ্ছিস।

[সুখেনের কক্ষান্তরে প্রস্থান।]

অনুপম। সুখেনের মনটা খুব সরল।

অরবিন্দ। ভয় তো সেখানেই। কখন যে কিসে ওর সেন্টিমেন্টে লাগবে।

সুখেন। [নেপথ্য থেকে] না মা, ও ফোঁটা আমি পরতে পারব না। [বলতে বলতে সুখেন ঢোকে, পিছনে একটা চন্দনবাটি, ধান, দূর্বা ও সন্দেশের বাক্স নিয়ে সুচেতার প্রবেশ]

সুচেতা জন্মদিনে মায়ের হাতে একটা ফোঁটা নিলে তোর বিপ্লব পেছিয়ে যাবে না শুকু।

সুখেন না-না, হাতে মিষ্টি দেবে নাকি দাও। ওসব রাখো।

শেখর। লজ্জা করে নাকি সুখেন? আমরা না হয় চোখ বুজি।

সুচেতা। ফাজলামো রাখ্।

কমলেশ। বটে! দেখি তুমি কেমন করে ফোঁটা না নিয়ে পার। ধর তো সবাই ওকে।

[সবাই মিলে সুখেনকে জাপটে ধরে]

সুখেন। কি হচ্ছে এসব?

শেখর। দিন তো মাসিমা.ওর কপালে চন্দনের ফোঁটা।

[সুচেতা প্রথমে চন্দনের ফোঁটা ও পরে ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে। সবাই মুখে আঙুল দিয়ে নকল জোকার দেয়। সুচেতা হাসে।]

সুখেন। ফাজিলের দল!

শেখর। শুভদিনের শুভ কাজ।

[সুখেনকে সবাই ছেড়ে দেয়।]

অনুপম। কই মাসিমা, আমাদের ফোঁটা দিলেন না?

শেখর। (অনুপমকে পেছনে সরিয়ে) অনুপম পরে, আমি আগে ফোঁটা নেব

অরবিন্দ। শেখরের আহ্লাদ বেশি। (এগিয়ে গিয়ে) আমাকে আগে ফোঁটা দিন মাসিমা।

কমলেশ। অরবিন্দ গবানন্দ সরো। মাসিমা আমাকে বেশি ভালোবাসেন। আমার দাবি আগে।

সুচেতা। (মৃদু হেসে) তোদের সবাইকে আমি ভালোবাসি। লাইন করে দাঁড়া

[সবাই লাইন করে দাঁড়ায়। সুচেতা সবাইকে ফোঁটা দেয়।]

কমলেশ। কই মাসিমা, আশীর্বাদ করলেন না?

সুচেতা। সবাই দীর্ঘজীবী হ, আর তোদের সুমতি হোক। [সবাইকে সন্দেশ দেয়। দেবতার প্রসাদ নেবার মতো ভঙ্গি করে জোড় হাতে তারা সন্দেশ নেয়। সুখেন তা করে না]

সুচেতা। সুখেন ওদের জল এনে দে।

[সুখেন কক্ষান্তরে যায়।]

কমলেশ। এইরে, মাসিমাকে প্রণামই করা হয়নি।

শেখর। তাই তো, সন্দেশের লোভে ভুলে গেছি।

[সবাই সুচেতাকে প্রণাম করে। সুখেন একটা কাঁচের গ্লাস ও কেটলিতে করে জল নিয়ে আসে]

অনুপম। এই সুখেন, মাকে প্রণাম কর। খালি মায়ের আদর নেয়া, প্রণাম করার নাম নেই।

[সুখেন মাকে প্রণাম করে। বন্ধুরা একগ্লাসে জল ভরে খেতে থাকে।]

সুচেতা। বোস। তোদের চা করে দিচ্ছি।

[সুচেতার কক্ষান্তরে প্রস্থান]

অরবিন্দ। জন্মদিনের প্রথম পর্ব তো হলো। আসল কাজের কথা হোক এবার।

শেখর। কাজ তো ঠিক হয়েই আছে। আজকের মিছিলটা জোর হওয়া চাই।

সুচেতা। (নেপথ্য থেকে) শুধু কেটলিটা দিয়ে যা বাবা।

[কেটলি নিয়ে সুখেনের প্রস্থান]

কমলেশ। কাল মিছিল করে ওরা চ্যালেঞ্জও করেছে। তার উচিত জবাব আমাদের দিতেই হবে।

অনুপম। শ্লোগানগুলো বেশ কড়া হওয়া দরকার।

শেখর। কী কী শ্লোগান হবে ?

অরবিন্দ। এখানে নয় পার্টি অফিসে গিয়ে ঠিক হবে।

[সুখেনের প্রবেশ]

কমলেশ। সুখেন, মিছিলে যাবি তো ? না ঘরে বসে শুধু জন্মদিনই করবি ?

সুখেন। পার্টির ডাকে যাইনি এমন হয়েছে কোনোদিন।

কমলেশ। না, বলছিলাম, মাসিমার আপত্তি থাকতে পারে তো ?

সুখেন। মা কখনো আমাকে বাধা দেন না।

অরবিন্দ। এগারোটায় মিছিল বেরুবে। আর দেরি করা ঠিক হবে না। বেরুবার আগে মিটিং-এ সব ঠিক করে নিতে হবে।

কমলেশ। ভালোভাবে তৈরি হয়ে বেরুতে হবে। (হাত মুঠ করে দেখিয়ে) মাল-মশলা সব ঠিক আছে তো ?

অরবিন্দ। চুপ কর। এমন মুখ পাতলা তুই।

[সুচেতা ট্রে-তে করে চা নিয়ে আসে। সবাই চা নেয়।]

সুচেতা। গত সনে এমন দিনে সুনীতি তোদের মধ্যে ছিল। সারাদিন থেকে কত আনন্দ করল।

অরবিন্দ। আমাদের সঙ্গে তার পোষাল না। আমরা নাকি নয়া-শোধনবাদী।

শেখর। বন্দুকের নলে শক্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে সে এখন।

কমলেশ। পার্লামেণ্ট শুয়োরের খোঁয়াড়।

অনুপম। জোতদার খুন করো।

শেখর। বোমা মেরে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উড়িয়ে দাও।

সুচেতা। মরণবুদ্ধিতে পেয়েছে ওদের। যেমন মারছে তেমন নিজেরাও মরছে।

অরবিন্দ। এসব ছেলেমানুষি করে বিপ্লব হয়না, মাসিমা। বিপ্লবের একমাত্র পথ শ্রেণীসংগ্রাম। অন্ধকারে গুপ্তহত্যা বা ব্যক্তিগত খুনের নীতিতে আমরা বিশ্বাসী নই।

সুখেন। এসব আলোচনা এখানে না করলে হয় না তোদের?

সুচেতা। (বিরক্তভাবে) এসব অলোচনা ছাড়া অন্য কথা তোরা বলিস কখন? সর্বদাই তো কানে আসে—হঠকারীদের খতম করো,—খুনকা বদলা খুন হ্যায়······ [দ্রুতপদে প্রস্থান]

অরবিন্দ। মাসিমাকে কেউ ভুল বুঝিয়েছে।

শেখর। শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে ধারণা এখনো পরিষ্কার হয়নি।

কমলেশ। আরো পড়াশুনো করা দরকার।

অনুপম। সুখেন পার্টিলিটারেচার বাড়িতে আনা দরকারই মনে করে না।

সুখেন। মোটেই তা নয়। মাকে পড়তে বললেই বলেন·· ঢের পড়েছি। তোরা তো এক তরফা কথা বলিস।

অরবিন্দ। বিপ্লবীরা যে এককথাই বলে সেটা বুঝিয়ে দেয়া তো আমাদের কাজ।

সুখেন। সুনীতি আমাদের এ-কথাটায়ই আপত্তি করতো। সে বলতো—বিপ্লবীরা তো যন্ত্র নয় যে তাদের মনে প্রশ্ন থাকবে না।

অরবিন্দ। আমরা বিপ্লবের সৈনিক। পদে পদে প্রশ্ন তুললে সৈনিক সংগ্রাম করতে পারে না। সেনাপতির আদেশ মেনে চলাই তার কাজ। পার্টি ডিসিপ্লিন না মানলে বিপ্লবী পার্টির সভ্য থাকা চলে না।

অনুপম। ব্যক্তিগত জীবনেও?

অরবিন্দ। বিপ্লবীর কোনো ব্যক্তিগত জীবন থাকতে নেই।

সুখেন। ভুল করি আমরা সেখানেই যেখানে মনে করি দরদীরাও পার্টি সভ্যেরই মতো।

অরবিন্দ। সুখেন।

সুখেন। হ্যাঁ তাই। আমরা আমাদের মতটাকে সবাইর ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইনে কি?

অরবিন্দ। কখ্খনো না।

সুখেন। তা হলে কারো মনে প্রশ্ন জাগলে আমরা তা চাপা দিতে চাই কেন ?

অরবিন্দ। সুখেন, তোকেও কি সুনীতের রোগে পেল নাকি ?

সুখেন। হাজার মনে হাজার প্রশ্ন উঠবে। তার উত্তর আমাদের দিতে হবে।

অরবিন্দ। শ্রেণীসংগ্রামের শত্রুরাই হাজার প্রশ্ন তুলছে।

সুখেন। লক্ষ মনে যদি লক্ষ প্রশ্ন থাকে তবে তা দাবিয়ে দেবার সাধ্য আমাদের নেই।

অরবিন্দ। লক্ষ জনের কথা ছেড়ে দে। বল তোর মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

সুখেন। সে প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হবে। কারণ আমি যখন পার্টির একজন সভ্য তখন সেটা আমার একার প্রশ্ন নয়। নিশ্চই য়বহুজনের প্রশ্ন।

অরবিন্দ। নেতৃত্বকে প্রশ্ন করিস—সেখান থেকেই উত্তর পাবি।

সুখেন। না। আমরা এখানে একসঙ্গে কাজ করি। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই উত্তর খুঁজে পেতে হবে।

অরবিন্দ। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে অস্বীকার করে ?

সুখেন। আমার মাকে কেন্দ্রীয় নেতারা চেনেন ?

অরবিন্দ। তা কি করে সম্ভব।

সুখেন। আমার মায়ের মতো যদি আরো অনেক মায়ের প্রশ্ন থাকে ?

অরবিন্দ। সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভব নয়।

সুখেন। এই করেই সুনীতের মতো সাচ্চা কমরেড কে আমরা হারিয়েছি।

অনুপম। তাকে রাখতে হলে তো তার মতবাদটা মেনে নিতে হতো ?

কমলেশ। তার অর্থ জনারণ্য ছেড়ে অরণ্যে গিয়ে বিপ্লব করা।

সুখেন। না। তাকে আমরা প্রকৃত রাজনীতি দিতে পারিনি।

অরবিন্দ। তুই দিলেই পরতিস।

সুখেন। পারিনি, কারণ আমার রাজনৈতিক জ্ঞান তোদের কারো চাইতে বেশি নয়।

শেখর। এখন তো খুব জ্ঞান দিচ্ছিস।

সুখেন। শেখর, বিদ্রূপ করে লাভ নেই। সুনীতির কথা শুনেও তোরা এভাবেই বিদ্রূপ করতিস। প্রশ্ন তাকে পাগল করে তুলেছিল, পথ চেয়েছিল সে তার সততার অভাব ছিল না। পথ না পেয়ে সেই বৈপ্লবিক প্রেরণাই তাকে ভুলপথে নিয়ে গেল।

কমলেশ। অরবিন্দ, এখন থেকে পার্টির কাজকর্ম শিকেয় তুলে রেখে মার্কস-বাদের একটা টোল খুলে দে।

অনুপম। আমরা ব্রহ্মচারী হয়ে সেখানে জ্ঞান অর্জন করবো।

সুখেন। পরিহাস! প্রশ্নকে পরিহাস করলে তোরা নিজেরাই একদিন পরিহাসের পাত্র হয়ে উঠবি।

অরবিন্দ। (সুখেনকে) তুই তাহলে মিছিলে যাচ্ছিস নে?

সুখেন। কেন যাবো না। প্রশ্ন থাকলেও পার্টির প্রতি আনুগত্য তোদের কারো চাইতে আমার কম নয়।

অরবিন্দ। That's like a comrade. চল্, আর দেরি নয়।

শেখর। চল, চল্, উত্তর যারা চেয়েছে তাদের উত্তর দিয়ে আসি। সুনীতের দল আজ উচিত জবাব পাবে।

[একে একে সবাই বেরিয়ে যায়। সুখেন বেরুতে যাবে এমন সময় সুচেতা প্রবেশ করে]

সুচেতা। শুকু।

সুখেন। (থমকে দাঁড়িয়ে) বলো মা।

সুচেতা। এখন না বেরুলেই নয়।

সুখেন। দেরী হবে না। যাব আর আসব।

সুচেতা। মনে হয় আজ তোরা একটা কিছু করবি।

সুখেন। কিছু না। মিছিল তো আমার ফি-রোববারই বার করি।

সুচেতা। কি একটা আলোচনা হচ্ছিল তোদের। আমি থাকায় চেপে গেলি।

সুখেন। এত ভয় কেন মা তোমার!

সুচেতা। কোন্ মা আজ ভয়ে ভয়ে না আছেরে? সবাইকে ভয় দেখানই তো আজ রাজনীতি। ভালোবাসা দিয়ে কেউ কাছে টানতে চায় না, চায় ভয় দেখিয়ে জয় করতে।

সুখেন। সবাইকে ভালোবাসা যায় না, মা। শত্রুকে ঘৃণা করতেই হবে। গান্ধীবাদের যুগ আর নেই।

[সুখেনের প্রস্থান। সুচেতা বিস্মিত হয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে ও পরে কাপ-ডিসগুলো ও কাঁচের গ্লাসটা ট্রেতে তোলে। বাজার নিয়ে ভবেশের প্রবেশ]

সুচেতা। এত দেরি করলে! কখন রেঁধে নামাব?

ভবেশ। কি করব। আধ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে তবে মাংস পেলাম। মনে হচ্ছিল এর চেয়ে নিজের গায়ের মাংস কেটে খাওয়া ভালো।

সুচেতা। ভেব না। দু-দিন বাদে হয়ত মানুষ মানুষের মাংসই খাবে।

[ট্রে টা রেখে দিয়ে বাজার নিয়ে সুচেতা কক্ষান্তরে যায়। ভবেশ একটা চেয়ারে বসে ক্লান্তি দূর করে।]

ভবেশ। [স্বগত] সুচেতা মিথ্যে বলেনি। সময় সময় মনে হয় আদিম মানুষের হিংস্রতা মরেনি শুধু সভ্যতার আবরু পড়ে আছে। প্রতিহিংসার ব্যারোমিটার চড়লেই আবরুটা ফেলে দিয়ে সেটা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

[জনার্দনের প্রবেশ]

জনার্দন। ভবেশবাবু আছেন, ভালোই হলো।

ভবেশ। বসুন।

জনার্দন। [চৌকির ধারে বসে] দেখুন, দুপুরে আমার আসা সম্ভব হবে না। রাত্রের দিকে এসে আমি যা হয় চারটি মুখে দিয়ে যাব।

ভবেশ। কেন দুপুরে অসুবিধা কি ? আজ রোববার আপনার স্কুল নেই।

জনার্দন। স্কুল থাকলেও আটকাতো না। ক্লাশ আর হচ্ছে কই! ঘণ্টা পড়ে, মাস্টার মশাইরা হাজিরা খাতায় সই করেন, তারপরে চলে যান। এসে একদল ছাত্র বললে, আজ আমাদের অমুক কারণে স্কুল বন্ধ। পরদিনই বিরুদ্ধ পক্ষের অন্যদল এসে শ্লোগান দিতে শুরু করল।— অমুকের প্রতিবাদে ছাত্র ধর্মঘট। কোনোদিন বেঞ্চি ও চেয়ার টেবিল ভাঙলো, কোনোদিন বা হাতাহাতি ঘুষোঘুষি হয়ে গেল। তারপর দপ্তরীকে বলি ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিতে। যাত্রার আসর ফাঁকা হয়ে যায়। তখন একা বসে থেকে স্কুল পাহারা দেবার তো মানে হয় না। আমিও চলে আসি।

ভবেশ। স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কোথায়ই বা লেখা পড়া হচ্ছে বলুন ? ছাত্রদের খাতায় নাম রাখতে হয় তাই রাখে। মাইনে পাই বলে যেতে হয়, আমরা যাই। ক্লাশের বেঞ্চগুলোর যদি চোখ কান ও মস্তিষ্ক থাকত ক্লাস করা চলতো। তা যাই হোক, এ-বেলাই আসছেন তো ?

জনার্দন। না, দেখুন, বলছিলাম কি··· [ইতস্তত করে] বলব ?

ভবেশ। বলুন না। অত কিন্তু কিন্তু কচ্ছেন কেন?

জনার্দন। বলছিলাম, এ-বেলা তো সুখেনের বন্ধুরা আমোদ আহ্লাদ করে খাবে···

ভবেশ। তা খাবে ওরা। আর সব পাড়ারই তো ছেলে। আপনার কিছু অসুবিধা হবে না।

জনার্দন। না, না, অসুবিধে হবে কেন, অসুবিধে হবে কেন। তবে ওদেরই বাধো বাধো ঠেকবে। প্রাণখুলে আমোদ করতে পারবে না।

ভবেশ। আপনার জন্যে না হয় আলাদা ঘরে ব্যবস্থা করা হবে।

জনার্দন। না, না, সেটাও ভাল দেখাবে না। এক বাড়িতে খেতে এসে একটা আলাদা আলাদা ভাব ভালো কি? তার চেয়ে বরং···

ভবেশ। আপনার আটকাচ্ছে কোথায় বলুন তো জনার্দনবাবু?

জনার্দন। তবে খুলেই বলি। [সুচেতা এসে ট্রে নিয়ে যায়] দেখুন ভবেশবাবু এক জায়গায় যদি পাঁচটা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, একেবারে মুখ বুজে থাকা যায় না।

ভবেশ। মুখ বুজে থাকার দরকারই বা কি?

জনার্দন। আপনি যদি সব কথায়ই সায় দিয়ে যান তবে সেটা খোশামোদের মতো শোনায় না কি?

ভবেশ। তা তো বটেই।

জনার্দন। কোনো অসঙ্গত কথা শুনে প্রতিবাদ না করাটাও সত্যকে চাপা দেয়ারই সামিল।

ভবেশ। ভীরুতাও বলতে পারেন।

জনার্দন। সত্য প্রকাশে সাহস দেখালে আপনি হয়তো অপমানিত হবেন। [সুচেতা ঢুকে দুটো করে সন্দেশ দু-জনকে দেয়। দু-কাপ চা ও দু-গ্লাস জল রেখে প্রস্থানোদ্যত হয়]

জনার্দন। আবার সন্দেশ কেন?

সুচেতা। শুকুর জন্মদিনে মিষ্টিমুখ করবেন না। [সুচেতার প্রস্থান]

ভবেশ। সুখেন আপনাকে কোনো অপমানজনক কথা বলেছে নাকি?

জনার্দন। [খেতে খেতে] না, না, সুখেন করতে পারে না। সে তেমন ছেলেই নয়। কিন্তু সবারই মুখে তো লাগাম নেই। আকার-ইঙ্গিতে এমন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব দেখায় সেটা চুপ করে বসে থেকে সহ্য করা

মুশকিল। আমাদের ভেতরের আগুন নাকি শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখন উনুনের বাসী ছাইয়ের মতো আবর্জনা মাত্র। ওদের শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বটা তাই আমাদের মাথায় ঢোকে না। আমরা নাকি এখন চতুষ্পদ জন্তুর মত গলিত চর্বন করি।

ভবেশ। শক্তির দাপাদাপি যেখানে, অপচয় সেখানেই জনার্দনবাবু।

জনার্দন। [খেতে খেতে] শেক্সপীয়র সেজন্যেই তাঁর fool-এর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন : Speak less have more than thou showest than thou knowest.

ভবেশ। শেক্সপীয়র মানব চরিত্রের খবর ভালো রাখতেন কিনা। ...

[দু-জনে চায়ের কাপ হাতে নেয়। দূরে একটা উত্তেজিত জনতার কোলাহল শোনা যায়। দু-জনেই উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন। অকস্মাৎ অনতিদূরে একটা বোমার আওয়াজ হয়। রাস্তা দিয়ে লোকজনকে ছুটোছুটি করতে দেখা যায়। কোলাহল বাড়ে। সুচেতা উদ্বিগ্ন হয়ে প্রবেশ করে। রাস্তার দিকে তাকায়।]

সুচেতা। কি হলো! বুঝতে পারছি নে। [সোমেন ছুটতে ছুটতে দোর গোড়ায় এসে দাঁড়ায়। তার হাতে একটা লম্বা লাঠি।]

সুচেতা। কি হলো সোমেন?

সোমেন। সুখেনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

তিনজন। [এক সঙ্গে] খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

সোমেন। হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গেই ছিল। বোমা ফাটার পর আমরা ছিটকে পড়ি। তারপর থেকে সুখেনকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সুচেতা। আমি জানতাম, আমি জানতাম আমার এমন সর্বনাশ হবে। আমি খুঁজে বার করবো, যেখান থেকেই হোক আমার শুকুকে খুঁজে বার করবো।

[হঠাৎ সুখেনের প্রবেশ]

সুখেন। মা!

সুচেতা। এসেছিস বাবা, এসেছিস। হাজার দিন তোকে বারণ করেছি...।

সুখেন। সেসব কথা এখন থাক, মা। সোমেন তোরা কেন রটিয়েছিস আমাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?

সোমেন। কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

সুখেন। যেখানেই থাকি, আমি যে মরিনি তা তো দেখতেই পাচ্ছিস। এখন যা।

সোমেন। তুই যাবিনে ?

সুখেন। পরে যাব।

সোমেন। মায়ের আঁচল ধরে থাকবি ? You are a coward.

[রাগতভাবে সোমেনের প্রস্থান]

ভবেশ। [চা শেষ করে] Sometimes cowardice is better than bravery.

জনার্দন। [কাপ রেখে] আমি এখন উঠি।

ভবেশ। একটু দেখে যান। Stray dogs are about.

জনার্দন। এখানেও তো বিপদ হতে পারে।

ভবেশ। বিপদের সময় সাহস করে দাঁড়াতে হবে। এড়িয়ে নিরাপদ হতে পারবেন না। [আবার কোলাহল]

সুচেতা। শুকু, কি হয়েছে বল ?

সুখেন। বুঝতেই পারছো।

সুচেতা। বোমা ফাটালো কারা ?

সুখেন। সে কথা পরে বলবো। সুনীতকে বোধহয় বাঁচানো গেল না, মা।

সুচেতা। কেন, কি হয়েছে তার ?

সুখেন। ধরা পড়েছে।

সুচেতা। পুলিশের হাতে ?

সুখেন। না।

সুচেতা। ও বুঝেছি। খুব মারছে বুঝি ?

সুখেন। মা, সুনীত এখন আমাদের শত্রু। আমি দেখলাম ঘোষ বাড়ির পেছনের গলি দিয়ে হেঁটে চলেছে। ওকে দেখে কেমন মায়া হলো। বললাম, সুনীত, শত্রু হলেও আমি চাইনে তুই খুন হোস। বাঁ দিক দিয়ে পালিয়ে যা। ডানদিকে গেলে ধরা পড়বি। শুনে সে বললে, আত্মরক্ষা কি করে করতে হয় আমি জানি। আমি তোকে সহ্য করতে পারিনে। যদি বাঁচতে চাস এই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে থেকে দূর হ।

স্নচেতা। তারপর ?

স্নখেন। তারপর আর বলতে পারব না, মা। এতক্ষণ সে বেঁচে আছে কি নেই…

স্নচেতা। তাকে বাঁচাতেই হবে। আমি তাকে বাঁচাবো…আমি যে মা…।

[গমনোদ্যত হয়]

ভবেশ। আমিও যাব।

স্নচেতা। না, তুমি শুকুকে আগলাও।

স্নখেন। আমি কোথাও যাব না, মা।

স্নচেতা। না—না, আমি তোদের কাউকে বিশ্বাস করিনে, কাউকে বিশ্বাস করিনে। একাই যাবো আমি, একা—আমি যে মা।

[কোলাহল স্পষ্টতর হয়। স্নখেন জানলার ধারে দাঁড়ায় ও বাহিরের দিকে তাকিয়ে থাকে।]

জনার্দন। কেমন হলো !

ভবেশ। অনেকক্ষণ মেঘের আড়ালে ঢাকা থাকার পর আকাশে সূর্যটা হঠাৎ দেখা দিলে আলোটা প্রথমে খানিকটা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, জনার্দন বাবু।

জনার্দন। আপনি আলো দেখতে পাচ্ছেন—আমি তো দেখছি শুধু অন্ধকার।

ভবেশ। উষার আলো দেখা দিবার আগে অন্ধকার বেশি হয় জানেন তো ?

জনার্দন। যা অবস্থা তাতে আর সূক্ষ্ম কথা মাথায় ঢোকে না মশাই।

ভবেশ। সূক্ষ্ম অনুভূতি ছাড়া তো আপনি স্থূলত্বকে আঘাত করতে পারবেন না।

জনার্দন। তার মূল্য দেয় কে।

ভবেশ। দেবে-দেবে, একদিন দেবে। তাৎক্ষণিক বিপর্যয়ে মানুষের উপর বিশ্বাস হারাবেন না।

জনার্দন। আমার ভালো লাগছে না। স্নখেনের মা একা গেলেন……

ভবেশ। আপনি ভাববেন না। স্নচেতা একাই একশো।

স্নখেন। [ব্যাকুল কণ্ঠে] স্ননীতকে ওরা মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে……

[ভবেশ, জনার্দন জানালার কাছে যায়।]

জনার্দন। কি ভয়ঙ্কর। একজন থান ইট তুলেছে ওকে মারতে। এ-দশা আর আমি দেখতে পারছিনে। চোখের সামনে খুন হয়ে যাবে অথচ কিছু করার নেই। কি অসহায় আমরা। [জনার্দন একটা

চেয়ারে বসে মাথা হেট করে ভাবতে থাকে। কোলাহল বাড়ে। ভবেশ এসে জনার্দনকে সুস্থ করার চেষ্টা করে।]

সুখেন। [উল্লাসে] মা ছুটে গিয়ে সুনীতকে জড়িয়ে ধরেছে। না ওরা কিছুতেই ছাড়বে না। মা সুনীতকে বুকের নিচে রেখে নিজের মাথাটা ওদের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

জনার্দন। [দুর্বল কণ্ঠে] ওরা মারছে না তো ?

সুখেন। না মারতে পারছে না। মার সঙ্গে তর্ক করছে।

ভবেশ। ওরা হার মানবেই, মানতেই হবে। হাজার মুষ্টির চেয়ে একটা মায়ের প্রাণে শক্তি বেশি।

জনার্দন। তাই হোক্ ভবেশবাবু, তাই হোক।

সুখেন। সুনীতকে মা নিয়ে আসছে।……ওরাও আসছে পিছনে পিছনে।

জনার্দন। [বিচলিত কণ্ঠে] এখানে এসে হামলা করবে না তো ?

ভবেশ। আগুনে জল ঢালতে গেলে নিজের গায়ে খানিকটা তাপ লাগে বৈকি। তা-বলে আগুনকে তো আর বাড়তে দেয়া যায় না। অত বিচলিত হবেন না। যত ভয় পাবেন ততই ওদের ভয় দেখাবার সাহস বাড়বে। [সুনীতকে নিয়ে সুচেতার প্রবেশ। সুনীতের কপালে দু-এক জায়গা দিয়ে রক্ত ঝরছে। সুখেনের চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নেয়। সুখেনকে বিষণ্ণ দেখায়। বাইরে চিৎকার—খুনীকে আমরা ছাড়বো না—ওর বিচার হবে। কাউকে রেহাই দেব না—খুনীকে যারা আশ্রয় দেয় তারাও খুনী—খুনের বদলে খুন চাই—হঠকারীর রক্ত চাই -ইত্যাদি]

সুচেতা। [ভবেশকে] ওকে পাশের ঘরে নিয়ে যাও। আলমারিতে ডেটল আছে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দাও। দরকার হলে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ো।

[ভবেশ ও সুনীতের প্রস্থান]

সুখেন। আমিও ওর কাছে যাই।

সুচেতা। না, তোর বাবা একাই পারবে।

জনার্দন। [ভয়ে কাঁপছে] আমি কি করবো ?

সুচেতা। এখানেই চুপ করে বসে থাকুন। আপনি কোনো কথা বলবেন না। [সুচেতা উদ্বিগ্ন হয়ে পায়চারি করতে থাকে। অরবিন্দ, কমলেশ,

শেখর, অনুপম, সোমেন ও তাদের সঙ্গে আরো তিন-চার-জন যুবক ঘরের মধ্যে ঢোকে]

সুচেতা। কি চাই তোদের ?

সোমেন। সুনীতকে চাই।

সুচেতা। পাবিনে।

অরবিন্দ। আপনি তাকে আটকিয়ে রাখতে পারবেন না।

সুচেতা। আমার দেহে প্রাণ থাকতে তোরা তাকে নিয়ে যেতে পারবি নে।

জনৈক যুবক। বোমা মেরে বাড়ি উড়িয়ে দেব।

সুচেতা। [এগিয়ে গিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে] মার না—এখনই মার না।

দ্বিতীয় যুবক। মারবোই তো ?

অরবিন্দ। [ধমক দিয়ে] এই, চুপ কর। মাসিমা, আপনি আমাদের লোক। আপনি যদি শত্রুকে প্রশ্রয় দেন পরিণাম খারাপ হবে।

সুচেতা তোদের লোক বলেই তো সুনীতকে বাঁচাবো। এ-সর্বনাশা পথ তোরা ছাড়। এমন তো তোরা ছিলিনে। এ খুনের নেশা তোদের মাথায় কে ঢোকালো। ভাইয়ের বুকে ভাই ছুরি বসাবে, ধারালো অস্ত্র দিয়ে ধড় থেকে মুণ্ডু খসাবে, অন্ধকারে খুন করবে—বন্ধু বন্ধুকে চিনবে না, ভাই ভাইকে বিশ্বাস করতে পারবে না।......

অরবিন্দ শ্রেণীসংগ্রামে তাই হয়, মাসিমা। সমস্ত সম্পর্ক বদলে যায়।

সুচেতা। হাঁ, মা-ছেলে, ভাই-বন্ধু, প্রতিবেশী, সবাইর সম্পর্ক বদলে যায় ! শ্রেণীসংগ্রাম ! প্রতিদিন খবরের কাগজ খুলি আর মন বিষাদে ভরে যায়। খালি খুন আর খুন। শ্রমিক শ্রমিককে খুন করছে। কৃষক কৃষককে খুন করছে, বন্ধুর বুকে বন্ধু ছুরি বসাচ্ছে। এই কি তোদের বিপ্লব ? যাদের তোরা শত্রু বলিস সেই টাটা-বিড়লাদের কতটুকু ক্ষতি হচ্ছে এতে ? প্রাণভয়ে মানুষ অস্থির। একদিকে পুলিশের দাপট, আরেক দিকে বিপ্লবের নামে নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি। কোন দিকে যাবে মানুষ।

সোমেন। আপনাকে রাজনৈতিক জ্ঞান দিতে হবে না।

সুচেতা। জ্ঞান তো তোরাই দিস। শুনতে ভালো না লাগে চলে যা।

শেখর। সুনীতকে দিন। আমরা চলে যাচ্ছি।

সুচেতা।. কি করবি তাকে নিয়ে ?

কমলেশ। তার বিচার হবে।

সুচেতা। কি করেছে সে ?

সোমেন। সে বোমা মেরেছে।

জনার্দন। বোমা মেরেছে, তাকে পুলিশের হাতে দিলেই হয়।

সোমেন। চুপ করুন আপনি। ভেজা বেড়ালটি হয়ে বসে আছেন। আপনাদের প্রশ্রয় পেয়েই তো ওরা···

অনুপম। মাসিমা, ঝামেলা বাড়াবেন না। এরপর জনতা যদি আপনার বাড়িতে এসে হামলা করে আমরা ঠেকাতে পারব না।

সুচেতা। [দৃপ্তকণ্ঠে] জনতা! আসুক-না জনতা। সেই জনতার মুখগুলোকে ভালো করে চিনে নেওয়া যাবে।

অরবিন্দ। সুনীতকে ছেড়ে দিন। আমরা ওর কিছু করব না।

সুচেতা। ওকে মারা হলো কেন ?

অরবিন্দ। ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে মেরেছে।

সুচেতা। তোরা তো ছিলি, ঠেকালিনে কেন ?

অরবিন্দ। ও ঠেকানো যায় না।

সুচেতা। তবে সুনীতকে তোদের হাতে ছেড়ে দেব কোন্ ভরসায়।

সোমেন। রাখতেও পারবেন না। তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাব। গণ-আদালতে তার বিচার হবে।

সুচেতা। বিচার। আগে নিজেদের বিচার কর—তার পর করবি অন্যের বিচার।

অরবিন্দ। সুনীত বোমা মেরেছে এটাতো সত্য।

সুখেন। না সুনীত বোমা মারেনি।

অরবিন্দ। তবে কে মেরেছে ?

সুখেন। কে মেরেছে তুইও জানিস অরবিন্দ।

দলবদ্ধ ভাবে—[কয়েকজন] বিশ্বাসঘাতক, তোকেও শেষ করব। [সুখেনের দিকে এগিয়ে যায়। সুচেতা রুখে দাঁড়ায়।]

সুচেতা। সাবধান! আমি শুধু সুখেনের মা নই, তোদেরও মা। সাহস থাকে আমার গায়ে হাত তোল্। [সবাই থমকে দাঁড়ায়।] কই মার, মার আমাকে ?

[এক-পা দু-পা করে সবাই পেছনে সরে যায়।]

অরবিন্দ। চল্, এর বিচার পরে হবে।

সোমেন। সুখেনের মা বলে রেহাই পাবেন না। এর সমুচিত জবাব দিতেই হবে।

[একে একে সবাইর প্রস্থান। সুচেতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নেপথ্যে শ্লোগান···খুনীকে আশ্রয় দেয়া চলবে না—চলবে না···বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি চাই—শাস্তি চাই···হঠকারীদের খতম করো···খতম করো ইত্যাদি।]

জনার্দন। [ভীতকণ্ঠে] আবার যদি ওরা আসে।

সুচেতা। [আর্দ্রকণ্ঠে] আসুক। আমি পারবো না, পারব না। মা হয়ে প্রাণ থাকতে একটা জলজ্যান্ত ছেলেকে আমি হাড়িকাঠের দিকে ঠেলে দিতে পারবো না।

[ভবেশের প্রবেশ]

ভবেশ। কোন মা-ই তা পারে না

জনার্দন। ভবেশবাবু, আপনাদের বোধহয় এখানে আর থাকা চলবে না।

ভবেশ। কোথায় যাবো ভাই? রক্তের হোলি খেলাতো আজ সর্বত্র। [সুচেতাকে] দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আজ শুকুর জন্মদিন, উৎসব করতে হবে তো?

সুচেতা। [কান্নায় ভেঙে পড়ে] ভালো লাগে না, আমার কিছু ভালো লাগে না।

ভবেশ। কাঁদবে না, কাঁদবে না। আজই তো সবচেয়ে শুভদিন গো। মরণকে হটিয়ে জীবনের উৎসব। [পাশের ঘরে গিয়ে সুনীতকে নিয়ে আসে। সুনীতের মাথায় ব্যাণ্ডেজ] নাও, নাও, ওকে আশীর্বাদ করো। তোমার আশীর্বাদে ওর উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল হবে। সুনীত মাসিমাকে প্রণাম কর। [সুনীত প্রণাম করে। সুচেতা তার মাথায় আশীর্বাদ করার পর তাকে বুকে চেপে ধরে কেঁদে ওঠে] মেঘে শুধু বজ্রবিদ্যুৎই থাকে না, বুকভরা তার বর্ষণের জলও থাকে। [এগিয়ে গিয়ে সুনীতের মাথায় হাত বুলোতে থাকে।] সুনীত, তোদের জেনারেশনের অস্থিরতার কথা আমি বুঝি। এখন একটা অন্ধকারে কেউ স্থির থাকতে পারে না। সবাই চায় আলো। কিন্তু অসহিষ্ণুতায় অন্ধকার আরও বাড়ে। বিপ্লবীর বীজ অঙ্কুর মেলে লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি মানুষের মনে। তাকে বাড়িয়ে দেয়ার, সতেজ করাই বিপ্লবীর কাজ। শক্তির উৎস বন্দুকের নল নয়, মানুষ। মানুষকে ভয় দেখিয়ে কি সঙ্গে পাবি?

বিপ্লব তো অঙ্কুর মেলেছে মাঠে খামারে, কলে কারখানায় গরিবের ভাঙা ঘরে। একদিন দেখবি ধানের ক্ষেতের লক্ষ কোটি শীষের মতো তারা একসঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সেদিন বিপ্লবের ফসল তুলতে হবে ঘরে। আর আমরা সবাই মিলে সেই শুভদিনটিতে করব বিজয়োৎসব—শুরু হবে সৃষ্টির মহাপর্ব। [সুচেতাকে] যাও, যাও, সুনীতকে মিষ্টিমুখ করাও। শুকুর জন্মদিনের উৎসব সার্থক হোক।

[সবার মুখে হাসি ফুটে ওঠে।]

[ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে]

পুস্তক-পরিচয়

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা। ভি. বিডনিক। মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। ছ-টাকা

বিংশ শতাব্দীতে quantum mechanics বা কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা পরমাণু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক ও অপরিহার্য মতবাদ রূপে পরিগণিত হয়েছে। মানুষের সাধারণ অনুভূতির বাইরে বিজ্ঞান জগতের এমন বহু ঘটনা রয়েছে, যার ব্যাখ্যা কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে অসুবিধা এই যে, গণিতের দুর্গম পথ এড়িয়ে এই বিষয়টি বোধগম্য নয়—তবে যাঁরা বিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তনের সাথে কিছুটা পরিচিত হয়েছেন তাঁদের পক্ষে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা যে দুর্বোধ্য নয় তা সম্প্রতি প্রকাশিত ঐ-সংক্রান্ত কয়েকটি বিদেশী পুস্তকের জনপ্রিয়তা থেকে অনুমান করা যায়।

১৮৯৭ খৃঃ টমসন্ যখন ইলেকট্রন্ আবিষ্কার করেন, তখন এই কণিকাগুলিও যে নিউটনীয় বলবিদ্যা মেনে চলবে এরকম ধারণা ছিল। ১৮০৩ খৃঃ ইয়ং-এর আলোর সমবর্তন বা diffraction পরীক্ষায় আলোর যে তরঙ্গ-রূপটি দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়েছিল, ১৮৬৪ খৃঃ ম্যাক্সওয়েল্ আলো ও বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করে আলোর সেই তরঙ্গবাদ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পরমাণুর গঠনবিন্যাস, এক্স-রশ্মি ও পদার্থের তেজস্ক্রিয়ার সমস্যাগুলি পুরাতন মতবাদগুলির মূলে আঘাত হানল। ১৯০০ খৃঃ প্ল্যাঙ্ক কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ বর্ণালীর বিশ্লেষণ (যা পুরাতন মতবাদ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না) করতে গিয়ে বিকিরণের কোয়াণ্টা বা কণিকারূপের প্রতিষ্ঠা করলেন। আলো বা যে-কোনো শক্তির বিকিরণ কখনো তরঙ্গাকার আবার কখনো কণিকার মতো এই দ্বৈতবাদ থেকে জন্মলাভ করল কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা। ক্রমশ দেখা গেল শুধু বিকিরণ নয়, পদার্থের বিভিন্ন ভৌত ধর্মেও (যেমন কার্বন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ, পরমাণুর চুম্বকীয় ভ্রামক ইত্যাদি) পরিমাপিত মানগুলি নিরবচ্ছিন্ন নয়। ১৯২৪ খৃঃ ডি. ব্রগ্‌লী জড়পদার্থ কণা ইলেকট্রন্ ইত্যাদির তরঙ্গরূপ প্রমাণ করলেন—ফলে জড়পদার্থের ক্ষেত্রে কণা ও তরঙ্গরূপ এই দ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা হলো। প্ল্যাঙ্ক ও ডি. ব্রগ্‌লী শক্তি ও জড়ের ক্ষেত্রে দ্বৈতবাদ দিয়ে যে-সমন্বয় সাধন করলেন তাতে বৈজ্ঞানিক

পরীক্ষার যে-ফলগুলি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি, তা এখন সম্ভব হলো। জড় বা শক্তির কণাকে তরঙ্গগুচ্ছ বা wave packet আকার ধরে নিয়ে তাদের অবস্থিতির সম্ভাবনা কোথায় এবং কতটুকু তা বলা সম্ভব হলো। অবশ্য এই সমস্ত প্রচেষ্টা যথেষ্ট গণিত-নির্ভর সন্দেহ নাই। তবে ১৯০০ খৃঃ থেকে বিজ্ঞানজগতে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বিজ্ঞানের যে-অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে সাধারণ পাঠকও যে গণিতের সাহায্য ছাড়াই কিছু জ্ঞানলাভ করতে পারেন ভি. রিড্‌নিক্ লিখিত বর্তমান পুস্তকখানি তার একটি উদাহরণ। বর্তমান কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার পরিধি শুধু পরমাণুজগতে আবদ্ধ নয়, রসায়ন, কঠিন পদার্থতত্ত্ব বা solid state physics প্রভৃতিতেও এর প্রয়োগ অপরিহার্য। রিড্‌নিক্ সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট করবার মতো একটি চমৎকার আঙ্গিক দিয়ে বইটি আগাগোড়া লিখেছেন। বইটি পড়ে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক-কিছুই জানা সম্ভব হবে। এর প্রথম অধ্যায়ে নিউটনীয় বলবিদ্যার সীমারেখা কোথায় এবং কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার সূত্রপাত আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্ল্যাঙ্কের আবিষ্কারের ভিত্তিতে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ডি. ব্রগ্‌লীর কণার দ্বৈতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে যথাক্রমে "নূতন তত্ত্বের পদক্ষেপ" ও "বোরের তত্ত্ব থেকে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা," এই দুটি অধ্যায়ে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার তাত্ত্বিক প্রকরণ-গুলির ব্যাখ্যা রয়েছে। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যথাক্রমে (১) ক্রিষ্ট্যাল, পরমাণু ও অণুজগতে, (২) পরমাণুকেন্দ্রে, (৩) মৌলিক কণার ক্ষেত্রে কিভাবে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার প্রয়োগ হয় ও ফলে যেসব রহস্যের সমাধান সম্ভব হয়েছে তার চমৎকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রধানত এই তিনটি অধ্যায় থেকে পদার্থ বিজ্ঞানের জানা ও অজানা বহু রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। এমন কি ইলেক্‌ট্রনের ভগ্নাংশ বিদ্যুৎ-আধান-বিশিষ্ট কোয়ার্ক (যার বাস্তব আবিষ্কারের চেষ্টায় এখন বিজ্ঞান-জগত তোলপাড় হচ্ছে) সম্পর্কেও পাঠকেরা কিছুটা ধারণা পাবেন।

রিডনিকের বইখানির ইংরেজি সংস্করণের বর্তমান বাঙলা অনুবাদ করেছেন শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী, শ্রীসুমিত চক্রবর্তী, শ্রীসনৎ বসু ও ডঃ জয়ন্ত বসু ; সম্পাদনা করেছেন ডঃ জয়ন্ত বসু ও অধ্যাপক অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। বইটির ভূমিকা লিখেছেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। বইটির অনুবাদ যথেষ্ট মূলানুগ হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত বইয়ে এতটা মূলানুগ হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে

মনে হয় না—কারণ তাতে অনেক সময় বিষয়বস্তুতে কিছুটা আড়ষ্টতা আসে। তবে এক্ষেত্রে মূলানুগ হওয়া সত্ত্বেও অনুবাদকগণ সহজ ভাষা ব্যবহার করে বইটি আকর্ষণীয় করার সার্থক চেষ্টা করেছেন। অনুবাদের মাধ্যমে বইটিতে অনেক-গুলি নূতন পারিভাষিক শব্দও যোগ করতে হয়েছে—যা বাঙলার বিজ্ঞান সাহিত্যে নূতন সংযোজন বলে গণ্য হবে। অবশ্য কয়েকটি পরিভাষা সম্পর্কে পরিবর্তনের হয়ত অবকাশ আছে।

সে যাহোক, বাঙালি পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বইটি যথেষ্ট আদৃত হবে সন্দেহ নেই। বিদেশী ভাষায় এই বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞানলাভের আগে এই বইটি মাতৃভাষায় ছাত্রদের মনে একটি সুন্দর পটভূমিকা তৈরি করতে পারবে—তাই বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছেও বইটি আদরণীয় হবে।

সূর্যেন্দুবিকাশ রায়

মৃত্যুহীন (সঙ্কলন)। প্রকাশক—বিপ্লবী নিকেতন, ১১ চৌরঙ্গী ম্যানসন, ৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ১৬। তিন টাকা

বিপ্লবী নিকেতনের পক্ষ থেকে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দ্রুতপাঠ্যরূপে 'মৃত্যুহীন' রচিত,—২৩টি প্রস্তাবে, ৩০এরও অধিক স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লব-পন্থী শহীদদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা, বিভিন্ন লেখকের লেখা, সযত্নে সংগৃহীত তথ্য ও চিত্রসহিত সঙ্কলিত।

এই ২৩০ পৃষ্ঠার বইখানাকে আমরা সাদরে অভিনন্দন জানাই।

এই শহীদদেব মধ্যে ভারতের নানা প্রান্তের শহীদদের দর্শন লাভ করি। তাতে করে বুঝতে পারি—স্বাধীনতার আদর্শেই শুধু সর্ব-ভারত উদ্বুদ্ধ হয়নি, তার বিপ্লবপন্থায়ও ভারতের সর্বপ্রান্তের মানুষই আকৃষ্ট হয়েছে, তাও একটা জাতীয় আকার লাভ করেছিল। মহারাষ্ট্রীয় তিন-ভ্রাতা দামোদর, বালকৃষ্ণ ও বাসুদেও তাঁদের সহকর্মী বিনায়ক রানাডে—এই চারজনই (১৮৯৮-৯৯) এই পন্থায় একালের প্রথম শহীদ। তারপরে শহীদ আমাদের প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম এবং কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তারপরে (১৯১০) বাঙলার বাইরে আবার দেখতে পাই আরও তিনজন মহারাষ্ট্রীয় বীর। কানহেরে, কার্ভে ও দেশপাণ্ডে। ক্রমে ক্রমে আমরা পাই তামিল ওয়াঞ্চি আয়ার (কেরল-

বাসী), অন্ধ্রে সীতারাম রাজুর, কাকোরী মামলার 'বিসমিল' আসফাক উল্লা, রৌশন সিং, রাজেন্দ্র লাহিড়ী (উত্তর প্রদেশ), চন্দ্রশেখর আজাদ (উঃ প্রঃ), সর্দার ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেব (পাঞ্জাব), আর বিলাতে ধিংড়া (১৯০৯) ও উধম সিং (১৯৪০) এর। বাঙলার বাইরেকার এই শহীদদের কথা বাঙালিদের অনেকের হয়তো বিশেষ জানা নেই। সত্যকথা বলতে কি, বাঙালি শহীদদের নামই কি আমরা ভালো করে স্মরণ করতে পারি? সব নাম তো দূরের কথা, এই সেদিনের অনেকের কথাও মনে করিয়ে দিলে তবেই মনে পড়ে। একদিক থেকে এটাই কালের নিয়ম।

এইভাবেই সত্য হয়ে থাকেন মহা-মহাবিপ্লবের উদ্‌যাপিত সাফল্যের মধ্যে নামহারা অজস্র শহীদেরা ও সাধকেরা। সেই সাফল্যের মধ্যেই তাঁদেরও সাফল্য, তাঁদেরও পরিচয়।

এইখানেই অবশ্য কঠিন প্রশ্ন মনে জেগে ওঠে—আমাদের স্বাধীনতার কী সাফল্য আমরা দেখছি? হয়তো সে সাফল্য এখনো বাকি যদিও রাজনৈতিক পরাধীনতা যে শেষ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

এই প্রশ্নের বিচার এ-পুস্তকের আলোচনায় অবান্তর। পুস্তকখানির প্রধান উদ্দেশ্য একালের ছেলেদের সামনে সুস্থির আদর্শের ও আত্মত্যাগী সাধকদের কথা সংক্ষেপে, অথচ সরল প্রাণবন্ত ভাষায় তুলে ধরা—যাতে বলতে পারলে সেই আড়ম্বরহীন সামান্য জীবন-কথাগুলি সত্যই প্রাণস্পর্শী হয়ে ওঠে। অথচ যাতে তা একালের ছিন্নমস্তা রাজনীতিরই আরেকটি পূর্বসংস্করণ বলে ভ্রান্তি উৎপাদন না করে, এবং না হয়ে ওঠে একালের শিশুত্ববিলাসী প্রাপ্তবয়স্কদের জলো রোমান্সের খেলো উপকরণ।

এসব সংক্ষিপ্ত লেখায় অবশ্য কথা ফেনিয়ে তুলবার সে-অবকাশ ছিল না। এবং বিশেষ করে, লেখকরা প্রায় সকলেই দায়িত্ব নিয়ে তাঁদের কর্তব্য প্রতিপালন করেছেন—চমক জাগানোর অপেক্ষা নিজেদের সত্তায় তাঁরা প্রাণসঞ্চার করেছেন, বিষয়মাহাত্ম্যে চেয়েছেন বালকমনে একটি গভীর আদর্শের জন্য গম্ভীর বোধ সঞ্চারের। এইজন্য এই ছোট বইটি এতো অভিনন্দনযোগ্য। আশা করি, লেখকদের ও প্রকাশকদের চেষ্টা সার্থক হবে।

গোপাল হালদার

কর্ণফুলী। আলাউদ্দিন আল আজাদ। প্রকাশক—কারাভা, ৭৫ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-৩। তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

পূর্ব-পাকিস্তানে প্রকাশিত গল্প-উপন্যাস কদাচিৎ আমাদের হাতে এসে পৌছয়। সুতরাং আমাদের বাঙলা গল্প-উপন্যাসের আলোচনাও অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের ইতিহাস যে-সব চোখে পড়েছে তাতে অসংখ্য আধুনিক গল্প-উপন্যাসের নাম পেয়েছি, কিন্তু পড়বার সুযোগ না পাওয়ায় আমরা তার আলোচনা করতে পারি না। যখন ভাগ্যক্রমে কোনো বই হাতে পাই, তখন তাকে আর 'সম্প্রতিকালের' রচনা বলা যায় না, বইটি প্রকাশের পাঁচ-সাত বছর পরে সেটি তখন পূর্ব-পাকিস্তানে 'পুরানো' হতে চলেছে। তবু আমাদের কাছে 'নতুন', আর মনকে সান্ত্বনা দিই, ইয়োরোপের অনেক বই-ই তো এইভাবে অনুবাদের মধ্য দিয়ে অনেকদিন পর আমাদের হাতে এসে পৌছয়। অবশ্যই পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙলা বই আর বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ তুল্য-মূল্য নয়, এবং এর ফলে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতির দিকটি বিচার্য। আলাউদ্দিন আল আজাদ-এর (জন্ম ১৯৩৪) অনেকগুলি গল্প-উপন্যাস গ্রন্থের নাম এর আগে শুনেছি, যেমন, 'ধানকন্যা'(১৯৫১), 'জেগে আছি' (১৯৫৫), 'মৃগনাভি', 'অন্যমুখ', 'ক্ষুধা ও আশা' (১৯৬৪) প্রভৃতি। 'কর্ণফুলী' (১৯৬২) উপন্যাসটির নাম আগে শুনলেও পড়বার সুযোগ পেলুম সম্প্রতি, এবং বহুবিলম্বিত হলেও নানা কারণেই উপন্যাসটির আলোচনা হওয়া প্রয়োজন আছে মনে করি।

বাঙলা উপন্যাসে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সঙ্গতি সাধন ঘটে না। তাই প্রায়শই উপন্যাসপাঠে নৈরাশ্য এবং কখনো বিরক্তিবোধ অনিবার্য হয়। 'কর্ণফুলী' কোনো অসামান্য উপন্যাস নয়, বক্তব্যের দিক থেকে বা শিল্পনৈপুণ্যেও উপন্যাসটি অবিস্মরণীয়তা দাবি করতে পারে না। তবু সচরাচর যেসব বাঙলা উপন্যাস আমরা পড়ি, তার সঙ্গে 'কর্ণফুলী'র পার্থক্যও স্বীকার্য। আলাউদ্দিন আল আজাদ উপন্যাসের পটভূমি রচনায় ও চরিত্র নির্বাচনে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন, এবং আমাদের অপরিচিত অথচ আমাদের খুব কাছেরই বাস্তব জগৎকে আশ্চর্য জীবন্ত করে তুলেছেন। কর্ণফুলী নদীর তীরে চট্টগ্রামের পটভূমিতে উপন্যাসটি লেখা, শহর ও পাহাড়তলী অঞ্চলে কাহিনী ছড়িয়ে আছে। নায়ক ইসমাইল পকেটমার, প্রয়োজনবোধে খুন-জখমও করে থাকে, কিন্তু তার "স্বপ্ন ছিল সারেঙ হবে, খুব বড় সারেঙ, সাতদরিয়া যে চড়ে বেড়ায় সেই বড় জাহাজের সারেঙ; অনেক

বড় স্বপ্ন, ছোটবেলাকার স্বপ্ন, কৈশোরের স্বপ্ন এবং যৌবনের স্বপ্ন। কিন্তু কোথায়? বুকের ঘাম, চোখের পানি এক করেও, এত বছরে একটা নলিও জোগাড় করতে পারেনি, বোম্বাই করাচি এডেন লণ্ডন টোকিও হংকং ঘুরে বেড়ানোর কথা বাদ। হ্যাঁ, অলীক স্বপ্ন। এতো দুঃস্বপ্ন। তা সে জানে না এমন নয়। তবু, চট করে সোঁতের শেওলার মতো ভেসেও যেতে পারবে না।" তাই সে যুদ্ধ করে প্রতিবেশের সঙ্গে, দারিদ্র্যের সঙ্গে,—জাহাজের সারেঙ হওয়ার 'নলি'র জন্য একশ টাকা ঘুষ দিতে হবে, সেই টাকা সংগ্রহের জন্য মরিয়া হয়ে রমযানের রহস্যময় অভিযানে যোগ দিয়েছে। বাইরে সে নির্মম, কঠোর, তিক্ত, কিন্তু ভিতরে লুকিয়ে আছে সারেঙ হওয়ার স্বপ্নের সঙ্গে জুলায়খাকে নিয়ে ঘর বাঁধার বিপরীত কিন্তু অনিবারণীয় আকাঙ্ক্ষা। মাঝখানে রাঙামিলার প্রতিও আকর্ষণবোধ করে, এবং নীতিবোধের প্রশ্ন না থাকলেও শেষ পর্যন্ত রাঙামিলাকে ছেড়ে দেয়, তাকে ও তার প্রণয়ীকে রমযানের গুণ্ডাদের হাত থেকে উদ্ধার করে। কিন্তু পরে মনে হয় "যে ছিল শত্রু, প্রতিদ্বন্দ্বী, সেই বন্ধু হয়ে গেল! এতো সে চায়নি? এত মহৎ সে কখনো নয়।" আসলে ইসমাইল নিজের অন্তরের দুর্বলতা শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে। সেইখানেই তার মনুষ্যত্ব। হয়তো আমার দ্রুত কাহিনী-সংক্ষেপে কিছুটা ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে গেল, 'মন্দের মধ্যে ভালো' দেখানোর সদুদ্দেশ্য থেকে ইসমাইলকে আঁকা হয়নি। আসলে ইসমাইলের প্রচণ্ড আবেগ ও উত্তেজনাই তাকে ছন্নছাড়ার মতো উড়িয়ে নিয়ে চলে, জুলায়খাকে বিয়ে করাও সেই আকস্মিক উন্মাদনা থেকে। কিন্তু ভালোবাসা ধীরে ধীরে তার মনে শান্তি আনে, যদিও সেই সঙ্গে রয়েছে সারেঙ হওয়ার স্বপ্ন। ইসমাইলের সেই দ্বন্দ্ব বারকয়েক তাকে কাতর করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কৈশোর-যৌবনের স্বপ্নেরই জয় হয়েছে। "ভিতরটা ওর এখন শান্ত স্নিগ্ধ। যেন বুঝেছে পাওয়ার জিনিসকে ছাড়তে পারলেই তাকে বেশি করে পাওয়া যায়। এই উপলব্ধি সহজ নয়, এর সঙ্গে মিশে আছে অনেক অশ্রু, দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু তারও হয়তো প্রয়োজন ছিল।"

জুলায়খা—জুলি, তাকেও আশ্চর্যভাবে চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক। বালিকা থেকে জননী—রূপান্তরটি মনে দাগ কেটে যায়। বিদায়ের মুহূর্তে ইসমাইলকে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, "ভুলি ন যাইও। সপ্তায় সপ্তায় পত্র লেইকখো। বিদেশ বিপ্যাচ—হুনি মেম দেখি মানুষ পাগল হয়। তুঁই আবার যেন বিয়া গরি ন ফেল। জবাবের সময় দেবে না, জুলি আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছে, একটানা

মাঝে একটু ঢোক গেলে শুধু, কিন্তু থামলো না। আর যদি বিয়া গরই তইলে এ্যান চাই গরিবা যেন্ আঁইও থাইৎ পারি।"—নারী হৃদয়ের পূর্ণ উন্মোচন ঘটে উক্তিটিতে।

উপন্যাসের কাহিনী এবং চরিত্র বাদ দিলে থাকে ভাষা। ভাষার সার্থকতা —বর্ণনায়, আবহসৃষ্টিতে, সর্বোপরি সংলাপে। আলাউদ্দীন আল আজাদ উপন্যাসের সূচনায় 'লেখকের কথা'য় জানিয়েছেন, "চরিত্রকে 'স্বাভাবিক' করার চেষ্টায় আমি এ-বইয়ে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করিনি। চিত্রী যেমন বিভিন্ন রং দিয়ে একটি সৃষ্টি সম্পূর্ণ করেন, তেমনিভাবে আমি বিভিন্ন ভাষার রং ব্যবহার করেছি মাত্র; কর্ণফুলীর জীবনধারা, সবুজ প্রকৃতি, শ্যামল পাহাড় ও সাগরসঙ্গমে বয়ে চলা প্রবাহের মতোই এই ভাষা অবিভাজ্য। শিল্পসিদ্ধির জন্য এর অবলম্বন আমার কাছে অপরিহার্যরূপে গণ্য হয়েছে। সকল পাঠককে এই সংলাপের প্রত্যেকটি কথা বুঝতে হবে এমন কোনো কথা নেই; মোটামুটি আবহটুকুন অধিকাংশের মনে এলেই যথেষ্ট।" বাঙলা উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ এর আগেও দেখা গেছে, কিন্তু উপন্যাসে তার ভূমিকা ছিল নিতান্ত নগণ্য, কারণ উপন্যাসের সবগুলি চরিত্র সেখানে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে না, এবং আঞ্চলিক হলেও সে-ভাষা অনেক সময়েই আমাদের বোধগম্য। কিন্তু 'কর্ণফুলী' উপন্যাসের সবগুলি চরিত্রই চট্টগ্রামের মুসলমান এবং কয়েকটি চাকমা (পাহাড়ী) নরনারী—ফলে আঞ্চলিক ভাষাই এখানে স্বরাট্। অন্যদিকে চট্টগ্রামী ভাষা, এবং বিশেষত চাকমা ভাষা পশ্চিমবঙ্গে কেন পূর্ববঙ্গেও অধিকাংশ অঞ্চলে দুর্বোধ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও উপন্যাসটি কোথাও পাঠযোগ্যতা হারায়নি, বরং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠককে আকর্ষণ করে রাখে; এবং আবহসৃষ্টিতে আঞ্চলিক ভাষা বিশেষ সাহায্য করেছে। আলাউদ্দিন আল আজাদ শক্তিমান লেখক তার প্রমাণ 'কর্ণফুলী' উপন্যাস।

আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে (ভাদ্র ১২৮০) মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' নাটকের সমালোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন'-এ মন্তব্য করেছিলেন, "জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্তৃক এই নাটকখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানি বাঙ্গালার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালার অপেক্ষা এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ।" বলা বাহুল্য, 'মুসলমানি বাঙ্গালা' সম্বন্ধে একদা বাঙালি, বিশেষত হিন্দু পাঠকের এক ধরনের বিশেষ অস্বস্তি ও আপত্তিবোধ

ছিল। কিন্তু নাটক বা উপন্যাসের প্রয়োজনেই ভাষায় 'মুসলমানি' অর্থাৎ ফার্সী এবং কদাচিৎ আরবী শব্দের প্রয়োগ ঘটে। যেখানে অধিকাংশ বা সবগুলি চরিত্রই মুসলমান, সেখানে এই জাতীয় শব্দ ব্যবহার অনিবার্য বিবেচনা করি। 'কর্ণফুলী' উপন্যাসেও তাই বেশ কিছু ফারসী আরবী শব্দের ব্যবহার ঘটেছে, এগুলির সঙ্গে আঞ্চলিকতার যোগ সামান্য, যেমন, আমাদের খুব পরিচিত—চেরাগ, দরিয়া, আসমান, কিস্‌সা, নাস্‌তা এবং কিছুটা অপরিচিত—কাবিন, জেওর, খায়েশ প্রভৃতি।

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে বর্তমান লেখকের সামান্যতম প্রত্যক্ষ পরিচয়ও নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও উপন্যাসের সংলাপ অনুসরণ করতে খুব কষ্ট হয়নি। সাধারণভাবে বাঙলা ভাষার সঙ্গে যেটুকু পরিচয় আছে, তার সাহায্যে অধিকাংশ শব্দের অর্থোদ্ধার করা যায়। আসলে ধ্বনিগত পরিবর্তনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাঙলা ভাষাতত্ত্ব নিয়ে এখনও সে-রকম আলোচনা হয়নি, অন্তত বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার বিশিষ্টতা নির্দেশে ভাষাবিজ্ঞানীরা এগিয়ে আসেননি। ডঃ সুকুমার সেন 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৬৮) গ্রন্থে 'আধুনিক-বাঙ্গালা উপভাষা ও বিভাষা' নিয়ে আলোচনাকালে পাঁচটি উপভাষা-গুচ্ছের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের উপভাষার নাম দিয়েছেন 'বঙ্গালী'। বলা বাহুল্য, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ একটি বিরাট অঞ্চল, এবং সেখানেও অঞ্চলভেদে ভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। 'বঙ্গালী' বলতে অল্প যে-কয়েকটি লক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে, তাও নিতান্ত অসম্পূর্ণ। ডঃ সেন 'বঙ্গালী'র প্রধান বিভাষারূপে 'চাটিগ্রামী'র উল্লেখ করেছেন, এবং তার একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, "ইহাতে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনে ব্যাপক উষ্মীভবন লক্ষণীয়।" তুলনায় ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-এর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৬৫) গ্রন্থে বাঙ্গালা উপভাষার আলোচনা অনেক তৃপ্তিদায়ক। ডঃ শহীদুল্লাহ্ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের ভাষাকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছেন, এবং যদিও তিনি কাছাড় থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমস্ত স্থানের ভাষাকে 'পূর্বপ্রান্তিক উপভাষা' নামে অভিহিত করেছেন, তবু মোটের উপর তাঁর আলোচনা থেকে চট্টগ্রামের ভাষার কিছু লক্ষণ স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু 'কর্ণফুলী' উপন্যাসটি পড়তে পড়তে মনে হয়েছে, বাঙলাদেশের প্রতিটি জেলার ভাষার বিশিষ্টতা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়োজন এখনও রয়ে গেছে, এবং সেদিক থেকে এই জাতীয় আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সাহিত্যকর্ম ভাষাবিজ্ঞানীদের বিশেষ সাহায্য করবে।

'কর্ণফুলী' উপন্যাস থেকে যথেচ্ছভাবে কয়েকটি উক্তি উদ্ধার করি,—

'কেয়া ?' 'গম্ ন লাগের্। বিয়াল্য যাইত পারজুম।'

'তুই বড়্ উজর করর। হে তো আর গুরা পুয়া ন ? নিশ্চয় কোন কামে গেইয়ে, শেষ হইলে ফিরি আইব।'

'ন বাজী, তুঁই বুঝিৎ ন পারর। বিপদ-আপদ ন অইলে আঁই কালিয়া তারে খোয়াবে দেখ্খি ?'

এখানে ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কতকগুলি জিনিস লক্ষণীয়। প্রথমত কয়েকটি অপরিচিত শব্দ, যেমন, কেয়া, গম্, গুরা। হাতের কাছে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত 'পূর্বপাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' থাকায় শব্দগুলির অর্থ জানতে পারলুম। কেয়া<কেঅ<কেন। ['কেয়া' শব্দটি 'কেহ' অর্থেও চট্টগ্রামে ব্যবহৃত হয়]। গম্<গহাম (বোড়ো ভাষার শব্দ), অর্থ 'ভালো'। [ঔপন্যাসিকের 'গম্' শব্দটি সম্ভবত খুব ভালো লেগেছে, তাই উপন্যাসের মধ্যে বারবার শব্দটির প্রয়োগ]। গুরা<গুঁড়া, অর্থ 'ছোট'। 'খোয়াব' শব্দটি আমাদের একেবারে অপরিচিত নয়, এসেছে ফার্সী 'খ্বাব' থেকে, অর্থ 'স্বপ্ন'।

ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি বিকেলে (বৈকালে)>বিয়াল্য ; সে>হে ; দেখি>দেখ্খি। অন্যত্র আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছে, যেমন, কারণ আছে>হারণ আগে ; কিন্তু>হিন্তু ; কি হল>হি অল ; একটুখানি>ইক্কানি ; এখনই>ইত্তরি ; মেরেছ, ঠিকই করেছ>মাইর্‌গো ঠিকই গইর্‌গো। চট্টগ্রামী আঞ্চলিক ভাষায় আনুনাসিকের ব্যবহার কিছু বেশি বলেই মনে হলো, তবে সাধারণত এগুলি নাসিক্যীভবনেরই দৃষ্টান্ত, বিশেষত সর্বনামের ক্ষেত্রে ; আমি>আঁই, তুমি>তুঁই, আমার>আঁর, তোমাদের (কে)>তোঁয়ারারে। তবে 'টাকা' সর্বদা 'টেঁয়া' স্বতোনাসিক্যীভবনের দৃষ্টান্ত ; এ-জাতীয় আনুনাসিকের আতিশয্য সব সময়ে আঞ্চলিকতার লক্ষণ কিনা জানি না।

রূপগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে, ভবিষ্যৎ কালে উত্তম পুরুষে 'জুম' এবং 'যুম' বিভক্তির ব্যবহার লক্ষণীয় ; পারব>পারজুম, ফেলব>ফ্যালায়ুম, দিব>দিইয়ুম ; ভবিষ্যৎকালে মধ্যম পুরুষে পারবে>পারিবা, ভবিষ্যৎকালে প্রথম পুরুষে আসবে>আইব। তুমর্থে (infinitive) ও অধিকরণে দিতে>দিৎ, ঘরেতে> ঘরৎ, হাতে>হাতৎ, বুঝতে>বুঝিৎ।

মধ্যবাঙলায় সমাপিকা বা অসমাপিকা ক্রিয়াপদের আগে নঞর্থক (না) বসিয়ে বাক্য গঠনের যে রীতি ছিল পূর্ববাঙলার কোনো কোনো আঞ্চলিক ভাষায় এখনও তা বিদ্যমান। চট্টগ্রামী উপভাষায় তার বহুল প্রয়োগ—আই তো মরি ন যাই। জুলিরে তো কই ন পাইর্। আঁই আর একটু বাধা নইদ্দম।

চাকমা ভাষার অর্থোদ্ধার তুলনায় অনেক কঠিন, ভাষাতাত্ত্বিকেরাও এ-ব্যাপারে আমাদের বিশেষ সাহায্য করেন না। একটা দৃষ্টান্ত দিই—"স্যান ইত্তুন প্রায় কুড়ি-পোজোস মেল দূরৎ। গধা হাট এক্কান শহর আয়া। দিনে রেতে হাম গগুন—হদক মানুষ! মস্ত দেবেদা পাপা হল—হালখানা। পানি বেশ অলে ছাড়িবেত্তেই দাঙর দাঙর দুয়ার জুগলদন। দিবা মস্তমস্ত সুড়ং গস্থন। সিন্দিপানি হুব হিজি যেব। স্যানি চাকাৎ যেই পড়িব গৈ। চাক্কা বা ঘুরের্ সত্তুন লেত্রিক তৈয়ার অব। সে লেত্রিক্কই ভালক্কানি হল হারখানা চলিব্য।" প্রসঙ্গ অনুসরণ করে অর্থ কিছুটা বোঝা যায় ঠিকই, তবু চাকমা শব্দভাণ্ডার ও ভাষায় ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য জানা থাকলে আরও উপভোগ করতে পারতুম।

অলোক রায়

ঘরে দূরে দিগন্তরেখায়। শিবশম্ভু পাল। সাহিত্যপত্র গ্রন্থ। তিন টাকা

"এই নাও এলিয়ট কাফকা টমাসমান জয়েস বিষ্ণু দে/মননের ঝাঁজালো ওষুধে/কাজ হয় না আজকাল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ক্ষয়ে যায় চটি।/সব নাও রেখে দিও শুধু গীতবিতানের দ্বিতীয় খণ্ডটি॥" 'ঘরে দূরে দিগন্তরেখায়' কাব্যের সুপরিচিত কবি শিবশম্ভু পাল তাঁর চারপাশের পুতুল-পরিবেশের ওপর খুব বেশি রুষ্ট হলে বড়জোর এটুকু উঁচু গ্রামেই কথা বলতে পারেন। বিপরীতভাবে বলা যায় কাব্যিক উচ্চারণে যে-কোনো ধরনের অতিরেকের তিনি বিরোধী। তাই সারারাত নির্ঘুম থেকে, সামনে "অনুর্বর শাদা" পৃষ্ঠা ও "ব্যর্থকাম কলম" নিয়েও "একচ্ছত্র আগ্নেয় কবিতা" লিখতে না পারার বেদনা তাঁর মনে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়ার হিংস্র অধীরতা জাগায় না। আসলে শিবশম্ভু অন্তরঙ্গ, ঘরোয়া মেজাজে কবিতা লিখতে ভালোবাসেন, কবিতা তাঁর কাছে দৈনন্দিন জীবন-যাপনের অন্যতম সহজ সর্ত। ফলে, প্রকাশরীতিতে নাটুকেপনা তো দূরের কথা, নাটকীয়তা থেকেই তাঁর সসম্ভ্রম প্রস্থান। কবিতা নিয়ত স্রোতের মতো তাঁর অনুভূতিতে ঘুরেঘুরে কাজ করে। সেই বহতা মানসিকতার প্রকাশে হার্দ্য

হয়ে উঠে এ-জাতীয় পংক্তিনিচয় "ঘরের ভিতরে বিছানায়/যখন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি হয়, বজ্রপাত, পথঘাট জলে জলাকার/যখন বৃষ্টির শব্দে বিরহ শব্দের ধ্বনি মেশে/বজ্রপাতে মর্মলোক পুড়ে যায়, ক্লান্ত ক্লান্ত বলে/হাহাকার করে ওঠে সর্বাঙ্গ আমার/তখনো রয়েছো পাশে তুমি" '(পাঁচ বছর পর সত্যি কথা) অথবা, "তুমি যে আমায় দিয়ে কবিতা লিখিয়ে নিলে একাধিক, আমি/স্বীকার করেছি বাহাদুরি।" (কবিতা লিখিয়ে নিলে)।

কবিতা রচনার বিভিন্ন কলাকৌশল ও চাতুর্য শিবশম্ভুর কলমের একান্ত অধীন। আঙ্গিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি পটু ও পরিশ্রমী। মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত মিল দিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করতে তিনি পারঙ্গম। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় এ-জাতীয় কাব্যাংশের, "আত্মগোপন করেছি অনেক দিন/মুখরিত জনপদে।/যেন ভালোবাসি আমি আগ্রাসী চীন/ ··রাজদ্রোহিতা নিরীহ পরিচ্ছদে"(আত্মগোপন), অথবা, "তা হলে কি থাকে, মিছিলের কলকাতা/বর্ষার টালাপার্ক/ এবং হয়তো ডায়েরি কয়েক পাতা,/···ডানাভাঙা স্কাইলার্ক" (অবশেষে)।

রাজনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন বিষয়কে যুক্ত করে কবিতায় এক নতুন মেজাজ আনার কৌতুহলোদ্দীপক নজির সৃষ্টি করেছেন শিবশম্ভু। বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তাঁর কাব্যগ্রন্থের এ-জাতীয় কিছু পংক্তি! "অফিস ফেরৎ বাসে বিসদৃশ যুক্তফ্রণ্ট মেনে নিয়ে ফুটবোর্ডে ঝুলি", "কেউ··· জানবে না/আমাদের ষড়যন্ত্র ভূমণ্ডলে অলৌকিক সাম্রাজ্য বিস্তারে গভীর ব্যস্ততাময় শীর্ষসম্মেলন", "দমননীতির প্রতিবাদে/চড়াদামে দ্বিপ্রহরে কিনে নিয়ে আমি", অথবা "ইউলিসিস, কর্ণ থেকে জওয়াহরলাল/সকলেই অনাত্মীয় অভিজাত প্রতিবেশী আলোকিত উৎসবের বাড়ি/ওখানে আমার নিমন্ত্রণ নেই"।

শিবশম্ভু পাল দীর্ঘকাল কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতা সহজ, কিয়দংশে সফল, কিন্তু তাঁর কাব্যিক প্রচেষ্টায় দুর্মদ উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। পঞ্চাশের কবিকুলের নানা ধাচের নানা চরিত্রের যে সতেজ, জোরালো কাব্য আন্দোলন বাঙলা কবিতায় প্রশ্নচিহ্নময় উদ্দামতা এনেছিল, তিনি তার দুরন্ত উত্তাপ থেকে নিজেকে সন্তর্পিত করে একটি নিজস্ব কাব্যালোক নির্মাণ করতে প্রয়াসী। 'ঘরে দূরে দিগন্তরেখায়' কাব্যটি এই প্রয়াসেরই স্বাক্ষরবহ।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

নান্দীকার-এর 'তিন পয়সার পালা'

১৯২৮ সালে ইংরেজি নাটক 'বেগার্স্ অপেরা'র অনুসরণে ব্রেখ্ট্ যখন তাঁর 'থ্রি পেনি অপেরা' নাটকটি রচনা ক'রে প্রখ্যাত কম্পোজার্ কুর্ট্ ভেইলের সঙ্গীতসমেত মঞ্চস্থ করেন, তখন থেকেই ব্রেখ্টীয় থিয়েটারের যথার্থ আরম্ভ বলে অনেকেই মনে করেন। এই সময় থেকে ব্রেখ্টের থিয়েটারে যে-ফর্মের ব্যবহারকে লক্ষ্য করা যায়, তার মধ্যে এ্যারিস্টটেলীয় ক্যাথার্সিস্‌কে পরিহার ক'রে নাটকে এক ধরনের বৌদ্ধিক তীক্ষ্নতা সম্পাদনের চেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তন্ময়ীভবনকে পরিহার ক'রে ব্রেখ্ট্ যেন দর্শককে সর্বদাই সচেতন রাখতে চেয়েছিলেন যে তাঁরা একটি থিয়েটারই প্রত্যক্ষ করছেন। বিভিন্ন ধরনের দর্শনীয় কৌশলের প্রয়োগে এবং সর্বোপরি বিশিষ্টতাসূচক (স্টাইলাইজড) অভিনয়কলার দ্বারা ব্রেখ্ট্ এমন একটি আবহ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, যার দ্বারা দর্শক কেবল থিয়েটারের আনন্দেই মগ্ন হবেন না, পরন্তু তাঁর বিচারবুদ্ধির প্রয়োগে শেষ পর্যন্ত একটি সিদ্ধান্তেও উপনীত হতে পারেন। ব্রেখ্টের নাটকের ফর্মের এই অভিনবত্ব অবশ্য তাঁর পরবর্তী নাটক-গুলিতে আরো সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। 'থ্রি পেনি অপেরা'তে ফর্মের এই অভিনবত্ব হয়ত কিছুটা সোচ্চার। ফলত এখানে যেন থিয়েটারী আবহের মোহ সৃষ্টিতেই ব্রেখ্ট্ অধিকতর আগ্রহী হয়েছেন। কিন্তু নাটকীয় বক্তব্য উপস্থাপনায় ব্রেখ্ট্ এ-নাটকে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিতে পেরেছেন। নায়ক ম্যাকহীথ্ গুণ্ডা ও ডাকাত, কিন্তু নিজেকে সে 'বিজনেসম্যান' বলেই অভিহিত করে এবং লুঠপাট করতে গিয়ে রক্তপাতে তার প্রচণ্ড অনিচ্ছা। এমনকি তার ব্যবসার খাতা আর ব্যাঙ্কের এ্যাকাউণ্টও রয়েছে। কিন্তু এই ম্যাকহীথ্‌ই তার ফাঁসির পূর্ব মুহূর্তে দর্শকদের জানায় যে এবার তার মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ডাকাতদের যুগ শেষ, এখন আরম্ভ হচ্ছে বড় বড় ব্যাঙ্কার, শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদের যুগ। অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার মূল সত্তাটিকেই এ-নাটকে ব্রেখ্ট্ ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করতে চেয়েছেন ম্যাকহীথের মতো প্রবৃত্তি-নির্ভর ছোটখাটো গুণ্ডাদের করুণ পরিণতির কাহিনী বর্ণনা করে। নাটকের অপর দুটি প্রধান চরিত্র 'টাইগার ব্রাউন্' এবং পীচামের

মধ্যেও এই বুর্জোয়া সমাজের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের দুটি পরিচয় চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। ব্রাউনের অর্থ-লালসাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে বন্ধুত্বের ওপর, আর পীচাম্ মানুষের মানবিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার উপার্জনের পথটি আবিষ্কার করে নিয়েছে। এমনকি এই বুর্জোয়া সমাজে 'প্রেম' নামক ব্যাপারটিও যে কতখানি ভঙ্গুর, ম্যাকহীথের সঙ্গে পলির বিবাহদৃশ্য ও পরবর্তী ঘটনায় ব্রেখ্‌ট্ তা দেখিয়েছেন। পতিতালয়ের দৃশ্যাবতারণায় ব্রেখ্‌ট্ বুর্জোয়া সমাজের মানবিক মূল্যবোধের অধোগতির পরিচয়কেই তুলে ধরেছেন। কিন্তু সেই অধোগতির পিছনের করুণ ইতিহাসটিকেও 'দ্য ব্যালাড্ অব্ দ্য ফ্যান্সি ম্যান্'এ ম্যাক্ এবং জেলির অতীত প্রেমের চিত্রের উপস্থাপনায় লক্ষ্য করা যায়। ব্রেখ্‌ট্ আসলে নিম্নবিত্ত সমাজের প্রবৃত্তি-নির্ভর মানুষগুলির প্রতি তাঁর অন্তরের ভালোবাসাকে গোপন রাখতে পারেননি। মানবপ্রেমিক ব্রেখ্‌ট্ তাই শেষ পর্যন্ত ম্যাক্‌হীথ্‌কে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাতে পারেননি, একটি প্রচণ্ড ঠাট্টায় তাকে শেষ পর্যন্ত রাণীর অনুগ্রহে রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করে সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিতে রূপান্তরিত করেছেন। বস্তুত পক্ষে, 'থ্রি পেনি অপেরা'তে ব্রেখ্‌ট্ বুর্জোয়া সমাজের ব্যবসায়িক লেনদেন ও বিবাহ, রোমান্টিক প্রেম, বন্ধুত্ব প্রভৃতি যাবতীয় নৈতিক মূল্যবোধের ভাঙনের রূপটিকেই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

ব্রেখ্‌টের এই 'থ্রি পেনি অপেরা'কেই নান্দীকার গোষ্ঠী নিবেদন করেছেন 'তিন পয়সার পালা' নামে। ব্রেখ্‌টের নাটকের ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাঙলায় রূপান্তরিত করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ('তিন পয়সার পালা' জাতীয় সাহিত্য পরিষদের নান্দীকার-এর 'ত্রয়ী' নাট্য-সঙ্কলনে প্রকাশিত হয়েছে)। মূল নাটকের চরিত্র-পরিচয় এবং পরিবেশকে অজিতেশবাবু কলকাতার উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের 'বাবু' সংস্কৃতির কালে স্থানান্তরিত করেছেন। ঐতিহাসিক স্থান ও কালের এই পার্থক্য সত্ত্বেও 'তিন পয়সার পালা' কিন্তু আশ্চর্যভাবে উৎরে গেছে। মূল নাটকের ম্যাক্‌হীথ্, টাইগার ব্রাউন্ আর পীচাম এখানে যথাক্রমে দস্যু মহীন্দ্র, পুলিশের বড় কর্তা 'বাঘা কেষ্ট' এবং ধনী ভিক্ষুক-ব্যবসায়ী যতীন্দ্রনাথ পাল-এ রূপান্তরিত। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের কলকাতায় এইসব ব্যক্তিরা খুবই সঙ্গতভাবে খাপ খেয়ে গেছেন। এমনকি পারুলবালা, প্রীতিলতা ও জোছনাও বেমানান নন। এক কথায় বাবু কালচারের পীঠভূমি কলকাতায় তখন এ-জাতীয় ঘটনা একান্ত অস্বাভাবিক ছিল না। ফলত 'থ্রি পেনি অপেরা'র বাঙলা রূপান্তর

রূপে 'তিন পয়সার পালা'কে তাই প্রায় মৌলিক নাটক বলেই মনে হয়। মঞ্চ পরিবেশ ও সাজসজ্জা রচনার দিকেও নান্দীকার গোষ্ঠী উনবিংশ শতকের এই কলকাতাকেই বিশেষভাবে স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছেন। তবে প্রধান গায়কের পোষাক এবং হাতের ঘড়িতে এ-পরিবেশ বিচ্যুত হয়েছে। কিন্তু সমগ্র নাটকের প্রয়োগনৈপুণ্যে তা ঢাকা পড়ে গেছে। ব্রেখ্‌টের নির্দেশমতো ঘটনাপ্রবাহের ইঙ্গিতবাহী প্ল্যাকার্ডের ব্যবহার, দর্শকদের সামনেই কোনো সময়ে মঞ্চসজ্জার প্রস্তুতি ও অভিনেতাদের বিচিত্র ও নানা রঙ-বেরঙের জমকালো পোষাকে ও হালকা চালের নাচের ভঙ্গিতে সমস্ত ব্যাপারটাই দর্শকদের উপভোগ্য রূপে উপস্থিত করা হয়েছে। মাঝে মাঝে যাত্রার আবহও দেখা গেছে। ব্রেখ্‌টের থিয়েটারে অভিনয় অনেকাংশে স্টাইলাইজড, তথাপি তা যথেষ্ট কঠিনও বটে। নান্দীকার গোষ্ঠী দলগত অভিনয়ের গুণপনায় তাকে অনেকখানিই আয়ত্ত করতে পেরেছেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, কেয়া চক্রবর্তী, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সীমন্তিনী দাস ও লতিকা বসু-র কথা। সঙ্গীত এ-নাটকের ফর্মেরই একটি অঙ্গ। সেদিক থেকে সঙ্গীতের সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্যও প্রধান গায়ক রূপে পরিতোষ পাল প্রশংসার যোগ্য। সবশেষে 'তিন পয়সার পালা'-র জন্য নান্দীকার গোষ্ঠীকে আমাদের অভিনন্দন জানাই।

অজিত বন্দ্যোপধ্যায়

চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন

ভারতের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানের অনুসন্ধান কাজে ব্রতী এই মানুষটি বরাবর নিজেকে প্রচারযন্ত্রের নাগালের বাইরে সরিয়ে রেখেছেন। ভারতের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে-রাজনীতির খেলা শুরু হয়েছিল, তা থেকেও তিনি ছিলেন অনেক দূরে। সাধারণ মানুষের কাছে তাই তাঁর পরিচয়টা বরাবরই ছিল খুব অস্পষ্ট, বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর বহু উক্তিকেও অনেকে তাই ভুল বুঝেছেন। কেউ তাঁকে বলেছেন দাম্ভিক, কেউ বলেছেন কটুভাষী—সঠিক মূল্যায়নটা আর হয়ে ওঠেনি।

রমন ছিলেন বিজ্ঞানী—মনেপ্রাণে খাঁটি বিজ্ঞানসাধক। বিজ্ঞানের গবেষণাই ছিল তাঁর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যে 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কারের জন্যে ১৯৩০ সালে তিনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, সেই আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তার এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার ক্ষেত্রে কি অসাধারণ সম্ভাবনার দিগন্তকে খুলে দেবে, তখনো কিন্তু কেউ তাঁকে এতটুকু বিচলিত বা উত্তেজিত হতে দেখে নি। ভবিষ্যতে নতুন কাজের পরিকল্পনার কথা তখন তিনি ভাবছেন। খাঁটি কর্মসাধকের এরচেয়ে বড় পরিচয় আর কিছু হতে পারে না।

রমন ১৮৮৮ সালের ৭ই নভেম্বর দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনাপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই পদার্থবিদ্যা বিষয়ে তাঁর গভীর আগ্রহ জন্মে। একটি ছোট ঘটনা থেকে এই আগ্রহের আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে। রমনের বয়েস যখন সাত, তখন তিনি একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ভুল বকতে শুরু করেন। তার সেই কথা থেকে বোঝা গেল তিনি আসলে লিডেন জারের মধ্যে বৈদ্যুতিক ডিসচার্জের পরীক্ষাটি দেখতে চাইছেন। পরীক্ষাটি দেখানোর পরে রোগীর অবস্থাও শান্ত হয়ে এল।

রমন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। স্নাতক হবার পূর্বেই রমন বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৯০৬ সালে আলোক-বিজ্ঞানে তাঁর একটি

মৌলিক গবেষণাকাজ লণ্ডনের ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল।

রমনের আন্তরিক ইচ্ছা, পদার্থবিদ্যার উচ্চতর গবেষণার জন্যে বিদেশে যান, কিন্তু তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। বাড়ির দিক থেকে অবশ্য চাপটা ছিল, যাতে তিনি সরকারের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কোনো চাকুরী গ্রহণ করেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে এক সরকারী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে রমন ভারতীয় ফিনান্স ডিপার্টমেণ্টে ডেপুটি অ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হয়ে কলকাতায় এলেন। ভবিষ্যতের মহান বৈজ্ঞানিকের এক বিচিত্র কর্মজীবন শুরু হলো।

'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেসন অফ সায়েন্স'-এর কর্মকেন্দ্র তখন বৌবাজার স্ট্রীটে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা। রমন তাঁর কাছে গিয়ে অনুমতি চাইলেন যাতে তার অবসর সময়ে অ্যাসোসিয়েশনের গবেষণাগারের সাহায্য নিয়ে তিনি কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ করতে পারেন। অনুমতি সহজেই পাওয়া গেল এবং রমন তাঁর অবসর সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত গবেষণাগারে কাটাতে শুরু করলেন।

দশ বছর বিভিন্ন জায়গায় সরকারী চাকুরী করার পর রমন ১৯১৭ সালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যা বিভাগে পালিত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যেই নেচার, ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিন, ফিজিক্যাল রিভিউ প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর মৌলিক গবেষণা সংক্রান্ত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

রমন ষোল বছর বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৪ সালে রমন লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। বিদেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্মেলনে তাঁকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে হয়। ১৯২৫ সালে মস্কো ও লেনিনগ্রাড বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর দ্বি-শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদানের জন্যে তিনি আমন্ত্রিত হন।

১৯৩০ সালে প্রকাশিত হলো রমনের নোবলপুরস্কারজয়ী যুগান্তকারী আবিষ্কার 'রমন এফেক্ট'। আলোকবিজ্ঞানে এই আবিষ্কার এক নতুন বিস্ময়রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করেছে। এর সন্ধানী-আলোকের পরীক্ষায় জানা গেছে অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর—তরঙ্গতত্ত্বে, অণু-পরমাণু রাজ্যে, বিকিরণ-ধর্মে, তাপ-গতিবিদ্যায়, রসায়নে। এই আবিষ্কারের পরবর্তী দশ-পনেরো বছরের মধ্যে রমন-প্রদর্শন সংক্রান্ত অন্তত দু-হাজার মৌলিক গবেষণা নিবন্ধ বিশ্বের নানাজাতির

বিজ্ঞান-পত্রিকায় স্থান অধিকার করেছে—বিজ্ঞান গবেষণার ইতিহাসে যা অভূতপূর্ব। এই গবেষণাকাজটি এতখানি সর্বজাগতিক আগ্রহ জাগাতে পেরেছিল শুধু নতুন বলে নয়—কেননা বিজ্ঞানের অন্যক্ষেত্রে ঐ সময়ের মধ্যেই আরো নতুন আবিষ্কার হয়েছে—এর প্রকৃত কারণ, একাধারে পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়নের লক্ষ্যস্থলস্বরূপ দুর্গম অণুরাজ্যের পথ খুলে গিয়েছিল আলোকবিকিরণের এই নব-পরীক্ষায়। রমনের এই আবিষ্কার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা পরিচয় আমরা গ্রহণ করার চেষ্টা করব।

'রমন এফেক্টের' মূলে আলোক বিকিরণের যে-পরীক্ষা, তার প্রেরণার মূলস্বরূপ রমন একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছিলেন। ১৯২১ সালে গ্রীষ্মাবকাশে যখন তিনি ইয়োরোপযাত্রী তখন শান্ত ভূমধ্যসাগরের আশ্চর্য নীলোচ্ছ্বাস তাঁর প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটে। ঐ রূপ দর্শনের ফলে তাঁর ধারণা হয়, আকাশের বর্ণশোভার মূলে রয়েছে যেমন সূর্যকিরণে বায়ুকণার দীপ্তি, সেইরূপ রবিদীপ্ত বারিকণারাই সমুদ্রবক্ষের নীলোচ্ছাসের মূল কারণ। পর্যটন শেষে কলকাতায় ফিরে এসে ঐ ধারণার বশবর্তী হয়ে রমন অনুরূপ গবেষণায়, অর্থাৎ তরল বস্তু সমূহের অণুদ্বারা আলোকরশ্মির বিকিরণ ধর্ম নির্ধারণে প্রবৃত্ত হলেন।

আলোকরশ্মির সঙ্গে বস্তুর অণুর সংঘর্ষ ঘটলে কখনো কখনো আলোর প্রকৃতি বদলে যায়, এইটাই রমন এফেক্ট বা রমন-প্রদর্শনের মূল কথা। ব্যাপারটা কিভাবে ঘটছে দেখা যাক।

আলোকরশ্মি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণায় বাধা পেলে চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে, যদিও তার বেগ থাকে একই। এই বিকীর্ণ আলোকধারা কতরকমের নিয়ম মেনে চলে, টিণ্ড্যাল থেকে শুরু করে বহু বিজ্ঞানী সেসব অনুসন্ধান করেছেন। যে-ক্ষেত্রে বিকিরক কণা হলো বস্তুর অণু, তার গবেষণায় হাত দেন লর্ড র‍্যালে, যে-কারণে আগে অণুর বিকীরণকে অনেক সময় র‍্যালে বিকিরণ (Rayleigh scattering) বলা হতো। এই আণবিক বিকিরণকে আমরা লক্ষ্যপথে আনতে পারি, তার দীপ্তি বিচার করতে পারি এবং বিকীর্ণ আলোকতরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা কম্পনসংখ্যা মাপতে পারি।

যে-কোনো বস্তুর অণুকে কোনো এক বর্ণের (monochromatic) অর্থাৎ শুদ্ধ এক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের স্থির আলো দিয়ে উদ্ভাসিত করা হলো। ফলে অণু থেকে যে-আলো বিকীর্ণ হলো, র‍্যালে দেখালেন সেই আলোর জ্যোতি বর্ণে বা তরঙ্গ-দৈর্ঘে অর্থাৎ কম্পনসংখ্যার বিচারে দীপক আলোর সঙ্গে অভিন্ন, যদিও সেই

আলো তুলনায় অত্যন্ত ম্লান, দীপক আলোর শতাংশের মতো তার দীপ্তি। একে বলে র‍্যালে-বিকিরণজ্যোতি, ১৮৯৯ সাল থেকে এর ধর্ম নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে।

আশ্চর্য ব্যাপারটা হলো এই, র‍্যালের আবিষ্কারের পর ত্রিশ বছর ধরে কারো লক্ষ্য হয়নি যে বিকীর্ণজ্যোতির সবটুকুই অবিকৃত ও অভিন্ন নয়। তাতে র‍্যালের অভিন্ন জ্যোতির সঙ্গে মিশে আছে আরো ক্ষীণ কিছু নতুন আলো, যা উদ্ভাসী আলোর মধ্যে কখনো ছিল না। তার রঙ আলাদা, অর্থাৎ তরঙ্গদৈর্ঘ বা কম্পনসংখ্যাও পৃথক। এ অতিক্ষীণ র‍্যালে-বিকিরণের ক্ষীণ দীপ্তিরও শতাংশের মতো, তাই হয়তো কারো নজরে পড়েনি। ১৯২৮ সালে রমন এই আলো এবং তার মর্ম ও মূল্যের কথা প্রথম প্রচার করেন, যা তিনি দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

র‍্যালে-বিকিরণের পাশাপাশি এই নতুন ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ আলোকতরঙ্গ-মালাকে রমন-রশ্মি বলে। এরা আবার অনেক সময় একবর্ণের না হয়ে, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ম্লান, ম্লানতর নতুন আলোর সমষ্টিরূপে দেখা দেয়।

বস্তুর অণুর সঙ্গে আলোকতরঙ্গের সংঘাতের ফলে দু-রকম ফল ঘটতে পারে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যা ঘটে, তাকে আমরা বলতে পারি নিষ্ফল সংঘাত। আলোর অণুতে কোনো শক্তিপরীক্ষা হলো না, অবিকৃত আলোকণা যেমন এসেছিল তেমনি ঠিকরে পড়ল, অর্থাৎ বিকীর্ণ হলো অভিন্নজ্যোতি—র‍্যালে যা দেখিয়েছিলেন।

কিন্তু সংঘাত যখন সফল হলো, তখন আলোকণার খানিক শক্তি অণু গ্রাস করে নিল। অতিদ্রুত কাঁপনের একএকটি আলোকণা থেকে অণু যেন নিজের মধ্যেকার স্থির কাঁপনটা কেটে নিল। যেটা বাকি রইল, বিকীর্ণ হলো ভিন্ন জ্যোতির রূপ নিল—তাই হলো রমন-রশ্মি। বস্তুর অণুর মধ্যে আলোর যে-কাঁপনটুকু খোয়া গেল তা অণুর নিজেরই কোনো একটা স্বাভাবিক কাঁপন। উদ্ভাসী আলোর কাঁপন থেকে অণুর স্বাভাবিক কাঁপন বা কাঁপনগুলো একে একে বাদ দিয়ে রমন-রশ্মিরূপ নতুন আলোকমালার সৃষ্টি হলো। যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে এই রমন-রশ্মিদের ফটো তোলা যায়, তাদের কম্পনসংখ্যা মাপা যায়।

রমন-পরীক্ষায় উদ্ভাসী আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ বা কম্পনসংখ্যা নিয়ে খুব বাছাবাছি নেই। সেটা আগে থেকে জানা একটা মাপের এবং বিকিরণের

সুবিধার জন্যে নীল-ঘেঁষা হলেই হলো। আসলে মূল্যবান যেটা তাহলো, উদ্ভাসী আলোর কম্পনসংখ্যা থেকে রমন-রশ্মির কম্পনসংখ্যার অন্তরফলটা, কেন-না সেটুকুর মধ্যেই নিহিত রয়েছে অণুর কৃতিত্ব, তার নিত্যধর্ম, তাকে জানার চাবিকাঠি। এটাই অণুনিহিত স্বতঃস্পন্দন। অণুর এই সমস্ত আভ্যন্তরীণ কারণ আগে জানা প্রায় অসাধ্য ছিল, অথচ এদের না মাপতে পারলে অণুর নানা সূক্ষ্ম গঠনকৌশল জানার কোনো উপায় নেই।

পদার্থ ও রসায়নবিদ্যার সমবেত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে রমনের আবিষ্কারের বহুমুখী প্রয়োগ ঘটেছে—বিশ্বের গবেষণা-পত্রিকাসমূহে এ-বিষয়ে তিন হাজারের ওপর মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশের মধ্য দিয়েই আমরা তার পরিচয় লাভ করি। ১৯৫৫ সালে এ-বিষয়ের ওপর এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

রমন তাঁর নোবেল পুরস্কারের অর্থের বেশিরভাগ অংশ ক্রিষ্টালোগ্রাফী সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে হীরক কেনার ব্যাপারে খরচ করেন। তিনি সারা জীবনে বিভিন্ন আকারের ৭০০এর বেশি হীরকখণ্ড সংগ্রহ করেন। আসল বা নকল হীরে চেনার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন এক নিপুণ ব্যক্তি।

রমন ১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্সের ডিরেক্টর রূপে যোগদান করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি বাঙ্গালোরে রমন রিসার্চ ইনষ্টিটিউট স্থাপন করেন এবং পরবর্তীকালে এখানেই তাঁর সমগ্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজ পরিচালিত হয়। রমন বিদেশের বহু আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালে রমন ভারতের জাতীয় অধ্যাপক নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৪ সালে তাঁকে ভারতরত্ন উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির করেস্পণ্ডিং মেম্বার নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ১৯৫৭ সালে আন্তর্জাতিক লেনিন পুরস্কার লাভ করেন।

নীরস পদার্থবিদ্যার গবেষণায় ব্যাপৃত থেকেও রমনের সৌন্দর্যস্পৃহা এবং রসবোধ ছিল অপরিসীম। বিভিন্ন সঙ্গীতযন্ত্র, আলোক-তরঙ্গের বিচিত্র অভিব্যক্তি সমুদ্রের রঙ, পাখির পালকের বর্ণবৈচিত্র্য, শামুক-ঝিনুকের খোলায় রামধনুর কম্পন, হীরকের গঠন, আণবিক সংস্থান ও সৌসাদৃশ্য বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণার মধ্যেও তাঁর সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। রঞ্জন-রশ্মির diffrae-tion বা অবচ্যুতি এবং ফুলের রঙ সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। গবেষণার মূলে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর কাছে তিনি কৃতজ্ঞতার কথা আজীবন স্বীকার করেছেন।

শঙ্কর চক্রবর্তী

আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ

ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের মহর্ষি আচার্য আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব পূর্বেই পদ্মভূষিত হয়েছিলেন, এবারে পদ্মবিভূষিত হলেন। অবশ্যই আচার্য খাঁ-সাহেব এমনই বৃদ্ধ হয়েছেন যে, ভূষণ বা বিভূষণের তিনি বাইরে, এমনকি 'রত্ন' লাভ করলেও মহর্ষির কাছে সেটা বিভূতি মাত্র ; তবে 'ভারতরত্ন'-টা নিশ্চয়ই ভারত সরকারের মন্ত্রীবর্গের বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের জন্যই তোলা আছে। এবং আচার্য খাঁ-সাহেবকে পদ্মবিভূষিত করে ভারত সরকার যে বিশেষ সম্মানিত হয়েছেন সে-বিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।

পুরাণে পড়ি মহর্ষি ভগীরথ ষাট সহস্র বছর কঠোর তপশ্চর্যা করে মর্তভূমিতে স্বর্গ মন্দাকিনী এনে সগরবংশকে উদ্ধার করেছিলেন, আর তাতে ভারতভূমি গঙ্গার স্রোতে হয়ে উঠেছে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা।

সঙ্গীতের জন্য আচার্য খাঁ-সাহেবের সাধনাকে তুলনা করতে পারি মহর্ষি ভগীরথের সঙ্গে, সেই দুরূহ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রসধারায় ভারতভূমি আজ উর্বর। লক্ষ্য করার বিষয়, আজীবন সাধনালব্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কঠোর বন্ধনী ভেঙে আচার্য খাঁ-সাহেব তাতে এনেছেন লোকসঙ্গীতের, বিশেষ করে, পূর্ববাঙলার লোকসঙ্গীতের মিষ্টি রস। একদিকে তিনি ধ্রুপদীর ধ্রুপদী, অপরদিকে তাঁরই হাতে, ইদানীং তাঁর মহারথ পুত্র আলি আকবর খাঁ বা জামাতা রবিশঙ্করের হাতে হয়তো ভোর রাত্রের শেষ আসরের ভৈরবী মনে করিয়ে দেয় বাঙলা দেশের একেবারে ঘরোয়া লোকসঙ্গীতের জলে-ভেজা মিষ্টি শ্যামল রূপটিকে, যদিও যে-কোনো সময়েই তাতে তাঁদের ঘরের স্বকীয় তন্ত্রবাজের কাঠামোটি থাকে অক্ষুণ্ণ।

তাঁর জীবনকথা

পুরো তথ্যসমৃদ্ধ জীবনী হয়তো একদিন প্রকাশিত হবে, উপস্থিত বিশিষ্ট কয়েকটি ঘটনার মাত্র উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতে হবে স্থানাভাবে।

কুমিল্লার শিবপুরের গ্রামে ওঁদের হলো ডাকাতের বংশ—পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সাধক সম্প্রদায়ী এই বংশটিতে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের প্রভাব প্রায় সমান সমান। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাবান্বিত এই পুরুষটি উদয়শঙ্করের

সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমনান্তে হজ্‌ করে এসেছেন। আবার মাইহারে তাঁর একান্ত নিজস্ব ছোট কামরাতে বহু দেবদেবীর সঙ্গে যীশুখৃষ্টের ছবিও দেখেছি।

বড়ো ভাই ফকির আফতাবউদ্দিন বাঁশি বাজাতেন। দরবারী ছিলেন না কোনোদিনই, তবে তাঁর বাঁশির নাম ছিল তখনকার বাঙলাদেশে।

ছোট ভাই, আলাউদ্দীন. লোকে তাকে ডাকতো 'আলাম' বলে (মাথাটা বড়ো) বছর দশেক বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতার পথে পথে ঘুরে, ভিখারির নঙ্গরখানায় খেয়ে শেষ অবধি রাজা সৌরেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাগায়ক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (নুলো গোপাল নামে সাময়িক পরিচিত) এর কাছে এক নাগাড়ে সাত বছর কেবলমাত্র সারগাম অভ্যাস করেন। বলা বাহুল্য, নুলো গোপালের মায়া পড়ে যায়, বাড়ি-ছাড়া এই ছোট ছেলেটিকে একেবারে গোড়ার ধ্রুপদী স্বরসাধনার তালিম দিতে তিনি কার্পণ্য করেননি।

যে-কলকাতার পথে পথে একদিন তিনি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, সেই কলকাতার পৌরসভা যখন ১৯৫৮ সালের আগষ্ট মাসে তাঁকে পৌর সম্বর্ধনা দান করে তখন সে-কথা আচার্য খাঁ-সাহেব সজল চোখে ধন্যবাদার্থে বলেছিলেন।

নুলো গোপাল হঠাৎ মারা যান কলকাতার বিখ্যাত প্লেগে, আলাউদ্দিনের বয়স তখন বছর কুড়ি। কলকাতার প্লেগ হয়েছিল ১৮৯৮ সালে।

নুলো গোপালের মৃত্যুর পর আবার কিছুদিন পথে পথে ঘুরে শেষ অবধি বিবেকানন্দের খুল্লতাত হাবু দত্তের আসরে বেশ কয়েকটি বাজনা এমনকি বিলাতি শেখার তাঁর সৌভাগ্য হয় এবং গিরীশ ঘোষের কৃপায় তাঁর সামান্য একটা চাকরিও বোধহয় মিনার্ভা থিয়েটারে জুটে যায়। ইতিমধ্যে বাড়ির লোক খোঁজ পেয়ে তাঁকে জোর করে বাড়ি ফেরত নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেয়।

কিন্তু বিয়ের রাত্রেই তিনি আবার কলকাতা চলে আসেন এবং অনেক চেষ্টাচরিত্র করে আমির খাঁ-সাহেবের কাছে সরোদ শিক্ষার সুযোগ পান। গুরু সেবার নামে শিষ্যকে অনেক কিছুই কষ্ট করতে হয়, শিক্ষার কাজটাও বেশির ভাগ মুখে মুখে। আসলে, আমাদের আজকের দিনের কলেজ বা স্কুল ধরনের স্বরলিপি মারফৎ শিক্ষার ব্যবস্থাও ছিল না, আবার আলাউদ্দীনের মতো অজ্ঞাতকুলশীল ছাত্রের মতো গুণপনাই থাক না কেন. গুরুর কাছে ব্যক্তিগত তালিমের ব্যবস্থাও ছিল না।

অথচ আলাউদ্দীন ছিলেন শ্রুতিধর এবং শুনে শুনে যা শিখেছিলেন তাই বাজাতে গিয়ে একদিন গুরুর কাছে, যাকে বলে, ধরা পড়ে গেলেন। শেষ

অবধি আমির খাঁ তাঁকে বললেন 'সরোদ শিখতে চাও তো রামপুরে উজীর খাঁকে ধরো'।

রামপুরের নবাবের সঙ্গীতের সভাটি বিশেষ জাঁকালো, ভারতবিখ্যাত বহু জ্ঞানীগুনীর সমাগম হয়ে থাকে, আর মিয়া তানসেনের দৌহিত্র বংশের উত্তরাধিকারী উজীর খাঁ ধ্রুপদী ও বীণকারও বটে তার মধ্যমণি, তাঁর নাগাল পাওয়া সহজ নয়। সুদূর বাঙলাদেশের মলিন বস্ত্র পরিহিত গোত্রহীন আলাউদ্দীনের স্থান কোথায় সেখানে? যুবক আলাউদ্দিন কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—ইট খোলায় সামান্য বেতনে চাকরি করে কোনোরকমে দিনযাপন করেন আর ঘুরঘুর করেন যদি উজীর খাঁর সাক্ষাৎ মেলে। শেষ অবধি তিনি একদিন রামপুরের নবাবের গাড়ি রুখে দিলেন, হাতে আফিমের ছোটো কৌটো, সামান্য দাবি—উজীর খাঁর কাছে না শিখতে পারলে প্রাণ রাখবো না।

রামপুরে বাঙলাদেশের ছেলেদের একটু ভয় করতো—তারাই না বোমা পিস্তল নিয়ে ইংরেজ হুকুমতকে তাড়াবার সঙ্কল্প নিয়েছে। আলাউদ্দীনের প্রতিজ্ঞার সামনে নবাব প্রথম তাঁর বাজনা শুনলেন, প্রীত হয়ে উজীর খাঁর কাছে শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আলাউদ্দীন উজীর খাঁর বাড়িতে ঢুকবার অনুমতি মাত্র পেলেন বলা চলে। সকালে যান, গড়গড়ার জল ফিরানো থেকে কাপড়-কাচা ইত্যাদি সবরকমের গুরুসেবাই করেন, বদলে উজীর খাঁর বড়ো ছেলে সগীর খাঁর (আজকের বহুপরিচিত দবীর খাঁর পিতা) কাছে কিছু কিছু তালিম মেলে। অবশ্য আগেই বলেছি, আলাউদ্দীন ছিলেন শ্রুতিধর; কোনো আসরে বা উজীর খাঁ যখন নিজের মনে বাজাতেন তখন শুনতে পেলেই তাঁর যথেষ্ট। পরে তিনি বাড়ি ফিরে তা তুলে নেবেন।

ঠিক কত বছর এ-ধরনের শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন বলা শক্ত—মনে হয়, অন্তত দশ থেকে বারো বছর। তারপর একদিন উজীর খাঁ তাঁর শিক্ষার সমাপ্তি ঘোষণা করে বিদায় দিলেন। কলকাতা ফিরে দলাদলি ভালো লাগলো না, ছোট মাইহার স্টেটের রাজার কাছে হাজির হলেন। রাজা বাজনা শুনতে চাইলেন—সময়টা বিকাল, আলাউদ্দিন সন্ধিপ্রকাশ রাগ 'শ্রী'তে আলাপ করবেন বলে যন্ত্র বেঁধে যেই সামান্য বাজিয়েছেন, রাজা তাঁকে আসতে বল্লেন। মনটা খারাপ হয়ে গেল, 'শ্রী'র মতো রাগ, এ-কোন্ বেরসিক বেসুর আদমি যে সেটা শুনতে চায় না।

পরদিন রাজা তলব করে আলাউদ্দীনকে গুরুপদে বরণ করলেন, বললেন, 'তোমার ঐ রাগে আমার যে অপূর্ব রোমাঞ্চ ও অনুভূতি হয়েছে, তাতে তোমাকেই আমার সঙ্গীতগুরু করলুম।'

সালটা যতদূর অনুমান করতে পারি, প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে, ১৯১৮-১৯। এই সময়েই তাঁর বড়ো মেয়ের জন্ম হয়, কিছুদিন পরে ১৯২১-২২এ আলি আকবরের। মাইহারে শান্তিতে দিন কাটে, অনাড়ম্বর জীবন, প্রাচুর্য না থাকলেও মোটামুটি স্বচ্ছল, আর মাইহারেই দু-একটি ছাত্র জোটে, তিমিরবরণ অবশ্য এরপরে।

এমন সময়ে খবর পেলেন, গুরু উজীর খাঁর বড়ো ছেলে, সগীর খাঁ, যাঁর কাছে আলাউদ্দিনের প্রধান শিক্ষা, তিনি মারা গেছেন। সবকিছু থেকে ছুটি নিয়ে তিনি গেলেন উজীর খাঁর সঙ্গে দেখা করতে। গুরু এবার ভেঙে পড়লেন —'আলাউদ্দিন, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, অন্যায় করেছি, আসল শিক্ষা তোমাকে দিইনি; এখন থেকে যাও, দোবো।'

সত্যই, এরপরের দু-তিন বছর যে-শিক্ষা আলাউদ্দিন উজীর খাঁর কাছে পেলেন, সেটাই তাঁকে একদিন রামপুরের উজীর খাঁর ঘরের প্রধান উত্তরসাধক করে তুললো। পরে এখান থেকেই তাঁর নিজের অর্থাৎ আলাউদ্দিনের ঘরানার সৃষ্টি। অবশ্যই আলাউদ্দিনকেও একদিক থেকে ছাড়িয়ে গেছেন তাঁর পুত্র, আলি আকবর খাঁ—তবে সঙ্গীতের বহুল প্রচারের সুযোগে তথা লং-প্লেয়িং রেকর্ড প্রভৃতির কল্যাণে ঘরানার গোঁড়ামি আজ প্রায় ভেঙে গেছে। তাছাড়া আলি আকবর খাঁ সাহেবকে দেখেছি, স্বরলিপির ব্যবস্থা প্রচলনে বিশেষ উৎসাহী, এবং এমনকি কখনও নিজেকে লিখে দিতে বা ছাত্রদের স্বরলিপি সংশোধন করতেও দেখেছি।

গুরুর শিক্ষা সমাপ্ত করে ১৯২৪এর এলাহাবাদ সঙ্গীত কনফারেনসে আলাউদ্দীন উপস্থিত। ভাতখণ্ডে প্রমুখ বড়ো বড়ো সমজদার আর ভারত বিখ্যাত বহু গায়ক বাদকের সমাবেশ হয়েছে। আলাউদ্দিন বাজাতে চান, কিন্তু বিশেষ পাত্তা মেলে না। কারণ গুরুর নাম উল্লেখ করেননি, পাছে খারাপ বাজান। এটা আমার তাঁর নিজের মুখেই শোনা। শেষ অবধি দুই প্রোগ্রামের মাঝের দশ-পনের মিনিটের ব্যবধানে তাঁকে বাজাতে অনুমতি দেওয়া হলো।

আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের ভাষায়, 'ইষ্টদেবতা ও গুরুর নাম স্মরণ করে বাজাতে বসে কখন দশ-মিনিট গড়িয়ে দেড়-ঘণ্টা হয়ে গেছে, কি বাদক কি

শ্রোতা কোনো আপত্তি করেনি (তখনকার সঙ্গীত কন্‌ফারেনসে এতো অক্ষর বাঁধাবাঁধির ব্যবস্থা ছিল না—অবশ্যই এর দুটো দিক আছে)। আলাপ-জোড়-ঝালার কাজ শেষ হলো, কুন্ঠিত আলাউদ্দিন, শ্রোতৃবর্গ চমকিত—সঙ্গীত রসিকদের ভাষায়—'এ-কোন্‌ বনের বাঘ, এ-কোথায় বাড়ছিল?' অবশ্যই জানাজানি হলো।

এবারে তখনকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক, খলিফা আবেদ হুসেন খাঁ সাহেবের সঙ্গে সঙ্গত—তখনকার দিনের দু-চারজনের মুখে শুনেছি, বহু লয়কারী, আড়ি-কুয়াড়ির নানারকমের জোট ছাড়িয়ে শেষ অবধি দু-জনে জলদে এসে জমে গেলেন প্রায় দু-ঘণ্টা। কেউই কাউকে ছাড়বে না। এ-রকম লড়ালড়ি তখনকার দিনে হতো—আজকাল সঙ্গতের দ্বন্দ্বটা একান্তই চুক্তি করে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে। হয়তো ভালোই। শেষ অবধি পণ্ডিত ভাতখণ্ডে দু-জনেরই মান রাখবার জন্য থামিয়ে দিলেন। এরপর থেকে আলাউদ্দিন খাঁ-সাহেব উত্তর ভারতীয় ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের অন্যতম সম্রাট।

আলাউদ্দিনের ঘরানা

আমাদের সঙ্গীত প্রধানত কণ্ঠনির্ভর। অবশ্যই যন্ত্রের স্বকীয় স্বাধীন অস্তিত্ব যন্ত্রের উন্নতি সাধন না হলে হয় না, সেটা প্রাচীন যুগে সম্ভব ছিল না। অতএব যন্ত্রসঙ্গীত ছিল অনুগত—accompanient—যেমন চালু কথা, নারদ বীণা বাজিয়ে গান করছেন।

উজীর খাঁ ছিলেন বীণকার, আসলে বড়ো ধ্রুপদী, ইচ্ছে ছিল বড়ো ছেলে সগীর খাঁকে সেইভাবেই তৈরি করবেন। খানিকটা ঘটনাচক্রে, কিন্তু অপরিসীম সাধনার বলে আলাউদ্দিন খাঁ যখন প্রধান শিষ্যত্ব লাভ করলেন (সগীর খাঁর মৃত্যুর পর) উজীর খাঁ গোড়াতেই বলে নিলেন যে, তাঁর পুত্রবংশীয় ছাড়া আর কাউকে তিনি বীণ শেখাবেন না, তবে তাঁকে সরোদ শেখাবেন এমন ভাবে যাতে বীণ, রবাব, সুরশৃঙ্গরের বাজ ধরা পড়বে, —এককথায় পুরো ধ্রুপদী আলাপ, এবং মীড় অঙ্গ বা তারপরণের কাজ সবই সরোদের মাধ্যমেই প্রতিভাত হবে।

ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীতের পক্ষে মহা শুভদিন ছিল এটি বলা যেতে পারে। সরোদ পূর্বে ছিল প্রখর দু-তারার লোকসঙ্গীতের মতো একটা যন্ত্র, যার প্রায় একমাত্র বাজ্‌ ছিল বোল্‌ অঙ্গ। এরপর থেকে আচার্য আলাউদ্দিন এবং তাঁর

ঘরানার আলি আকবর রবিশঙ্কর বা নিখিল ব্যানার্জীর হাতে আমরা সরোদ বা সেতারের মাধ্যমেই পুরো ধ্রুপদী আলাপ বা জোড়ের কাজ পাই, নিশ্চয়ই রাগমূর্তির রূপায়ণেও সেটা বিশেষ সাহায্য করে। এ-নিয়ে বিস্তৃত কিন্তু হয়তো খানিকটা টেকনিক্যাল আলোচনা করার নিশ্চয়ই আরো অবকাশ আছে। আমরা সাধারণ দু-একটি কথা পেশ করবো।

দশ বছর বয়স থেকে সংগ্রাম করে পঞ্চাশোর্ধে আলাউদ্দিন তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। এই চল্লিশ বছরের তপশ্চর্যার প্রভাব আলাউদ্দিনের সঙ্গীতে পড়েছে এমনভাবে, যাতে মনে হয় মাঝে মাঝে তাঁর বাদন যেন খানিকটা নিষ্করুণ, কিছুটা রুক্ষ তবে আসল দরবারী সঙ্গীতের চেহারা নিয়েছে। অথচ এই দরবারী মেজাজের সঙ্গে মিশেছে বাঙলার লোকসঙ্গীতের বহু কলি, ফলে একাধারে তাঁর বাদন যেমন ব্যাকরণশুদ্ধ, তেমনি মিষ্টত্বের দাবি করতে পারে।

সঙ্গীত জগতে আলাউদ্দিন খাঁ-সাহেব মহর্ষি এবং দার্শনিক, আর তাঁর পুত্র আলি আকবর এক কথায় কবি। আলি আকবরের প্রথম যৌবন অবধি কেটেছে কঠোর সাধনার মধ্যে, আর সেটা ঘটেছে মাইহারের ধূসর দিগন্তে, তার পাহাড়ের কোলে আলাউদ্দিনের ছোট্ট 'শান্তি কুটিরে'। আলাউদ্দিনের মতো তাঁকে পথে পথে ঘুরতে হয়নি, তাঁর পিতার তৈরি ঘরের উপর যে ইমারত আলি আকবর গড়ে তুলতে পেরেছেন, সেখানে অবশ্য তিনি একক। ধ্রুপদী অতলস্পর্শী গভীরতার সঙ্গে শ্যামল বাঙলার লোকসঙ্গীতের এমন কবিত্বময় সম্মেলন আর কখনও ঘটেনি। রবিশঙ্কর এখানে একটু আলাদা, প্রজাপতির চঞ্চলতা এসেছে ধ্রুপদী কাঠামোতে, প্রধানত তাঁর বিচিত্র চোখের মাধ্যমে। দু-জনেই সঙ্গীতের রাজা আর জুড়িতে যেন প্রয়াগ-সঙ্গম।

রবীন্দ্র-কল্যাণ

১৯৬১ সালে পার্ক সার্কাস রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসবের ৯ই নভেম্বর আচার্য খাঁ-সাহেবকে সম্মেলনে নিয়ে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল লেখকের। আর মাঠের মধ্যে তাঁকে যখন পাথুরিয়াঘাটার মন্মথ ঘোষের বিচিত্র চিত্তাকর্ষক সঙ্গীত-প্রদর্শনীতে নিয়ে যাচ্ছি, তখন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে দেখা। তাঁর আসার কথা ছিল পরের দিন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে একদিন পূর্বেই এসেছিলেন।

দু-জনে পরম বন্ধু, আলিঙ্গন কুশল এবং সঙ্গীত প্রদর্শনী দেখার পরে যখন

তাঁদের ভেতরের মধ্যে নিয়ে আসা হলো অভ্যর্থনার জন্য তখন প্রায় দুই হাজার লোক। সেখানে আচার্য খাঁ-সাহেব স্বকণ্ঠে মুলুহা-কেদারা ও কল্যাণ মিশিয়ে একটি নতুন রাগের কাঠামো মাত্র পেশ করেন, নাম দেন তাঁর ভাষায় 'গুরু-কল্যাণ'—কারণ রবীন্দ্রনাথকে তিনি গুরু বলেই ডাকেন। আরো প্রায় বছর দুয়েক পরে পুত্র আলি আকবর খাঁ এই কল্যাণের (বলা যেতে পারে রবীন্দ্র-কল্যাণ) পুরো রূপ দিয়েছেন। আর গৎয়ের বন্দেশ করেছেন সাড়েসাত মাত্রায়—রূপকের শেষ তিন মাত্রাকে ডবল করে বাজালে দাঁড়াবে ১ ২ ৩। ৪। ৫ ৬ ৭—অর্থাৎ ৫ মাত্রা।

আচার্য খাঁ-সাহেব অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গানকে গৎয়ের বন্দেশে ফেলেছেন, বিশেষ করে, রবীন্দ্রনাথের "মহারাজ, একি তোমার সাজ" বেহাগের দ্রুত গতে বাঁধাতে রেখাবের তীব্রতা সত্ত্বেও বেহাগ ক্ষুণ্ণ হয়নি।

তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করে ও অপরিসীম শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণ করি, কলকাতায় তাঁর শেষ বাদন—১৯৫৮এর ১৫ই আগস্টের সকালে—শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনে। সকালের প্রথম প্রহরের দেওগিরি-বিলাবলের বিষণ্ণ সুন্দর করুণ, একান্ত আত্মনিবেদনের ভক্তিমূলক রূপটি কোনোদিন ভুলবার নয়।

দিলীপ বসু

পল এনটনি স্যামুয়েলসন

গতবারের মতো এ-বছরেও সুইডিশ একাডেমির নোবেল প্রাইজ কমিটি সমাজ বিজ্ঞানের প্রতি তাঁদের গুণগ্রাহিতা দেখিয়েছেন, এবং এ-কথা স্বীকার করেছেন যে পদার্থতত্ত্ববিদ, শরীরতত্ত্ববিদ অথবা সাহিত্যিকের মতো সমাজবিজ্ঞানীরাও নিজের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান করতে পারেন। গতবছর এই পুরস্কার পেয়েছিলেন রাগনার ফ্রিশ এবং জান টিনবারজেন। সুইডিশ একাডেমি অব সায়ান্স এবছর পল এণ্টনি স্যামুয়েলসনকে পুরস্কৃত করতে গিয়ে তাঁদের বিচার পত্রে বলেছেন যে পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক এই অধ্যাপক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণস্তরকে যে-কোনো অর্থশাস্ত্রবিদের চেয়ে উন্নততর করেছেন।

স্যামুয়েলসন অর্থনীতির ভাষাকে নতুন রূপ দিয়েছেন। তাঁর মতে গণিত ঘেঁষা ভাষা সমস্ত অর্থশাস্ত্রকে এক অপূর্ব ঐক্য প্রদান করবে এবং এই শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, যথা উৎপাদন, ভোক্তা ব্যবহার, ব্যবসায়-চক্র, আন্তর্জাতিক

বাণিজ্য প্রভৃতি একতার সূত্রে আবদ্ধ হবে। তাই তিনি গণিতের মাধ্যমে অর্থশাস্ত্রকে পরিবেশন করেছেন। গণিতের পরিভাষায় গড়ে উঠেছে অর্থশাস্ত্রের মৌলিক সিদ্ধান্তগুলি। এবং যাঁরা গণিত-প্রধান উক্তিই পছন্দ করেন, তাঁদের সুবিধার জন্য তিনি তাঁর গবেষণাগ্রন্থ (হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৭) Foundations of Economic Analysis গ্রন্থের শেষ দুই পরিশিষ্টে গণিতের জটিল বিশ্লেষণ সমাবিষ্ট করেছেন।

সামুয়েলসন জন্মগ্রহণ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইনডিয়ানা রাজ্যের গ্যারি শহরে ১৯১৫ সালের পনেরোই মে তারিখে। পড়েছেন চিকাগো ও হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ অ্যালভিন হ্যানসেন ছিলেন হারভার্ডে তাঁর শিক্ষাগুরু। ১৯৪১ সালে হারভার্ড থেকেই তিনি পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করলেন। তাঁর গবেষণা সন্দর্ভ Foundations of Economic Analysis সামুয়েলসনের অন্তর্নিহিত শক্তির নির্দেশ দেয় এবং তিনি এ-গ্রন্থ প্রকাশের ফলে অর্থশাস্ত্রীয় মহলে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন।

১৯৬০ সালে তিনি টাস্ক্ ফোর্স-এর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। এই টাস্ক্ ফোর্স-এর কাজ ছিল, কি করে মন্দাকে প্রতিরোধ করা যায় সে সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া। জন মেনার্ড কেইন্স পুঁজিবাদী দেশের মোট আয়কে মোট ভোগ ব্যয় ও মোট লগ্নি ব্যয়ে ভাগ করে দেখিয়েছিলেন। বড়লোকদের বর্ধমান আয় থেকে বেশি বেশি অংশ সঞ্চয় হয়ে যায়। অন্যদিকে মূলধনলগ্নিকারীরা যে শতাংশ আয় প্রত্যাশা করেন, তার চেয়ে বেশি বা প্রায় সমান সুদের হার হলে, লগ্নি র হার কমে যায়। এই হ্রাসমান লগ্নিকে ভরতুকি দিতে পারে সরকারী ব্যয়। এ-সরকারী ব্যয় অনেকখানিই কর আরোপ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে করা যেতে পারে। তাঁর বিবরণীতে সামুয়েলসন বললেন যে জড়ত্বের বা অবনয়নের সম্মুখীন মার্কিনী অর্থনীতি ব্যবস্থাকে বাঁচাতে এবং অর্থনৈতিক বিকাশের নীতিকে কার্যকরী করতে হলে করভার তিন বা চার শতাংশ কমিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হতে পারে। মুহ্যমান ও পরিশ্রান্ত অর্থ-ব্যবস্থাকে জীবিত করে তোলার জন্য তিনি অনুমোদিত সরকারী খরচপত্রের সমর্থন করেন। তবে এর জন্য বিশেষ জরুরী এবং বৃহত্তর সরকারী খরচপত্রের সমর্থন করেন না। পরে সামুয়েলসন ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে ১৯৬১ সালের দ্বিতীয় অর্ধাংশে মার্কিন অর্থব্যবস্থার গতি শুদ্ধ হয়ে যেতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে অধিকতর সরকারী প্রোৎসাহের প্রয়োজন হতে পারে। তার

জন্য তিনি যে-নীতি অনুমোদন করেন তাতে রয়েছে করনীতি ও ব্যয়নীতি সম্বন্ধে জাতীয় মনোভাব এবং সুদের হার ও টাকা পয়সার সরবরাহ সম্বন্ধে জাতীয় নীতি। স্বাধীন অর্থব্যবস্থায় মূল্য-যন্ত্র যে সকল অবস্থাতেই অর্থব্যবস্থার মানকে অব্যাহত রাখবে এ যুক্তি তিনি জোর দিয়ে খণ্ডন করেন।

তাঁর সমধিক পরিচিত আলোচনা হলো—Ecanomics-An Introductory Analysis। এই গ্রন্থের দশ লক্ষেরও বেশি কপি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই বিক্রি হয়েছে। এ-ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যে-সব দেশে ইংরাজির মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে সেখানেও সামুয়েলসনের এই পুস্তকটি জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তকের মর্যাদা পেয়েছে। অর্থনীতির এই প্রাথমিক পুস্তকে গণিতবিধির ব্যাপক প্রয়োগই এর সমাদরের মূল কারণ। আদি সংস্করণগুলিতে সামুয়েলসন তাঁর পুস্তকে মুদ্রাস্ফীতি এবং মন্দাবিষয়ক আর্থিক ঘটনাবলীর জটিল বিশ্লেষণ করেন। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে তিনি অর্থশাস্ত্রের পুরোনো এবং নতুন সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটা নিও-ক্লাসিক্যাল্ সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। সংক্ষেপে তাঁর সমন্বয় হলো এই যে অ-সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি বাণিজ্যের মন্দা বা তেজী অবস্থাকে রাজস্ব এবং মুদ্রানীতির সাহায্যে সফলভাবে নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম।

সামুয়েলসনই সর্বপ্রথম নির্দেশ করেন যে স্থিতিস্থাপক অবস্থার ব্যতিক্রমে অর্থব্যবস্থায় কিভাবে প্রতিক্রিয়া হয় এটা না জানলে অর্থব্যবস্থার স্থিতি বজায় রাখা যায় না। এইরূপে তিনিই সর্বপ্রথম গতিশীল ধারার (Dynamic Schema) ব্যবহার করেন। স্থিতিশীল ধারার (Static Equilibrium) প্রবর্তন করেছিলেন ভালরাস এবং পরে এই ধারা পারেতোর হাতে পূর্ণরূপ প্রাপ্ত হয়। পারেতোই তুলনামূলক স্ট্যাটিক্সের ব্যবহার করেন কিন্তু তাঁর গাণিতিক বিশ্লেষণে কিছু দুর্বলতা ছিল। সামুয়েলসন করেসপণ্ডেন্স পদ্ধতির (Correspondence Principle) উদ্ভাবন করে এই বিশ্লেষণকে এগিয়ে দিলেন। এরপরেই তিনি এতে জুড়ে দিলেন Dynamics বা গতিশীলতা। এতেও তিনি সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি উদ্ভাবন করলেন তুলনামূলক গতিশীলতা (Comparative Dynamics) যেমন গত শতাব্দীতে ভালরাস করেছিলেন তুলনামূলক স্থিতিশীলতা (Comparative Statics)। তুলনামূলক স্থিতিশীলতার সারতত্ত্ব হলো এই যে আমরা কোনো কিছুর পরিবর্তন করছি এবং সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করছি। স্থিতিশীল অবস্থায় কিন্তু প্রাথমিক অবস্থার পরি-

বর্তনে অর্থব্যবস্থার ব্যবহারে শেষ পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু এই বিশ্লেষণে বাস্তবের পূর্ণ ব্যাখ্যাও হয় না বলে সামুয়েলসন তুলনামূলক গতিশীলতার প্রবর্তন করেছিলেন।

কল্যাণের অর্থশাস্ত্রের (Welfare) ক্ষেত্রে সামুয়েলসান হলেন ordinal utility সিদ্ধান্তের একজন প্রাথমিক প্রবর্তক। এই সিদ্ধান্ত যাঁরা প্রস্তুত করেছেন তাঁরা বলেন যে প্রান্তিক উপযোগিতার সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে পরিমাপ্যতাই যখন প্রধান অন্তরায় তখন একে অপরিমাপ্য করাই হলো এই সিদ্ধান্তকে উৎকর্ষের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মনে করা যাক, একজন ব্যক্তি ক বস্তুসমূহের চেয়ে খ বস্তুসমূহকে বেশি পছন্দ করে, এবং খ এর চেয়ে গ বস্তুসমূহকে আরো বেশি পছন্দ করে। তাইলে এ-কথা বলা চলে যে সে গ বস্তুসমূহকে ক বস্তুসমূহের চেয়েও বেশি পছন্দ করে। সামুয়েলসন বললেন যে এই প্রকাশ্য পছন্দ সিদ্ধান্ত (Revealed preference theory) সম্পূর্ণ অবাস্তব, কেননা এর আধার হল ব্যক্তির ব্যবহারের যৌক্তিকতা এবং সঙ্গতি সম্বন্ধে ধারণা, যে ধারণা বাস্তবিক পক্ষে ঠিক নয়। এ-ছাড়া প্রকাশ্য পছন্দ সিদ্ধান্ত আমাদের ভোগ ব্যবহার বিষয়েও যথোচিত সমাধানের পথ নির্দেশ করে না। একইভাবে সামুয়েলসন দেখিয়েছেন যে সামূহিক নিরপেক্ষতার রেখার Community Indifference curve-এর ধারণাটিও ভ্রান্ত।

নিও ক্লাসিকাল বণ্টন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করতে গিয়ে সামুয়েলসন বলেছেন যে এই সিদ্ধান্তের মূলে রয়েছে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিখুঁত ধারণা যা সত্যিকারের সঞ্চয় এবং সত্যিকারের পুঁজিনিয়োগকে সমান করে রাখবে। বাস্তবিক পক্ষে এই ধরনের পরিস্থিতি তখনই হতে পারে যখন পূর্ণনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই ধরনের পরিস্থিতি খুব কমই হয়ে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অ-পূর্ণনিয়োগ (Underemployment)। তখন সঞ্চয়ের চেষ্টা করা সত্ত্বেও সঞ্চয়ের পরিমাণ কমই হয়, বেশি নয়। ভোগব্যবহার কম করার চেষ্টার ফলে আয় কমে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সবাই নিজেকে সঞ্চয় করার ব্যাপারে অসমর্থ মনে করে। এমনি করে বিকশিত পুঁজিবাদী দেশে মিতব্যয়িতার ফলে পুঁজিনিয়োগ প্রকৃতপক্ষে কম হয়ে পড়ে।

ডর্ফমান এবং সোলো-এর সঙ্গে সামুয়েলসনের যৌথ রচনা Linear Programming and Economic Analysis গ্রন্থটি এক নতুন পথনির্দেশ

করেছে। এই গ্রন্থটিতে Linear Programming এবং Input-Output-এর বিশ্লেষণ সুসম্বদ্ধভাবে সর্বপ্রথম প্রকাশিত করা হয়েছে। যদিও এই দুইটি বিষয়ে সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ্ কেনতারোভিচতো বটেই, আমেরিকায় দান্‌ৎসীগ এবং লিয়োনতিয়েফ্ ইতিপূর্বেই কিছু কাজ করেছিলেন। বিশেষ করে লিয়োনতিয়েফ্ কাজের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবহরের বহুমুখী কাজকর্মের ভেতরে কিভাবে সর্বোচ্চ উপযোগিতার প্রবর্তন করা যায়, এই প্রসঙ্গ বিচারে কিন্তু এদের উপযোগিতা সম্বন্ধে কোনো পরিষ্কার ধারণা ছিল না। এই সব সিদ্ধান্তের অন্তরালে প্রধান যুক্তি হলো এই যে যেখানে উৎপাদন সহযোগী সংখ্যায় অনেক এবং তাদের ব্যবহারও নানাভাবে হতে পারে সেখানে সর্বোচ্চ ফল পাওয়ার জন্য অর্থব্যবস্থায় এদের কাম্য প্রয়োগ প্রয়োজন। Input-Output বিশ্লেষণের প্রাথমিক স্তরের লক্ষ্য ছিল একটা বদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে ভোগ সামগ্রীকে ধরে নেওয়া হয়েছিল অন্তর্বর্তী সামগ্রী হিসেবে, এবং এদেরই পক্ষান্তরে ব্যবহার করা হতো ব্যক্তিগত সেবারূপে। পরবর্তীকালে এই বিশ্লেষণের উৎকর্ষ করতে গিয়ে চরম চাহিদাকে স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারিত বলে নেওয়া হয়েছে। এবং Input-Output বিশ্লেষণকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের এমন একটা স্তর আবিষ্কার করতে হবে যা স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারিত এই চরম চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারে। পোলিশ অর্থনীতিবিদ্ অসকার লাঙ্গে এই Input-Output বিশ্লেষণের উপযোগিতা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ব্যাখ্যা করেছেন। বলা বাহুল্য, সোভিয়েত অর্থনীতি ঢের আগে থেকেই ব্যাপ্ত পরিকল্পনার প্রয়োজনে এ-বিশ্লেষণ কার্যকর করেছিল। মার্কসের উৎপাদনের স্থত্রের মধ্যেই Input-Output বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক স্থত্রপাত ছিল।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে সামুয়েলসন লিখেছেন যে 'প্রতিবেশীকে ভিক্ষুক করে দেওয়া'র সংরক্ষণ নীতির ফলে শেষ পর্যন্ত নিজেকেই ভিক্ষুকে পরিণত হতে হয়। অপরপক্ষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে উভয় দেশেই উৎপাদন সহযোগীদের মূল্যের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে Heckscher-Ohlin সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে যে অবাধ বাণিজ্যের ফলে জাতীয় আয়ের যে অংশ অপ্রচুর উৎপাদন-সহযোগী পেয়ে থাকে তা আপেক্ষিকভাবে কমে যায়। সামুয়েলসন প্রমাণ করেছেন যে অবাধ বাণিজ্যের ফলে এই অংশ শুধু আপেক্ষিকভাবেই নয়, নিরঙ্কুশভাবেও কমে যাবে।

সামুয়েলসনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা অবাধ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করে। তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে তুলনামূলক অধ্যয়ন করে এই কথাই প্রতিপাদিত করেছেন যে—কি, কেমন করে এবং কার জন্য উৎপাদন হবে—এই সব চূড়ান্ত প্রশ্নগুলির একমাত্র সহজ লাভ-লোকসান কেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থাতেই সঠিকভাবে সমাধান হতে পারে। অপরপক্ষে কেন্দ্রীভূত অর্থব্যবস্থায় এই সব প্রশ্নের সমাধান অবশ্যই হয়ে থাকে, কিন্তু সেই সব সমাধান যে কতখানি নিখুঁত তা বিচারসাপেক্ষ, তবে একটা কথা তিনি স্বীকার করেছেন যে সাম্যবাদী দেশগুলোর পুঁজিনিয়োগ বিষয়ক সিদ্ধান্ত সরাসরি রাষ্ট্রকেই নিতে হয় বলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাণিজ্যিক অস্থিরতাকে এড়িয়ে যেতে পারে। তাই ব্যবসা চক্রের উৎপাত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে যেভাবে আঘাত করে থাকে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে তা স্পর্শও করতে পারে না।

সামুয়েলসন অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের সঙ্গে সংযুক্ত থাকা সত্ত্বেও সাধারণ পরিহাসপ্রিয়তা ও বাক্‌পটুতা হারিয়ে ফেলেননি। মূলধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অসম ঝোঁকের ব্যাপারে তাঁর সরস মন্তব্যগুলি লক্ষণীয়। যখন স্টক বাজার ফেঁপে উঠল তখন তিনি সংবাদপত্রে লিখলেন যে এর জন্য তাঁর বাজারের মূল্য তালিকা দেখার প্রয়োজন হয় না—অর্থনীতির অধ্যাপক বলে তাঁর প্রতি প্রতিবেশীদের আগ্রহ দেখেই তিনি তা বুঝতে পারেন। যখন মহাকাশযাত্রা শুরু হয় তখন তিনি বলেন যে এবার তাঁর পদার্থবিদ্যাবিদ্ ও জ্যোতিষশাস্ত্রী বন্ধুদের দরকার হবে। আবার যখন স্টক বাজার ফেঁপে উঠল তখন তিনি সোচ্চার হয়ে বলেন—এবার আমার পালা।

গীতা লালওয়ানী

সারাভারত সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সম্মেলন

ভারতের রাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদের ট্রোজান হর্স সাম্প্রদায়িকতার ভূমিকা ভারতবাসীর কাছে অজানা নয়। একদা এই অশুভ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দ্বিজাতি তত্ত্বকে মূলধন করে ডিভাইড এ্যাণ্ড রুলের কূটকৌশল চালিয়েছে ভারতবাসী তা মর্মে মর্মে জানে। সাম্রাজ্যবাদের দুধকলায় পুষ্ট, দেশী সামন্ততান্ত্রিক ও ধুরন্ধর আমলাতন্ত্রী কেষ্টবিষ্টুদের আশীর্বাদ সিঞ্চিত সাম্প্রদায়িকতার বিষধর স্বাধীনতার পর বারবারই ভারতে এখানে ওখানে ছোবল

মেরেছে। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবের জের টেনে আনা এই দুর্লক্ষণ এখন নয়া ঔপনিবেশিকপন্থীদের হাতে তুরুপের তাস হয়ে ওঠার লক্ষণাক্রান্ত।

নয়া ঔপনিবেশিকতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ আছে। পরাধীন দেশের বিপুল ও ব্যাপক আন্দোলনের ফলে সাম্রাজ্যবাদীরা প্রত্যক্ষত দেশ ছেড়ে গেলেও, মূলধনের রপ্তানি অব্যাহত রাখার জন্য, দেশের কাঁচামাল ও শ্রম শোষণের জন্য এবং সমাজতন্ত্রবিরোধী লড়াইয়ে স্থান, সেনাবাহিনী এবং পরিপোষকতার প্রয়োজনে নয়া ঔপনিবেশিকতার পত্তন ঘটাতে চায়। কার্যত দেশে একটি স্বাধীন সরকার নামে থাকা সত্ত্বেও, নয়া ঔপনিবেশিকতার ফলে সেই সরকার আসলে সাম্রাজ্যবাদীদেরই বশংবদ থাকে। দেশের সবচেয়ে পশ্চাদপদ ও রক্ষণশীল এবং গণতন্ত্রবিরোধী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ আঁতাত করে। কোন সামরিক চুক্তির সঙ্গে সরকারকে সংযুক্ত করে সামগ্রিক সার্বভৌমের ব্যবস্থা কব্জা করার প্রচেষ্টা চালায়। এশিয়া-আফ্রিকা-লাটিন আমেরিকার দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদীরা এই নয়া ঔপনিবেশিকতার চক্রান্তজাল বিস্তার করে চলেছে।

বলাবাহুল্য, ভারতের স্বাধীনতার পরিধি ক্রমাগত সঙ্কুচিত করে, আর্থনীতিক-সামাজিক বিকাশ বিনষ্ট করে, যাতে পরিপূর্ণ নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসন ব্যবস্থা চালু করতে পারা যায়, সে জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের পালের গোদা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের অন্ত নেই। জাতীয় ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপন্থী শক্তিগুলিকে বলশালী করে তোলার মধ্যেই নয়া ঔপনিবেশিক চক্রান্ত জয়ী হবার পথ। এজন্য ভারতের দিকে দিকে সাম্প্রদায়িকতা, দুর্বোধ্যতাবাদ, ভাষান্ধতা, উগ্র জাত্যন্ধতার অন্ধকারের শক্তিগুলিকে তারা লালন করছে। সাম্প্রদায়িকতা সেই নয়া ঔপনিবেশিক চক্রান্তের একটি অমূল্য অস্ত্র। আর ভারতের যারা স্বাধীনতার সাচ্চা সৈনিক, যারা গণতন্ত্রের পরিধি বিস্তার করতে উন্মুখ, যারা স্বাধীন ও স্বনির্ভর আর্থনীতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ কামনা করেন, তাঁদের কাছে সাম্প্রদায়িকতার চেয়ে জঘন্য—অন্ধ আচার, সংস্কৃতি ও পশ্চাদপদতাবিধৃত কুৎসীত বীভৎস আভ্যন্তরীন শত্রু আর নেই। স্বদেশের স্বনির্ভরতার প্রয়োজনে এবং শ্রমিকশ্রেণীর রাজনীতিতে ক্ষমতা পরিগ্রহণের সাপেক্ষতার বিচারে সাচ্চা প্রগতিশীলদের কাছে সাম্প্রদায়িকতার গণতন্ত্রঘাতী ভূমিকা আজ দিনের পর দিন ভারতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিশেষভাবে, ভারতে দক্ষিণপন্থী মহা-জোটের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার দলটির প্রাধান্য, সাম্রাজ্য

বাদের পরিপোষকদের শেষ লড়াইয়ের দুর্লক্ষণকে স্পষ্টতর করে তুলছে। আধাসামরিক ধর্মান্ধতাভিত্তিক যুবরক্ষীবাহিনী, শিক্ষাব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার প্রচার, অনৈতিহাসিক কাহিনী ও দর্শনপ্রস্থান সাম্প্রদায়িকতাকে একটি অব্যর্থ 'ভারতীয় সত্য' রূপে চিহ্নিত করতে চাইছে। আর এই পরিস্থিতিতেই সারাভারত সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সম্মেলন সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো। এর আগে আরও তিনবার এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতবারের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এলাহাবাদে।

এ-সম্মেলনের গুরুত্ব আরও কয়েকটি দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে সব অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতার জবরদস্তি গত ক-বছরে খুবই দৃশ্যমান ছিল, যেমন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, বোম্বাই, গুজরাট, জম্মু ও কাশ্মীর, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লী, সে সমস্ত জায়গা থেকে বহু প্রতিনিধি এ সম্মেলনে যোগ দেন। সর্বমোট প্রায় সাতশো সত্তর জন প্রতিনিধি এসেছিলেন। জনসংঘ প্রভাবিত দিল্লী থেকেই এসেছিলেন তিনশোরও বেশি। দিল্লীর মহিলা, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতির অকাতরে এই সম্মেলনকে সফল করার জন্য ভূমিকা, দিল্লীতে যে গুণগত রূপান্তর চলেছে সেটাই ঠিক চোখে পড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন রাজনীতি ও গণআন্দোলনের বহু বিশিষ্ট নেতা, ছাত্রযুবকর্মী, শ্রমিক ও কৃষক নেতা, সমাজসেবী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ প্রভৃতি। রাজনৈতিক ও সমাজসেবী সংস্থার মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি (গুজরাট), সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল (যোশীপন্থী), ফরওয়ার্ড ব্লক, জামিয়াত উলেমা প্রভৃতির প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নির্দলীয় কর্মীদের সংখ্যাও কম ছিল না। তৃতীয়ত, একই মঞ্চ থেকে তিনজন জননেতা বিশিষ্ট ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন 'সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্যের অগ্রগতি যৎসামান্য।' তিনি সমস্ত প্রগতিশীল মানুষকে এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন "এই সংগ্রাম গণতন্ত্র রক্ষায় সংগ্রাম এবং গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে আমি জীবনদানে প্রস্তুত।" তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে অপর একজন জননেতা শ্রীএস এম যোশী শ্রমিক ও কিষাণ আন্দোলন শক্তিশালী করে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল হতে বলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই সমস্যা যে শ্রমিক-কিষাণ আন্দোলনকেও পঙ্গু করে দিচ্ছে তাও উল্লেখ করেন। কিন্তু এই সম্মিলনের সব চেয়ে তাৎপর্য

পূর্ণ ভাষণ দেন কমিউনিস্টনেতা এস জি সরদেশাই। তিনি সাম্প্রদায়িকতাকে ১৯৭০ সালে ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত করে বলেন—যে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ইউরোপে প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দল তাদের সমস্তরকম মতপার্থক্য নিয়েও যেভাবে 'ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে নেমেছিল আজকের ভারতবর্ষের সেই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ছাড়া এই ফ্যাসীবাদের অভ্যুদয়কে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। ভারতের ফ্যাসীবাদের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন জার্মানীতে ইহুদী-বিদ্বেষের মতো ভারতের মুসলিমবিদ্বেষ প্রচারের মধ্য দিয়ে এই ফ্যাসীবাদ সাম্যবাদী, সমাজবাদী ও প্রত্যেকটি মুক্ত চিন্তার আদর্শে বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক মানুষকে বিলুপ্ত করতে বদ্ধপরিকর। দেশী, বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি এদের প্রতিনিয়ত রসদ যোগাচ্ছে। প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যাধিপতিরা; প্রাক্তন সেনাপতি, বৃদ্ধ ও ঝানু আমলারা এদের পশ্চাতে সুযোগের অপেক্ষায় আছে। এই বিপদের লাল সঙ্কেত জানিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর মতো সমস্ত গণতান্ত্রিক দল ও মানুষকে এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অগ্রসর হতে আহ্বান জানান। শ্রীসরদেশাই এই সর্বপ্রথম না হলেও বিশেষ অবস্থার মধ্যে অত্যন্ত জোরালোভাবে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনের রাজনৈতিক চরিত্র দেশের গণতন্ত্রানুরাগী মানুষের সম্মুখে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।

চতুর্থত—এই সম্মেলনের কার্যসূচী হিসেবে তিনটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারগুলি যথাক্রমে যুব, মহিলা, ও বুদ্ধিজীবীদের সেমিনার ছিল। এক মহিলা সেমিনার ছাড়া প্রায় সবকয়টি সেমিনার নেহাৎ মামুলী ধরনের হয়েছে। এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট হয়েছে বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা। অথচ এই আলোচনায় ডাঃ সতীশচন্দ্র ও দিলীপ মুখার্জি রচিত দুইটি অসাধারণ ভালো নিবন্ধ আলোচনার ভিত্তি হিসাবে পঠিতও হয়েছিল কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের স্বভাবজাত অহমিকা ও আত্মপ্রচার উন্মুখতায় এই আলোচনা চক্র এক সুদীর্ঘ ক্লান্তিকর মেঠো বক্তৃতার আসরে পরিণত হয়েছিল। একমাত্র মহিলাদের আলোচনার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার বিপদ সম্পর্কে গাম্ভীর্যপূর্ণ বাস্তবানুগ আলোচনা ও কর্ম্মসূচীর কথা বলা হয়। এই দিক থেকে এই আলোচনা সার্থক। মহিলা আলোচনার প্রধান নিবন্ধরচয়িতা ছিলেন শ্রীমতী রাজ থাপর। অন্যান্য অংশগ্রহণকারিণীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী কমলা কাজি, বিমলা ফারুকি, সুভদ্রা যোশী ও মৈত্রেয়ী দেবী। এই আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সতপথী।

যুব সেমিনার গতানুগতিক ও এলোমেলো হলেও এর উদ্বোধক শ্রীগুজরাল তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন 'আজকাল সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ইতিহাস, সমাজ, বিজ্ঞান ও দর্শনের আশ্রয় নিচ্ছে আর আশ্রয় নিচ্ছে সাহিত্য ও ললিতকলার। তারা তাদের মারাত্মক সাম্প্রদায়িক আদর্শকে যুক্তি আশ্রয়ী করতে চাইছে। ইতিমধ্যে বেশকিছু বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, অধ্যাপক ও ছাত্র তাদের যুক্তিতে বিভ্রান্তও হচ্ছে।"

পঞ্চমত—এই সম্মেলনে যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে ছিল—(১) জাতীয় সংহতি ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে; (২) সাম্প্রদায়িক প্রচার ও আধাসামরিক বাহিনী বেআইনী ঘোষণা প্রসঙ্গে; (৩) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ন্যায্য অভিযোগগুলির দূরীকরণ প্রসঙ্গে; (৪) শিক্ষা ব্যবস্থা, পাঠ্যসূচী ও পুস্তক প্রণয়ন প্রসঙ্গে; ও (৫) মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদের অভ্যুদয় প্রসঙ্গে।—এই প্রস্তাবগুলি আলোচনা তেমন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেনি। কারণ সময় খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। তবুও এর মধ্যে যে সব প্রতিনিধি তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বক্তব্যকে জোরালো করতে সক্ষম হন তাঁরা হলেন অধ্যাপক হরিহর তেওয়ারী (পশ্চিমবঙ্গ) শ্রীডি. গোয়েল; হারদানিয়া (মধ্যপ্রদেশ) পি, ডি, গান্ধী (গুজরাট), অধ্যাপক মৃন্ময় ভট্টাচার্য (পশ্চিমবঙ্গ) ও এম আগরওয়াল (রাজস্থান)।

অপর একটি প্রস্তাবে বিভিন্ন রাজ্য থেকে তিনজন করে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করার কথা ঘোষণা করা হয়। এই কমিটির সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হন—শ্রীমতী সুভদ্রা যোশী। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই জাতীয় কমিটিতে আবদুল হালিম, মৈত্রেয়ী দেবী ও শান্তিময় রায় আছেন।

উদ্যোক্তারা বিভিন্ন রাজ্যের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কোন সুযোগ রাখেন নি। কয়েকটা 'গুরুত্বপূর্ণ' প্রশ্নের নিরাকরণ অতীব প্রয়োজন। প্রশ্নগুলি হলো: ১। এই আন্দোলনের সার্থকতা আছে কি? সাম্প্রদায়িকতা কোথাও আছে কি? ২। সমাজবিপ্লব না হলে এর সমাধান হওয়া সম্ভব কি? ৩। সাম্প্রদায়িকতাবাদের সঙ্গে নয়া ঔপনিবেশিকবাদের সম্পর্ক আছে কি? ৪। ১৯৭০-৭১ সালে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিশেষ কোন রাজনৈতিক চরিত্র আছে কি? ৫। একমাত্র শাসনব্যবস্থার মাধ্যমেই এই ব্যাধি দূর করা সম্ভব কি? ৬। শ্রমিক, কৃষক—কেন আন্দোলনে এগিয়ে আসছে না? ৭। এই আন্দোলনে শিক্ষকসমাজের ভূমিকা কার্যকরী হতে পারছে না কেন? এই সব প্রশ্নের আলোচনার মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ প্রগতি নির্ধারিত হবে।

শান্তিময় রায়

অধ্যাপক তারকনাথ সেন

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের শেষ কিংবদন্তী, ক্যাপ্‌টিন্‌ ডেভিড্‌ লেস্টর্‌ রিচার্ডসন, চার্লজ্‌ হেনরি টনি, হ্যারিংটন্‌ হিউ, মেল্‌ভিল্‌ প্যার্সিভ্যাল, মনোমোহন ঘোষ, হেন্‌রি রোশুর্‌ জেমজ্‌, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ দিক্‌পাল অধ্যাপকদের সার্থক উত্তরসূরী, তারকনাথ সেনের অমূল্য জীবনের আকস্মিক অবসানে (১১ জানুয়ারি ১৯৭১) উপর্যুক্ত কুলীন কলেজের গৌরবময় ঐতিহ্যের পরিসমাপ্তি ঘটল। এই প্রতিভাবান্‌ অধ্যাপকের পাণ্ডিত্য ও জীবনচর্চার বিস্ময়কর বিবরণী এমতো সংক্ষিপ্ত পরিসরে পেশ করা আমার সাধ্যাতীত ; সর্বোপরি মহামতিত্বের সঙ্গে মহানুভবতার এমনতর সার্থক মিলন যে-কোনও দেশকালেই বিরল।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ জানুয়ারি তারকনাথ জন্মগ্রহণ করেন ; ষোল বছর বয়সে কলকাতার সেণ্ট্রাল্‌ ক্যালিজিয়েট্‌ স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন্‌ পরীক্ষায় (১৯১৫) উত্তীর্ণ হন। ম্যাট্রিকুলেশন্‌ থেকে এম্‌. এ. (১৯২১) পর্যন্ত প্রত্যেকটি পরীক্ষাতে তাঁর স্থান ছিল সর্বোচ্চ ; আর যেসব পদক, পুরস্কার ও বৃত্তি তিনি লাভ করেছিলেন সেগুলির যথাযথ উল্লেখনে প্রয়োজন এক দীর্ঘ তালিকা প্রণয়নের—যতীন্দ্রচন্দ্র পদক (১৯২৫) থেকে ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় স্বর্ণ পদক (১৯৩১) পর্যন্ত ন্যূনপক্ষে দশটি সম্মান অর্জনের অধিকারী হন তিনি। এবং এমতো আশ্চর্য বিশ্ববিদ্যালয়গত সাফল্যে আদৌ তারকনাথের বিদ্যাবত্তা শান্ত হয়নি ; জীবনের শেষ সচেতন মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের বহুধাবিচিত্র শাখায় তাঁর নিরন্ত পরিক্রমণ ছিল শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো অনিবার্য। বস্তুত প্রকাশিত ডজনখানেক গবেষণাপত্রে তারকনাথের পাণ্ডিত্য, চিন্তন ও মৌলিকতার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

প্রেসিডেন্সি কলেজে তারকনাথের যোগদান (১৯৩৪) করার পূর্বে প্যার্সিভ্যাল্‌ সাহেব অবসরগ্রহণ করেছেন (১২ এপ্রিল ১৯১১) এবং কবি-অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের বিয়োগান্ত মৃত্যু (৪ জানুয়ারি ১৯২৪) সজ্ঘটিত হলেও জনশ্রুতির অন্যতম নায়ক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তখন অপ্রতিহত, অনতিপরে যাঁকে ছায়ার মতো ঘিরে থাকতেন সেই সহৃদয় হ্যাম্‌ফ্রি হাউস্‌ আর যাঁর পরম সাধ ছিল অধ্যাপক ঘোষকে একবার অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজের স্বনামখ্যাত অধ্যাপকদের সামনে উপস্থিত করার যাতে বাঙলাদেশ নামীয় ভারতের এক প্রদেশে ইংরেজি চর্চার প্রকৃত মহিমা অনুধাবন করতে পারেন বিদেশী বিদ্বজ্জন। এমনতর কোনও

বিদ্যাবান্ অধ্যাপক সেনকে ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়ে ভারতবর্ষে ইংরেজি পঠনপাঠনের শেষ মাহাত্ম্য প্রচারে উৎসুক হয়েছিলেন কিনা জানি না; তবে অধ্যাপক তারকনাথ যে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর যে-কোনও সম্ভ্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল অধ্যাপক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন একথা সর্বজনবিদিত।

ছাত্রজীবনেই তারকনাথ জ্ঞানচর্চায় তাঁর প্রবেশের যথার্থ নজির দেখিয়েছিলেন—'*Things Essential and Things Circumstancial*' (*The Presidency College Magazine. Vol. XVI, Nos . 1, 2 and 3.*) প্রবন্ধ প্রণয়নে এবং পরিণত বয়সে তাঁর বিশাল বিদ্যাবত্তার বিদ্যুৎগতি বিস্তার দেখালেন *Shakespeare's Short Lines* (*Shakespeare Commemoration Volume. Calcutta 1966.*) রচনায়; বলা বাহুল্য একজন তারকনাথ ব্যতিরেকে অপর কোনও ভারতীয় পণ্ডিতের পক্ষে এমতো মহার্ঘ পরিকল্পনা ছিল বস্তুত অসাধ্য। আর তাঁর সুবিখ্যাত *Hamlet's Treatment of Ophelia in the Nunnery Scene* (*The Modern Language Review. Vol. XXXV, No. 2*) গবেষণাপত্রটির কথা বিদ্বৎসমাজের অজানা নয় যা *Readings on the Character of Hamlet.* (*London 1950.*) গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ইংরেজিচর্চার সঙ্গে সমানে তারকনাথ যত্নবান ছিলেন ইয়োরোপের প্রধান ভাষাগুলির পরিশীলনে,—লাটিন, গ্রীক, ফরাসী, ইতালীয়, গের্মনীয় প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর প্রবেশ ছিল সুগভীর। সর্বোপরি শুধুমাত্র সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন নয়; চিত্রকলা ভাস্কর্য, স্থাপত্য, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস এমন কি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবাধ পরিক্রমণ ছিল আমরণ।

মনীষা ও মনস্বিতার সার্থক সমন্বয়ের অধিকারী হয়ে স্বল্প মানুষই তারকনাথের মতো জীবন সম্পন্ন করতে পেরেছেন; এবং সেই দুর্লভ বস্তুসমষ্টি বস্তুতঃ মূল্যবান্ বিবেচিত হবে তাঁদের কাছে যাঁরা অন্তরঙ্গভাবে তাঁকে জানতেন। তারকনাথের উৎসর্গিত জীবন তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধদের প্রাণিত করবে অনেক অনেককাল; তাঁদের অক্ষয় স্মৃতির পারম্পর্যে এই প্রতিভাধর অধ্যাপক সজীব হয়ে থাকবেন ভাবীকালের বিদ্যোৎসাহী মানুষের অমর আত্মায়।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

নিয়মাবলী

পরিচয়ে লেখা ফুলস্কেপ কাগজের একদিকে লিখে
উপযুক্ত ডাকটিকিটসহ পরিচয় সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে।
অমনোনীত কবিতা ফেরৎ পাঠানো হয় না।

যে-কোনো মাস থেকেই গ্রাহক হওয়া যায়।
বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা দশ টাকা
ষান্মাসিক সাড়ে-পাঁচ টাকা।

ম্যানেজার
পরিচয়
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলকাতা-৭

পরিচয়

বর্ষ ৪০ । সংখ্যা ৭-৮

মাঘ-ফাল্গুন । ১৩৭৭

ফেব্রুয়ারি-মার্চ । ১৯৭১

সূচিপত্র

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য । হিরণকুমার সান্যাল । সুশোভন সরকার

অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র । গোপাল হালদার । বিষ্ণু দে । চিন্মোহন সেহানবীশ

সুভাষ মুখোপাধ্যায় । গোলাম কুদ্দুস ।

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ সান্যাল

প্রচ্ছদ

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।



দ্রুত পদক্ষেপ আর অনুপম
আরাম– এই অভিপ্রায়ে ব
বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করুন : কুশন আর্চ ও ইনসোল আকস্মিক আঘাত থেকে রক্ষা করে। ক্ষয়শীল
সন্ধিস্থলে টেকসই বন্ধনী। ভারী বাম্পার টোগার্ড। ঢালাই সোল আর হিল এমন
কৌশলে তৈরি যা পারতপক্ষে হড়কাবে না। সব মিলিয়ে
আশ্চর্য সমাবেশ।



বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত বিভাগ এ-রাজ্যের প্রতিটি জেলার যাবতীয় পুরাকীর্তি বিষয়ে বাঙলা ভাষায় যে সুলভ গ্রন্থাদি (Archaeological Encyclopaedia of West Bengal) প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' সে-প্রকল্পের প্রথম পুস্তক। প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত পূর্ত বিভাগের প্রকাশন কমিটির সভাপতি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এ-বই-এর ভূমিকায় লিখেছেন—"এ-পুস্তকের লেখক শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মন্দিরাদি বিষয়ে বাঙলা ভাষায় রচিত প্রথম, তথ্যবহুল, প্রামাণিক গ্রন্থ 'বাঁকুড়ার মন্দির'-এর প্রণেতা হিসাবেই সমধিক খ্যাত।… এ-গ্রন্থ পাঠে বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন কীর্তি ও কাহিনী সম্বন্ধে সকলের মনেই একটি স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।…বহুদিন পর্যন্ত ভবিষ্যৎ গবেষকদের পথনির্দেশ করিতে পারিবে তাহাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই।"

পুরু, দীর্ঘস্থায়ী 'ক্রীমওভ' কাগজে ছাপানো পাঠ্যাংশ (২৪৬ পৃষ্ঠা), ভালো আর্ট কাগজে মুদ্রিত ৬৫টি উৎকৃষ্ট ফোটোগ্রাফ (৪৮ পৃষ্ঠা), দু'রঙের প্রচ্ছদচিত্র-শোভিত শক্ত বোর্ডের সুদৃশ্য 'লিম্প'-বাঁধাই এই অসামান্য বইটির মূল্য মাত্র ৩·৭৫ টাকা। পুস্তক-বিক্রেতারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারী প্রেসের (৩৮ গোপালনগর রোড, কলকাতা-২৭) সুপারিটেনডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করলে নিট সেক্রেটারিয়েট ভবনের বিক্রয়কেন্দ্র থেকে ২০% কমিশনে দ্রুত সরবরাহ পাবেন।

ASP/LIC/Z-70A BEN

পরিচয়
বর্ষ ৪০ । সংখ্যা ৭
মাঘ । ১৩৭৭

আধুনিক নন্দনতত্ত্ব প্রসঙ্গে

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

সমাজতন্ত্রের সঙ্গে নন্দনতত্ত্বের প্রায় অহি নকুলের সম্পর্ক—এজাতীয় ধারণা অদ্যাবধি অনেকে পোষণ করেন। তাঁদের যুক্তিটা এইরকম, সমাজতন্ত্র যেহেতু বাস্তবজীবনের মঙ্গল ও কল্যাণের মধ্যেই অনেকাংশে সীমিত, যেহেতু তা সাধারণ মানুষের কেবলমাত্র দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের অংশীদার অতএব সমাজতন্ত্রে সৃষ্ট সাহিত্যেও কেবলমাত্র এই রূঢ় বাস্তবেরই প্রতিফলন ঘটবে। এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণের যথাসাধ্য চেষ্টা দীর্ঘকাল ধরেই করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টার আর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আলোচ্য গ্রন্থখানি। ৩৫৮ পৃষ্ঠার এই সুদীর্ঘ গ্রন্থে তেরোটি প্রবন্ধের ছত্রেছত্রে সোভিয়েত লেখকদের সৌন্দর্যতত্ত্বের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের অনবদ্য প্রয়াস ধরা পড়বে। প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধেই মার্কসীয় দৃষ্টিতে সৌন্দর্যতত্ত্বের মূল উৎসের সন্ধান করা হয়েছে, সমাজতন্ত্রে সৌন্দর্যতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব কিনা তা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে এবং সর্বশেষে যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হয়েছে তাতে গোঁড়ামি এবং সঙ্কীর্ণতার কোনো চিহ্নই নেই। আধুনিক নন্দনতত্ত্বের এমন কোনো সমস্যা নেই যার প্রতি প্রবন্ধগুলির রচয়িতা সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের মোটামুটিভাবে দৃষ্টি পড়েনি। বিষয়বস্তু বিচারকালে তেরোটি প্রবন্ধকে এইভাবে ভাগ করা যায়, সোভিয়েত শিল্পসাহিত্যে নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত মূলনীতি, শিল্পে আদর্শ ও নায়কবিচার, নন্দনতত্ত্বের অনুভূতির উৎসস্বরূপ হিসেবে শ্রমের ভূমিকা, নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সম্পর্ক, বস্তুবাদের ঐতিহাসিক বিবর্তন, বস্তুবাদের লক্ষ্য ও তার সীমাবদ্ধতা, শিল্পের ঐতিহ্য ও

Problems of Modern Aesthetics, Collection of Articles, Progress Publishers, Mscoow.

পুনর্গঠন ইত্যাদি। আধুনিক শিল্প-সাহিত্য থেকে অজস্র উদাহরণ দিয়ে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞের দল এই চিরায়ত অনুভূতিটির সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। এইজন্য তাঁরা নিজেদের দেশের বাইরেও পা বাড়াতে দ্বিধা বোধ করেননি। অ্যালবেয়ার কামু, বের্টোল্ট ব্রেখট, বেকেট, অয়নেস্কো, সার্ত্র প্রভৃতি সুবিতর্কিত ও বিখ্যাত লেখকদের নেওয়া হয়েছে। এছাড়া অন্তত দুটি প্রবন্ধ আছে যেখানে নন্দনতত্ত্বের অনুভূতি সম্পর্কে সোভিয়েত নন্দনতাত্ত্বিকদের ধারণা ও আলোচনা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত।

২

১৯০৫ সালে লেনিন 'পার্টিসংগঠন ও পার্টি সাহিত্য' নামক প্রবন্ধ লিখলেন। এই ছোট প্রবন্ধটিতেই সর্বপ্রথম শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে পার্টির আদর্শ ও মতবাদের সম্পর্ক কি জাতীয় হবে সে সম্পর্কে বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া হলো। লেনিনের মূল বক্তব্য ছিল 'সাহিত্যকে প্রত্যক্ষভাবে সর্বহারার স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে'।[১] অথচ কেবল যান্ত্রিক বা ছকবাঁধা পদ্ধতিতে এই যোগসাধন সম্ভব নয়। কাউট্স্কি যেমন anarchy in intellectual production-এর কথা বলেছিলেন, লেনিন কোনোদিন তাতে সম্মতি দেননি। একদিকে যান্ত্রিক তাত্ত্বিক প্রয়োগ ও অপরদিকে শিল্পীর তথাকথিত নির্ভেজাল স্বাধীনতা—লেনিন এই দুইয়েরই ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি শিল্পসাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চাননি। বরং তিনি বলেছিলেন যে "greater scope must undoubtedly be allowed for personal initiative, individual inclination, thought and fantasy, form and content"[২] অর্থাৎ শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকা এবং গুরুত্ব লেনিন কখনও অস্বীকার করেননি। আবার সঠিকভাবে এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিল্পী বা সাহিত্যিকদের স্বেচ্ছাচারকে গুরুত্ব দিতেন না, কারণ, তাতে নৈরাজ্য দেখা যায় এবং সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবোধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

লেনিন প্রদর্শিত এই পথই বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির পথ। অ্যালেক্সি মেত্চেস্কো তাঁর ৩৫ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রবন্ধে সোভিয়েত

১। 'Literature openly linked with the proletariat' লেনিনের সংগৃহীত রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮।

২। লেনিনের সংগৃহীত রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬

সাহিত্যের মূল নীতিগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিনের মতবাদকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পাশ্চাত্য পাঠক ও সমালোচকেরা অনেক সময় সোভিয়েত রাশিয়ার মুষ্টিমেয় লেখকদের কোনো তথাকথিত 'ব্যতিক্রম'ধর্মী গ্রন্থ পড়লেই সেগুলির মধ্যে 'আধুনিকতা', লেখকের 'স্বাধীনতাস্পৃহা'—এই সমস্ত খুঁজে পান। তাঁদের বক্তব্য; আধুনিক নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক সাধারণভাবে নেই। কেবল দু-একজন বিদ্রোহী-লেখক প্রকৃত সৌন্দর্যতত্ত্বটি তাঁদের রচনায় প্রকাশ করার চেষ্টা করে চলেছেন।

এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। প্রচলিত বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীতে আধুনিক সোভিয়েত শিল্পসাহিত্যে নন্দনতত্ত্বের উপস্থিতি অনুভব করা যাবে না। সোভিয়েত শিল্প-সাহিত্য মার্কসবাদসম্মত নন্দনতত্ত্বের ধারক ও বাহক, শিল্পসাহিত্য সর্বহারার স্বার্থের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কোনো সাহিত্যস্রষ্টাই নিরপেক্ষ বা স্বাধীন নন, সমাজ ও সাধারণের প্রতি তাঁর একটা দায়িত্ব আছে। যে শিল্পী যত একাকী, তিনি ততটা বিচ্ছিন্ন। এই দৃষ্টিতে অবিচল থেকে সোভিয়েত শিল্পী তার শিল্পে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন। যে শিল্পীর সঙ্গে জনগণের কোনো যোগাযোগ নেই তাঁর ভবিষ্যৎ ভয়াবহ। লেনিনের ভাষায়, "the silence of the people is particularly terrifying since it threatens the writer with loss of identity. আর সেইসমস্ত শিল্পীরাই সাফল্যমণ্ডিত হবেন যাদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ আছে, জনগণের প্রতি যাদের বিশ্বাস আছে, "victory will belong only to those who have faith in the people, those who are immersed in the life-giving spring of popular creativity."[৩] মেত্‌চেস্কো উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে জারের আমলে রাশিয়ার মানুষ কেবল অশিক্ষার জন্য পুশকিন এবং তলস্তয়ের রচনার আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হতো। আর বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার পরিস্থিতি ভিন্ন। ক্লাসিক শিল্প ও সাহিত্য এখন জনগণের সম্পত্তি।

এই মতবাদ বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার প্রথম পর্যায়েই ক্রুইসভ, ব্লক, মায়াকভস্কি, ইয়েসেনিন, গরোদেৎস্কি, সেলভিনস্কি, লাভরেনিওভ, ফেদিন প্রমুখ সাহিত্য-স্রষ্টাদের বুর্জোয়া নন্দনতত্ত্বের পথ থেকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পথে নিয়ে এল। এদের মুখপাত্র হিসেবেই সেলভিনস্কি একদা বলেছিলেন "এরা জনগণের কথা ভাবেন না, এবং নিজেদের কবিতায় নিজেদের কথা ছাড়া অন্য কারও কথা বলায় এরা উৎসাহী নন। শকলোভ্‌স্কি ১৯১৯ সালে লিখেছিলেন "শিল্প জীবনকে

৩। লেনিনের সংগৃহীত রচনাবলী, ২৬তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৯২

অস্বীকার করে, আর সহরের দুর্গে উড্ডীয়মান পতাকার রঙ এতে প্রতিফলিত হয় না।" আবার এই শক্লোভ্স্কিই পরে লিখেছিলেন যে "পতাকার রঙই কবিতার আসল কথা। কারণ এর মধ্যে হৃদয়ের রঙ মিশ্রিত আছে, আর এই হৃদয়ের সঙ্গেই শিল্প ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।" এইসব স্বীকৃতিই প্রমাণ করে যে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার প্রথম স্তরে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাঙ্কেতিকতা, দুর্বোধ্যতার অস্তিত্ব ছিল এবং সেগুলিকে রাষ্ট্রীয় শক্তির দ্বারা দূর করা হয়নি। সেই সমস্ত শিল্পী সাহিত্যিকেরা নিজেরাই পাল্টে গেছেন।

তাসত্ত্বেও কোনো স্তরেই সোভিয়েত শিল্প সাহিত্য নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন ছিল না। যারা জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে থেকে সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন তাঁরাও 'অনুপ্রেরণা' বা 'হৃদয়'কে বিস্মৃত হননি। মায়াকভ্স্কির মতো কট্টর বাস্তববাদীও সর্বদাই হৃদয়ের কাছে আবেদন করতেন, গোর্কী 'আন্তরিকতা এবং অনুপ্রেরণা'কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন আর শলোকভ অনেক ক্ষেত্রেই লেখকের পার্টির প্রতি দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে হৃদয়ের প্রাধান্য স্বীকার করেছেন।

৩

সংস্কৃত অলঙ্কারিক থেকে শুরু করে অ্যারিস্টটল পর্যন্ত প্রায় সমস্ত নন্দনতাত্ত্বিকেরাই সাহিত্যে নায়ক-বিচার প্রসঙ্গে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছেন। তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে ভিন্ন সুর থাকলেও মূল বক্তব্য সম্পর্কে সকলেই একমত। কাব্যে বা মহাকাব্যে নায়কের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সদ্বংশজাত, উদারপ্রাণ ও বীর হলেই ভালো হয়। ভারতীয় মহাকাব্যে তো দেবতা না হলে নায়ক বলে কাউকে স্বীকারই করা হতো না। অ্যানাতলি দ্রেমভ তাঁর—'শিল্পে আদর্শবাদ ও নায়কবিচার' নামক প্রবন্ধে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার দৃষ্টিতে নায়ক-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন। সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে নায়ক কোনো অতিমানব নয়, সে সাধারণ ঘরের মানুষ। কিন্তু শৌর্যে পরাক্রমে ও ত্যাগে সে সকলকে ছাড়িয়ে নায়ক পদবাচ্য হয়। লেনিন তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তিতে বলেছিলেন, "Man needs an ideal, but a human ideal corresponding to nature and not a supernatural ideal."[৪] সোভিয়েত রাশিয়ায় তাই আজকের নায়ক হচ্ছেন যথার্থ

৪। লেনিনের সংগৃহীত রচনাবলী, ৩৮ তম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৫

সোভিয়েত শ্রমিক, কর্মী অথবা সৈনিকেরা। এই কারণেই ইস্পাতকর্মী মিখাইল প্রিভালভ, কৃষক মিখাইল ডোভ্‌ঝিক এবং সাধারণ নাগরিক যুরি গাগারিন আজ সোভিয়েত রাশিয়ায় মহানায়ক। অলঙ্কারশাস্ত্রের নায়কের সংজ্ঞা ও পরিচয়কে এ-ক্ষেত্রে তাঁরা অস্বীকারই করেছেন।

ভিক্টর রোমানেঙ্কো তাঁর 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্য' বিষয়ক প্রবন্ধটি শুরু করেছেন চেকভের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে—"The sense of beauty in man knows no bounds or limits." উদ্ধৃতিটি নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। এই উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করে রোমানেঙ্কো সৌন্দর্য সম্পর্কে মার্কসবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট করেছেন। সৌন্দর্যবোধ মানুষের অন্তরের একটি চিরন্তন অনুভূতি। একে কোনো তত্ত্ব বা নিয়মশৃঙ্খলার বাঁধনে বাঁধা যায় না। সুতরাং যাঁরা এতাবৎকাল বলে এসেছেন যে মার্কসবাদীরা তাদের শিল্প-সাহিত্য থেকে প্রকৃতি এবং সৌন্দর্যকে নির্বাসিত করতে চায় এ-প্রবন্ধটি তাঁদের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ। রোমানেঙ্কো তাঁর প্রবন্ধের প্রথমেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে প্রকৃতির সৌন্দর্য যে দীর্ঘকাল ধরে শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে আসছে এ-ব্যাপারে সন্দেহ করবার কোনো কারণই নেই। কিন্তু মার্কসবাদীরা বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। প্রকৃতি তাদের কাছে 'কেবল সৌন্দর্যের মন্দির নয়, এ-হচ্ছে মানবের কর্মক্ষেত্র'। আইনস্টাইন রুশবিজ্ঞানী পিয়োতর্ লেবেদফকে বিংশশতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম কবি আখ্যা দিয়েছিলেন, কারণ তিনি সূর্যের রশ্মিকে আটকে ফেলে আলোর চাল নির্ধারণ করেছিলেন। এইভাবে যাঁরা প্রকৃতির কোনো-না-কোনো রহস্যের আবিষ্কার করেছেন তাঁরাই প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রকৃত উপাসক। অনেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সমাজ ও বাস্তবজগৎ নিরপেক্ষ অতিপ্রিয় ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য বলে মনে করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রকৃতি কোনো বিশেষ ধরনের সৌন্দর্য উৎপন্ন করে না। মানুষ যে-দৃষ্টিতে তাকে দেখে প্রকৃতি সেইরূপেই উদ্ভাসিত হয়। তাই মানুষ এবং প্রকৃতি একাত্ম। এঙ্গেলস এই কারণেই বলেছিলেন, "man by his very flesh, blood and brain belongs to nature and is within her and it is in man alone that nature becomes aware of herself. Man commands nature, but how ? By accepting her own laws and correctly applying them." রোমানেঙ্কো বলছেন তুর্গেনিভ, তলস্তয় প্রিশাভিন এবং পাউস্তোভ্‌স্কির রচনায় অনেকটা প্রকৃতি সম্পর্কে এই জাতীয়

দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রন্থটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা হলো নিকোলাই সিলায়েভের 'নন্দনতত্ত্বের অনুভূতির উৎস হিসেবে শ্রমের ভূমিকা।' বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে এবং বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে এটি সত্যি একটি স্মরণীয় প্রবন্ধ। আধুনিক ও সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতে বিচার করে তিনি 'শ্রম'কে মানুষের প্রায় সমস্ত সৌন্দর্যানুভূতির স্রষ্টা বলে ঘোষণা করেছেন। এর আগে পর্যন্ত, এমনকি সোভিয়েত রাশিয়াতেও প্রকৃতি এবং মানবজীবনের মধ্যেই সৌন্দর্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত হতো। কিন্তু বর্তমানে দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপ, শ্রম এবং উৎপাদনকেও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। 'শ্রমের নান্দনিক আবেদন' অথবা 'শ্রমের সৌন্দর্য' এ-জাতীয় কথা আমরা প্রায়ই বলে থাকি। কিন্তু এগুলির দ্বারা যথার্থই কি বোঝায়?

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের পরিবেশ এমনই যে যেখানে কাজের আনন্দ' বলতে কিছুই থাকে না। শ্রমিক সেখানে শোষণের জাঁতাকলে বন্দী। তার নিজস্বতা বা উৎপাদনে দক্ষতার কোনো মূল্যই সেখানে স্বীকৃত নয়। মার্কস্ তাঁর ক্যাপিট্যাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এক জায়গায় বলেছিলেন যে কাপড়ের কলের শ্রমিকদের এমনই এক অসহনীয় পরিবেশে কাজ করতে হয় যাতে তাদের সৌন্দর্যের অনুভূতি বর্ধিত হওয়া দূরে থাকুক তাঁদের সমস্ত অনুভূতিই সেখানে শোষিত হচ্ছে। অথচ, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবার পর অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। তখন শ্রমের মাধ্যমে শ্রমিকের মর্যাদা বাড়ে, সৌন্দর্যচেতনা বিকশিত হয়। অর্থাৎ শ্রমে আকর্ষণীয়তার দ্বারা 'ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অনুভব' সম্ভবপর হয়। তাই শ্রমিক যখন কাপড়ের উপর সুন্দর একটি নক্সার সৃষ্টি করে, রাজমিস্ত্রী যখন একটি চমৎকার বাড়ি তৈরি করে, দাবাখেলোয়াড় যখন অপূর্ব কৌশলী একটি চাল দিয়ে প্রতিপক্ষকে মাত করে দেয়, ফুটবলের সেণ্টার ফরওয়ার্ড যখন নয়নভিরাম গোল করে তখন মনে যে সৌন্দর্যের অনুভূতি জাগে তা প্রকৃতপক্ষে 'শ্রমের সৌন্দর্য'। যে-শ্রমে আনন্দ নেই তা দাসত্ব মাত্র। অতএব, আধুনিক নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় 'শ্রমের নান্দনিক আবেদন'কেও যথার্থ স্বীকৃতি দেওয়া একান্ত কর্তব্য। কাজের আনন্দ এমন একটা জিনিষ যা মন ও দেহকে জাগিয়ে তোলে। মার্কস-এর ভাষায়, "as something which gives play to bodily and mental powers" (ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৮)।

বস্তুবাদ সম্পর্কিত বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের আ একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। নিকোলাই লেজিরভ তাঁর 'বস্তুবাদের উদ্দেশ্য ও সীম বদ্ধতা' প্রবন্ধে এই অবদানের গুরুত্ব চমৎকারভাবে আলোচনা করেছেন সন্দেহ নেই বস্তুবাদ ব্যাপারটি কিছুটা জটিলও বটে। বস্তুবাদ একটি শৈল্পিক আঙ্গিক হিসেবে স্বীকৃত হবার বহু আগেই অ্যারিস্টটল শিল্প-সাহিত্যে বস্তুবাদের প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে একজন শিল্পী "must represent things···either as they were or are, or as they are said or thought to be or to have been, or as they ought to be" (on the Art of Poetry, পৃষ্ঠা ৮৬)। কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা ঠিক এই জিনিষ নয়। মার্গারেট হার্কনেসকে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস বাস্তবতার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন যে বাস্তবতা হচ্ছে 'বিশেষ পরিবেশে বিশেষ চরিত্রের যথাযথ রূপায়ন'। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সমাজ-তান্ত্রিক বস্তুবাদের অন্যতম প্রবর্তক নিজে কখনও বস্তুজগতের নিখুঁত প্রতি-ফলনের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। জীবনকে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করে আঁকলে বস্তুবাদী সাহিত্য হয় না। বলজাক তাঁর বিখ্যাত গল্প-গুলিতে সমকালীন সমাজের দোষ ও গুণ যথাযথভাবে চিত্রিত করেছেন তাই তাঁর রচনা বাস্তববাদী সাহিত্য, কিন্তু অ্যালবেয়ার কামুর 'দি স্ট্রেঞ্জার' গ্রন্থে মানবচরিত্রকে বিকৃত করে আঁকা হয়েছে তাই সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদের বিচারে তা ব্যর্থ রচনা। রাশিয়ান বস্তুবাদের অন্যতম তাত্ত্বিক ভি. বেলিনস্কি তাই প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'আজকের দিনে যথার্থ শিল্প কি?' তিনি নিজেই এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন, 'এ-হচ্ছে সমাজের বিচার ও বিশ্লেষণ, যথাক্রমে সমালোচনা' অ্যালেকসি তলস্তয়ের মতে বাস্তবতা হলো একটি 'সামাজিক বিষয়বস্তু' আর ব্রেখট-এর মতে শৈল্পিক পদ্ধতিতে জীবনের সত্য প্রতিফলনই হলো বাস্তবতা। অতএব, মার্কসবাদীরা বস্তুবাদকে কখনই জীবন ও সমাজ-বিচ্ছিন্ন যান্ত্রিক তত্ত্ব হিসেবে দেখেন না। বরং তাঁরা স্বীকার করেন যে বস্তুবাদের কোনো ধরাবাঁধা প্রয়োগপদ্ধতি নেই। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রতিভার, ক্ষমতার ও বৈচিত্র্যের উপরই তাদের রচনার উৎকর্ষতা নির্ভরশীল। গোর্কীর 'মা' ও ব্রেখ্‌ট-এর 'মা' দুটি গ্রন্থই প্রমাণ করে যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা হলো জীবন সম্পর্কে লেখকদের নিজস্ব ও নির্দিষ্ট ধারণা, আর এই দু-খানি গ্রন্থের দ্বারা আরও প্রমাণিত হলো যে মহৎ শিল্পীরা একই বিষয়বস্তু অবলম্বনে কত বিচিত্র অথচ জীবনধর্মী শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন।

ডাক্তার তারকেশ্বর এবং মানুষের ব্রেন

অজিত মুখোপাধ্যায়

অন্ধকার হাঁটু গেড়ে বসেছে গ্রামটার বুকে। শ্বাসরোধ করে দিচ্ছে। কোথায় একটা কালপেঁচা ককিয়ে উঠছে মাঝে মাঝে···ক্রমাগত ঝিঁঝিঁর অসহ্য আর্তস্বর। বাইরে কে ডাকছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে মশারির ভিতর থেকে হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনের পলতে উস্কে দিল ডাক্তার তারকেশ্বর। বিছানায় উঠে বসে আগন্তুকের কণ্ঠস্বর চেনার চেষ্টা করল। এবং ডানদিকে ঝুঁকে দেখল একটি অপরিচিত ছায়ামূর্তি, পরণে হাফ-শার্ট। এ-পোশাক গ্রামে বিরল।

পূর্ণাকে ডাকল চাপা কণ্ঠে। পূর্ণা হঠাৎ উঠে বসে তারকের গলা জড়িয়ে ধরল। আতঙ্কে গোঙাতে লাগল, কে···কে···

বিরক্তি মিশ্রিত স্বরে তারক অস্ফুট উচ্চারণ করল, আঃ। কল এসেছে।

কল।

হ্যাঁ···

কোত্থেকে···

বিছানা ছেড়ে নামতে নামতে ডাক্তার ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করল, কোত্থেকে আসছেন ?

দরজা খুলুন বলছি···তাড়াতাড়ি খুলুন···

ডাক্তারেরা রাত-বিরাত নেই, ডাকের বাছ-বিচার নেই। কিন্তু যা দিনকাল ডাক না চিনে হুট করে মাঝ-রাত্তিরে দরজা খোলাও যায় না।

পূর্ণা চাপা স্বরে বলল, নাম-ধাম বলতে চায় না কেন !

নাই বলুক। আমার কাছে সব রোগীই সমান।

যদি আদৌ রোগী না হয় ?

আলনা থেকে ধুতি ও হাফ-শার্ট টেনে নিয়ে জানলার কাছে এসে মুখ বাড়িয়ে তারক প্রশ্ন করল, কাদের বাড়ি ভাই ?

বাবুদের বাড়ি।

[illegible] বাড়ি ?

হ্যাঁ…

গ্রামের শেষ অংশে রায়চৌধুরীদের বিশাল বাড়ি। আসলে ওটা অন্ত গ্রাম…দুটি গ্রাম ক্রমশ বাড়তে বাড়তে পরস্পরের সীমা স্পর্শ করেছে।

পাশের ঘর থেকে সাইকেল বের করতে গেল তারক। পূর্ণা নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করল এবং তারকের কাঁধে হাত রেখে বলল, কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাও।

কয়েকদিন আগে পাশের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল। এবং গ্রামে 'ছোট লোকদের সঙ্গে রায়চৌধুরীর সংঘর্ষটা ক্রমশ তীব্র রূপ ধারণ করছিল আর রায়চৌধুরী নিশ্চয় ডাক্তারের সম্বন্ধে খবর রাখেন। ডাকাতের চিন্তা করে তারক বললে, ভয় করছে? যত শীগগীর পারি চলে আসব।

আমার জন্যে বলছি না… সে আমি ঠিক থাকতে পারব। কী আছে আমাদের! বলছিলাম, ওদের বাড়ি যাবে এত রাত্রে! সঙ্গে কাউকে নিয়ে যাও।

হেসে উঠল তারক, না না ওরা আমার কিছু করবে না।

কেন জানি আমার মনে বড় অশুভ চিন্তা জাগছে!…বেশ কাতরভাবে বলল পূর্ণা।

জাগুক… ডাক্তারের কাছে সবাই সমান…সকলের সেবা করতে হবে নিরপেক্ষভাবে।

যা ভাল বোঝ কর।

পূর্ণার মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল। সে সিগারেটের প্যাকেট দেশলাই রুমাল ইত্যাদি এগিয়ে দিল। তারক হাতব্যাগটা সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে নিয়ে প্রস্তুত। উত্তর-দিগন্ত থেকে মুহুর্মুহু বোমা বিস্ফোরণের শব্দ ভেসে এল পরপর পাঁচবার, কোনো বাড়িতে নিশ্চয় ডাকাতি হচ্ছে।

বহির্বারান্দায় আগন্তুক নালঠোকা জুতো পায়ে সন্ত্রস্তভাবে এদিকে-ওদিকে ছোটাছুটি করতে করতে প্রশ্ন করল…কোন দিকে…কোন দিকে বলতে পারেন!

ততক্ষণে কপাট খুলে তারক সাইকেলের একটি চাকা বের করেছে। বললে, বাবুদের বাড়ির দিকে নয়…বাবুদের বাড়ি তো দক্ষিণে…

আগন্তুক দ্রুত কণ্ঠে বললে, সাইকেল রাখুন, সাইকেল রাখুন! গাড়ি আছে। ছুটে গেল গাড়ির দিকে।

এতক্ষণ কেউ লক্ষ্য করেনি। বাড়ির সামনে কলাগাছের ঝোপের আড়ালে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে রায়চৌধুরীদের জিপগাড়ি।

কোনো ভয় নেই, দরজায় খিল দিয়ে ঘুমোও।

পূর্ণার গালে সাদরে হাত বুলিয়ে দিল তারক।

সারাদিন আজ আকাশটা শ্বাপদের মতো মেঘের থাবা মেলে ধরেছিল। আড়ষ্টতায় হাঁসফাঁস করছিল মানুষ। গ্রামের ভিতরে বাঁশবন আমবাগান এবং নানান বুনো ঝোপ-ঝাড়ে অন্ধকার জটিলাকার ধারণ করেছিল···আকাশে ক্বচিৎ কয়েকটি তারা ফুটে উঠেই নিভে যাচ্ছিল দলভ্রষ্ট জোনাকির মতো। গাড়ির শব্দ পেয়েই চুপ করে যাচ্ছিল গর্জনরত ভেকের দল, এবং গাড়িটা তাদের আশঙ্কার পরিধি থেকে দূরে চলে যেতেই পুনরায় তারা অপেক্ষাকৃত উচ্চগ্রামে গর্জন করে উঠছিল।

হাটতলার মাঠে থামল জিপগাড়ি। তারপর পোড়ো রাসমঞ্চ। তারপর উঁচু প্রাচীর ঘেরা বাড়ি। বাড়িতে কত বড় বড় ঘর, বন্ধ এবং অন্ধকার। কোনো কোনো ঘরে মানুষ বাস করে···নিচ-তলায় দুটি ঘরে বাতি জলছে।

রায়চৌধুরীদের বাড়ির ভিতরে কোনোদিন পদার্পণ করেনি তারক। আজ এই প্রথম···ওরা রোজই কলকাতা যাতায়াত করে···কলকাতা এখান থেকে মাইল চল্লিশ দূর···গ্রামের ডাক্তার ডাকার প্রয়োজন পড়ে না, রোগীকে গাড়ি চাপিয়ে কলকাতা নিয়ে চলে যায়। ওদের বাড়ি তারক বরাবরই দেখেছে দূর থেকে। পনের বিঘে জমির ওপর বিরাট বাড়ি···প্রায় তিনশো মেম্বার···এখনো একান্নবর্তী, সাত-আটশো বিঘে জমি আছে···দুটো কলের লাঙল ছাড়াও কুড়িটা গরুর লাঙল আছে। চাষ আছে বাড়িতে। এই পরিবার থেকে দুজন আই-এ-এস পাঁচজন ব্যারিস্টার বেরিয়েছে। পাঁচ মাইল দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায় গেরি-মাটি রঙের সুউচ্চ বাড়িটা।

প্রাচীন আমলের বাড়িটা আগাপাশতলা সংস্কার করা হয়েছে। রায়চৌধুরীরা নিজেদের ক্ষমতায় দু-মাইল দূরে ডি-ভি-সির লাইন থেকে টেনে এনেছেন বিদ্যুত।

গাড়ির শব্দ শুনে মোহিনীমোহন তিনতলার একবুক উঁচু রেলিঙ দেওয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। মুখে উদ্বেগের স্পষ্ট ছাপ। প্রায় চল্লিশ বছর বয়স মোহিনীমোহনের কিন্তু যুবকের মতো দৃপ্ত ও সপ্রতিভ। কেবল দেহের মধ্যভাগ একটু স্ফীত। ঠোঁট দুটি ফোলা ফোলা এবং চোখ দুটি

গোলাকার। কপাল ও টাক মিশে গিয়েছে একসঙ্গে। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। সদ্য পাটভাঙা শান্তিপুরি ধুতি ও গায়ে সিল্কের গেঞ্জি, গলায় ঝুলছে স্বর্ণখচিত কবচ, কাঁধে একটি ধবধবে তোয়ালে। মাঝে মাঝে তোয়ালে দিয়ে বর্তুল স্কন্ধ ও মুখ মুছছেন।

আসুন, আপনি যে গ্রামে আছেন ভুলেই গেছলাম! আমি তো ওয়াইফকে বলছিলাম, চল, এখুনি কলকাতা নিয়ে চলে যাই, ওখানে একবার পৌঁছে গেলে—

গ্রামাঞ্চলে ডাক্তারের অস্তিত্ব ভুলে যেতে পারে এমন লোক অদৃষ্টপূর্ব। স্বভাবতই তারক আকস্মিক অপমানে বিদ্ধ হলো। হাতুড়ে ডাক্তার হলে হয় তো তারক রাগ করত না…কিন্তু সে এম. বি. বি. এস. পাশ করা রীতিমতো ডাক্তার।

রোগীর ঘরে পা দিয়ে তারক বললে, এসে যখন পড়েছি, তখন একবার দেখে নিই, কলকাতা নিয়ে যাওয়া উচিত কিনা …

না না ··আপনি দেখুন···সবিনয়ে বললেন মোহিনীমোহন।

মৃতপ্রায় একটি সুদর্শন কিশোরের মাথা কোলে নিয়ে মেহগিনি পালঙ্কের উপর বসে আছেন সুন্দরী এক ভদ্রমহিলা। শিয়রের দিকে টিপয়ের উপর স্থাপিত টেবিল-ফ্যানটি ঘূর্ণায়মান। একজন কর্মচারী কিশোরটির কালো কুচকচে এবং কোঁকড়ানো চুলের ভিতর জল ঢেলে চলেছে·· পাশে পড়ে আছে একটি আইসব্যাগ। মোহিনীমোহন বললেন, ফ্রিজটা খারাপ করে রেখেছে···ভূতের রাজত্ব চলছে আজকাল ··সকলের সব কিছুতে হাত লাগানো চাই তো···

ঘরে চার-পাঁচজন কর্মচারী·· ওদের লক্ষ্য করে বললেন মোহিনীমোহন সকলের মুখে বিরস কাঠিন্য জেগে উঠল।

তারক রোগী পরীক্ষা করতে করতে হেসে বলল, মানুষের কৌতূহল বাড়ছে ···ভালোই তো···Everyone should know the truth and carry on accordingly.

তারকের ঠোঁটে হাসিটা লেগে রইল।

হাতব্যাগ থেকে একটা ছোট প্যাড বের করে তাতে খসখস করে একটা ইঞ্জেকশনের নাম লিখে দিয়ে বললে, এটা এখুনি চাই···আমার কাছে এটা নেই। জামালপুর থেকে এক্ষুনি নিয়ে আসুক। কলকাতা না গিয়ে ভালোই করেছেন। কলকাতা নিয়ে যাবার আগেই এই রোগী মারা যেত।

মোহিনীমোহনের স্ত্রী ধরা গলায় প্রশ্ন করলেন, কী অসুখ।

ম্যানেঞ্জাইটিস ম্যালেরিয়া। শহরের লোক জানে, বাঙলাদেশ থেকে ম্যালেরিয়া মুছে দিতে পেরেছে! শুধু ম্যালেরিয়া কেন, মানুষের যে-কোনো বিপদ একেবারে মুছে দেওয়া খুবই কঠিন। আবার হাসল তারক। ভদ্রমহিলা কাঁদতে লাগলেন।—না না, কান্নার কিছু নেই। আপনি শুধু শুধু এত ভয় পাচ্ছেন। মোহিনীমোহন তারককে পাশের ঘরে নিয়ে এলেন।

চারটি বড় বড় আলমারী মোটামোটা বইয়ে ঠাসা। দুটি টেবিল ··পাশে খান পাঁচেক কাঠের চেয়ার। ঘরের মাঝখানে আধুনিক কায়দায় বসার সরঞ্জাম ···সোফা সেট সেণ্টার টেবিল ইত্যাদি। এ-বাড়িতে মা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর যুগ্ম পীঠস্থান।

বসুন · মোহিনীমোহন সৌজন্য প্রদর্শন করলেন।···পূর্ণা তো এখানেই আছে?

হ্যাঁ···সোফায় বসতে বসতে বললে তারক।

এখানেই কি বরাবর বাস করবেন?

ভাবছি তো···কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হয় জানি না···

হ্যাঁ···এখানে বরাবর বাস করা অসম্ভব। মানুষ বড় হিংসুটে হয়ে গেছে।

কোথায় আর হিংসুটে মানুষ নেই! এখানে লোকের নিজেদেরই বাঁচার সামর্থ্য নেই, ডাক্তারকে বাঁচাবে কেমন করে। আর যাদের সামর্থ্য আছে, তারা বলে, বাবা তুমি আমাদের ঘরের লোক, তোমাকে আর কী ফি দেব। তারক জোরে হেসে উঠল।

মোহিনীমোহন অন্যমনস্কভাবে বললেন, পূর্ণা আমাদের বড় প্রিয়পাত্রী ছিল।

শুনেছি।

ও আজকাল আর বেড়াতে আসে না কেন?

যা ঝামেলা...

ছেলেটা বাঁচবে?

নিশ্চয়। ওটি কি আপনার ছেলে!

একমাত্র ছেলে।

পাশের ঘর থেকে ছেলেটির আর্তনাদ ভেসে এল। মোহিনীমোহন উৎকণ্ঠা নিয়ে দ্রুত পায়ে ছুটে গেলেন এবং ফিরে এলেন কয়েক মিনিট পরে। চার-দেয়ালে আঁটা চারটি নিয়ন বাতি। জ্বলছে একটি মাত্র। তারক ছাইদানিটা

কাছে টেনে এনে সিগারেট ধরাতে উদ্যত হতেই মোহিনীমোহন বলে উঠলেন, উঁহুঁ হুঁ। আছে ··

দামী সিগারেটের টিন এগিয়ে দিলেন।

ছেলেটা বেঘোরে ধুঁকছে...

কোনো ভয় নেই···জামালপুরে ইঞ্জেকশন পেয়ে যাবে···কোনো ভয় নেই। ঠিক এ-রকম একটা কেস ইঞ্জেকশনের অভাবে আমি বাঁচাতে পারিনি। আপনার গাড়ি আছে···আনতে চলে গেল। গত বছর, সরকারদের নন্দবাবু ম্যানেঞ্জাইটিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ঠিক এমনি সময়ে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল·· রাত দেড়টার সময়···ইঞ্জেকশন আনতে লোক পাঠালে ওপারে। ভরা নদী···নৌকো ছিল আবার ওপারে · এপার থেকে হেঁকে ওপারে বলাইকে ডেকে তুলতেই চলে গেল অনেক সময় · ভেবে দেখুন, আধ মাইল চওড়া নদী···অবশ্য নদীর বাঁধের গায়েই বলাইয়ের বাড়ি। ইঞ্জেকশন নিয়ে এসে পৌছানোর আগেই মারা গেলেন নন্দবাবু···উঃ বিধবা স্ত্রীটির সে কী আকুল কান্না। মারা যাবার দেড়ঘণ্টা পর পৌছল ইঞ্জেকশন।

হঠাৎ তারকের চোখে পড়ল ঘরের কোণে একটি টেবিলের পরে পড়ে আছে দো-নলা রাইফেল।—ওটা কি টোটা ভরা ?

হ্যাঁ···চিন্তিতভাবে বললেন মোহিনীমোহন।

বোমার শব্দে বোধহয় রায়চৌধুরী বাড়ির সব রাইফেল এবং বন্দুকগুলিতে টোটা ভরা হয়ে গেছে ···

কিছুদিন থেকেই আপনার কথা ভাবছিলাম।

বিস্ময়োত্থিত কণ্ঠে তারক বলে উঠল, আমার কথা !

বেশ হালকা সুরে মোহিনীমোহন বললেন, 'ওদের' সঙ্গে নিজেকে জড়াচ্ছেন কেন ?

'ওদের' কথাটার গূঢ় অর্থ আছে। অর্থটা বুঝেছে, স্বীকার করবে কিনা তারক ভাবল কয়েক মুহূর্ত। ওরা মানে যারা বর্তমানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, এই বর্তমানের বুক থেকে সমস্তরকম অবিচার ও অন্যায় যথাসম্ভব মুছে দিতে চাইছে, যারা চাইছে নতুন ধরনের জীবনের পুনর্বিন্যাস। তারক 'ওদের' প্রতি আকর্ষণ বোধ করে···কারণ তার গবেষণার বিষয়বস্তুও 'ওদের' চিন্তাধারার সদৃশ ও সমতুল্য। মেডিকেল জার্নালে মানুষের ব্রেন সম্পর্কিত তারক যে আলোচনা করছে, তার প্রতিপাদ্য বিষয়, ব্রেনের এবং মনুষ্যজাতির ক্রমবিকাশ। বিকাশ

ক্রিয়াটাই গতিশীল। বর্তমান থেকে ক্রমমুক্তির পথও বলা যায় বিকাশের ধারাকে। তারকের চিন্তার সঙ্গে ওদের কাজ ও চিন্তায় দৃষ্টিভঙ্গীর বড় মিল। কেন তাদের সমর্থন করবে না তারক। কেন সে ও-নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনাই বা করবে না।

আমি তো নিজেকে জড়াইনি। আমি কোনো দলে নেই।

একটা নতুন সিগারেট ধরাল তারক।

আপনার নাম কেন শুনতে পাচ্ছি! এমনও শুনছি, ছোটলোকদের আপনি নাকি উস্কাচ্ছেন!

আমি? হো হো করে তারক হেসে উঠল···উস্কাচ্ছি! মিস্টার রায়চৌধুরী, চিকিৎসা চালিয়ে নিজের খাওয়া-দাওয়া করার সময়ই জোটে না···লোকে পয়সা দিতে পারুক আর নাই পারুক·· তারা আমাকে ডাকতে ইতস্তত করে না, কারণ আমার বলা আছে, যখনই জানবে অসুখ, ডাকবে তখুনি···বাড়াবাড়ি অবস্থায় ডাক, রোগী মেরে, তার দোষ আমার ঘাড়ে চাপাতে পারবে না।

আপনি ওদের পরামর্শ দেন—রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন।

যারা আমার ওপর বিশ্বাস করে কিছু সত্য জানতে চায়, আমার কর্তব্য নয় কি, কী সত্য তাদের জানানো? যতটুকু বুঝি যতটুকু জানি, সে তো চিরকালই বলব—আপনিও বলবেন। নয় কি? হা হা হা—সে তো মশাই সবাই বলবে —

সত্যটা কী? কী তারা জানতে চায়? সামান্য ঝাঁঝ প্রকাশ পেল মোহিনী মোহনের কণ্ঠে।

তারা জানতে চায় বর্তমানটা বদলাবে কি না। মানুষের শুভদিন আসবে কি না? এ-ভাবেই মানুষ চিরকাল বাঁচবে কি না—এই সব—

আপনি কি বলেন—

বলি? বলি বদলাবে।

ধ্বংসের দিকে, না সৃষ্টির দিকে?

সৃষ্টির দিকে—মহত্তর জীবনের দিকে। কেউ এই গতির তীব্রতাকে পুরোপুরি নষ্ট করে দিতে পারে না। বাধা দিতে পারে, এই গতির রাস্তা ভেঙেচুরে দিতে পারে—কোথাও পর্বতপ্রমাণ প্রাচীর খাড়া করে দীর্ঘকাল স্তব্ধ করতে পারে—কিন্তু চৈতন্যের বিকাশ কেউ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দিতে পারে না—

মোহিনীমোহন ক্রমশ রেগে উঠছেন, তারক লক্ষ্য করেনি— তাঁর মুখ ক্রমশই লাল হয়ে যাচ্ছে। বললেন, এগুলো কি বিকাশের লক্ষণ? বিশৃঙ্খলা স্বেচ্ছাচারিতা, রাহাজানি, খুনোখুনি—এইগুলো বিকাশের পথ?

পতন ছাড়া উত্থান নেই মিস্টার রায়চৌধুরী। ওঠা-পড়া নিয়ে একটা ঢেউ। শুধু পড়া দেখে যদি সেটাকেই চূড়ান্ত ভাবি, তাহলে ভুল করব।

ওইসব উপমা দিয়ে জীবন-বিচার চলে না···তীব্র তাচ্ছিল্য ফুটে উঠল মোহিনীমোহনের কণ্ঠে।···প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবনের কোনো মিল নেই···

আছে, নিশ্চয় আছে। মানুষ প্রকৃতির সন্তান। এবং কোটি কোটি বছরের প্রাকৃত ক্রিয়ার ফলে মানুষের ব্রেনের সৃষ্টি হয়েছে। এটা একটা অপরিহার্য ব্যাপার। অবশ্যম্ভাবীও। কিন্তু মজার কথা ব্রেনের আগে কোনো জীব বা বস্তু প্রকৃতিকে কাজে, মানে নিজের কাজে লাগাতে পারেনি···একমাত্র মানুষের ব্রেন তা পেরেছে। একটা পশু বা পাখি স্বেচ্ছায় একটা গাছের চারা এক মাটি থেকে উপড়ে অন্য মাটিতে রোপণ করতে পারে না, পারে মানুষ। মানুষ একদিন, একটা নক্ষত্রকে আরেকটা নক্ষত্রের পাশে বসিয়ে নিজের ইচ্ছাপূরণ করবে···জানেন?

এইবার মোহিনীমোহন টেনে টেনে হাসলেন, অসম্ভব! আপনি একজন ডাক্তার, আপনার মুখে এমন অসম্ভব কথা কি শোভা পায়?

গুহার মানুষ বর্তমান সভ্যতার কথা কল্পনা করতে পারত কি?

কিন্তু মানুষ আজ ধ্বংসের মুখে, সেটাও বোধহয় তারা কল্পনা করতে পারেনি···

কেন ধ্বংসের মুখে?

মোহিনীমোহন উত্তর না দিয়ে সিগারেট ধরালেন, কিছু চিন্তা করলেন, এবং উঠে গিয়ে অকারণে রাইফেলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করলেন, কোনো ধ্বংস সংঘর্ষ এবং প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের ছবি তাঁর মাথায় ফুটে উঠছে এবং মিলিয়ে যাচ্ছে···

Co-operation was the path of civilization. আজ তার দিকে বিরুদ্ধাচরণ করাটাই মানুষ বেছে নিয়েছে···ধ্বংস ছাড়া অন্য কোনো গতি নেই।

এই এলাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ পুরুষ মোহিনীমোহন···যাঁর ইচ্ছাপূরণের জন্যে মানুষ ঠেলাঠেলি করেছে···আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান,

তারি লাগি কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। যিনি কথায় কথায় বলতেন, ও আমার কথা ঠিক শুনবে·· আমার ব্যাপার সুতরাং কোনো চিন্তা নেই···ওরে আমার নাম করে বলিস—হয়ে যাবে। সেই মোহিনীমোহন আজ চিন্তান্বিত··· সভ্যতার প্রথম ও শেষ কথা বিরুদ্ধাচারণ। কোনো নতুনের জন্ম ও প্রতিষ্ঠার প্রথম পথ বিরুদ্ধাচারণ···

তা বলে সর্বদা আপনি বিরুদ্ধাচারণ করবেন? ভালো মন্দ সব কিছুর? যা প্রাচীন তারই?

না। যা আমাকে শক্তিশালী করে আমি তার বিরুদ্ধাচারণ করি না, কারণ সেটা আমি অর্জন করেছি···কিন্তু যা আমাকে হীন করছে দুর্বল করছে, সঙ্কীর্ণ করছে, তার বিরুদ্ধাচারণ আমি সর্বদাই করব।

কী করে বুঝবেন, কার বিরুদ্ধাচারণ করা উচিত?

বুঝব না? আপনি বুঝতে পারছেন না, কে আপনার বিরুদ্ধাচারণ করছে! কার বিরুদ্ধাচারণ করা আপনার উচিত?

রাইফেলটা রেখে দিয়ে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে করতে মোহিনীমোহন সেন্টার টেবিল থেকে সিগারেট তুলে ঠোঁটে চেপে ধরলেন···অগ্নিসংযোগ করলেন।

কই, ঠিক বুঝতে পারছি কোথায়? একবার ভাবছি এর, একবার ভাবছি তার বিরুদ্ধাচারণ করি! ঠিক ডিসিশন নিতে পারছি না···

I know my decision. ঝপ করে বলে বসল তারক।

আপনি বাড়িয়ে বলছেন···

বাড়িয়ে?

হ্যাঁ বাড়িয়ে। কেউ কোনোদিন ডিসিশন নিতে পারে না···

তা পার···সব ব্যাপারগুলোই জটিল···জড়াজড়ি করে সংঘর্ষ করে এগোচ্ছে ···তার মাঝখান থেকে রাস্তা বেছে নিতে হবে···রাস্তাটা বেছে নেবার ব্যাপারটাকেই আমি ডিসিশন বলছি।

রাস্তা কি বেছে নেওয়া যায়? এবং সবসময় ঠিক রাস্তাটা?

ভুল ও শুদ্ধ মিলিয়েই গতি···শুদ্ধ পদ্ধতিটা বেছে নিতে হবে···এবং সেটা মানুষের ব্রেন বেছে নিতে পারে।

না পারে না। ভগবানের ওপর ছেড়ে দিতে হয় শেষ পর্যন্ত।

ভগবান বলে কিছু নেই। আছে প্রকৃতি এবং তার অনিবার্য গতি। যাকে

বলা চলে অনিবার্যতা। প্রকৃতির অনিবার্যতার সঙ্গে চৈতন্যের চিরকাল টোক্কর। কোথাও প্রকৃতির অনিবার্যতার সঙ্গে চৈতন্য আপস করেছে, কোথাও বিরুদ্ধাচারণ করে সংশোধন ও আয়ত্ব করেছে। এবং এইভাবে চৈতন্য প্রকৃতির উপর ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করবে···ধরুন আপনার ছেলের অসুখ···অসুখটা প্রকৃতির অনিবার্যতা···মানুষ ইঞ্জেকশন সৃষ্টি করে তার বিরুদ্ধাচারণ করেছে···অনিবার্যতাকে আয়ত্ব করেছে···কারণ অসুখের ফল যে মৃত্যু তাকে পেছিয়ে দিচ্ছে।

মানুষ যত পারে লড়াই করুক না প্রকৃতির সঙ্গে, তাতে আমার আপত্তি নেই···কিন্তু মানুষ যে মানুষের প্রতি হিংস্র আচরণ করছে, বিদেশের প্ররোচনায়? নিজের দেশের ঐতিহ্য নষ্ট করতে চাইছে···অবশ্য বিদেশের কোনো তত্ত্ব আমাদের দেশের ঐতিহ্য নষ্ট করতে পারবে না বলেই আমার বিশ্বাস! এগুলো সব সাময়িক···এসব একদিন নিজেরাই মারামারি করে ধ্বংস হবে।

ইঞ্জেকশানটা এক সাহেব আবিষ্কার করেছেন। তাতে আমাদের দেশের লোকের রক্তে কাজ করছে না? অনেক ওষুধ ও ইঞ্জেকশন বিদেশের আবিষ্কার। সত্যের দেশ-বিদেশ নেই মিস্টার রায়চৌধুরী···তত্ত্ব যদি খাঁটি হয়···তাহলে যে-কোনো দেশের ঐতিহ্যে তার ফল পাওয়া যাবে। কোথাও আগে, কোথাও পরে···এই যা তফাৎ।

কখ্খনো না···আমাদের দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনো দেশের ঐতিহ্যের মিল নেই।

বিজ্ঞানের কোনো দেশ-বিদেশ নেই মিস্টার রায়চৌধুরী। শৈত্য তাপ ইত্যাদি কারণে আবহাওয়ার তারতম্যে তার প্রয়োগের তারতম্য ঘটতে পারে, কিন্তু মূল নীতি এক···বিজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

এই সময়ে ইঞ্জেকশনের প্রসঙ্গ আসার পর থেকে মোহিনীমোহনের কান পড়েছিল পাশের ঘরের দিকে···তিনি হঠাৎ অস্থির পদক্ষেপে বেরিয়ে গেলেন এবং একটু পরেই ফিরে এসে বললেন, ডাক্তারবাবু, একবার আসুন···

তারক জানে এখন তার কিছু করার নেই, এখন তাকে প্রকৃতির অনিবার্যতা সয়ে যেতে হবে···এখন প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করার মতো অস্ত্র তার হাতে নেই, রোগীর মাথায় জল ঢালতে বারন করে দিয়ে তারক বারান্দায় এসে দাঁড়াল··· অন্ধকার ক্রমশ যেন বেড়েই চলেছে···অদৃশ্য বৃষ্টিপতনের শব্দ···আর্দ্র বাতাস বয়ে আনছে···তারক সিগারেট ধরাল···আর সিগারেটের ধোঁয়া সহ্য হচ্ছে

না···ভোঁতা লাগছে···হাই তুলল তারক···। একজন কর্মচারী এসে জানাল কফি দেওয়া হয়েছে।

কে, পাঁচু ঠাকুর মনে হচ্ছে? আবছা অন্ধকারে প্রশ্ন করল তারক।

হাঁ ডাকতর বাবু···আমি গো···

কেমন আছে তোমার স্ত্রী?

ভালো আছে গো···

বেশ···

কিছুদিন আগে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে তারক। তারক নিজে কি বাঁচিয়েছে? না। তার জ্ঞান ও বুদ্ধি, যা অন্য মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত বা অর্জিত। কিন্তু জ্ঞান প্রয়োগের পর সুফলের অধিকারী তারক··· গৌরবেরও।

মোহিনীমোহন ইতিমধ্যেই কখন এসে সোফায় বসে ধূমপান করছিলেন চিন্তামগ্নভাবে···তারকের প্রবেশে কোনো কথা বললেন না। দুজনেই কফির পেয়ালা চুমুক দিতে লাগল। দীর্ঘকাল পরে কফি পান করছে তারক। কলেজ জীবনের দুরন্ত মুহূর্তগুলি স্মরণে ভেসে উঠে গোপন বেদনার সৃষ্টি করল।

আপনি তো কোনো দলের মেম্বার নন, বললেন?

হ্যাঁ···নই···

আপনার কী দরকার ওদের সঙ্গে মেলামেশা করার?

ডাক্তার রোগীর সঙ্গে মিশবে না? এ-কেমন কথা বলছেন!

সোজা হয়ে বসলেন মোহিনীমোহন, যেন তিনি এবারে কিছু অমোঘ আদেশ ঘোষণা করবেন।

চিকিৎসা করবে, চলে যাবে। কলে যাবেন, চিকিৎসা করেই চলে আসবেন···আপনার সঙ্গে চিকিৎসা ভিন্ন আর কী প্রয়োজন তাদের?

আপনার ছেলেকে দেখতে এসে কি কেবল চিকিৎসার কথাই হচ্ছে? মৃদু হেসে বাঁকা চোখে তাকিয়ে অতি সহজ সুরে বললে তারক।

আমাদের কথা আলাদা···ঘাড় শক্ত করে থুতনি নামিয়ে বললেন মোহিনীমোহন।

কেন আলাদা! প্রত্যেক লোকের সত্য জানার এবং সত্য অবলম্বন করার অধিকার আছে! তারকের কণ্ঠে প্রচুর বিস্ময় ঝরে পড়ল।

ছোটলোকরা সত্যের মর্ম কী বুঝবে, ওরা তো মশাই পশুশক্তি।

মানুষের ব্রেন নেই ওদের ? আপনার আমার মত একই ব্রেন ?

মোহিনীমোহনের মুখ অধীরতায় লাল হয়ে উঠল···তারক তাঁকে আঘাত দেবার জন্য বলেনি···সে বলেছে ডাক্তার সুলভ সহজ ভঙ্গিতে।

ওরা নতুন কিছু শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করে না, তারক বলে চলল, আমার কাছে এসে যাচিয়ে নেয়। তার মানে ওরা আমাকে অগাধ বিশ্বাস করে আমি কি ওদের মিথ্যে বলতে পারি। সত্য জানানোর অধিকার কি আমার নেই বলতে চান ?

কথায় কথায় তারক উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল, সে চেয়ারের হাতলে চাপড় মেরে বসল।

আত্মগত স্বরে বললেন মোহিনীমোহন, আপনি তাহলে সত্যের ভক্ত. গোঁড়া ভক্ত ?

ভক্ত কি না জানি না···কিন্তু আমি সত্যকে ভালোবাসি···সত্য উন্মোচিত করতে আনন্দ পাই···সত্য প্রচার করতে পারলে খুশীতে আত্মহারা হই।

ব্যঙ্গাত্মক স্বরে মোহিনীমোহন বললেন, সত্যের কোনো নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা আছে ? বলুন দেখি, সত্য কী···

এমন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন যেন এবারে তারক ঢিট হয়ে যাবে।

সলজ্জভাবে তারক হাসল। বলল, মস্ত প্রশ্ন করলেন, এর উত্তর দিতে পারব কিনা জানি না··

তাহলে এত সত্য-সত্য করে নাচানাচি করছেন কেন ?

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে তারক মনে মনে কথা গুছিয়ে বলল, শুনুন, ক্রমাগত বৃহত্তর সংখ্যায় মানব জাতির উৎকর্ষ বিস্তারের যা উপযোগী তাই সত্য···

মোহিনীমোহন সহসা তাঁর নিজের চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন, তারকের কথায় মনোযোগ দিতে পারেননি।

বললেন, আবার বলুন··

বারবার তিনবার তারক সত্যের সংজ্ঞা উচ্চারণ করল।

বললে, নিজের রোগের চিকিৎসার জন্য বৈজ্ঞানিক বা ডাক্তাররা ওষুধ ও ইঞ্জেকশন আবিষ্কার করেননি·· হয়তো তাঁদের সদ্য আবিষ্কৃত ওষুধ বা ইঞ্জেকশন তাঁদের চিকিৎসার কাজে লেগেছে কিন্তু আবিষ্কারের উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতি···ব্যক্তির বিস্তার ও মানবজাতির বিস্তার পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। ব্যক্তির বিস্তারের ফললাভ থেকে যখন মানুষ জাতটা বঞ্চিত

থেকেছে তখনই লেগেছে সংঘর্ষ...আর তার ফলে ব্যক্তিমানুষ হেরে গেছে... জিতেছে বৃহত্তর মানবজাতি...আর যেখানে ব্যক্তির বিস্তার মানবজাতির বিস্তারের অঙ্গ, সেখানে ব্যক্তির বিস্তারকে মানবজাতি বুকে টেনে নিয়েছে...

দূরাগত মোটরের শব্দ দুজনের মনোযোগ ছিন্ন করে দিল ক্ষণিকের জন্য। মোহিনীমোহন সোজা হয়ে বসলেন, তাঁর চোখ দুটি এখনো গভীর অন্তর্মুখী।

তিনি বললেন, আপনার কথাগুলোর সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক কোথায় বুঝতে পারছি না···অসংলগ্ন মনে হচ্ছে না?

মোটেই না মানবজাতির বিস্তারের জন্য সংঘর্ষ, বিশৃঙ্খলতা স্বেচ্ছাচারিতা। এগুলোর কোনোটাই আকস্মিক নয়। এর অনিবার্য অতীত আছে·· শান্তি শৃঙ্খলা ও পরার্থপরতার দিকে যাত্রার জন্যে এইগুলো···চৈতন্যর জয়যাত্রায় এ-রকম বিপর্যয় সংঘর্ষ অনেক হয়েছে, হবে আরও অনেক···

সংঘর্ষের ফল কী হবে? ধ্বংস? জানেন, কত সভ্যতা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে!

গোটা মানবজাতি লোপ পায়নি। প্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতি দুই-ই চৈতন্যের জয়যাত্রার বিরুদ্ধতা করেছে, কিন্তু চৈতন্যের কাছে ক্রমশই তারা পরাজিত হচ্ছে। ধরুন, একদিন ভূকম্পনে পৃথিবীটা চৌচির হয়ে গেল, তখন কোনো গ্রহে বা তারায় তারা উদ্বাস্তু হয়ে চলে যাবে···বন্যা বা ভূকম্পনে অনেক মানুষ ধ্বংস করেছে কিন্তু মানব জাতিকে ধ্বংস করতে পারেনি।

আপনার চৈতন্যের জয়যাত্রার পদ্ধতিটা কী? একজন মানুষ যা অর্জন করছে, পাঁচজনে তা কেড়ে নেওয়া?

রাগে উঠে দাঁড়ালেন মোহিনীমোহন। তিনি এবারে ধৈর্যের সীমান্তে এসে পড়েছেন। এই লোকটা তাঁর ছেলের চিকিৎসা করতে না এলে, কখন একে তিনি গলাধাক্কা দিয়ে বিতাড়িত করতেন।

ডাক্তার বললেন, কেউ দরজা-জানালা বন্ধ করে গান গাইলে, প্রথমে কিন্তু শ্রোতা বাইরে থেকে শুনবে, কিছু উঁকি মারবে···এবং যদি ভালোভাবে শুনতে না পায় তাহলে কেউ কেউ দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়বে···জানেন না, জলসাগুলোতে কী হয়···প্যাণ্ডেলের বেড়া ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে?

রাস্কেল সব!

ড্রাইভার ইঞ্জেকশন হাতে গর্বিত পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করতেই উঠে দাঁড়াল দুজনে।

মোহিনীমোহনের স্ত্রী ছেলের মাথা কোলে নিয়ে চোখের জল মুছছিলেন... অন্যান্য কর্মচারীরা যে যেখানে পেরেছে ঠেস দিয়ে ঢুলছিল।

তারক অ্যাম্পুল কেটে দ্রুত হস্তে সযত্নে ইঞ্জেকশন করে দিয়েই পা বাড়াল বাড়ি যাবার জন্যে। বললে, কোনো ভয় নেই...এবারে আমি আপনাদের পুরোপুরি ভরসা দিতে পারি...

কিছুক্ষণ দেখে গেলে ভালো হতো না?

হাসতে হাসতে তারক বললে, দরকার হবে না বলেই মনে হচ্ছে...

সগর্ব হাসি। একজন ইঞ্জেকশন আবিষ্কার করে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ করার যে-গর্ব উপভোগ করেছিলেন, সেই গর্ব তারক আবার নতুন করে উপভোগ করতে করতে হাসতে হাসতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। মোহিনীমোহন হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠলেন, তাঁর বিনীতভাব উবে গেল, তাঁর মুখমণ্ডল ভারী হয়ে গেল। বললেন, আমার কথাগুলো ভেবে দেখবেন।

কোন কথাগুলো? তারক তো নিজেই প্রায় এক তরফা বকে গেছে।

সে বলল বিস্মিতভাবে, কোন কথা?

ছোটলোকদের সঙ্গে বেশি বেশি কেন, মেলামেশাই করবেন না। স্বরে আদেশের স্পষ্ট আভাস।

কেন বলুন তো?···সিঁড়ির কয়েক ধাপ নামতে নামতে হঠাৎ থেমে মুখ ফিরিয়ে বলল।

বাগদি পাড়ার লোক হাবা দত্তকে মেরেছে···আপনি জানেন, হাবা আমার কত বাধ্য ছিল...

সবাই জানে, হাবা দত্ত দিনের পর দিন বছরের পর বছর গরিবদের কাছে চড়া ও চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ নিয়ে উপকার করার ছলে বিরাট সম্পত্তি করেছে— ওর একটা ঘর বন্ধকী ঘটি-বাটি-কলসী ইত্যাদি বাসন-কোসনে ভর্তি— জালিয়াতি তঞ্চকতা ইত্যাদি নানান কৌশলে হাবা দত্ত সরেস ব্যক্তি—ওর বাড়তি জমি দখল করতে গিয়েছিল একদল লোক—হাবা এক ঝোপের আড়াল থেকে গুলি করে ফেলে দিয়েছে এক দখলকারীর লাশ। দখলকারীরা ছুটে গিয়ে হাবার হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে পাইকারী মার দিয়েছে। হাবাও ঐখানে ইহলীলা ত্যাগ করেছে।

বাগদি পাড়ার লোকেরা সংখ্যায় বেশি ছিল দখলকারীর দলে।

সহসা তারকের মুখে কোনো কথা জোগাল না। হাতব্যাগটা বগলে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকল—

মোহিনীমোহন তোয়ালে দিয়ে কাঁধ গাল ও কপাল মুছলেন। আমি ডিসিশান নিয়েছি—হয় মুছে যেতে হবে, নয় মুছে দিতে হবে—বিরুদ্ধতা আর আমি সহ্য করব না।

পিতৃসুলভ উৎকণ্ঠা কখন সরে গিয়েছে মোহিনীমোহনের চোখ থেকে, তার জায়গায় ঝরছে কর্তৃত্বের নিষ্ঠুরতা।

মাটি ছাড়া কি গাছ বাঁচে মিস্টার রায়চৌধুরী? রোগী ছাড়া ডাক্তার?

সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসার পর অন্ধকার বাগানে এসে তারকের গা ছমছম করতে লাগল। হঠাৎ তারকের মনে পড়ল রাইফেলটার কথা। মোহিনীমোহন কি ডাকাতের ভয়ে রাইফেলে টোটা ভরে রেখেছেন, নাকি ডাক্তারের ভয়ে? তারক ঠিক বুঝতে পারল না।

২

বাড়ির সামনে গাড়ি থামার শব্দে পূর্ণা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে সদরের দিকে এগিয়ে গেল। গুমট গরম, গায়ে জামা রাখতে কষ্ট হচ্ছে। রোদ ও ছায়ার ক্রমাগত লড়াই চলছে আকাশে।

গাড়ি থেকে নামলেন মোহিনীমোহন। গিলেকরা পাঞ্জাবী শান্তিপুরী ধুতি। পায়ে পাম্পস্থ হাতে গজদন্তখচিত ছড়ি। জুতোয় মচমচ শব্দ করতে করতে এসে উঠলেন বারান্দায়। কয়েকজন রোগী বসে বসে ঝিমোচ্ছিল, ওরা সন্ত্রস্তভাবে উঠে এসে নমস্কার করল মোহিনীমোহনকে।

ডিস্পেন্সারিতে ঢুকে মোহিনীমোহন ভ্রূ কুঁচকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। কাদার গাঁথনি দিয়ে ইটের চার দেয়াল। তার উপর খড়ের চাল। করোটির দন্তপংক্তির মতো ইটগুলো বেয়াড়াভাবে প্রকাশিত। দুটো পাল্লাহীন আলমারীতে ওষুধ-ইঞ্জেকশন-তুলো ইত্যাদি বস্তুতে বোঝাই। একটি কাঁঠাল-কাঠের বৃহৎ টেবিলের উপর মোটামোটা ডাক্তারী বই পলিথিনের চাদরে ঢাকা...দেয়ালে ঝুলন্ত সেলফ তিনটিতেও বহু সরঞ্জাম, একটি চেয়ার একটি লম্বা বেঞ্চ...। প্রাণপণে পূর্ণা মুখে হাসির কষ্টসাধ্য উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে বুকের ভয় চাপা দেবার চেষ্টা করতে লাগল।

তারক নেই? গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন মোহিনীমোহন।

বসুন। চেয়ারটি আঁচলে মুছে এগিয়ে দিল পূর্ণা। মাঝপথে মোহিনীমোহন নিজেই চেয়ারটি টেনে নিলেন, কেড়ে নেবার মতো। কলে গেছেন।

কলে? বলতে বলতে মোহিনীমোহন চিন্তায় তলিয়ে গেলেন।

একটু বসুন আমি আসছি…

না না, আসতে হবে না আমি কিছু খাব না…

সে হয় নাকি! আপনি কি আর রোজ আসবেন। আপনার পায়ের ধুলোর আজ কত দাম?

বটে? যদি রোজ আসি?

তাহলে কিন্তু রোজ খাতির করতে পারব না…

লোকটির ছলনাগুলি স্পষ্ট ঝলসে উঠল স্মৃতিপটে এবং পূর্ণার দ্বিধায় আচ্ছন্ন দৃষ্টিও স্বচ্ছ হয়ে গেল।

একদিন যাকে ডেঁয়োপিঁপড়ের মতো গা থেকে ঝেড়ে ফেলেছিলেন, সেদিন ভাবতে পেরেছিলেন মোহিনীমোহন যে, কোনোদিন তার বাড়িতে গায়ে পড়ে ছুটে যেতে হবে!

তোর কাছে এসেছি বলে এই অপমান করছিস।

মোহিনীমোহনের মুখ থমথম করতে লাগল।

অপমান? কই না তো…

হঠাৎ মোহিনীমোহনের শরীর ডিঙিয়ে এক ঝলক বাতাস এসে পূর্ণার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করতেই, তার গা গুলিয়ে উঠল। মদের গন্ধ চিনতে ভুল করল না সে। বেশ দামী এবং সুগন্ধ হলেও মদের গন্ধ যে। তার মনে হলো আজ মোহিনীমোহনকে চূড়ান্ত অপমান করতে পারলে সে খুব খুশী হতো।

বসুন…বসুন না…

চেয়ার ধরে তখনো মোহিনীমোহন দাঁড়িয়ে।

পূর্ণা বাপীকে ডাকতে বারান্দায় এলো। একপাল ছেলে বারবার ড্রাইভারের তাড়া খেয়েও কচুরিপানার মতো গাড়ির মোহ ত্যাগ করতে পারছে না। বেশ কয়েকবার ডাকার পর বাপী এলো। তার কানে কানে কী বললে পূর্ণা। সে দৌড়ে চলে গেল কলাবনের আড়ালে।

মোহিনীমোহন পূর্ণার শিরে হাত রেখে বললেন, তেমি আছিস তুই।

মোটেই না তখন কত বোকা ছিলাম—নইলে আপনার ছলনায় ভুল করি।

ভুল?

হ্যাঁ, ভুল বৈকি। যে ভুল সারা জীবন আমাকে দগ্ধাচ্ছে—

কেন। স্বামীকে বলতে পারিসনি বুঝি—খোঁচা মারলেন মোহিনীমোহন।

ও-সব আবার বলা যায় কোনোদিন! বলতে পারলে কি আর কষ্ট হতো। চেপে চেপেই তো কষ্ট পাচ্ছি।

আমি তোর স্বামীকে বলে দেব—তোর কষ্ট লাঘব হবে—কী বলিস?

মৃদুমৃদু হাসতে লাগলেন মোহিনীমোহন—এবং এক কোণের ছোট্ট টেবিলে রাখা মাইক্রোস্কোপে চোখ পড়তে, সেদিকে হেঁটে গেলেন।

আপনার বিনা সাহায্যেই কষ্ট সহ্য করতে পেরেছি এতদিন—বাকি জীবনটাও পারব আশা করি—

ধুলোয় লুটোনো কোঁচা ঝাড়তে ঝাড়তে মোহিনীমোহন বললেন, কিন্তু আমি বোধহয় যেকোনো মুহূর্তে তোকে খুব কষ্ট দিতে পারি।

দেশের ভাগ্যনিয়ন্তার স্পষ্ট সুর ফুটে উঠল তাঁর কণ্ঠে—দাম্ভিকতা ঝরে পড়ল তাঁর সমস্ত ভঙ্গি থেকে—

সেজন্তেই কি বাড়ি বয়ে সুসংবাদটা দেবার জন্যে ছুটে এসেছেন? সেটা বোধহয় না জানালেও চলত—আপনি যে এ-তল্লাটের হর্ত-কর্তা-বিধাতা—আপনার খুশীতে যে আমরা সবাই বেঁচে আছি, এ-খবর কে না জানে? আপনি যাঁর প্রতি বিরূপ তাঁর যে আর ইহজীবনে পরিত্রাণ নেই, সেটাও ভালোভাবে জানা আছে।

হেসে উঠলেন মোহিনীমোহন, অহঙ্কার বাজতে লাগল হাসিতে। বললেন, শহর ছেড়ে হঠাৎ গাঁয়ে এলি কেন, আমার পেছনে লাগতে?

সে ক্ষমতা আমাদের আছে নাকি মোহিনীদা?

না না—ঠাট্টা নয়—সত্যি বল।

ওঁর রিসার্চের জন্য।

রিসার্চ? এখানে তার কী সুবিধে?

জানেন না? এখানে খুব অশিক্ষিত মানুষের ব্রেন পাওয়ার সুবিধে আছে যে! শিক্ষিত মানুষের ব্রেন নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে, অশিক্ষিত, একেবারে পশুর মত জীবন-যাপন করছে যে মানুষ তাদের মস্তিষ্ক সহজে মেলে না যে—

ওসব বাজে রিসার্চ আর করতে হবে না—শহরে উঠে যা—তোর বর ডাক্তার হিসেবে মন্দ না। আমার ছেলেটাকে একেবারে সুস্থ করতে পেরেছে—অবশ্য আমার গাড়ি ছিল বলেই সম্ভব হয়েছে। গাড়ি ছিল লোক ছিল—

সে তো বটেই আপনার ছেলে বেঁচেছে আপনার নিজের গৌরবে।

গৌরব আজ আর কোথায় আমার? লোক তো আমার উপকার ভুলতে বসেছে, আমি নাকি কিছুই করিনি কারুর।

কে বলছে। করেছেন অনেক। আপনার মত উদারচেতা আর কে আছে!

উদারতার কোনো দাম নেই আজ। ভাগাড়ে সদ্য আনা মড়ার মতো উদারতা···হাজার হাজার শকুনিতে ছিঁড়ে খেতে ছুটে আসবে···উদারতার খুবই অভাব আজ। আমাকে সবাই ছিঁড়ে-খুঁড়ে খাবার জন্যে তাই সবাই উদ্‌গ্রীব।

বাপী এমন সময় পূর্ণাকে ডাকতেই পূর্ণা মোহিনীমোহনকে দু-দণ্ড বসতে বলে ভিতরে চলে গেল। এবং কয়েক মিনিট পরেই এক প্লেট মিষ্টি নিয়ে ফিরে এল আবার। মোহিনীমোহন চমকে উঠে বললেন, না না···আমি ওসব খাব না।

ভয় করছে নাকি? হাজার হোক আপনাকে আমি বিষ দেব না। মিষ্টি অথচ ব্যাঙ্গাত্মক হাসি হাসতে লাগল পূর্ণা।

মোহিনীমোহন দেয়ালে হেলান দেওয়া ছড়িটা তুলে নিলেন, বললেন, যখন-তখন আমি খাই না পূর্ণা—শোন্ তোর বরকে বলিস একটু। বুঝিয়ে বলিস। ডাক্তারি করছে ডাক্তারিই করুক। ফিলসপি বা রাজনীতি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি যেন না করে। শেষকালে একূল ওকূল দুকূল যাবে।

আপনি খাবেন কি না বলুন। এ-বাড়িতে আপনি কতদিন সেধে খেয়ে গেছেন মনে আছে!

সেদিন তুই আমার কত প্রিয় ছিলি, আজ যে তুই আমার শত্রুতা করছিস—

আমি!

হ্যাঁ। তুই, তোর স্বামী দুজনেই—সব আমার কানে আসে। স্বামী পেয়ে আমার কথা তুই ভুলে গেছিস দেখছি—তা ভালোই হয়েছে। আমাকে ভুলে তুই নতুন সুখ পেয়েছিস—তোর অনেক ঝঞ্ঝাট দেখতে পাচ্ছি, লোক নেই জন নেই—বোধহয় সংসারও খুব সচ্ছল নয়—কিন্তু তোর চোখে মুখে সুখের স্পষ্ট আভাস বারবার টের পাচ্ছি—আর এই সুখের গর্বে তুই আমার শত্রুতায় যোগ দিয়েছিস। কিন্তু ভুলে যাস না, তোর এই সুখের সংসার আমি এক নিমেষে নষ্ট করে দিতে পারি।

পূর্ণার মনে হলো যে যদি সত্যি সত্যি খাবারে বিষ মিশিয়ে নিয়ে এসে মোহিনীমোহনের ঠোঁটে গুঁজে দেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হতো, তাহলেও তার

সান্ত্বনা ছিল। সে অত্যন্ত কাতর স্বরে প্রশ্ন করল, কেন আপনি আমার সুখ নষ্ট করবেন—কী দেখেছেন, কী তার প্রমাণ ?

ছোটলোকরা আমার ভাই চন্দ্রমোহনকে মারার জন্য শাসাচ্ছে। আর ছোটলোকদের আড্ডা তোদের এই ডিস্পেনসারিতে। আমি বললাম না, তুই তেম্নি আছিস, তেমনি বোকা। তুই ভুলে গেলি কী করে যে, তোর সেই ছবিটা আজও আমার কাছে রয়েছে ! বোকা নইলে আবার কেউ ভুলে যায় ! সে-ছবিটা যদি একবার তোর বরকে দেখাই ?

৩

কখনো কখনো মনে হলো মোহিনীমোহন ফাঁকা শাসিয়ে গেলেন। দশ-বারো বছর আগেকার ছবি এত যত্ন করে কেউ তুলে রাখে ? সব মিথ্যে তর্জন। আর, যদি সে-ছবি আজ অবধি তুলেই রেখে থাকে, সে কি আজ আর স্পষ্ট আছে। সে কবে ঝাপসা হয়ে গেছে। যদি ঝাপসা না হয় ? যদি সে-ছবি মোহিনীমোহন সযত্নে সঞ্চয় করে রেখে থাকেন ? যত ভাবতে লাগল পূর্ণার ততই নতুন নতুন আতঙ্ক জন্মাতে লাগল। সব চাইতে শ্রেয় রাস্তা, নিজ মুখে স্বামীকে সব বলা। কিছু-কিছু পূর্ণা ইতিমধ্যেই বলে দিয়েছে। কিন্তু আর কিছু-কিছু নয়, সবটাই খুলে বলা। কিন্তু তারক সব শোনার পর যদি অসহ্য আঘাত পায়—যদি তারক আর কোনোদিন পূর্ণাকে শ্রদ্ধা করতে না পারে ? বার তিনেক চেষ্টা করল পূর্ণা খুলে বলার। তিনবারই কোনো না কোনো বাধা। দুপুরে যখন একটা-দুটো পাপিয়া আর ঘুঘু ডাকছিল, তখন বিশ্রান্ত তারক পড়ছিল খবরের কাগজ—শুয়ে শুয়ে—পূর্ণা বলল, শোনো—কাগজ রাখ—তোমাকে কাগজের চাইতে চমকপ্রদ খবর শোনাব।

বাইরে থেকে কে ডাক দিল, ডাক্তরবাবু গো—

রাত্রে তারা দুজনে অনেকক্ষণ বিছানায় গল্প করল—একেক দিন দুজনকেই কথায় পেয়ে বসে, ঘুম আসতে চায় না—একটা করে আলোচনা শুরু হয়, শেষ হয় অনেক পার হয়ে।

এবারে ঘুমোও, আর বকবক কোরো না কাল আমার অনেক কাজ অনেক খাটুনি—

পূর্ণাও তারকের কথাগুলি তোতাপাখির মতো আউড়ে গেল।

তুমি আগে ঘুমোও—

আগে তুমি—

আমার ঘুম আসছে না—

শোনো—

বোস বাড়ির ও-দিক থেকে কলরব ভেসে এল—কয়েকটা আলো জ্বলে উঠল, দেখা যাচ্ছে পায়ের দিককার জানলা দিয়ে আলোগুলো চঞ্চলভাবে ইতস্তত সঞ্চালিত হচ্ছে—একটা আলো তাদের দিকে ছুটে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে, ডাক্তার, ও ডাক্তার—

কে, হরগোবিন্দ দা?

হ্যাঁ ভাই—ওঠ—রিঙ্কুকে সাপে কেটেছে।

কোথায়?

হাতে।

বাঁধন দিয়েছেন?

দিয়েছি—

চলুন, এখখুনি যাচ্ছি—

আর সে-রাত ডাক্তার বা পূর্ণা কারুর ঘুম নেই। বাপীর কমবয়সী রিঙ্কু··· সাত-আট। তারক ও পূর্ণার কোলে চেপে বসে কোন জন্ম-জন্মান্তরের দাবিতে। মেয়েটি বড়ই নাছোড়। গায়ে পড়ে আদর আদায় করতে কোনো লজ্জা হায়া নেই। রক্তপরীক্ষা ইঞ্জেকশন—এ সব করতেই রাত্রি পার হয়ে গেল। পরদিন দক্ষিণ মাঠে লাগল প্রবল সংঘর্ষ। চন্দ্রমোহন ও একজন ক্ষেতমজুর—জাতে খয়রা, মারা গেল। শান্ত স্তব্ধ গ্রাম অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সর্বত্রই কী-হয় কী-হয় আতঙ্ক। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না···ছোট ছোট জটলা ···ফিসফিস চলছে। হঠাৎ কেউ সেখানে গিয়ে পড়লে ফিসফিস থেমে যাচ্ছে, মানুষ মানুষের চোখে তাকাচ্ছে নতুন দৃষ্টিতে···যেন লোকটার ভিতরে কোনো বিপজ্জনক নতুন আস্থানা গেড়েছে। চন্দ্রমোহন ও হাসাকে চিকিৎসা করার জন্য তারকের কাটল সারাদিন অভুক্ত অবস্থায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কাউকে বাঁচান গেল না। একজনের কাঁধে তীর বিঁধেছে আর একজনের বুকে গুলি। বিকেলে স্নানাহার করে তারক আরাম-কেদারায় বসে সিগারেট ধরিয়ে সংঘর্ষের কথা চিন্তা করছিল। মানুষে মানুষে সংঘর্ষ কবে শেষ হবে···যতদিন এ-সংঘর্ষ শেষ না হচ্ছে ততদিন সব ব্রেনগুলি একসঙ্গে কাজে লাগবে না···সমস্ত ব্রেনগুলি সুশৃঙ্খলভাবে কাজে লাগলে চৈতন্যশক্তির বিস্তার নতুন আকার

পরিগ্রহ করবে। তখনই শুরু হবে সত্যকার সভ্যতার নবতর পদক্ষেপ।

পূর্ণা নিজেকে প্রসারিত করছিল—আলুথালু চুলগুলি বিন্যস্ত করতে করতে দাঁতে চিরুনী চেপে এসে দাঁড়াল। অন্তরে বাহিরে উন্মত্ততা তলিয়ে যাচ্ছিল—ক্রমশঃ পাতাল থেকে জেগে উঠছিল বিস্তারিত শান্তি ও স্তব্ধতা—আর আকাশ থেকে ডানা ঝাপটানোর শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছিল।

তুমি ভীষণ বোকা —

উঁ—কথা কানে ঢোকেনি তারকের।

ভীষণ বোকা তুমি—কী করে যে নিজেকে এত বুদ্ধিমান ভাব জানি না—

কেন—

কী বলেছ মোহিনীমোহনকে ?

কই, কিছু বলিনি তো—ঘাড় কাত করে তাকাল তারক বিস্ময়ান্বিত নজরে, কই কিছু না।

বলনি বৈকি—

আমি তো গোপন খবর কিছুই জানাইনি —

দর্শন তত্ত্ব, রাজনীতি—আরও কত কী শুনিয়ে এসেছ !

ওসব ওকে শুনিয়ে কী লাভ। তোমার কথা ওরা শুনবে ? তীক্ষ্ণ তিরস্কার পূর্ণার কণ্ঠস্বরে।

ওঃ হো—এই কথা—হাসল তারক—তা শুনিয়েছি। কেমন যেন মা সরস্বতী হঠাৎ আমার জিবে ভর করেছিলেন, কিছুতে আমি সামলাতে পারলাম না। বুঝিয়ে দিলাম পৃথিবীর ইতিহাস কোন খাতে বয়ে চলেছে —

মোটেই ভালো করনি —

কেন বল তো ? উৎকণ্ঠিত স্বরে তারক সোজা হয়ে বসল সেদিন কি কিছু বলে গেছে ?

অনেক কিছু বলেছে।

কী, কী বলেছে !

কী দরকার ছিল তোমার পণ্ডিতি করার। আজকাল কাউকে পেলেই দেখেছি, অমনি হুড়বড় করে সব বলে দেবে—

বলব না ? এতদিন যা পড়লাম, দেখলাম, শিখলাম বলব না ? আর কবে বলব পূর্ণা ?

বেনা বনে মুক্তো ছড়িয়ে কোনো ফল আছে ?

বেনা বন কাকে বলছ পূর্ণা। আর মুক্তোই বা কী। হয়তো আমি যা জানি, সেটা এখানে মুক্তাফল হয়ে উঠতে পারেনি? যদি আমার চিন্তা আমার ধারণা গ্রহণ করে, সত্যি সত্যি কেউ কোনোদিন মুক্তো সৃষ্টি করতে পারে—আর কে যে এগুলো কাজে লাগাবে কে জানে, কে আজ তাকে চেনে। আমার উচিত আমার চিন্তার প্রচার করে যাওয়া—কেবল প্রচার। আদৌ কোনো শ্রোতার বুকে সুরলহরী বেজে উঠবে না ভেবে কি ওস্তাদ গান গাওয়া বন্ধ করে দিতে পারেন?

তা বলে পাত্র-অপাত্র ভেদ নেই?

না নেই। আমি একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি, হয়তো সেটা আর পাঁচজনে অনুভব করছে, কিন্তু ধরতে পারছে না। তখন আমার উচিত সেটা ধরিয়ে দেওয়া। তাতে যে আমি সুখ পাব পূর্ণা!

দুঃখও পাবে···

হয় তো পাব। কিন্তু সে দুঃখও আমার সুখ হয়ে দেখা দেবে। ধর আমি দেখতে পাচ্ছি, ঈশ্বর বলে কোনো সর্বশক্তিমান নেই। মানুষ ওঁকে সৃষ্টি করেছে নিজেদের স্বার্থে। মানুষের ব্রেন ক্রমশই বিকশিত হচ্ছে···এবং একদিন এমন সময় আসবে, যখন মানুষ তার ব্রেনের সাহায্যে প্রায় ঈশ্বরের মতো শক্তিশালী হয়ে যাবে···অনেকেই এ-কথা ভেবেছেন···প্রকাশ করেছেন···আমি তাকে নতুনভাবে দেখতে পাচ্ছি, আমি এত বড় সত্যটা মনের মধ্যে চেপে রাখতে পারি?

তুমি তো এ-নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছ···মেডিক্যাল জার্নালে। আবার তা নিয়ে তোমাকে বলে বেড়াতে হবে কেন? থাম, সন্ধ্যে দিয়ে আসি···

পশ্চিমাকাশ ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে চলেছে···এবং কিছুক্ষণ পরে ফিঙ্গে রঙের গোল চাঁদ বাঁশগাছের শীর্ষগুলির পাশে উঠে দাঁড়াল·· পরনে তার রাজকীয় ময়ূরকণ্ঠী পোশাক, শিরে চামর দোলাচ্ছে সদ্যধৌত নারকেল গাছের পাতাগুলি। আকাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মিহি সাদা মেঘে ছড়িয়ে পড়ল চন্দ্রোদয়ের ঘোষণা। তারা কমলারঙের টুপি পরেছে আনন্দে।

ডাকতর বাবু···

কে...

বাইরে এসে দেখল তারক, পাঁচু ঠাকুর।

তোমাকে বাবু একবারটি ডেকেছেন গো···

আবার ছেলেটার কিছু হল নাকি, বা অন্য কারুর ?

না গো।

তবে ?

সে আমি বলতে পারনু না···

কে, কে ডাকছে। বলতে বলতে সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বেলে বেরিয়ে আসে পূর্ণা। পাঁচুদা···কী···

বাবু ডাকছেন উনাকে।

না, উনি যাবেন না···বাবুকে এখানে আসতে বলবে।

পূর্ণার কণ্ঠস্বরে রূঢ়তা চাপা রইল না।

ভয়ের কিছু নেই গো···দিদিমণি।

তোমার মনিবকে এখানে আসতে বলে দিও। যাঁর দরকার তিনি আসবেন।

পাঁচু ঠাকুর চলে যেতে তারক সিগারেট ধরিয়ে প্রশ্ন করল, হঠাৎ তুমি অমন খেপে গেলে কেন ?

কারণ আছে।

প্রায় সর্বস্ব দিয়ে তৈরি তারকের ছোটখাট ল্যাবরেটরিতে এবং ল্যাবরেটরি সংলগ্ন ডিসপেন্সারিতে আলো দিল পূর্ণা···ঝকঝকে লণ্ঠন···ভিতর বারান্দায় বাপী ও বুবুকে পড়তে বসাল··বাহির বারান্দায় পায়চারী করতে লাগল তারক···ল্যাবরেটরিতে গেল···জীর্ণ চেয়ারে বসে মেডিক্যাল জার্নালের পাতা ওলটাতে লাগল। চারটি কিস্তি প্রকাশিত হয়েছে···সেইগুলিতে চোখ বুলোতে বুলোতে, কোনো কোনো লাইনের নিচে লাল-পেন্সিল দিয়ে আঁচড় টানতে লাগল···এইগুলি সংশোধন অথবা পরিমার্জন করতে হবে। পঞ্চম কিস্তিতেই প্রবন্ধ শেষ...পঞ্চম কিস্তিটা এতদিন ছাপা হয়ে গেছে...কেন যে সৌজন্য সংখ্যা আসতে দেরী হচ্ছে···। কলাবনের অন্ধকারে জ্যোৎস্নার ঠেলাঠেলি। সেদিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে থুতনি চেপে ধরল তারক। কিছুদিন আগে এক বিজ্ঞানীর উক্তি পাঠ করে, সে নতুন চিন্তা করছে। বিজ্ঞানী বলছেন: আশী কোটি কোষ সম্বলিত মানুষের ব্রেনের পক্ষে সম্ভব এযাবৎ পৃথিবীর সমস্ত মুদ্রিত পুস্তক মুখস্ত করা।

তাহলে গাছপালা নদী সমুদ্র পৃথিবী এমন কি মহাকাশের উপরে কর্তৃত্ব বিস্তারের শক্তি এই ব্রেনের মধ্যে নিহিত থাকা এমন কিছু অসম্ভব নয়। তারক দেখতে পাচ্ছে: ক্রমশই দিগন্তবিস্তৃত বিশাল অনিশ্চিত অনিবার্যতাকে মানুষ

তার করায়ত্ত করতে করতে ঈশ্বরের কাছাকাছি চলে যাচ্ছে। কী প্রচণ্ড শক্তি এই কয়েক ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষুদ্রবস্তু ব্রেনটির। চুড়ির শব্দে তারক পাশ ফিরে তাকাল চেয়ারে বসেই। কিছুক্ষণ আগে তুমি আমাকে রায়চৌধুরীর সঙ্গে আপস করে চলার জন্যে যেন বলতে চেয়েছিলে, অথচ তুমি নিজেই সরাসরি জেহাদ ঘোষণা করে দিলে!

পূর্ণা তার দেহের গন্ধ ছড়িয়ে চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়াল।

ওর সঙ্গে ঝগড়া করে কী লাভ?

পাচু ঠাকুরকে তবে তাড়ালে কেন।

তাড়াইনি তো। মোহিনীদাকে তো আমি আসতেই বলে দিলাম।

ওইভাবে!

আমি বলেছি, মোহিনীদা কিছু মনে করবে না।

তোমার বক্তব্য আমি বুঝতে পারছি না পূর্ণা। কয়েকদিন থেকে তোমাকে আমার নতুন প্রবলেম মনে হচ্ছে।

আমাকে? কই না তো! খিলখিলিয়ে হেসে উঠল পূর্ণা…

যাক সে…তোমাকে রায়চৌধুরী কী বলে গেল?

বলবে আর কী। শাসিয়ে গেল।

শাসিয়ে! কেন! কী বলে শাসালে?

বললে, ওর বিরুদ্ধে কোনো কথা বললে, আমাদের সংসারের শান্তি নষ্ট করে দেবে। পূর্ণার স্বরে নকল বিদ্রূপ।

কী করে?

সে তার হাতে একটি মারাত্মক অস্ত্র আছে! মোহনীয় ভঙ্গিতে হাসতে লাগল পূর্ণা।

কী অস্ত্র।

হঠাৎ পূর্ণার কলহাস্য স্তব্ধ হয়ে গেল। যত সহজে তারককে সে সব কথা খুলে বলবে ভেবেছিল, তত সহজে সে বলতে পারল না। সে ধীরে ধীরে তারকের পেছনে এসে দাঁড়াল এবং চমকিতভাবে তারকের মাথাটা আকর্ষণ করল তার বুকের মধ্যে। তারক মুখ তুলে পূর্ণার চোখের দিকে চেয়ে দেখল পূর্ণার চোখে-মুখে ক্ষিপ্র বিচিত্র বর্ণান্তর খেলা করে চলেছে। বাঁ-হাতে তারক পূর্ণার হাত ধরে টেনে আনল পাশের দিকে। সারাদিনের পরিশ্রমে তার শরীর হালকা বোধ হচ্ছে…সে আজ জীবনের পাকেপাকে বিজড়িত…যতই সে

জীবনের পাকেপাকে নিজেকে জড়িয়ে চলেছে ততই স্পষ্টতরভাবে অমৃতের স্বাদ অনুভব করতে পারছে···আর সে অনুভবের মূলে ক্রমশই পূর্ণার ভূমিকা ব্যাপক পরিসরে ছড়িয়ে পড়ছে·· অমোঘ অপরিহার্য সে ভূমিকা··· তাদের নিত্য দ্বন্দ্ব নিয়ত কলহ···কিন্তু সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহের প্রান্তে তাদের অননুভূত মিল অবিচ্ছিন্ন ঐক্য—পাপ-পবিত্রতা দুঃখ-সুখ ঝঞ্ঝা ও শান্তির—যাবতীয় বিরুদ্ধ সংঘর্ষে তারা দুজনে সহযোগী যোদ্ধা। তারক যা জানে না শেখে পূর্ণার কাছে, পূর্ণার ত্রুটি সংশোধন করে দেয় তারক। আজ হঠাৎ তারক পূর্ণার এমন করুণ অসহায়তা দেখে, বুকে সন্দেহের প্রচণ্ড ধাক্কা খেল, বলল, তুমি ···তুমি কেন চুপ করে গেলে পূর্ণা···আমার যে ভয় করছে।

ধর, তুমি এক নির্মম সত্য জানতে পারলে, তা এককালে সত্য ছিল, আজ মিথ্যে হয়ে গেছে···তা নিয়ে তুমি কী করবে?

হেসে উঠল তারক হো হো শব্দে, সত্য যতই নির্মম হোক, তাকে আমি ভয় করি না। আর, সত্য কখনো মিথ্যে হয় না···তার পরিমার্জনা হয়। মিথ্যা হয়ে যায় না।

ধর, তুমি জানলে, মূলেই মানুষ স্বার্থপর হীন কুটিল তাহলে কী করবে, মানুষের প্রতি তোমার যে অগাধ শ্রদ্ধা তা ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে না?

না। মানুষ স্বার্থপর হীন জটিল, সে তো পদে পদেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তার ভিতরে পরার্থপরতা মহত্ত্ব সরলতার সম্ভাবনা রয়েছে। তাকে টেনে বার করতে হবে··তাকে টেনে বার করতে হবে··তাকে অস্বীকার করি কী ভাবে?

সত্যকে জানতেই হবে? আকুলতায় পূর্ণার চোখে জল এসে গেল।

নিশ্চয়। বিষ এবং অমৃত দুই সত্য। দুটিকেই সমান জানতে হবে। এবং তাদের ব্যবহার করবে মানুষ নিজের ইচ্ছায়।

কী প্রয়োজন আমাদের সব জেনে··মানুষ তো কত কিছু জানে না, আর না-জানার পরিমাণটাই তো বেশি···

তা বলে যা জানি সেটা বাজে হয়ে যেতে পারে না। যা জানি তা দিয়ে না-জানার দুর্গম রাজত্বে বীরের মতো অভিযান চালাব।

জানার পর তুমি দুর্বল হয়ে যেতে পারো তো?

জ্ঞান মানুষকে বীর্যবান করে, দুর্বল করে না কোনোদিন।

ধর, তুমি রায়চৌধুরীদের বাড়ি গেলে আর···

সহসা মাঝখানে পূর্ণার বাক রুদ্ধ হয়ে গেল।

আর, আর কী পূর্ণা ?

উঠে দাঁড়ালো তারক। তার বুকে অচিন্ত্য এক অস্বস্তির সৃষ্টি হলো, আর সেই অস্বস্তিটা ক্রমশই ঝোড়ো মেঘের মতো জ্যোৎস্নাচ্ছাদিত আকাশকে কবর দিতে লাগল, কঠোর স্বরে বলল, কী বলতে চাও…বল স্পষ্ট করে।

পূর্ণার শরীরে কাঁপুনি শুরু হয়েছে…তার কাঁধে হাত দিয়ে টের পেল তারক।

তার আগে একটা কথা বলি…তুমি…মানে তুমি আমার ভালোবাসায় কোনো সন্দেহ কর ?

অর্থাৎ ?

মানে আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি কিনা, এ-নিয়ে কোনোদিন তোমার মনে কোনো প্রশ্ন জাগে ?

হালকা হাসির সঙ্গে তারক বলল, সে তো সর্বদাই জাগে ?

পূর্ণার চোখের ভাব বদলাতে দেখে তারক দ্রুত বলে উঠল, না না গো ·· আমি জানি তুমি আমাকে কত ভালোবাসো।

বিশ্বাসে গাঢ় হয়ে গেল তারকেশ্বর।

তুমি জান, তোমাকে বলেছি, বিয়ের আগে মোহিনীদা আমাকে ভালোবাসত।

সে শুনে শুনে তো কানে কড়া পড়ে গেছে। মোহিনীদা ভালোবাসত, কিন্তু তুমি ভালোবাসতে না।

আমি ভালোবাসতাম কিনা জানি না…

তার মানে একটু একটু কেন যদি পুরোপুরিও ভালবেসে থাক, তাতে কী! তা নিয়ে আজ হঠাৎ এই সুন্দর ঝুলন পূর্ণিমায় সেই পচা অতীতকে টেনে এনে রাত্রিটাকে নষ্ট করছ কেন।

আছে, কারণ আছে, বলছি। রাগ করছ ? তাহলে আর বলব না।

রাগ ? আবার মুক্তভাবে হাসল তারক…না না…বল। তুমি বলে যাও।

মোহিনীদার কাছে প্রায়ই যেতাম…সে-ও এ-বাড়িতে সময়ে-অসময়ে আসত। কম বয়স আমার। ওর কাছে আমি যেন কেমন হয়ে যেতাম। হিপ-নটিজম বলে কিছু আছে কি না জানি না…কিন্তু মনে হতো ও যেন আমাকে সম্মোহিত করতে পারত…আমি যেন ওর হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছিলাম।

ভগবান তোমাকে বাঁচিয়েছে।

বাঁচিয়েছেন কি মেরেছেন জানি না···

আমার হাতে না পড়ে ওর হাতে পড়লে হয়তো তুমি মেরেছেন এ-কথা বলার সুযোগ পেতে না।

আমি তখন কেমন হয়ে যেতাম। আমাকে দিয়ে মোহিনীদা যা ইচ্ছে তাই করিয়ে নিতে পারত···একদিন আমার কাছে খুব খারাপ প্রস্তাব করলে, আমি রাজি কেন যে হলাম···

তারকের বুকের শব্দ গর্জন করে উঠল। সে নিশ্বাস বন্ধ করে পূর্ণার দুই কাঁধে দুই হাত স্থাপন করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখ দুটি জ্বলছে···

না, তুমি বলেছ, সত্য তোমাকে বিচলিত করতে পারে না···সত্য তোমাকে আনন্দিত করে···তোমাকে সত্য শুনতে হবে

তারকের বুকের ভিতর থেকে কে বলে উঠল অতি ক্ষীণ স্বরে, বল···বল···শুনছি···

একটা ছবি তুললে আমার।

নির্বাক পাহাড়ের মতো তারক পূর্ণার চোখের দিকে আর চাইতে পারছে না ···তার দৃষ্টি চেতনা সব যেন ক্রমশই নিভে আসছে···আলোকিত বিশ্ব ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে...

হ্যাঁ···ন্যুড ছবি

তারকের গলা জড়িয়ে অসংখ্য চুম্বন দিতে লাগল পূর্ণা, বলতে লাগল, তুমি আমাকে ঘৃণা করছ না তো? বিশ্বাস কর, ওকে আমি এখন আর ভালোবাসি না। ও কবে আমার মন থেকে মুছে গেছে···তুমি যদি বল, আমি এখুনি ছুটে গিয়ে ওকে খুন করতে পারি···সত্যি বলছি···বিশ্বাস কর···বিশ্বাস কর, সত্যি বলছি···

কাঁদতে লাগল পূর্ণা ··অনেক্ষণ ধরে কাঁদল। তারক স্থির।

ভিতর বারান্দা থেকে বাপী ও বুবুর মারামারি শোনা গেল। কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল বুবু, পাঁচ বছরের মেয়ে। চেঁচাতে লাগল, বাবা বাবা দেখ আমাকে মারছে ··আমি কিছু করিনি বাবা···

নেপথ্যে বাপীর গলার স্বর, আমার ভূগোল বইয়ের পাতা ছিঁড়ে দিয়েছে বাবা···

চোখের জল মুছতে মুছতে চলে গেল পূর্ণা বাপীকে শাসন করতে।

বুবু তারকের জানু জড়িয়ে ধরে কাঁদছে, তলপেটে কচি মুখ ঘষছে বারবার। ওকে কোলে তুলে নিয়ে তারক বুবুর ভেজা গাল নিজের গালে চেপে ধরল কিছুক্ষণ, তারপর কান্না থেমে গেলে ওকে নামিয়ে দিয়ে রাস্তার দিকে পা বাড়াল।

যার সঙ্গে বর্তমানের কোনো সম্পর্ক নেই সেই অতীত কখন কোথায় ভয়ঙ্করভাবে টর্পেডোর মতো বিস্ফোরিত হয়···আবার অতীত কোথাও সমতলে নদীর মতো অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে জনপদ লোকালয় আলিঙ্গন করে ঢেলে দেয় অমৃত-নির্ঝর?

নদীর বাঁধ আমবাগান বাঁশবন পার হয়ে তারক এসে পড়ল ধূ ধূ বালিয়াড়িতে। আকন্দের ঝাড়ে বসল নিজেকে আড়াল করে।

প্রকৃতি তারককে যত সুখ এবং অমৃত দান করেছিল, সে-সব বর্তমানে তার কাছে বড় অপরিচিত ঠেকছে। সে যেন সুখামৃতের সন্ধান কোনোদিন জানত না···কোন্ কোন্ মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ মিশ্রণে সুখামৃতের সৃষ্টি, কী তার ফরমুলা···এই নদী ও চন্দ্রালোকিত বৃক্ষরাজি বালিয়াড়ি সবুজ বলয়ের মতো দিগন্ত নক্ষত্রমণ্ডলী এবং মহাকাশের সন্তান যে মানুষ, সমস্ত কিছুর আস্বাদ গ্রহণের ইন্দ্রিয়াবলীতে যে বিভূষিত, সেই মানুষ যেন বিন্দুর মতো অজানার বিস্ফোরণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। পদে পদে সংখ্যাতীত বাধা-বিপদ জীবাণু-নিয়তি ভয়-দুর্ঘটনা পার হয়ে কোটি কোটি বছরের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা অর্জন করে এসে সমস্ত প্রকার বিরুদ্ধতা চূর্ণ করার সাহস ও শক্তির অধিকারী মানুষ কি একদিন সামান্যতম কারণে প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হবে?

কে গো···ঝুঝকি আঁধারে কে?

পারাপারের এক যাত্রী দেখতে পেয়েছে বেড়াল-নজরে।

শ্মশানের উপর ক্যানে বসে গো?

শ্মশান?

সে কী শ্মশান-মশান হদিশ নেই?

পাঁচু ঠাকুর নাকি?

হ্যাঁ গো চলুন উঠুন ইখ্যানে ক্যানে? দিদিমনির সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়েছে নাকি? তা আজ্ঞে দুখান কাঁসার বাসন পাশাপাশি রইলে ঠোকাঠুকি নাগেই··· চলুন, দিনকাল বড খারাপ আজ্ঞে ··

চল···

তারক বালি ঝেড়ে উঠে পা চালাবার আগেই পাঁচু ঠাকুর দূরের আবছা আলোয় মিলিয়ে গেল···রায়চৌধুরীর ভাঙা রাসমঞ্চে ঘণ্টা বাজছে···ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে কিছু শিশু কিশোরের উচ্চ কণ্ঠ ভেসে আসছে···তারক বাপী ও বুবুর চিন্তা করতে করতে বালির উপর একটার পর একটা গভীর পদচিহ্ন আঁকতে লাগল। ইদানিং সে একটু মোটা হয়ে গেছে।

৪

পরদিন যখন দশটা গ্রামের 'ছোট লোক' সমুদ্রের মতো ক্রোধে উত্তাল হয়ে উঠল, তারা ডাক্তারের খুনের বদলা নেবে, তখন হারু পিওন কাঁধে খাঁকি ঝোলা নিয়ে ফিরে গেল নিজের বাড়ি। আজ এ-অঞ্চলে শোকপালন, সে কী করে ডিউটিতে বেরোয়। হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করা তার ছেলে নিমাই বাবার কাঁধের ঝোলা থেকে বের করে মেডিক্যাল জার্নালটা খুলে পড়তে লাগল। তারকের প্রবন্ধর শেষাংশ প্রকাশিত হয়েছে, যাতে সে বলেছে : ব্রেনের প্রধান বৈশিষ্ট্য, ব্রেন নিত্য নতুন সত্য গ্রহণ করতে এবং সে-সত্যকে নিত্য নতুনভাবে মানবজীবনে নিজ নিজ চিন্তানুযায়ী প্রয়োগ করতে পারে । এইভাবে এক ব্রেণ অন্য ব্রেণকে গর্ভবতী করছে এবং নতুন চিন্তার জন্ম দিচ্ছে। শরীরের নির্দিষ্ট মা বাপ আছে। কিন্তু চিন্তার নির্দিষ্ট মা-বাপ নেই। সে সর্বদাই সংকর। চির সংকর।

ক্যাপিটাল-এর আরেক গ্রন্থকার

আলেকজান্দার ম্যালিশ

নিচে উদ্ধৃত কথাগুলি দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আজ জানা। ১৮৬৭ সালের ১৬ই আগস্ট রাত্রি দুটোর সময় 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষ পৃষ্ঠার প্রুফ দেখা সাঙ্গ করে মার্কস এঙ্গেলসকে চিঠি লিখতে বসলেন। লিখলেন, "অবশেষে প্রথম খণ্ড ছাপার জন্যে তৈরি। আমার পক্ষে এ-কাজ করা যে সম্ভব হলো সে একমাত্র তোমার জন্যেই! আমার কারণে তোমার আত্মত্যাগ ছাড়া তিন খণ্ডের এই বৃহৎ কাজ পুরোপুরি শেষ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হতো। আমার সকৃতজ্ঞ আলিঙ্গন জানাই"।

এইভাবে তাঁর অমর গ্রন্থ রচনায় এঙ্গেলসের অবদানের মূল্যায়ন করেছিলেন মার্কস।

বস্তুত, এই অবদানের মাত্রা অপরিমেয়। মার্কসের জীবদ্দশায় তাঁর প্রতিভার পথ প্রশস্ত করতে এবং 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থ রচনায় এঙ্গেলস সাধ্যমতো সর্বপ্রকার সাহায্যই করেছিলেন। অকাতরে অর্থ-সাহায্য তো করেই ছিলেন. উপরন্তু প্রধান প্রধান তত্ত্বগত সমস্যার সমাধানে পরামর্শ দিয়েও সহায়তা করেছিলেন। অর্থনীতি-শাস্ত্রে এঙ্গেলস ছিলেন সুপণ্ডিত, তাই অর্থনীতির নানা বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্যে মার্কস প্রায়ই বন্ধুর শরণ নিতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতিতে মার্কসের অগ্রণী ভূমিকার কথা স্মরণ রেখেও এঙ্গেলসকে ঐ শাস্ত্রের প্রথম পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে 'রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতি-বিষয়ক বিশ্লেষণ-মূলক সূত্রাবলী' ইতিহাসে বুর্জোয়া সমাজের মৌল অর্থনৈতিক সূত্রগুলির মার্কসবাদী বিশ্লেষণের প্রথম চেষ্টা বলে গণ্য। প্রবন্ধটি তৎকালে মার্কসের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। মার্কস এটিকে জনৈক প্রতিভাবানের সৃষ্টি বলে গণ্য করতেন।

'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের মতো শক্তিশালী বিপ্লবী হাতিয়ার হাতে পাওয়ার জন্যে বিশ্বের নির্বিত্ত জনগণ এঙ্গেলসের কাছে ঋণী। লেনিনও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ধরনে এঙ্গেলসের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এই

বলেন, "বাস্তবিক, 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের এই দুই খণ্ড আসলে মার্কস ও এঙ্গেলস এই দুজন ব্যক্তির যৌথ সৃষ্টিকর্ম"।

'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ মার্কস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পরে তাঁর প্রতিপক্ষীয়রা এই মর্মে দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত গুজব ছড়াতে শুরু করে যে মার্কস নাকি 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড লেখার পর আর অগ্রসর হননি এবং দ্বিতীয় খণ্ড লেখার কথা নাকি "তাঁর মাথাতেই ছিল না"। বিরোধীরা বলতে থাকে, মার্কসের এই দ্বিতীয় খণ্ড বই লেখার ব্যাপারটা তাঁর প্রথম খণ্ডে আলোচিত মূল্য ও উদ্‌বৃত্ত মূল্য বিষয়ক তত্ত্বের সমালোচকদের সঙ্গে বিতর্ক এড়ানোর একটা "কূট কৌশল" ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সবরকম গুজব ও আন্দাজের অবসান ঘটিয়ে এঙ্গেলস স্থির প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করলেন যে লেখক-কৃত 'ক্যাপিটাল'-এর পরবর্তী খণ্ডগুলির পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হতে চলেছে। মৃত বন্ধুর ইচ্ছা-অনুযায়ী এঙ্গেলস আর কাল বিলম্ব না করে উপরোক্ত পাণ্ডুলিপিগুলিকে ছাপাখানায় দেবার উপযোগী করতে ঘসামাজায় লেগে গেলেন।

'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় খণ্ডটিকে ভেঙে দুটি বইয়ের আকারে প্রকাশ করার কথা মার্কস ভেবেছিলেন। একটি বই মূলধনের সঞ্চালন বিষয়ে, এবং অপরটি সমগ্রভাবে মূলধনতান্ত্রিক উৎপাদনের ধরন সম্পর্কে। কিন্তু লেখার মালমশলা হাতে এত জমে যায় এবং বই দুটির আয়তন এত স্ফীত হয়ে ওঠে যে এঙ্গেলস কাজের সুবিধের জন্যে পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ও-দুটিকে পরস্পর নিরপেক্ষ দুটি বই হিসেবে প্রকাশ করতে মনস্থ করেন।

মার্কসের রচনার অসমাপ্ত খসড়াগুলি একত্র করে এঙ্গেলস প্রতিটি বাক্য ধরে ধরে তুলনামূলক বিচার করেন এবং শেষ খসড়ার পরিবর্তনগুলির উপর ভিত্তি করেও যেখানে-যেখানে তা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, সে জায়গাগুলি পূর্ববর্তী পাঠের সাহায্যে পূরণ করে নিয়ে তিনি বইয়ের সর্বশেষ পাঠ প্রস্তুত করেন।

প্রথম খণ্ড 'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় ও তার পরবর্তী সংস্করণগুলির পাঠ-বিন্যাসের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এঙ্গেলস এই বই দুটির বিন্যাসও নির্ধারণ করেন। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, কেবল প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের মতো মার্কস এই দ্বিতীয় খণ্ডটিকেও শুধু বিভিন্ন পরিচ্ছেদ ও ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করেছিলেন, আর এঙ্গেলস মার্কসের প্রতিটি পরিচ্ছেদকে বইয়ের এক-একটি অংশ বা খণ্ডে

পরিণত করে প্রতিটি অংশকে আবার বিষয়বস্তুর দিক থেকে পূর্ণাঙ্গ ও সংহত কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করলেন। এছাড়া বই দুটির প্রতিটি অংশ, পরিচ্ছেদ ও পরিচ্ছেদাংশের মাথায় এঙ্গেলস সুস্পষ্ট ও যথাযথ সব শিরোনাম বসালেন। এ-ব্যাপারে কিছুটা মূল পাণ্ডুলিপিতে মার্কসের দেওয়া শিরোনাম এবং অন্যত্র নিজের বিচার-বিবেচনা তাঁকে সাহায্য করেছিল।

এইভাবে এঙ্গেলসের সম্পাদনায় 'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮৫ সালের জুলাই মাসে প্রথম প্রকাশিত হলো।

তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের প্রস্তুতি

এঙ্গেলস প্রথমে যতটা ভেবেছিলেন তৃতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি ছাপাখানার জন্যে তৈরি করতে গিয়ে দেখলেন জটিলতা ও ঝঞ্ঝাট তার চেয়ে ঢের বেশি। সম্পাদনার এই কাজটি শেষ করতে তাঁর প্রায় দশ বছর লেগেছিল। পল লাফার্গ একটি চিঠিতে এঙ্গেলসের এই অসুবিধের কথা লিখছেন এইভাবে : "উইলিয়মসের (মার্কসের গুপ্ত ছদ্মনাম—লেখক) খুদে-খুদে গোল-গোল হাতের লেখার কথা তো জানেনই। তাঁর খসড়ায় সে-হাতের লেখা আরও অপাঠ্য। সূত্রাকার সংক্ষিপ্ত সব শব্দ পাঠককে বুঝে নিতে হয়, সংশোধন আর সংশোধনের ওপর সংশোধনের কাটাকুটির পাঠোদ্ধারে মাথা ঘামাতে হয়। দু-তিনটে অক্ষর একসঙ্গে জড়ানো এবং একবার লেখা মুছে আবার লেখা। গ্রীক পাণ্ডুলিপি পড়া যত শক্ত, এ-লেখা পড়া তার চেয়ে কিছু কম কঠিন নয়···

"এঙ্গেলসের বয়স এখন উনসত্তর। তিনি আমাকে লিখছেন, ইংরেজি '69 সংখ্যাটিকে যতভাবেই উলটেপালটে সাজাও না কেন তা 69ই থাকবে'··· ভাবতে অবাক লাগে, উইলিয়মসের রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রায় সকল দেশের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে চিঠি-পত্রের আদানপ্রদান তিনি করছেন কিভাবে···এঙ্গেলস সত্যিই একজন বহুভাষা-বিশারদ। তিনি শুধু বহু বিভিন্ন লিখিত ভাষাই জানেন না, আইসল্যাণ্ডিক ভাষার মতো কথ্যবুলি এবং প্রোভেন্স ও কাতালোনিয়া অঞ্চলের প্রাচীন ভাষাও জানেন।···ওঁর ভাষাজ্ঞান ভাসাভাসা নয় মোটেই···এঙ্গেলস এক আশ্চর্য লোক। এমন তরতাজা ও যুক্তির কাছে নমনীয় মন, এমন বিশ্বকোষতুল্য জ্ঞানের পরিধি আর কখনও দেখিনি"।

এঙ্গেলসকে 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয় খণ্ডের যাবতীয় উপাদান নতুন করে

সাজাতে হয়, সমস্ত তথ্যগত উপায় আবার পরীক্ষা করে দেখতে হয় এবং সমস্ত সারণীর হিসাবগুলিও ফিরে-ফিরতি দেখে দিতে হয়। মার্কসের বেশ কিছু অসংলগ্ন ও টুকরো টুকরো মন্তব্য ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে তিনি কয়েকটি পৃথক অনুচ্ছেদ ও এমনকি অধ্যায়ও সঙ্কলিত করেন। এইভাবেই বইটিতে 'পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থায় ঋণ গ্রহণের ভূমিকা' নামে অধ্যায়টির উদ্ভব হয়। মার্কসের পূর্বোক্ত মন্তব্যগুলি ছিল 'মূলধনের স্টক-শেয়ার ধাঁচের বিকাশ' 'মূলধনকে উৎপাদকদের সম্পত্তিতে পুনরায় পরিণত করার পথে' এক প্রয়োজনীয় মধ্যবর্তী স্তর গণ্য করে যে পরিচ্ছেদটি লেখা হয়েছিল তার অংশবিশেষ। মার্কসের ঐ রচনার পরে উপরোক্ত যুগটির অবসান ঘটে। এঙ্গেলসের সামান্যীকরণসূচক সূত্রগুলিও ওই বিশেষ যুগের পক্ষে প্রযোজ্য ছিল। এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সিদ্ধান্তটি এই, "প্রতিযোগিতার স্থান গ্রহণ করেছে একচেটিয়া পুঁজি এবং ভবিষ্যতে সমগ্র সমাজ, সমগ্র জাতির পক্ষে সম্পত্তি অধিকারের পরম আনন্দদায়ক পথটি পরিষ্কার হচ্ছে"।

মার্কসের পাণ্ডুলিপিতে ছিল কেবলমাত্র বইয়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদের শিরোনামটি 'মুনাফার হারের উপর মোট লগ্নী টাকার প্রভাবের ফলাফল' এইরকম একটা ইঙ্গিত যে বইয়ের শেষের দিকে তিনি যেন উক্ত সমস্যার অন্তঃসারটি উপস্থাপিত করতে যাচ্ছেন। কিন্তু তার সময় পেলেন না তিনি। এঙ্গেলসকেই এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি পুরো লিখতে হয়। এ-পরিচ্ছেদে পরিবর্ধিত পুনরোৎপাদনের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম উদ্ভাবিত ও লিপিবদ্ধ রয়েছে। "মুনাফার হার ও উদ্বৃত্ত মূল্যের হারের পারস্পরিক সম্পর্ক" শীর্ষক তৃতীয় পরিচ্ছেদের পাঠ্যাংশে পূর্বোক্ত চতুর্থ পরিচ্ছেদের মতো এঙ্গেলসের সম্পাদনার কলম চলতে ও তাঁর নামের আদ্য অক্ষরের প্রাদুর্ভাব ঘটতে দেখা যায় না। তৎসত্ত্বেও, এই পরিচ্ছেদটিও প্রধানত এঙ্গেলসের লেখা।

এঙ্গেলস 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয় খণ্ডের জন্য এক বিস্তারিত ভূমিকা লিখলেন এবং বইটিকে ছাপাখানায় দেয়ার উপযোগী করে তুললেন। ওই মুখবন্ধে তিনি মূল পাণ্ডুলিপির অবস্থা এবং পাণ্ডুলিপিটি অবলম্বনে তাঁর সম্পাদনার কাজের বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া মুখবন্ধে এঙ্গেলস মূল্যমানের বিধিবদ্ধ নিয়মের ভিত্তিতে কীভাবে একই ধরনের মুনাফার হার নির্ধারিত হতে পারে এবং তা হয়েও থাকে এই সমস্যা সমাধানের কিছু কিছু উপায়ের গুণাগুণ

বিশ্লেষণ করে দেখান। 'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পর অধ্যাপক ভি. লেকসিস. ডঃ সি. স্মিডট এবং পি. ফায়ারম্যান উপরোক্ত উপায় আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। এঙ্গেলস দেখান, এঁদের কারো প্রচেষ্টাই সফল হয়নি।

প্রসঙ্গত এঙ্গেলস মূল্যমানের বিধিবদ্ধ নিয়মের ভূমিকা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিশেষ উল্লেখ্য বক্তব্যটি সূত্রাকারে উপস্থাপিত করেন: "...মূল্যমানের বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রথম থেকেই পুঁজিবাদী চিন্তা পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত এই ধারণাটির বিরোধী যে অতীতের পুঞ্জীভূত শ্রম, পুঁজিও যার অন্তর্ভুক্ত, তা উৎপাদিত তৈরি মূল্যের নিছক একটা মুদ্রার অঙ্ক মাত্র নয়, বরং তা নিজেই মূল্য উৎপাদন করছে এবং ফলে নিজস্ব মূল্য ছাড়াও তা আরও বেশি মূল্যের আকর। এই ধারণার বিরুদ্ধে মূল্যমানের নিয়ম এই সত্যটিকেই প্রতিষ্ঠা করছে যে বর্তমানের জীবন্ত শ্রমই একমাত্র উপরোক্ত ক্ষমতার অধিকারী।"

মার্কস "যেখানে কেবল অনুসন্ধানের কাজ চালান সেখানেও সংজ্ঞা বেঁধে দিতে চাই" বলে যে অভিযোগ উঠেছিল উল্লিখিত ভূমিকায় এঙ্গেলস তাকে খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, মার্কস কখনও অনড়, ইচ্ছেমতো বানানো এবং চিরকাল প্রয়োগ করা চলতে পারে এমন কোনো সংজ্ঞা নির্দেশ করেননি। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত প্রধান পদ্ধতিগত নীতিটি বিবৃত করেন: "যেখানে বস্তুসমূহ ও তাদের পরস্পর-সম্পর্ককে অনড় বিবেচনা না করে পরিবর্তনশীল বলে গণ্য করা হয়, সেখানে তাদের মানসিক প্রতিচিত্রণ, বোধ ও ধারণা যে একইরকমভাবে পরিবর্তন ও রূপান্তরের বশবর্তী হবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ। আর এই ধারণা ইত্যাদিকে তাই অনড় অটল সংজ্ঞার খোলসে আবদ্ধ করা হয়নি, বরং তাদের নিজ ঐতিহাসিক ও যুক্তিসিদ্ধ গঠনের পদ্ধতিতেই বিকশিত করে তোলা হয়েছে"।

মুখবন্ধের শেষাংশে মার্কসবাদের—মার্কস-উদ্‌ভাবিত ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা ও অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সমালোচকদের যুক্তি-তর্কের অশোভন কলাকৌশলের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন এঙ্গেলস। অবশ্য এ-সব সত্ত্বেও, 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু মার্কস রচিত রাজনীতি-সংক্রান্ত অর্থনীতির সৌধ ধূলিসাৎ করার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত আজগুবি সব আক্রমণের অবসান ঘটল না। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্ ও তাদের পোঁ-ধরা ব্যক্তিরা 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে কাল্পনিক পরস্পর বিরোধী বক্তব্য আবিষ্কার করে ফেলল। তারা বলল, প্রথম খণ্ডে যুক্তি-তর্ক দিয়ে

সাজাতে হয়, সমস্ত তথ্যগত উপায় আবার পরীক্ষা করে দেখতে হয় এবং সমস্ত সারণীর হিসাবগুলিও ফিরে-ফিরতি দেখে দিতে হয়। মার্কসের বেশ কিছু অসংলগ্ন ও টুকরো টুকরো মন্তব্য ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে তিনি কয়েকটি পৃথক অনুচ্ছেদ ও এমনকি অধ্যায়ও সঙ্কলিত করেন। এইভাবেই বইটিতে 'পুঁজিবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থায় ঋণ গ্রহণের ভূমিকা' নামে অধ্যায়টির উদ্ভব হয়। মার্কসের পূর্বোক্ত মন্তব্যগুলি ছিল 'মূলধনের স্টক-শেয়ার ধাঁচের বিকাশ' 'মূলধনকে উৎপাদকদের সম্পত্তিতে পুনরায় পরিণত করার পথে' এক প্রয়োজনীয় মধ্যবর্তী স্তর গণ্য করে যে পরিচ্ছেদটি লেখা হয়েছিল তার অংশবিশেষ। মার্কসের ঐ রচনার পরে উপরোক্ত যুগটির অবসান ঘটে। এঙ্গেলসের সামান্যীকরণসূচক সূত্রগুলিও ওই বিশেষ যুগের পক্ষে প্রযোজ্য ছিল। এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সিদ্ধান্তটি এই, "প্রতিযোগিতার স্থান গ্রহণ করেছে একচেটিয়া পুঁজি এবং ভবিষ্যতে সমগ্র সমাজ, সমগ্র জাতির পক্ষে সম্পত্তি অধিকারের পরম আনন্দ-দায়ক পথটি পরিষ্কার হচ্ছে"।

মার্কসের পাণ্ডুলিপিতে ছিল কেবলমাত্র বইয়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদের শিরোনামটি 'মুনাফার হারের উপর মোট লগ্নী টাকার প্রভাবের ফলাফল' এইরকম একটা ইঙ্গিত যে বইয়ের শেষের দিকে তিনি যেন উক্ত সমস্যার অন্তঃসারটি উপস্থাপিত করতে যাচ্ছেন। কিন্তু তার সময় পেলেন না তিনি। এঙ্গেলসকেই এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি পুরো লিখতে হয়। এ-পরিচ্ছেদে পরিবর্ধিত পুনরোৎপাদনের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম উদ্ভাবিত ও লিপিবদ্ধ রয়েছে। "মুনাফার হার ও উদ্বৃত্ত মূল্যের হারের পারস্পরিক সম্পর্ক" শীর্ষক তৃতীয় পরিচ্ছেদের পাঠ্যাংশে পূর্বোক্ত চতুর্থ পরিচ্ছেদের মতো এঙ্গেলসের সম্পাদনার কলম চলতে ও তাঁর নামের আদ্য অক্ষরের প্রাদুর্ভাব ঘটতে দেখা যায় না। তৎসত্ত্বেও, এই পরিচ্ছেদটিও প্রধানত এঙ্গেলসের লেখা।

এঙ্গেলস 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয় খণ্ডের জন্য এক বিস্তারিত ভূমিকা লিখলেন এবং বইটিকে ছাপাখানায় দেয়ার উপযোগী করে তুললেন। ওই মুখবন্ধে তিনি মূল পাণ্ডুলিপির অবস্থা এবং পাণ্ডুলিপিটি অবলম্বনে তাঁর সম্পাদনার কাজের বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া মুখবন্ধে এঙ্গেলস মূল্যমানের বিধিবদ্ধ নিয়মের ভিত্তিতে কীভাবে একই ধরনের মুনাফার হার নির্ধারিত হতে পারে এবং তা হয়েও থাকে এই সমস্যা সমাধানের কিছু কিছু উপায়ের গুণাগুণ

বিশ্লেষণ করে দেখান। 'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পর অধ্যাপক ভি. লেকসিস, ডঃ সি. স্মিডট এবং পি. ফায়ারম্যান উপরোক্ত উপায় আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। এঙ্গেলস দেখান, এঁদের কারো প্রচেষ্টাই সফল হয়নি।

প্রসঙ্গত এঙ্গেলস মূল্যমানের বিধিবদ্ধ নিয়মের ভূমিকা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিশেষ উল্লেখ্য বক্তব্যটি সূত্রাকারে উপস্থাপিত করেন: "···মূল্যমানের বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রথম থেকেই পুঁজিবাদী চিন্তা পদ্ধতি থেকে উদ্ভূত এই ধারণাটির বিরোধী যে অতীতের পুঞ্জীভূত শ্রম, পুঁজিও যার অন্তর্ভুক্ত, তা উৎপাদিত তৈরি মূল্যের নিছক একটা মুদ্রার অঙ্ক মাত্র নয়, বরং তা নিজেই মূল্য উৎপাদন করছে এবং ফলে নিজস্ব মূল্য ছাড়াও তা আরও বেশি মূল্যের আকর। এই ধারণার বিরুদ্ধে মূল্যমানের নিয়ম এই সত্যটিকেই প্রতিষ্ঠা করছে যে বর্তমানের জীবন্ত শ্রমই একমাত্র উপরোক্ত ক্ষমতার অধিকারী।"

মার্কস "যেখানে কেবল অনুসন্ধানের কাজ চালান সেখানেও সংজ্ঞা বেঁধে দিতে চাই" বলে যে অভিযোগ উঠেছিল উল্লিখিত ভূমিকায় এঙ্গেলস তাকে খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, মার্কস কখনও অনড়, ইচ্ছেমতো বানানো এবং চিরকাল প্রয়োগ করা চলতে পারে এমন কোনো সংজ্ঞা নির্দেশ করেননি। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত প্রধান পদ্ধতিগত নীতিটি বিবৃত করেন: "যেখানে বস্তুসমূহ ও তাদের পরস্পর-সম্পর্ককে অনড় বিবেচনা না করে পরিবর্তনশীল বলে গণ্য করা হয়, সেখানে তাদের মানসিক প্রতিচিত্রণ, বোধ ও ধারণা যে একইরকমভাবে পরিবর্তন ও রূপান্তরের বশবর্তী হবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ। আর এই ধারণা ইত্যাদিকে তাই অনড় অটল সংজ্ঞার খোলসে আবদ্ধ করা হয়নি, বরং তাদের নিজ ঐতিহাসিক ও যুক্তিসিদ্ধ গঠনের পদ্ধতিতেই বিকশিত করে তোলা হয়েছে"।

মুখবন্ধের শেষাংশে মার্কসবাদের—মার্কস-উদ্ভাবিত ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা ও অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সমালোচকদের যুক্তি-তর্কের অশোভন কলাকৌশলের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন এঙ্গেলস। অবশ্য এ-সব সত্ত্বেও, 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু মার্কস রচিত রাজনীতি-সংক্রান্ত অর্থনীতির সৌধ ধূলিসাৎ করার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত আজগুবি সব আক্রমণের অবসান ঘটল না। বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্ ও তাদের পোঁ-ধরা ব্যক্তিরা 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে কাল্পনিক পরস্পর বিরোধী বক্তব্য আবিষ্কার করে ফেলল। তারা বলল, প্রথম খণ্ডে যুক্তি-তর্ক দিয়ে

বোঝানো হয়েছে যে পণ্যদ্রব্য তাদের মূল্য অনুযায়ী বিকোয়, আর তৃতীয় খণ্ডে বলা হলো পণ্যদ্রব্য বিক্রি হয় তাদের মূল্য অনুযায়ী নয়, তাদের উৎপাদনের খরচ ও গড়পড়তা মুনাফা হিসেবের মধ্যে ধরে যে উৎপাদনের দাম নির্ধারিত হয় সেই দামে। এই তথাকথিত 'সমালোচকদের' অন্যতম এ. লোরিয়া মূল্য সম্বন্ধে মার্কসবাদী মতকে সর্বদাই অদ্ভুত, অর্থহীন, ধোঁকাবাজি বলে অভিহিত করত।

শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও মার্কসের তত্ত্বকে আরও একবার ব্যাখ্যা করার জন্যে এঙ্গেলসকে আবার কলম ধরতে হলো। উদ্দেশ্য, "১৮৬৫ সালে লেখা রচনা যাতে ১৮৯৫ সালের অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় তার জন্যে মূল রচনায় যে-সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকের উপর যথেষ্ট জোর পড়েনি সেই দিকগুলিকে চোখের সামনে তুলে ধরা এবং রচনায় কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ঘটানো"। ১৮৯৫ সালের মে-জুন মাসে তিনি 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয় খণ্ডের প্রস্তাবিত দুটি অনুপূরক অংশের প্রথমটি, 'মূল্যমানের বিধিবদ্ধ নিয়ম ও মুনাফার হার' নামের প্রবন্ধটি লেখেন। এতে প্রথম কয়েক পৃষ্ঠায় লোরিয়াকে "স্থূল রাজনীতি-সংক্রান্ত অর্থনীতির এক হাস্যকর জীব" প্রতিপন্ন করে এবং ঔদ্ধত্য ও অজ্ঞতার জন্যে তাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে এঙ্গেলস মূল্যমানের নিয়ম-সম্পর্কিত যে-সমস্ত দিক বোঝা বিশেষ দুরূহ তাদের ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করেন। এই প্রবন্ধটি এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পত্রিকা 'ডাই নিউ জাইত'-এ প্রকাশিত হয়।

এঙ্গেলসের মতে, 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয় খণ্ডের মূল পাণ্ডুলিপি তৈরি হওয়ার তিন দশকের মধ্যে স্টক-এক্সচেঞ্জ পুঁজিবাদী উৎপাদনের সবচেয়ে উল্লেখ্য প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে উঠতে থাকে। এঙ্গেলস ভেবেছিলেন, 'স্টক-এক্সচেঞ্জ' নামে তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অনুপূরক প্রবন্ধটিতে তিনি স্টক-এক্সচেঞ্জের পরিবর্তিত ভূমিকা, শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে শেয়ার স্টকের কর্মতৎপরতার ক্রমবিকাশ, কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিজ্ঞানগত পরিবর্তন ও কৃষিতে ব্যাঙ্ক ও স্টক এক্সচেঞ্জের বৃহত্তর ভূমিকা, শেয়ারের আকারে পুঁজির রপ্তানি, এবং একই স্টক এক্সচেঞ্জের সুবিধার্থে উপনিবেশগুলিকে ইয়োরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে বণ্টন, প্রভৃতি বিষয় ব্যাখ্যা করবেন। পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিতে যেসব নিগূঢ় ক্রিয়াকর্ম চলে তারই অন্যতম সূচক এই স্টক-এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠান। এঙ্গেলস একে বৃহৎ পুঁজির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্যের সঙ্গে এক করে দেখতেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, তিনি 'ক্যাপিটাল'-এর তৃতীয় খণ্ডের এই অনুপূরক অংশটির একটি বিস্তারিত খসড়া-পরিকল্পনামাত্র ছকে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গভীর অনুধ্যান

পুঁজিবাদ বিকাশের উচ্চতম পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার সময় পর্যন্ত এঙ্গেলস জীবিত ছিলেন না। এ-কারণে, স্বাভাবিকভাবেই, তাঁর পক্ষে ওই পর্যায়ের বহুমুখী তত্ত্বগত বিশ্লেষণ উপস্থিত করা সম্ভব ছিল না। তৎসত্ত্বেও অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়মগুলি সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুধ্যান, বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বহুমুখ জ্ঞান এবং প্রতিভার ফলস্বরূপ তাঁর দূরদৃষ্টি জায়মান নতুন যুগের কতগুলি মূল বৈশিষ্ট্য ধরতে সক্ষম হয়েছিল। ট্রাস্টগুলির একেক ধরনের সমস্ত শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানের উপর একচেটিয়া আধিপত্য সম্পর্কে এঙ্গেলসের মতের উদ্ধৃতি দিয়ে এবং "ব্যক্তিগত উৎপাদনই যে কেবল বন্ধ হচ্ছে তাই নয়, পরিকল্পনার অভাবেরও অবসান ঘটছে" তাঁর এই কথাগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে লেনিন লিখেছেন: "পুঁজিবাদের আধুনিকতম পর্যায় বা সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তত্ত্বগত মূল্যায়নের একেবারে অন্তঃসারটুকু তাঁর লেখায় আমরা পাচ্ছি। আর তা হলো, এই পর্যায়ে পুঁজিবাদ **একচেটিয়া পুঁজিবাদে** পরিণত হয়"। লেনিনের মতে, অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সম্পর্কে এঙ্গেলসের এই "অত্যন্ত মূল্যবান উক্তি" "কতখানি মনোযোগ ও ভাবনা নিয়ে আধুনিক পুঁজিবাদের নানা পরিবর্তনকে যে তিনি লক্ষ করেছিলেন এবং এ-কারণে এই বর্তমান, সাম্রাজ্যবাদী যুগে আমাদের করণীয় কি আগে থেকে তাও কিছু পরিমাণে নির্দেশ করতে যে সক্ষম হয়েছিলেন" তার প্রমাণ।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পরবর্তী বিকাশ, পুঁজিবাদের নতুন নতুন রীতিপদ্ধতি, একচেটিয়া পুঁজি ও বুর্জোয়া রাষ্ট্র কর্তৃক বহুতর উৎপাদনের উপায়ের সামাজিকী-করণ এবং সর্বপ্রকার পুঁজিবাদী দমনপীড়নের ও প্রতিক্রিয়ার প্রচণ্ডতাবৃদ্ধিকে এঙ্গেলস সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতির, সমাজতন্ত্রের বস্তুগত সূচনা সৃষ্টির বিষয়মুখ ভিত্তি বলে গণ্য করেছিলেন।

'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের সম্পাদনা-সম্পর্কিত কাজ এঙ্গেলসকে একজন বিরাট অর্থনীতিবিদ, দ্বান্দ্বিক তত্ত্ববিদ ও শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে এবং প্রমাণ করেছে যে মার্কসীয় রাজনীতি-সংক্রান্ত অর্থনীতি এমন একটি সদা-বিকাশমান বিজ্ঞান যার তাত্ত্বিক সূত্রগুলি বিষয়মুখ অর্থনৈতিক বাস্তবতার মর্মবস্তুর সর্বপ্রকার ধরন ও গতিশীলতাকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করতে সমর্থ।

লেনিন লিখেছেন, "...'ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করে এঙ্গেলস সেই মহৎ প্রতিভা, যিনি তাঁর বন্ধু ছিলেন, তাঁর এক মহিমময় স্মরণস্তম্ভ রচনা করলেন এবং সেই স্মরণস্তম্ভে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীয় নামটি চিরকালের মতো খোদাই করে রাখলেন"।

মায়ের মুখের পুণ্য

সিদ্ধেশ্বর সেন

শিলাইদহের কুঠি, পদ্মায়
বজরায়
ভেসে-চলা ছবি

গল্পগুচ্ছের গুণ
বাঙালির
স্বভাব-আঙিনায়

মানেনিক' ভেদ, সীমা ধুলোবালির, কিম্বা
কোনো ত্রুটি

তাই কি আগুন
হ'য়ে ফের, উনিশ শো পাঁচের, অম্লান
ভ্রূকুটি—ঘেরায় ঘূর্ণী

তোলে প্রাণ
জাতিসত্তা
ভাঙবার আয়োজন ভেঙে, ক'রে চূর্ণ,—সেদিনের
কুটিল কার্জনী

তখনই তো পথে পথে কলকাতায়
হাতে নিয়ে রাখী
স্বদেশাত্মা
হেঁটে যান আমাদের কবি

শতকের এইদিকে প্রতিধ্বনি
বাঁধভাঙা গর্জনই, আবার
ঢাকায়

জয়দেবপুরে গুলি, স্মৃতির সম্বলই নয়, শুধু, শহীদ
ফেব্রুয়ারি

রক্তঋণ
আবাঙলা শুধছে—
তবে এতোদিন

জাগরণে আজ তারই, রাঙারাখী
দু'হাতে পরাতে আসে
পলি-জমা, মজা, বুঝি হুগলীর
বানের উচ্ছাসে
একী রমনার আশা

বাঙলার জল-মাটি
পুণ্য

আমাদের সকলের মুখে মুখে খাঁটি, এই সবার গানের
সংহত-সচল

প্রাণ-পাওয়া, প্রাণ-দেওয়া
বাঙলাদেশ, অমোঘ, অশেষ
মায়ের মুখের পুণ্য—
ভাষা ॥

জলবন্দী

শিবশম্ভু পাল

ভেসে যাচ্ছে সাজানো বাগান
অন্ত্যজ কচুরিপানা, গৃহস্থালী, হতভম্ব মাছের সমাজ
ভেসে যাচ্ছে দেবালয়, অসহায় বিমর্ষ নমাজ
স্রোতে কিম্বা খরস্রোতে ভেসে যাচ্ছে বর্তমান, আহা, বর্তমান।

যেন রবাহূত, যেন অনাহূত ভবিতব্য বসে আছে ভিতর দুয়ারে
চিনেও চিনিনা, শুধু জানলার পর্দা কিনি, দেখেছি দুজন
নৃত্যনাট্যগীতিময় রবীন্দ্রসদন ;
প্লাবন তখনও সূচিভেদ্য অন্ধকারে

নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে পড়ে থাকে প্রচ্ছন্ন মাটিতে
আমার আজন্ম সহচর,
বাসুকীর মতো শুধু মাঝেমধ্যে নড়ে ওঠে, ভেসে যায় সাজানো নগর
দৃশ্যমান বিপর্যয়ে আত্মপরিচয়টুকু দিতে···

ফেটে পড়ে অবহেলা বেপরোয়া অজয় নদীতে ॥

সঙ্গ নিঃসঙ্গতার দিনলিপি

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

এ কোন জন্ম পেয়েছি
কোন জন্ম চেয়েছিলাম
কোন জন্ম
পেয়েছি তোমারই আনন্দে হে পিতা ! ক্ষণ মুহূর্তের ঐশ্বরিক যাদুকর
পতনশীল সত্তা এই দাহ্য সত্তা তোমারই মরণোত্তর সান্ত্বনা হতে পারে
হতে পারে স্রষ্টার নির্বিকল্প সাধনা
আর আমি বহন করে চলেছি তোমারই বৃষকাষ্ঠ মৃত্যুর আগেই এইভাবে

এইতো জন্ম পেয়েছি
বদ্ধ জলায় সন্তরণ মোহনা নেই যে নদীর যে নদী আদৌ নাব্য নয়
ভাসাই নৌকো তারই আবর্তে তারই অবিরল ঘূর্ণিতে এই আবর্তন
পরিণামহীন এই আবর্তন

জন্ম চেয়েছিলাম চৈতন্যে প্রতিফলিত স্বর্ণ অনেকান্ত প্রয়াস ও প্রজননক্ষম
জ্ঞানময় পুরুষ নিখিলে মেলে দেবে প্রজ্ঞাখচিত চন্দ্রাতপ এক দিগবিজয়ী
সংবেদন আত্মায় প্রোথিত এক বৃক্ষ অনন্তমূল নিরন্তর আত্মদানে
নির্ভার এক মহান বোধিবৃক্ষ
চেয়েছিলাম শব্দ ফিরে পাক চাবি সেই যাদুকরী চাবি যা হারিয়েছে
দীর্ঘ ইতিহাসে অন্ধকার নির্বাক প্রার্থনায় খুলে দেবে ত্রাতা এক নিহিত
বোধ নিহিত দুঃখ স্বচ্ছ একটি ত্রিকোণকাচ প্রতিফলিত হয় সেখানে
বহুকৌণিক পরিচয় আত্মপ্রতিকৃতির সঠিক ও সম্ভাব্য পরিচয়

ফুলের রং আরো উষ্ণবেদনায় গাঢ় হয়ে উঠবে চরিতার্থ জীবন যেন পরিচয়ের
আনন্দে আরো গাঢ় স্পন্দিত কোনো উৎসব যেন
আর আকাশ
ক্রমশ নীল রক্ত ঝরে যাওয়া মুমূর্ষু আকাশ
স্বপ্ন আর সান্ত্বনা ফিরিয়ে দিতে নীল হয়ে ছড়িয়ে পড়বে আকাশে
আরো নীলরক্ত স্পন্দিত হবে অনবয়ব শরীরে
পতন আরো পতনশীল দাহ্য আত্মাগুলি আরো স্বপ্ন আর সান্ত্বনার জন্যে
প্রিয়তম শরীর মেলে দেবে স্বর্ণখচিত পাত্র যেন

সময় থেকে মহাসময়ের দিকে চলমান এই মানুষ এই খঞ্জ শীর্ণ মানুষ এই আমি
কেন জন্ম চেয়েছিল জানার আগেই
কোন জন্ম পেয়েছে জানার আগেই
চলে যায় প্রত্নপৃথিবীর দিকে নিমজ্জমান শিশুর মতোই নিষ্ফল আশ্রয় খুঁজে
মানুষে　　ঈশ্বরে

পেয়েছি এই দেহ প্রাণবহনযোগ্য অক্ষম এই দেহ তোমারই দানে
হে পিতৃত্বলোভি সকরুণ অহংকার।
অনিচ্ছুক ভারবাহক এই স্পন্দমান দেহ
বহন করছে অস্তিত্ব এক পাথর এক প্রত্নশিলালেখ

যার কোনো অর্থ না জেনেই সাড়া দিতে হয় বহন করতে হয় আমরণ
পার নেই জেনেও বৈঠা ফেলা
সার নেই জেনেও বীজ ছড়িয়ে যাওয়া
কোন অলক্ষ্য প্রভুর কুটিল ইঙ্গিতে এই প্রাণধারণ এই প্রাণবহন

নিজের জন্য কিছু নয়
শুধু তারই জন্যে!
শুধু তারই জন্যে!

তিনটি কবিতা

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

তুমি আসছ বহুদূর থেকে,
তুমি আসছ, আসবেই জানতাম।
কতদিন পথ চেয়ে আছি, রোদে জলে পুবালি হাওয়ায়।
আমি তো পারিনি আজো যুদ্ধে জয়ী হতে।
আমাকে তোমার সঙ্গে নাও।

২

এখন সময় জানো ? কত রাত ?
সময়েরও অতিরিক্ত নক্ষত্র প্রহরে
কেবল তরঙ্গ গুণছি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে অন্তহীন রাত্রির সময়।
তবু তুমি হেসে ওঠ স্রোতের গভীরে।
আমি তীরে রেখে যাই আত্মপরিচয়।

৩

জানি ভোরে কেউ আসবে,
ফসলের শিস দেখতে নদীর কিনারে।
নরম আলোয় কেউ শিখে নেবে বিশ্বাসের পাঠ।
আমি শুধু রেখে গেছি, ভালোবাসা রেখে যাবো
ভোরের শিশিরে।
তবু দরজা বন্ধ দেখলে, খুলে দিও সমস্ত কপাট।

নতজানু প্রার্থনায় শব্দময়

বঙ্কিম মাহাত

আর কোনো আক্রোশ কি অভিমান নয়
উত্তর তিরিশ কাল বড়ো দুঃসময়
কবিতার জন্য অতঃপর
শালীন শব্দের মতো বাজুক নিজের কণ্ঠস্বর

দর্পণে বিম্বিত হোক নিজের পুরনো মুখ নয়
বরং শব্দের মালা শব্দে শব্দে চিত্র শব্দময়
কবিতা আক্রোশে নয় অভিমানে নয়
কান্নায় বা হতাশায় নয়
কবিতা বাঙ্ময় হয় ক্ষমায়, সুন্দর হয় ক্ষমা প্রার্থনায়
বাঙ্ময় সুন্দর হয় নতজানু নম্র প্রতিমায়।

রক্তে কবিতার রঙ মিশে গেছে কবে
চেতনায় ঢেউ ওঠে কবিতার তুমুল উৎসবে
প্রেম ভালোবাসা সব কবিতায় গাঁথা
জীবন কবিতা কিংবা কবিতা জীবন
যেন সবুজে বনস্থলী পাতা
তাহলে আক্রোশ নয় অভিমান কান্না কিংবা হতাশাও নয়
নতজানু প্রার্থনায় শব্দে চিত্রে কবিতায়
এসো হই কবিতা ও চিত্র শব্দময়॥

পরস্পরের কাছে আমরা

দুলাল ঘোষ

প্রত্যেকের অস্তিত্বে কিছুনা কিছু বিষাক্ত রক্ত
দুঃখ ও সুখের ভাঙা দোলনা ব্রীজ
পাকাপোক্ত কিছু একটা বিকল্প করতে গেলেই
অসম্ভব কাঙাল হয়ে পড়ে…

প্রত্যেকের চেতনায় ছোট না হয় বড়, যে কোন
হিলহিলে সরীসৃপ
মন ভোমরার সন্ধান দিয়ে
হতভম্ব পৃথিবীর মুখ, বাঁয়ে আরো বাঁয়ে ঘোরালেই
ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে…

অর্থাৎ শহরতলি কিংবা দূরপাল্লার একান্ত নির্ভরশীল
সমস্ত সহযাত্রী
আমরা পরস্পরের কাছে ভীষণ কুৎসিত—।

জনৈক সৈনিকের প্রতি

অনন্ত রায়

তোমার স্বপ্নালু ঐ হৃদয়ের
ব্রাউন রঙের পেলমেট থেকে
রক্তাভ পর্দাটা খুলে নিয়ে
বেঁধে নাও তোমার লোহার হেলমেটে
হে সৈনিক!
তারপর আকণ্ঠ প্রচণ্ড এই জীবনের
বিষ বুকে নিয়ে
নীলকণ্ঠ হয়ে
ছড়াও অমৃত এই পৃথিবীর
প্রতি ঘরে ঘরে।

তোমরা যেখান থেকে

বীতশোক ভট্টাচার্য

ছেঁড়া-কাগজের ঝুড়ি একদিকে—'তুমিও রক্ষণশীল দলে আছো,'—
ব'লে দ্রুতপদে পথে নেমে যেতে হয়; 'আর, বন্ধু, তুমিও…
বলতে গেলে পথ পেরিয়ে চলে যায় ধার্মিক কুকুর!
ও বুঝি একান্ত যাবে তোমাদের খেলার প্রান্তরে?
ও ঝুড়ি কী শেষ অবধি নুয়ে যাবে তোমাদের কমলাবাগানে?
তোমরা যেখান থেকে কোলে-পিঠে শিশু নিয়ে আসো?
ধারণার মধ্যে আছে ডিম ও উলের বল, ও পাপ, ও খেলাচ্ছল,
তোমরা এমন পথে পা দিয়ো না—মাতার ভিতরে বহু মাতাহারি আছে
'তুমিও, তুমিও' ব'লে তাদের নাছোড় গান ছুটে যায় পথ থেকে পথে।

ভূমিরাজস্ব বিষয়ে কিছু চিন্তা

হরশঙ্কর ভট্টাচার্য

১৯৬৭ সালের শুরু থেকে ভারতের কয়েকটি রাজ্যসরকার ভূমিরাজস্ব সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিমাণে তুলে দিয়েছেন। কয়েকটি রাজ্যসরকার এ-বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছেন। পশ্চিমবাঙলায় প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার তার কর্মসূচীতে এ-বিষয়ে লিখেছিলেন: "৫। (খ) তিন একর পর্যন্ত জমির মালিকদের ভূমিরাজস্ব তুলে দেওয়া"। ঐ সময় কংগ্রেস বা অপর কোনো দল কোনো কর্মসূচি দেয়নি, তাই তাদের কথা এ-ধরণের ঘোষিত কর্মসূচির বাইরে অপ্রকাশ্য রয়ে গেছে।

একদিকে রাজনৈতিক দলগুলি এ-বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করছেন, অপরদিকে ভারতের অর্থনীতিবিদগণ, পরিকল্পনা রচয়িতাগণ সবাই একযোগে কৃষিক্ষেত্র থেকে আরও বেশি টাকা তোলার প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনার উপর জোর দিয়ে চলেছেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনার সময়ে পরিকল্পনা কমিশনের দূর-প্রসার বিভাগ (Perspective Division of the Planning Commission) দুটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছিলেন: একটি হলো, ভূমি-রাজস্বের উপর অতিরিক্ত আদায় বা সারচার্জ এবং তা ক্রমবর্ধমান হারে (progressive rate) আরোপ করা, ও দ্বিতীয়টি হলো বাণিজ্যিক শস্য (চা, পাট, তুলা, ইক্ষু প্রভৃতি) উৎপাদনের অঞ্চলের ভূমিরাজস্বের উপর অতিরিক্ত আদায় (surcharge)। অনেকে আবার বর্তমানের ভূমিরাজস্ব তুলে দিয়ে তার বদলে ক্রমবর্ধমান হারে কৃষি আয়কর প্রবর্তনের কথাও বলেছেন। পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান গ্যাডগিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কাছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত জাতীয় উন্নয়ন কাউনসিলের সামনে কৃষিক্ষেত্র থেকে টাকা তোলার জন্য আবেদন করে বিফল হয়েছেন। মনে হচ্ছে (দক্ষিণ বাম উভয় প্রকার) রাজনীতিবিদদের চিন্তার সঙ্গে অর্থনীতিবিদদের চিন্তার কোনো একটা সমতলতা পাওয়া যাচ্ছে না, যেন একটা সমান্তরালতা দেখা দিচ্ছে। তাই বিষয়টি মোটামুটি স্বচ্ছভাবে সাধারণ ভাষায় আলোচনা করে কোনো সমাধানে পৌছান যায় কিনা সে চেষ্টা করা দরকার।

১

আমাদের কারও কারও মনে এ রকম ভুল ধারণা থাকতে পারে যে ভূমি রাজস্বকেই খাজনা বলে। আসলে তা নয়, এ-দুটো পৃথক বিষয়, পৃথক লেন দেন। রাষ্ট্রশক্তি বা সরকার জমির মালিকদের কাছ থেকে বাৎসরিক যে আদায় করেন তারই নাম ভূমিরাজস্ব বা Land Revenue, আর জমির মালিক তার প্রজার কাছ থেকে বৎসরে বা প্রতিবারের উৎপাদন পিছু নগদে বা ফসলে যে আয় আদায় করে তার নাম খাজনা বা Rent ; খাজনা আদায় করে জমির মালিক তা থেকে ভূমিরাজস্ব মেটায়। কোনো ক্ষেতমজুর খাজনা দেয় না, মজুরির বিনিময়ে চাষ করে। ভাগচাষী বা আধিয়ার যে ভাগ দেয় তাকে খাজনা বলা চলে। নিজের মালিকানার জমি যে নিজে হাতেই চাষ করে সে খাজনা পায় না, তার আয়ের মধ্যে সেই অংশ থেকেই যায়, সে সরকারকে যা দেয় তা হলো ভূমিরাজস্ব।

মোট কথা রাজ্যসরকারগুলি যা পায় তা হলো ভূমিরাজস্ব, খাজনা নয়। রাষ্ট্রশক্তিকে রাজস্ব দেওয়ার এই প্রথা সবচেয়ে প্রাচীন, চাষীর উদ্বৃত্ত যুগ যুগ ধরে পেয়েছে বলেই রাজার শক্তিসামর্থ্য ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক সম্ভব হয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে আমাদের দেশে ভূমিরাজস্বের বিবর্তনের কাহিনী পরে হবে। বর্তমানের কথা আগে হোক।

আমাদের সংবিধানে ভূমির উপর কর আরোপ করা ও আদায় করার ভার রাজ্যসরকারগুলির উপর এবং এ-থেকে কোনো ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হয় না। ভূমিরাজস্ব কতটা আরোপ করা হবে তার কোনো নির্দিষ্ট ভিত্তি (base) ভারতের সকল রাজ্যসরকারের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। কোথাও কোথাও সম্পত্তির মোট মূল্যের উপর, আবার কোথাও বা খরচ খরচা বাদ দিয়ে নীট উৎপাদনের মূল্যের উপর। আবার অনেক রাজ্যে কর আরোপকারী অফিসারের বিচারবুদ্ধির উপরই বিষয়টি ছেড়ে দেওয়া আছে।

এখন, এমন একটা সময় ছিল যখন (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকায় নয়) এই ভূমিরাজস্ব কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর বদলানো হতো। জমি বা সম্পত্তির গুরুত্বে পরিবর্তন বা নীট উৎপন্নের মূল্যে পরিবর্তন মোটামুটি ধরে নিয়ে ভূমি-রাজস্বও পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে ভূমিরাজস্ব দীর্ঘদিন যাবত অপরিবর্তিত, ফলে সম্পত্তির বা নীট উৎপন্নের মূল্যে পরিবর্তনের সঙ্গে আর তার কোনো যোগাযোগ নেই, এটা এখন নিছক জমির পরিমাণের

উপর অর্থাৎ আয়তনভিত্তিক একটা মোটামুটি আদায়ে পরিণত হয়েছে। ১৯৫১-৫২ সালে সকল রাজ্যসরকারের মিলিতভাবে ভূমিরাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ৫২ কোটি টাকা, ১৯৫৮-৫৯ সালে হলো ৯৬ কোটি টাকা, ১৯৬৭-৬৮ সালে হলো ৯৯.২ কোটি টাকা, ১৯৬৮-৬৯ সালের প্রস্তাবিত বাজেটগুলি যোগ করে ধরা হয়েছে ১০৮.৭ কোটি টাকা। ভূমিরাজস্বের হার সমান রইল, ভূমির পরিমাণও বাড়েনি, তাহলে এই উৎস থেকে আদায়ের পরিমাণ বাড়ল কি করে? এর কারণ হচ্ছে পুরনো মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকারগুলির কিছুটা পরিমাণ রাজ্যসরকারগুলির হাতে এসেছে। ভূমিরাজস্বের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়লেও রাজ্যসরকারগুলির মোট আয়ের অনুপাত হিসাবে এর গুরুত্ব ক্রমাগত কমে এসেছে। অন্যান্য উৎস থেকে রাজ্যগুলির আয় বেড়ে যাওয়ার ফলেই এ-রকম ঘটেছে। নিচের তালিকা থেকে এই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বুলেটিনগুলি থেকে তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে।

রাজ্যের আয়ের মধ্যে ভূমিরাজস্বের অনুপাত

বৎসর	ভূমিরাজস্ব (কোটি টাকার হিসাবে)	মোট আয়ের অনুপাত
৯৫১-৫২	৪৮	১২.১
৯৬০-৬১	৯৭	৯.৬
৯৬৬-৬৭	৯০	৪.২
৯৬৭-৬৮	৯৯	৪.০
৯৬৮-৬৯ (প্রস্তাবিত)	১০৯	৪.২

২

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের শুরু থেকেই, প্রধানত প্রতিটি রাজ্য-কংগ্রেস কমিটির উৎসাহে এই প্রচার শুরু হয় যে ভূমিরাজস্ব তুলে দেওয়া হোক। তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে কোনো কোনো বামপন্থী প্রার্থী এবং দলও এই প্রচার শুরু করেন। ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে প্রথমে মাদ্রাজ সরকার ভূমিরাজস্ব বিলোপের কথা ঘোষণা করেন। যুক্তি হিসাবে তাঁরা দেখান যে এ-থেকে আয় ৬ কোটি টাকা, কিন্তু আদায়ের খরচা ৩ কোটি টাকা। ভূমিরাজস্বের উপর ২৫ শতাংশ সারচার্জ তাঁরা ইতিমধ্যেই তুলে দিয়েছেন। কয়েকটি রাজ্য আংশিকভাবে হলেও, এর অনুসরণ করেছে, যেমন উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর।

পুরনো পাঞ্জাবের আইনসভার কংগ্রেসী সদস্যগণ পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশের নূতন রাজ্যসরকারগুলিকে অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেন, যেন তাঁরা ভূমিরাজস্ব তুলে দেন। মধ্যপ্রদেশ সরকার ১৯৬৭ সালের ১৫ই জানুয়ারি থেকে সাড়ে সাত একরের কম জোতের বা পাঁচ টাকার কম আদায় বিলোপ করে দিয়েছেন। রাজ্যের আর্থিক ক্ষতি হিসেব করা হয়েছে সাড়ে তিন কোটি টাকা। ১৯৬৭ সালের অক্টোবরে উত্তর প্রদেশ যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সঙ্কটের কথা স্মরণ করলে দেখা যায় যে এস্. এস্ পি-র পাঁচজন মন্ত্রী পদত্যাগ করলেন কারণ সওয়া ছয় একর পর্যন্ত জোতের ভূমিরাজস্বের অর্ধেক ছাড় দিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তুত নন।

রাজনীতিবিদ্‌দের যুক্তি কি তা সুস্পষ্টভাবে বোঝার উপায় নেই। তবে মনে হয় তাঁদের যুক্তিগুলি হলো: ১। রাজ্যসরকারগুলির আয়ের খুব কম অংশ আসে ভূমিরাজস্ব থেকে, ২। আদায়ের খরচা খুব বেশি, আয়ের প্রায় অর্ধেক, ৩। চাষীর উপর করভার লাঘব করা উচিত।

প্রথম বক্তব্যটি বিচার করা যাক। ১৯৫৩-৫৪ সালে কর অনুসন্ধানী কমিশন বলেছিলেন যে ভূমিরাজস্বের কোনো বিকল্প, যোগ্য উৎস নেই, "no real substitute." উন্নয়নমূলক কার্যের চাপ ক্রমশ বাড়ছে, রাজ্য সরকারগুলির বাজেটে টাকার দরকার সর্বদা বেড়ে চলেছে। প্রথম পরিকল্পনার সময়ে ভূমিরাজস্ব দিয়েছে ৩২৭ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৯৫ কোটি টাকা।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে এই উৎস থেকে আরও অতিরিক্ত ৫০ কোটি টাকা (অর্থাৎ মোট ৬০৯ কোটি টাকা) তোলার কথাই কমিশন বলেছেন, উৎসমুখ বন্ধ করে দিতে বলেননি। কমিশনের ভাষায় বলতে গেলে "In the last year or so, some states have imposed additional agricultural taxation by way of surcharges on land revenue higher irrigation charges, surcharges on commercial crops and so forth. Taking all these types of measures together, it is imperative to add to the effort which has been initiated in a modest way, either through revisions in land revenue rates or through adjustment in irrigation charges or by levy of special surcharges on commercial crops, substantial

resources can be mobilized in the remaining years of the plan."

কর থেকে পাওয়া রাজস্বের কত অংশ ভূমিরাজস্ব থেকে আসে? এদের অনুপাত কি? কেরালাতে ৬ শতাংশ, আসাম অন্ধ্রপ্রদেশ ও জম্মু কাশ্মীরে ২০ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশে ৩০ শতাংশ এবং রাজস্থানে ৩১ শতাংশ। কর রাজস্বের এত বৃহৎ অংশ কোন রাজ্যসরকারের পক্ষেই কমতে দেওয়া চলে না। বিশেষত তাঁরা যখন প্রতিবৎসরই কেন্দ্রীয় সাহায্যের উপর ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে উঠছেন, ১৯৫১ সালের ৩১শে মার্চে কেন্দ্রীয় সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১৯১ কোটি টাকা, আর ১৯৬৬ সালে বর্তমানে ৩২০০ কোটি টাকার কাছাকাছি। এই পরনির্ভরশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে কোন রাজ্যের নেতাদেরই ভূমিরাজস্ব তুলে দেওয়ার কথা চিন্তা করা চলে না।

আদায়ের খরচ যদি বেশি হয়, তবে তা কমাবার বাস্তব পদ্ধতি খুঁজে বার করা দরকার। প্রশাসনিক যোগ্যতা বাড়ান, আদায়ের পদ্ধতিতে নূতনত্ব এনে ব্যয়সংক্ষেপ করা যায় কিনা তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাই বাস্তব বুদ্ধি সম্মত। সরকারী কর্মচারীদের মাধ্যমে তোলা যদি ব্যয়বহুল হয় তবে পঞ্চায়েতী সংগঠনের মাধ্যমে বা (যেখানে আছে) সমবায় সমিতির হাতে আদায়ের ভার দিয়ে কিছু অংশ কমিশন হিসাবে দেওয়াও চলে। তাদের অভাব কিছুটা মেটে আদায়ের পরিমাণও বাড়ে, বকেয়া পড়ে না, এবং খরচা কমে। এসব চেষ্টা না করে এই উৎসটি তুলে দেওয়া কোন দিক থেকে যুক্তিযুক্ত তা বোঝা যাচ্ছে না।

৩

তৃতীয় যুক্তিটিই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও আবেগসঞ্চারক, তাই অর্থনীতিবিদ্‌দের কাছে সর্বাধিক বিচারযোগ্য। যুক্তিটি হলো চাষীর উপর করভার কমান উচিত। এবিষয়ে অর্থনীতির শিক্ষা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। সেই শিক্ষা অনুযায়ী প্রথমত ভূমিরাজস্বের করভার খুবই কম, নেই বললেই হয়। আর দ্বিতীয়ত, তুলনামূলকভাবে চাষীর উপর এত কম যে সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতি অনুসারে অন্যান্য শ্রেণীর উপরই বিষম অবিচার করা হচ্ছে, এই বৈষম্য দূর করার জন্য চাষীর উপর করভার বাড়ান দরকার।

করভার নেই কেন? অর্থনীতির সোজা উত্তর—করের মূলধনীকরণ

(Capitalisation of taxes) হয়ে গেছে। কোনো ব্যক্তি কোনো স্থায়ী সম্পত্তি কেনার সময়ে লক্ষ্য রাখে যে এই সম্পত্তি থেকে আয়ের উপর কোনো ধরণের কর আরোপিত রয়েছে কিনা, এরকম কোনো কর থাকলে ওই সম্পত্তি থেকে নীট আয় কমে যায় ফলে নূতন ক্রেতারা (অর্থাৎ কর আরোপের পরে যারা কিনছে) এই সম্পত্তির জন্য কম দাম দেয়। একেই বলে করের মূলধনীকরণ। করের পরিমাণকে প্রচলিত সুদের হারে মূলধনে রূপান্তরিত করে সে হিসাব অনুযায়ী ক্রেতারা সম্পত্তির জন্য কম দাম দিতে প্রস্তুত হয়। একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি সহজে বোঝানো যাবে। মনে করুন, একখণ্ড জমি থেকে বছরে ১০০টাকা আয় হয়। বাজারে চলতি সুদের হার হল ৫ শতাংশ। এ-অবস্থায় ওই জমিটির দাম হবে ২০০০ টাকা। এখন ধরে নিন, জমির আয়ের উপর ১০ শতাংশ হারে ভূমিরাজস্ব আরোপিত হলো। এই রাজস্ব মেটাবার পরে ঐ জমি থেকে নীট আয় হল ৯০টাকা। বাজারে ৫ শতাংশ সুদের হার অনুযায়ী এই ৯০ টাকাকে মূলধনে পরিণত করলে দেখা যায় যে জমিখণ্ডের বর্তমান দাম হবে ১৮০০ টাকা। জমির ভবিষ্যৎ ক্রেতারা জানে যে ঐ আয়ের উপর ভূমিরাজস্ব আরোপিত আছে। তারা তাই এই করকে মূলধনে রূপান্তরিত করে, কম দামে জমিটি কিনবে, এভাবে ভবিষ্যতে চিরকালের জন্য করভার এড়িয়ে যাবে। জমির মালিক ১০ টাকা ভূমিরাজস্ব দেবে ঠিকই কিন্তু সে যে ২০০ টাকা কম দিয়েছে সেই ২০০ টাকার মূলধন থেকেই ৫ শতাংশ সুদের হারে তার ১০ টাকা আয় হবে। অর্থাৎ কমদামের মাধ্যমে সে করভার এড়াতে পেরেছে। অর্থনীতির ভাষায় তাই বলে যে পুরনো করের কোনো ভার নেই, "an old tax is no tax."

ভূমিরাজস্বের আসল ভার নেই বললেই চলে তার আরও একটি কারণ হলো একদিকে যেমন প্রবল মুদ্রাস্ফীতি অপরদিকে তেমনি ঐ রাজস্বের অপরিবর্তনীয়তা। টাকার আভ্যন্তরীণ মূল্য কমে যাওয়ায় এবং টাকার অঙ্কে ভূমিরাজস্ব সমান থাকার ফলে স্বভাবতই ওর আসল ভার প্রায় শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছে, যদিও রাজ্যসরকারের তহবিলে ওর প্রয়োজন মোটেই কমেনি। আরও একটা কথা। একর প্রতি উৎপাদন অনেকটা বেড়ে গিয়েছে, সেচ নূতন ধরনের বীজ ব্যবহার—প্রভৃতির ফলেই একর প্রতি উৎপাদন বেড়েছে। তার পাশাপাশি একর প্রতি ভূমিরাজস্ব সমান থাকায় উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের সঙ্গে ভূমিরাজস্বের অনুপাতও স্বভাবতই কমে গিয়েছে। ফলে এর প্রকৃত ভার

অনেকটাই কমে গিয়েছে।

এখন আসা যাক অর্থনীতিবিদ্‌দের দ্বিতীয় বক্তব্যে: তাঁদের কথা হলো চাষীর উপর করভার অন্যান্য শ্রেণীর তুলনাতে অনেক কম। কর দু-রকমের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। জিনিসপত্র কিনলে বা আমোদপ্রমোদে খরচা করলে পরোক্ষভাবে সকলকেই কর দিতে হয়, চাষীর ছেলে তুলনামূলকভাবে বেশি সিনেমা দেখে তা নয়। বরং বিদেশ থেকে আমদানি করা জিনিসপত্র বা দেশে যাদের উপর উৎপাদনশুল্ক বেশি এ-ধরনের দ্রব্যসামগ্রী শহরের লোকেরাই তুলনামূলকভাবে বেশি ব্যবহার করে। পরোক্ষ কর বাদ দিলে থাকে দুটি প্রধান প্রত্যক্ষ কর ভূমিরাজস্ব ও কৃষি আয়কর।

ভূমিরাজস্ব পূর্বে আলোচিত হয়েছে। কৃষি আয়করের অবস্থা কি? অন্যান্য প্রত্যক্ষ করগুলি চাষীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও (যেমন ব্যয়কর, উপহার কর, সম্পত্তি কর, সম্পদ কর প্রভৃতি) তাদের উপর কোনো চাপই দিতে পারে না। কারণ— ১। ভারতে এখনও এদের গুরুত্ব কম, ২। যে নিম্নতম সীমার ঊর্ধ্বে কর শুরু হয় সেই সীমা এমন উঁচুতে যে কৃষি জমির মালিকেরা করের আওতায় আসেন না, এবং ৩। এই কর আইনগুলিতে এদের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে।

কৃষি আয়কর আরোপ, আদায় ও ব্যয় সবই করবে রাজ্য সরকার— সংবিধানে এরকম লেখা আছে। বিহার প্রথমে এই কর শুরু করে ১৯৩৮ সালে। বর্তমানে যে যে রাজ্যে কৃষি আয়কর রয়েছে তারা হলো আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মহীশূর, মাদ্রাজ ও কেরল। সাধারণ আয়করের তুলনায় এর হার অনেক কম। ভারতে চিরকালই এই করের ভূমিকা ছিল নগণ্য। নিচের তালিকার দিকে তাকালেই তা বোঝা যাবে।

বৎসর	আদায়ের পরিমাণ কোটি টাকার হিসাবে	রাজ্যসরকারের আয়ের মধ্যে কতটুকু অংশ
১৯৫১—৫২	৪.৩	১.১
১৯৬০—৬১	৯.৫	১.০
১৯৬৬—৬৭	১১.০	০.৫
১৯৬৭—৬৮	১০.৬	০.৪
১৯৬৮—৬৯ প্রস্তাবিত	১১.৩	০.৪

এই তালিকা থেকেই বোঝা যাবে যে কৃষি আয়কর এমন কিছু ভারবহুল হয়ে উঠছে না।

৪

ভারতে কৃষিকরের ভার কতটা তা নিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনা করা যাক। কৃষিকরের স্থূল ও নীট ভার উভয়ই দেখাবার চেষ্টা করা চলে। হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে ১৯৫৮-৫৯ সালে কৃষিকরের মাথাপিছু স্থূল ভার ছিল ১৪.৫২ টাকা। এই টাকা ছিল কৃষিক্ষেত্রের মাথাপিছু আয়ের শতকরা ৬.৮ ভাগ। অপরপক্ষে, অকৃষিক্ষেত্রে মাথাপিছু স্থূল ভার ছিল ওই বছরে ৪৬ টাকা বা মাথাপিছু আয়ের শতকরা ৯.২ ভাগ। পৃথকভাবে প্রতিটি করের করভার আলোচনা করে আমরা দেখাতে পারি যে মোটের হিসাবে, তুলনামূলক হিসাবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনের হিসাবে এই তিনদিক থেকেই ভারতের কৃষিক্ষেত্রের উপর করভার অনেক কম। কৃষিকরগুলির করপাত (incidence) ও করভার (burden) নিয়ে অনেক সুস্পষ্ট আলোচনা করা সম্ভব। নিচের তালিকাটিতে কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে মোট করপাতে পার্থক্য দেখান হয়েছে।

বৎসর	কৃষিক্ষেত্র	অকৃষিক্ষেত্র
১৯৫১-৫২	২০০	৪৫১
১৯৬০-৬১	৩৯৯	৯২২
১৯৬২-৬৩	৬১৯	১৭৫০

কৃষির উপর করভার কম বা বেশি এবং বাড়ছে বা কমছে কি না তা আরও ভালোভাবে বোঝা যায় যদি চলতি বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ এবং মূলধনী ব্যয়বরাদ্দের করপাত পরস্পর তুলনা করা হয় (by comparing the incidence of current budget expenditure and capital expenditure)।

নিচের তালিকাটি থেকে বিষয়টি (কোটি টাকার হিসাবে) স্পষ্ট হবে।

	কৃষিক্ষেত্র		অকৃষিক্ষেত্র	
বৎসর	এই ক্ষেত্র থেকে আদায়	এই ক্ষেত্রের জন্য সরকারী ব্যয়	এই ক্ষেত্র থেকে আদায়	এই ক্ষেত্রের জন্য সরকারী ব্যয়
১৯৫১-৫২	২০০	৩২৫	৪৫০	৩২৫
১৯৬০-৬১	৩৯৯	৭২১	৯২২	৬০২
১৯৬২-৬৩	৫০২	৮২১	১৩২৬	৬৮৯

অর্থাৎ, ১৯৫০-৫১ সালে কৃষিক্ষেত্র থেকে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারের তহবিলে আদায় হয়েছে ২০০ কোটি টাকা। এইটে হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রের স্থূল করভার (gross burden of taxation)। কিন্তু ওই একই বছরে, কৃষিক্ষেত্র সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে পাচ্ছিল ৩২৫ কোটি টাকা। কিছুদিন পরের হিসেব দেখুন। ১৯৬০-৬১ সালে কৃষিক্ষেত্র দিচ্ছিল ৩৯৯ কোটি টাকা, কিন্তু পাচ্ছিল ৭২১ কোটি টাকা। ১৯৬২-৬৩ সালের হিসেব দেখুন, কৃষিক্ষেত্র দিচ্ছে ৫০২ কোটি টাকা, কিন্তু নিচ্ছে ৮২১ কোটি টাকা। অর্থাৎ অন্যান্য উৎস থেকে আয় করা টাকা কৃষিক্ষেত্রে পৌঁছিয়েছে। অপরদিকে অকৃষিগত ক্ষেত্র সরকারী ভাণ্ডারে যা দিয়েছে যার তুলনায় নিয়েছে অনেক কম।

উপরের এই তালিকাতে মূলধনী বাজেটকে (Capital budget) ধরা হয়নি। তাতে আরও মজার ব্যাপার দেখা যায়। ১৯৬২-৬৩ সালে সরকারের মূলধনী বাজেটে কৃষিক্ষেত্র দেয় ৭৫ কোটি টাকা (স্বল্প সঞ্চয়, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড জমা, খোলাবাজারে ঋণদান প্রভৃতি ধরনে) কিন্তু ঐ বছরেই কৃষি উন্নয়ন, সমষ্টি উন্নয়ন, জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির জন্য সরকার খরচ করে ২৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ওইবছর নীট বহির্গমন (net outflow) হলো ১৭৫ কোটি টাকার। ১৯৬২-৬৩ সালের এই হিসাব প্রতিটি বছরের ক্ষেত্রেই সত্য। তাহলে আমরা নিশ্চয় এই সিদ্ধান্তে আসব যে কৃষিক্ষেত্রে করভার খুবই কম, এবং দেশের শিল্প প্রসার বা অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিক্ষেত্রের দান নিতান্ত সামান্য।

আরও একটু গভীরে আলোচনা করার জন্য গড় করহার (Average Tax Rates) এবং প্রান্তিক করহার (Marginal Tax Rates) বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। নিচের তালিকাটি একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে।

	কৃষিক্ষেত্র		অকৃষিক্ষেত্র	
বৎসর	মাথা পিছু কর	মাথা পিছু আয়ের মধ্যে করের অনুপাত	মাথা পিছু কর	মাথা পিছু আয়ের মধ্যে করের অনুপাত
১৯৫১-৫২	৮·০	৩·৮	৪১·৮	৯·৫
১৯৫৫-৫৬	৯·৫	৫·৪	৩৮·৪	৮·৯
১৯৬০-৬১	১৩·৪	৫·৬	৬৮·৯	১৩·০

উপরের তালিকা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, মাথা পিছু করের পরিমাণ

উভয়ক্ষেত্রে বাড়ছে ঠিকই, কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে মাথাপিছু আয়ের মধ্যে করের অনুপাত মাত্র ৫·৬ শতাংশ, আর অকৃষিগত ক্ষেত্রে এই অনুপাত হলো ১৩ শতাংশ।

করের গড়হারের তুলনায় আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো করের প্রান্তিক হার (the marginal rates of taxation) হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হয়েছে ১৭১৭ কোটি টাকা, কিন্তু অতিরিক্ত কর আদায় হয়েছে ১৯৮ কোটি টাকা—অর্থাৎ করের প্রান্তিক হার হল ১১·৫ শতাংশ। অপরদিকে একই সময়ের মধ্যে অকৃষি-ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হয়েছে ২৪২০ কোটি টাকা, কিন্তু অতিরিক্ত কর আদায় হয়েছে ৪৯৯ কোটি টাকা প্রায় অর্থাৎ করের প্রান্তিক হার হলো ২০·৬ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে কৃষিক্ষেত্রের তুলনায় অকৃষিক্ষেত্রে করের প্রান্তিক হার দ্বিগুণ।

মোট আয়ের শতকরা কত অংশ কর হিসাবে দেওয়া হয়? নিচের তালিকা থেকে বিষয়টি বোঝা যাবে।

পরিবারের বাৎসরিক আয়	১২ টাকা থেকে ৬০০ টাকা	৬১২ টাকা থেকে ১২০০ টাকা	১২১২ টাকা থেকে ১৮০০ টাকা	১৮১২ টাকা থেকে ৩০০০ টাকা	৩০০০ টাকা থেকে ৫০০০ টাকা
গ্রামীণ পরিবার	৩·২	৪·১	৪·৫	৫·০	৬·৬
শহুরে পরিবার	৩·০	৪·৪	৫·১	৫·১	৯·৮

গ্রাম ও শহুরে পরিবারের করপাত (tax incidence) তুলনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, বার্ষিক ৩০০০ টাকার নিচে গ্রামীণ পরিবারের উপর কর খুব কম বাড়ান চলে, অন্তত ন্যায়ের দিক থেকে (equity) এটা সঙ্গত। কিন্তু বার্ষিক ৩০০০ টাকা আয়ের উপরের গ্রামীণ পরিবারের উপর কর অনেকটা বাড়ান সম্ভব এবং উচিত। কারণ তারা তাদের স্থূল আয়ের মাত্র শতকরা ৬·৬ অংশ কর দেয়, অপরদিকে শহুরে পরিবারের একই আয়-শ্রেণী বার্ষিক স্থূল আয়ের শতকরা ৯·৮ অংশ কর দিচ্ছে। বার্ষিক আয় ৫০০০ টাকার বেশি এমন গ্রামীণ পরিবারের উপর করপাত সমআয়কারী শহুরে পরিবারের তুলনায় অনেক কম, কারণ (ক) শহুরে পরিবারের উপর ব্যক্তিগত আয়কর খুবই ক্রমবর্ধনশীল (highly progressive) এবং (খ) গ্রামীন পরিবারগুলির উপর

(বাগিচা ব্যতীত কৃষি) আয়কর বেশি আরোপিত হয় না, ঠিকমত হয় না, কৃষি থেকে আয়ের সঠিক হিসেব করাও মুস্কিল। কর আরোপনের ক্ষেত্রে ন্যায়নীতির প্রয়োগ করলে তাই বার্ষিক ৩০০০ টাকার অধিক স্থূল আয়ের পরিবারের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করা খুবই সঙ্গত।

অর্থাৎ, উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি (ক) সাধারণভাবে বলতে গেলে অকৃষি ক্ষেত্রের তুলনায় কৃষিক্ষেত্রের করভার অনেক কম, (খ) নিম্নশ্রেণীর তুলনায় উচ্চশ্রেণীর উপর করভার কম, এবং (গ) কৃষির উপর বিশেষত অধিক আয় শ্রেণীর উপর কর বাড়াবার সুযোগ আছে এবং উচিত।

৫

যদি আমরা বলি যে (ক) প্রতি চাষীর হাতে জমি নেই, বেশির ভাগ জমি কেন্দ্রীভূত হয়েছে অকৃষক পরশ্রমভোজী ভদ্রলোকদের হাতে, (খ) তাদের আয় বেড়েছে, বা ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরের পাওনা বৃদ্ধির তুলনায় এই অকৃষক মালিকদের আয় বৃদ্ধি হয়েছে বেশি হারে (অর্থাৎ শোষণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে), (গ) এরা কৃষি আয়কর ফাঁকি দিচ্ছে, (ঘ) এদের ঘরের ছেলেরা স্কুল কলেজ, অফিস আদালত দোকান বাজার প্রভৃতি থেকে বাড়তি টাকা রোজগার করে ঘরে আনে এবং সঙ্গে সঙ্গে চাষী খাটিয়ে 'খাজনা' পায়, (ঙ) শিল্পে টাকা খাটায় না, (চ) জাতীয় নমুনা অনুসন্ধানের হিসেব অনুসারে (National Sample Survey) গ্রামীণ পরিবারগুলির ব্যয়ের মধ্যে গড়ে শতকরা ১০·৩৬ ভাগ হলো অপ্রয়োজনীয় ব্যয়, যেমন পূজা-অর্চনা, মদ্যাদি, যাত্রাগান ইত্যাদি। এটা গড়ের হিসেব অর্থাৎ উচ্চ আয়শ্রেণীর পরিবারে এই অনুপাত আরও বেশি, এ-অবস্থায় ভূমিরাজস্ব তুলে দিলে কার লাভ হবে? প্রকৃত চাষীর হবে কি? বরং বলা যায় ভূমিরাজস্ব তুলে দেওয়া খুবই অবিজ্ঞজনোচিত কাজ হবে। লেভি করে ধান সংগ্রহ করায় রীতি যেখানে চালু রাখতেই হচ্ছে, সেখানে রাষ্ট্রের হাতে শস্যের আকারে ভূমিরাজস্ব আদায়ের এই অধিকার সহসা ছেড়ে দেওয়া চলে না। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের ইতিহাস থেকেও এই শিক্ষা আমরা পেয়ে থাকি।

৬

অনেকে বলেন যে ভূমিরাজস্ব তুলে দিয়ে কৃষি আয়কর বসান হোক। এ প্রসঙ্গটি একটু বিশদভাবে বুঝতে হবে। কৃষি আয়করের অর্থনৈতিক ও

প্রশাসনিক দুর্বলতা সকলেরই জানা। (ক) কৃষি আয় ব্যাখ্যা করা ও নির্ধারণ করা খুবই অসুবিধেজনক। আয় বলতে সাধারণত ধরা হয় মোট রেভিনিউ থেকে ঐ রেভিনিউ উপায়ের খরচ খরচা বাদ দিলে যা রইল। কৃষিক্ষেত্রে শস্য বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া গেল সেটাই রেভিনিউ। আর খরচ খরচার মধ্যে পড়বে জমি, ভাড়া করা শ্রমিক ও পরিবারের শ্রম, পরিচালনার শ্রম, যন্ত্রপাতির ভাড়া, নিজের যন্ত্রপাতি থাকলে সেটার উপর আন্দাজে আরোপ করা ভাড়া, গরু মহিষের খাদ্য, সার ইত্যাদি। কোন সাধারণ শিক্ষিত চাষীর পক্ষেও এসব হিসেব করা সম্ভব নয়, স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিতদের কথা তো ছেড়েই দিন। তাছাড়া, শহুরে শিল্প ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিরা বা চাকুরিয়ারা যেরকম হিসেব রাখতে অভ্যস্ত চাষীরা সেভাবে অভ্যস্ত নয়। (খ) বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন ও দামে যেরকম উঠানামা হয় তা বিস্ময়কর। এর ফলে ভিন্ন বছরে কৃষি আয়েও বিপুল তারতম্য দেখা দেয়। এইরকম আয়ের উপর আয়কর বসাবার অসুবিধে সহজেই বোঝা যায়। (গ) এখনও আমরা ভূমির মালিকানা ও ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়ম সুষ্ঠুভাবে রচনা করতে পারিনি। জমি থেকে আয়ের কিছু অংশ পেল মালিক কিছু পেল ভাগচাষী—আয়করের কে কতটা অংশ দেবে? মোট আয় হয়ত আয়করের আওতায় এল, কিন্তু ভাগ হয়ে যাবার পরে প্রত্যেক ভাগ সর্বনিম্ন সীমার নিচেই পড়ে রইল—এটাই তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হবে। (ঘ) কৃষি আয়কর আদায়ের খরচ হবে খুবই বেশি, এদিক ওদিক ছড়ানো চাষীর কাছ থেকে আদায় করাও শক্ত। যে বিপুল অসন্তোষ সৃষ্টির জন্য যে বিপুল ব্যয়ভার করতে হবে তার তুলনায় নীট আদায় হবে খুব কম।

এবং সর্বোপরি, একটি অর্থনৈতিক আপত্তিও আছে। কৃষি থেকে আয় করলে তবে আয়কর, আয় না হলে কর দিতে হচ্ছে না। ক্রমবর্ধনশীল আয়করের ফলে ভূমি নিস্ফলা করে রাখার দিকে প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। কিন্তু ভূমিরাজস্ব দিতেই হবে, মালিকানার উপর কর ওটা। ফলে ভূমি থেকে আয় বাড়াবার দিকে ঝোঁক বাড়াবার চাপ থাকছে। এই চাপ তুলে নেওয়া উচিত নয়।

৭

পশ্চিমবাঙলার কথা ধরা যাক্ (ভারতের কোন কোন রাজ্যে ভিন্ন অবস্থা হতে পারে)। ভূমিসংস্কার আইন হলো, উর্ধসীমা হলো, তবু বেশ কিছু পরিমাণ জমি বেনামী হয়ে রইল। বিশ বছর ধরে এই বেনামী চলেছে। এখন অবস্থা

কি ? যে ভাইপো ভাইঝি ভাগ্নেদের নামে জমি বেনামী হয়েছিল, তারা এতদিনে বড় হয়েছে, বাড়ির বড়কর্তা গত হয়েছেন, সে জমির প্রকৃত মালিকানা অনেকক্ষেত্রে এখন এই বেনামদারদের হাতেই বর্তে গেছে। প্রায় বিশটা বছর খেলা কথা নয়, অর্থনীতির নিয়মে সময় বা কালও বাস্তব ভূমিকা গ্রহণ করে। দ্বিতীয়ত, যৌথ পরিবারগুলি ভেঙে যাওয়ায় ভূমিমালিকানা ছোট ছোট হয়ে পড়েছে। এবং সর্বোপরি, আমাদের উত্তরাধিকার আইন। ইংলণ্ড, আমেরিকা তো বটেই, এমন কি জাপানেও একমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্র ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারী। আমাদের দেশে দায়ভাগ বলুন বা মিতাক্ষরা বলুন, সব ছেলে তো পাবেই, এখনও মেয়েরাও পাচ্ছে। আর মুসলমান উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তি আরও অনেক ভাগে বিভক্ত হচ্ছে। এখন তাই জমির মালিকানা মাথাপিছু অনেক কমে গেছে, এটাই বাস্তব সত্য কথা। আর দরিদ্র চাষীর হাত থেকে ভূমি হস্তান্তর হয়ে মাত্র কয়েকজনের হাতে শত শত একর জমি কেন্দ্রীভূত হওয়ার কথাটা বাস্তবে বিশেষ দেখা যাচ্ছে না, এরকম বড় জোতদারের সংখ্যা দ্রুত ক্রমক্ষীয়মান। যৌথ পরিবারের ভাঙন এবং দুর্লঙ্ঘ্য উত্তরাধিকার আইনের চাপ তো আছেই। ঋণের দায়ে ভূমি হস্তান্তরের বেগধারা খুবই শ্লথ, যে কোন জমি রেজিষ্ট্রী অফিসের দলিলঘরে খোঁজ নিলেই এটা শুনতে পারা যাবে। এইভাবে কালক্রমে বাস্তবে আমাদের দেশে একপ্রকার ক্ষুদ্র চাষী ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে (small peasant economy)। ঠিকই এখনও ৬০ বিঘে ৭০ বিঘের মালিক কিছু আছে, কর্তা মারা যাওয়ার পরে সে মালিকানাও ১৫।২০ বিঘেতে দ্রুত পরিণত হচ্ছে। এই চিত্রই ঘটমান ধারার চলচ্চিত্র, কিছু চা বাগান, মেছোঘেরি ইত্যাদিতে পশ্চিমবঙ্গে ভূমির কেন্দ্রীভবন থাকলেও সামগ্রিক কৃষি অর্থনীতির গতিশীলতার এই হচ্ছে দিক।

আর এই ক্ষুদ্র চাষীর অর্থনীতি ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে স্বচাষের নামে, ভাগচাষী সরিয়ে নিজে হাল বলদ ক্রয় করে, অথবা মজুর কবুলিয়ত লিখিয়ে নিয়ে ভাগচাষী উচ্ছেদ করে। এখনকার জমির মালিকরা রীতিমত হিসেব করেন, মজুর দিয়ে চাষ করালে কত মণ ধানের দাম দিতে হবে, ভাগচাষী দিয়ে করালে কত মণ ধান চলে যাচ্ছে ইত্যাদি। নগদ টাকা হাতে থাকলে ধানের দামের স্ফীতির বাজারে ক্ষেতমজুর দিয়ে চাষ করানই তুলনামূলক ভাবে অধিকতর লাভজনক, মালিকেরা তাও বোঝেন। ধানের অতিরিক্ত বাজার দাম অসংখ্য ভাগচাষী উচ্ছেদে প্রেরণা দিয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ

নেই। এই তুলনামূলক হিসেবের ফলে ভাগচাষীর পাওনা অংশও ধনতান্ত্রিক হিসেব নিকেশ রীতিনীতি ও নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে উঠেছে। সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের বদলে ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক প্রসারিত হয়েছে। দুটো ধরনের সম্পর্ক এখনও অনেক ক্ষেত্রে মিলে মিশে থাকছে, কিন্তু ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের প্রসার বেগ দ্রুততর, তাই সেটাই প্রধান ও মুখ্য। ভাগচাষী প্রথা থাকলেই সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থাকবে না—বহিঃ আকৃতি এবং অন্তর্নিহিত প্রকৃতি এক কথা নয়। অন্তত মার্কসবাদীদের দ্বান্দ্বিক চিন্তায় এ-পার্থক্য সহজেই ধরা পড়বে।

আমাদের প্রশ্ন হলো চাষীপ্রধান ভূমিব্যবস্থা যদি পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যরূপ হয়ে ওঠে, তবে এখানে কৃষি আয়করের গুরুত্ব কোথায়? অপরদিকে এই কাঠামোতে ভূমিরাজস্ব তুলে দেওয়ার যুক্তিই বা কোথায়?

৮

তত্বগত আপত্তিও আছে। ভূমিরাজস্ব তুলে দেওয়া একান্তভাবে পুঁজিতান্ত্রিক স্লোগান, মোটেই সমাজতান্ত্রিক নয়। ইংলণ্ডে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধে ধারণা পুঁজিতান্ত্রিক হয়ে উঠল, তখন থেকে ভূমিরাজস্ব তোলার কথা ওঠে। সহজভাবে বুঝলেই হয়। যদি কেউ কলকারখানাখুলে টাকা রোজগার করে, তাহলে সে রাষ্ট্রকে রাজস্ব দেয় না, কর দেয়। এটাই পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক, রাষ্ট্র ও ব্যবসায়ীর মধ্যে। ঠিক সেই রকম, যদি সেই টাকাটা খাটিয়ে মজুর নিয়োগ করে চাষবাস করে টাকা রোজগার করে তবে সেও আয়কর দেবে, কোনও রাজস্ব দেবে না। এটাই জমি সম্পর্কে ধনতান্ত্রিক ধারণা, রাষ্ট্র থেকে স্বাধীনভাবে যে কোনো উপাদান বাজারে বেচাকেনা করা যায় এ-রকম ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ধারণা। সম্পত্তি সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক ধারণা একটু পৃথক নয় কি? সকল সম্পত্তিই সমাজের, কেউ ব্যবহার করুক, মজুরি পাবে, কিন্তু সম্পত্তির মালিকানাজনিত পাওনা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে দিতে হবে। ভূমিরাজস্ব তুলে দিয়ে সম্পত্তি সম্পর্কে ধনতান্ত্রিক ধারণা চাষীর মনে দৃঢ় করে তোলা তাই তত্বগত দিক থেকেও আপত্তিজনক।

৯

বর্তমানে তাই ভূমিরাজস্ব তোলার পক্ষে তথ্য ও তত্বের দিক থেকে কোনো সমর্থন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অন্তত অর্থনীতিবিদ্‌রা পাচ্ছেন না। বরং কতক-

গুলি বিকল্প প্রস্তাব রাখা যেতে পারে। ক্রমবর্ধনশীল আয়কর থাক, কারণ বাগিচা, মেছোঘেরির আয় থেকে একটা অংশ তুলে আনতেই হবে। এরই সঙ্গে ভূমি-রাজস্বের উপর ক্রমবর্ধনশীল হারে সারচার্জ বসান চলে এবং দরকারও। পরিকল্পনা কমিশনের দূরপ্রেক্ষণ বিভাগ (Perspective Planning Division) নিম্নরূপ সুপারিশ করেছেন, পশ্চিমবাঙলার বাস্তব অবস্থায়, (সেচব্যবস্থা, মাথাপিছু গড় জমির পরিমাণ, একফসলী বা দোফসলী জমি প্রভৃতি) এর কিছু হেরফের করা চলে।

ভূমি রাজস্বের স্ল্যাব্		সারচার্জ (শতকরা হিসাবে)
প্রথম	৭ টাকা	শূন্য
পরের	৫ টাকা	৪০
পরের	৫ টাকা	৮০
পরের	৫ টাকা	১২০
পরের	৫ টাকা	১৬০
পরের	৫ টাকা	২০০

একেবারে কম যারা দেয়, ৭ টাকা বা তার কম তাদের বাদ দেওয়া হলো। পরের প্রতি পাঁচ টাকার স্লাবের শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত বেশি দিতে হবে। এইভাবে ক্রমবর্ধনশীল হারে ভূমিরাজস্ব বসান যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে এটা কৃষিআয়করের বিকল্প নয়। কারণ যাদের বছরে ৫০০০ টাকার কম আয় তাদের ক্ষেত্রে এই প্রস্তাব ক্রমবর্ধনশীল হলেও, তার ঊর্ধে এটা ক্রমহ্রাসশীল (regressive) হচ্ছে, তাই ওই আয়ের উপরে করের ক্রমবর্ধনশীলতা আনতে হলে কৃষি আয়করও থাকা দরকার।

দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবাঙলায় যেসব জমিতে চা, পাট, তামাক প্রভৃতি উৎপন্ন হয় সেসব জমির ভূমিরাজস্বের উপর নিশ্চয় সারচার্জ বসান যেতে পারে। আর এই সঙ্গে যদি পাটের নিম্নতম মূল্য উঁচু স্তরে বেঁধে রাখা যায় সেই উঁচু দামে পাটের সরকারি ক্রয় ও মজুত করা হয় এবং বিদেশ থেকে পাটের আমদানি হ্রাস করে পাটকলগুলিকে সরকারি গুদাম থেকে পাট কিনতে বাধ্য করা যায় তবে চাষীর পক্ষে ভূমিরাজস্বের উপর এই সারচার্জ দিতেও অসুবিধে

হবে না, চাষী ভালো দামও পাবে, পাটের ফাটকাবাজার বন্ধ হবে। এ-প্রস্তাবের সহজ কারণ হলো ধানের তুলনায় ও সব চাষে আয় বেশি। সরকারি সেচের সুবিধায় যেখানে একর প্রতি উৎপাদন বেশি, সেখানে এই সারচার্জও বাড়ান চলে।

তৃতীয়ত, যদি পশ্চিমবঙ্গ মনে করে যে, আমাদের পাট, চা, তামাক প্রভৃতি বাইরে যাচ্ছে অথচ আমাদের তা থেকে আরও কিছু আয় হওয়া দরকার তবে নিশ্চয় ক্রয়কর (Purchase tax) আরোপ করা চলে। পশ্চিমবাঙলার অর্থনীতির যে অবস্থা তাতে এ-রকম ক্রয়কর আরোপ করা বিশেষ যুক্তিসঙ্গত। দাম নিয়ন্ত্রণ ও ক্রয়কর-সাঁড়াশির এই দুই দিক সফলভাবে প্রয়োগ করলে নিশ্চয় আমরা চাষীকে রক্ষা করে ফাটকাবাজদের হাত থেকে শিল্পপতিদের রক্ষা করতে পারব, রাজ্যের রাজস্বও বাড়বে।

ভারতে ভূমি-রাজস্বের প্রশ্নটি জটিল। ভূমি-রাজস্ব তুলে দেবার প্রশ্নটি নিয়েও বিতর্কের অবকাশ আছে। প্রসঙ্গত অর্থনৈতিক জোত ও অ-অর্থনৈতিক জোতের সমস্যাগুলি মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতামত তাঁর নিজের। এ-বিষয়ে আলোচনা আহ্বান করছি প্রবন্ধটি ১৯৬৭ সালে রচিত। সম্পাদক

পুস্তক-পরিচয়

কাঁদিদ বা আশাবাদ। ভলত্যার। মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ। অরুণ মিত্র। সাহিত্য অকাদেমী। পাঁচ টাকা

অষ্টাদশ শতাব্দীকে মিশেলে বলেছিলেন 'মহান শতাব্দী' আর ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহাসিক জর্জ লেফেভর বলেছেন, যে কোনো অর্থেই যথার্থ নবজাগরণের শতাব্দী। এই শতাব্দীতেই আমেরিকা ও ফ্রান্সে দুটি যুগান্তকারী বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছে, সামন্ততান্ত্রিক স্থবিরতার বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণী প্রথম দেখিয়েছে মানুষের কর্মতৎপরতা কী ঘটাতে পারে। 'কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহার'-এর পাতায় মার্কস-এঙ্গেল্‌স্ তার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন: তারা মিশরের পিরামিড রোমানদের প্রাসাদ ও গথিক গীর্জা অনেক পেছনে ফেলে বহু বিস্ময়কর কার্য সম্পাদন করেছে; এমন সব বিজয়াভিযান চালিয়েছে যা পূর্ববর্তী যুগের গোটা জাতির দেশান্তরী অভিযাত্রা ও ধর্মযুদ্ধকে ম্লান ক'রে দিয়েছে।···উৎপাদনের নিয়ত পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক অবস্থার অবিরাম বিশৃঙ্খলা, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং আন্দোলন পূর্বের যুগগুলি থেকে বুর্জোয়া যুগকে বিশিষ্টতা দেয়; সুনির্দিষ্ট, সুসংহত সম্পর্কগুলি তাদের সমস্ত প্রাচীন এবং পবিত্র সংস্কার ও বিশ্বাস নিয়ে ভেসে যায়, নবগঠিত সম্পর্কগুলিও দানাবাঁধার পূর্বেই পুরাতনের দলে চলে যায়। যা কিছু কঠিন, গলে হাওয়ায় উড়ে যায়; যা কিছু পবিত্র অপবিত্র হয়, আর মানুষ অবশেষে স্থিরবুদ্ধি নিয়ে তার জীবনের প্রকৃত অবস্থা এবং তার জাতির সঙ্গে তার সম্পর্কের সম্মুখীন হ'তে বাধ্য হয়।

সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া শ্রেণীর এই প্রচণ্ড বৈপ্লবিক ভূমিকার গুরুত্ব অনেক সময়ই আমরা ভুলে যাই—শুধু উৎপাদন শক্তির বিকাশ ঘটানোর জন্যই নয়, তাবৎ কুসংস্কার, জড়ত্ব, সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া দার্শনিক ও চিন্তানায়কদের সংগ্রাম আজকের শ্রমিকশ্রেণীর কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক উত্তরাধিকারসূত্রে এসে পৌছয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বুর্জোয়াশ্রেণীর এই জাগরণ, চিন্তাজগতে আলোকপ্রাপ্তি বা এনলাইটেনমেণ্টের সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন, কারণ এক দার্শনিক বিপ্লব ফ্রান্সের রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটিয়েছিল (এঙ্গেল্‌স্-ই 'লুডভিগ ফয়ারবাখ'-এ এই মন্তব্য করেছেন), এবং সেই দার্শনিক বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো চিন্তা-পদ্ধতির সর্বোচ্চ রূপ হিসেবে দ্বান্দ্বিক বা ডায়ালেকটিক্‌স্-এর পুনর্গ্রহণ। আজও

বিশেষত আমাদের মতো দেশে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স শিক্ষার বিশেষ উৎস হতে পারে। সাহিত্য অকাদেমী রুশো ভলত্যার প্রমুখের রচনাবলী বাঙলায় প্রকাশ করে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের জাতীয় আয় দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে যায়। স্বভাবতই উচ্চতম শ্রেণীর হাতেই তার সিংহভাগ গিয়ে পড়ে—বিলাস-বাহুল্য এবং সাজানো-গোছানো বাসস্থানের দিকে নজর পড়তে থাকে। আসবাব পত্রের পুরনো ধরনই পালটে যায়, সরল রেখার জায়গায় বক্ররেখার বিন্যাস আসতে থাকে, পম্পেই আবিষ্কারের পর আলেকজান্দ্রিয় রীতির প্রচলন শুরু হয়। মেহগনীর ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। এই সম্পদ চুঁইয়ে চুঁইয়ে পৌছয় কারিগর, দোকানদার এবং ধনী কৃষকের কাছে। চা এবং চিনি, যা আগে কেবল ধনীদেরই ব্যবহার্য ছিল, জনসাধারণের পণ্য হয়ে ওঠে। জনসংখ্যা খুব একটা বেশি হারে বাড়েনি, দুর্ভিক্ষের সংখ্যাও কম ছিল, মৃত্যুহারও হ্রাস পায়। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, নতুন ব্যবসা বাণিজ্য, যন্ত্র ও যন্ত্রশক্তি ধীরে ধীরে ইওরোপের চেহারা পাল্টে দিচ্ছিল। পশ্চিম ইওরোপ ক্রমশই সম্পদশালী হয়ে উঠছিল।

এই কাঠামোর ওপরেই গড়ে ওঠে এক আশাবাদের দর্শন। স্যার আইজাক নিউটন এক কার্যকারণ সম্পর্কে গ্রথিত মহাবিশ্বের চিত্র দিয়েছিলেন—যেখানে যান্ত্রিক শৃঙ্খলা সদাবর্তমান। ধরে নেওয়া হলো. বিশ্বচরাচরের তাবৎ প্রাণীও একটি পরম্পরায় সাজানো রয়েছে···কীট থেকে স্বর্গীয় দেবদূত পর্যন্ত ধাপে-ধাপে একটি সিঁড়ি উঠে গেছে, তার মধ্যে একটি ধাপে রয়েছে মানুষ। এই পরম্পরা ঈশ্বরের সৃষ্টি, এবং ঈশ্বর নিজে যেহেতু সু এবং মঙ্গলের অধিষ্ঠাতা সেহেতু তাঁর সৃষ্টিও তারই প্রকাশ। এই পৃথিবী সৃষ্টি এবং এখানে যা কিছু ঘটে তার যাথার্থ্য এবং শ্রেষ্ঠতা তাই প্রশ্নাতীত। অংশত বা খণ্ডত যা খারাপ মনে হয়, সমগ্র জীবের এই মহাগ্রন্থিতে তা আসলে মঙ্গল। একজন স্পিনোজা (omnis existentia est perfectio) বা একজন লাইবনিৎস্‌-এর আধিবিদ্যক চিন্তায় হয়তো এই সর্বমঙ্গলময় সৃষ্টির মাহাত্ম্য ধরা পড়েছিল, কিন্তু বোলিংব্রুক ও শ্যাফট্‌বেরীর সাহায্যে কবি আলেকজাণ্ডার পোপ দ্বিপদীতে গেঁথে এর যা চেহারা দিয়েছিলেন তার মূল কথা দাঁড়ায় এই :

All partial evil, universal good.

All discord, harmony not understood. (Essay on Man)

এবং

Of systems possible, if'tis contest
That Wisdom infinite must form the best.
Where all must full or not coherent be,
There must be, somewhere, such a rank as man.

পোপ-এর এই দার্শনিক কাব্য প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই চমৎকার ফরাসীতে অনূদিত হয়েছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর একদল মানুষের প্রিয় দর্শন হয়ে উঠেছিল। এই আশাবাদী দর্শনের ছটায় যুবক ভলত্যারেরও চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। তবে জগতে কোথাও অমঙ্গল নেই, অন্যায় নেই এমন কথা কোনো-দিনই তিনি মানতে পারেননি। 'জাদিগ'এ জেসরাদ-এর সঙ্গে কথোপকথনের সময় জাদিগ-এর বাঙ্ময় 'কিন্তু—'ই তার প্রমাণ। অনুরূপভাবে রুশোর 'মানুষের মধ্যে অসাম্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা'য় মানবসমাজের বীভৎসতার চিত্র দেখেও ভলত্যার শিউরে উঠলেও "কেবল প্রকৃতিই ভালো" বা "মহৎ বর্বর"-এর কথাও সত্য বলে মানতে পারেননি।

Whatever is, is right, যা কিছু আছে, তা ঠিকই আছে এই যে দর্শন, বেসিল উইলি যার নাম দিয়েছেন 'কসমিক টোরিইজ্‌ম্', তা আসলে স্থিতাবস্থার পক্ষসমর্থন মাত্র। 'আশাবাদ' শুধু এইটুকুই যে এক মঙ্গলময় ঈশ্বর মানুষের স্রষ্টা, এবং যেহেতু এক সর্বাত্মক মঙ্গল থেকে এই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি, সেহেতু অমঙ্গল বলে কিছু নেই। এর নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় এই যে, যেহেতু শ্রেষ্ঠতম জগতে একটি সুশৃঙ্খল বিন্যাসে আমরা রয়েছি, এক অনিবার্য পরম্পরায় সব কিছু সাজানো রয়েছে সেহেতু আর উন্নতির কোনো পথ নেই, সবকিছুই পূর্বনির্দিষ্ট হয়ে আছে এবং ঠিকই আছে। এর উদ্দেশ্যও অত্যন্ত স্পষ্ট: সামাজিক স্তরভেদ রক্ষা করা।

১৭৫৫ সালের ১লা নভেম্বর, পবিত্র সন্ত দিবসে লিসবন শহর এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল। ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার লোক সেই এক ভূমিকম্পে নিহত হয়। অধিকাংশ মানুষই তখন গীর্জায় উপাসনারত। এই সংবাদ পেয়ে ভলত্যার কেঁদে উঠেছিলেন। "পোপ যদি লিসবনে থাকতেন, তবে কি তিনি বলতে সাহস পেতেন, সব ঠিক আছে?" এর কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হলো "লিসবন-ভূমিকম্প বিষয়ক কবিতা"। তার ভূমিকায় তিনি লেখেন: "এই নীতিবাক্য, 'যা কিছু আছে, তা ঠিকই আছে' যারা এইসব বিপর্যয়ের প্রত্যক্ষদর্শী তাদের কাছে খানিকটা অস্বাভাবিক মনে হবে। সব জিনিসই

নিঃসন্দেহে বিধাতা কর্তৃক সাজানো রয়েছে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এ-কথাও স্পষ্ট যে আমাদের বর্তমান সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য সব কিছু সাজিয়ে রাখা হয়নি।" ঐ কবিতাতে ভলত্যার 'আশাবাদ'কে বিদ্রূপ করেন 'ভ্রান্ত দর্শন ও বৃথা প্রজ্ঞা' বলে :

Grieve not, that others' bliss may oveflow.
Your sumptuous palaces are laid thus low ;
Your toppled towers shall other hands rebuild ,
With multitudes your walls one day be filled ;
Your ruin on the North shall wealth bestow,
For general good from partial ills must flow ;

ভলত্যারের জীবদ্দশায় ৩৬ খণ্ডে তাঁর রচনাবলীর যে ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় (১৭৬১-৬৯), তাতে এই কবিতাটির অনুবাদ করেছিলেন ঔপন্যাসিক টবিয়াস স্মলেট (উদ্ধৃতিটি সেই অনুবাদ থেকে)। ভলত্যারের যুক্তি অবশ্য রুশোর পছন্দ হয়নি, একটি লম্বা চিঠিতে তিনি লেখেন, "অধি-বিদ্যার সব মারপ্যাঁচ মিলেও আমাকে আত্মার অমরত্ব ও মঙ্গলময় বিধাতা সম্পর্কে এক মুহূর্তের জন্যও সন্দিগ্ধ করে তুলতে পারবে না। আমি অনুভব করি, আমি বিশ্বাস করি, আমি ইচ্ছা করি, আমি আশা করি আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত একে আমি রক্ষা করে যাব।"

ভলত্যার এর কোনো উত্তর দেবার চেষ্টা করেননি। কিন্তু লিসবন ভূমিকম্প থেকে শুরু করে মানুষের জীবনের বহু অমঙ্গল, অবিচার ও অন্যায় দিক নিয়ে এক তীব্র বিদ্রূপ হিসেবে ১৭৫৯ সালে জনৈক ডক্টর রাল্‌ফ্‌-এর নামে একটি বই প্রকাশিত হলো—"কাঁদিদ বা আশাবাদ"। একটি দার্শনিক মত খণ্ডনের জন্য ভলত্যার আরেকটি গুরুভার প্রবন্ধগ্রন্থ লিখলেন না। বরঞ্চ কাল্পনিক ভ্রমণকাহিনীর মাধ্যমে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের যে পথ পরিক্রমণ করেছিলেন জোনাথন সুইফট্‌ ('দার্শনিক পত্রাবলী'তে ভলত্যার তাঁর সম্পর্কে সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন) সেই পথ ধরে রচনা করলেন একটি 'মরাল ফেব্‌ল্‌'। ডঃ পাঁগ্লস এই কাহিনীতে আশাবাদের প্রবক্তা, হাজার দুঃখকষ্ট সয়েও তিনি লাইবনিৎস-এর অনুগামী থেকেই যান, বিশ্বাস না-করা সত্ত্বেও বলে চলেন যে সবকিছু চমৎকারভাবে চলছে, কারণ দার্শনিক কখনো স্ববিরোধিতা করতে পারেন না। কাঁদিদ অবশ্য সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য সয়ে শেষ পর্যন্ত ভিন্ন সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছয় : আমাদের কর্তব্য

আমাদের বাগান চাষ করা।

ভলত্যারও কি এই মতের পরিপোষক ছিলেন? নিজের বাগান চাষ করা বলতে তিনি ঠিক কী বোঝাতে চান? এ-বিষয়ে অরুণ মিত্র লিখেছেন, "অর্থহীন অসাম্য, অসামঞ্জস্য ও অবিচারপূর্ণ পৃথিবীর এক নৈরাশ্যজনক ছবি তিনি এঁকেছেন, কিন্তু উপসংহারে মানুষের সুখী হবার একটা পথেরও নির্দেশ দিয়েছেন। পথটা হলো: আসল সত্য কি, জীবনের রহস্য কি, এসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে যার যার নিজের কাজ করে যাওয়া।" (ভূমিকা: ১৩ পৃষ্ঠা)

কিন্তু ভলত্যার কি সত্যই তাই বিশ্বাস করতেন? 'একটি সদ্ ব্রাহ্মণের কাহিনী'তে সুখ এবং যুক্তিবুদ্ধি পরস্পরবিরোধী হয়ে দেখা দিয়েছে। কাহিনীর শেষে ভলত্যার লিখেছেন: "কিন্তু বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করার পর আমার মনে হলো সুখের তুলনায় যুক্তিবুদ্ধিকে পছন্দ করাটা নিছক পাগলামি। কিন্তু কী করে এই বিরোধ ব্যাখ্যা করা যায়। অন্য সব কিছুর মতোই তার ব্যাপারও অনেক কিছু বলা যেতে পারে।" দার্শনিক অভিধানে 'আদর্শবাদ' সম্পর্কে ভলত্যারের শেষ মত ছিল: "রোমান বিচারকরা কোনো মামলা বুঝতে না-পারলে যে দুটি বর্ণ ব্যবহার করতেন, অধিবিদ্যার প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে তাই লিখে রাখা যাক। N. L. (non liquet), এটি পরিষ্কার নয়। বিচার-বিবেচনা ব্যতিরেকে শুধু পেটে খাওয়াই মানুষের চূড়ান্ত সুখ এ-কথা ভলত্যার বা কোনো 'ফিলোসফ'-এর পক্ষে মেনে নেওয়া খুবই শক্ত। এ-বিষয়টি ভলত্যারের কাছেও বোধহয় non liquet হয়েই থেকে গিয়েছিল।

কিন্তু 'কাঁদিদে'র মহত্ত্ব তার সমাধানের জন্য নয়, বাস্তব ঘটনা (লিসবন ভূমিকম্প, তার পরবর্তী "বিশ্বাসের কাজ" অর্থাৎ জীবন্তদাহন, অ্যাডমিরাল বিং-এর হত্যাদণ্ড) এবং কাল্পনিক দেশভ্রমণ (এল দোরাদো) মিলিয়ে ভলত্যার 'আশাবাদে'র সমস্ত তত্ত্বকে যেভাবে ভূমিস্যাৎ করেছেন, সেই বিদ্রূপের অকল্পনীয় ঔজ্জ্বল্য আজও আমাদের মুগ্ধ করে। ডঃ পাঁগ্লস চরিত্রটি অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে, কিন্তু তার চরিত্রের এই সমতলত্ব বা ফ্ল্যাটনেস কোথাও অস্বাভাবিক নয়। সোম জেনিন্স (Soame Jenynes) তাঁর Free Enquiry into the Nature and Origin of Evil (১৭৫৭) গ্রন্থে পাঁগ্লসের মতোই 'নাইভ' দৃঢ়তার সঙ্গে এই আশাবাদের বাণী প্রচার করেছিলেন এবং ডঃ জনসন কর্তৃক সমালোচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। ভলত্যার সাধারণ-তন্ত্রী ছিলেন না, সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের প্রতিই ছিল তাঁর পক্ষপাত।

এল দোয়াদো রুশোর স্বর্গরাজ্য হলেও হতে পারে, ভলত্যার সেখানে থাকতে চাননি। ভলত্যারের কোনো ইউটোপিয়া নেই। 'আলোকপ্রাপ্ত স্বৈরতন্ত্রী'দের সম্পর্কে তাঁর আস্থা ফ্রেডেরিককে দেখেশুনে নিশ্চয়ই আর অটুট ছিল না। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব তাঁকে সম্মান দিয়েছে, তাঁর দেহ বাইরের সমাধি থেকে নিয়ে এসে প্যারিসে পাঁতেয়ঁতে সমাধিস্থ করেছে। বৃটিশ লোকসভায় এডমণ্ড বার্ক সকলকে এক বন্ধনীর মধ্যে ফেলে ঘোষণা করেছিলেন, "আমরা রুশোর হাতে মতান্তরিত হইনি, আমরা ভলত্যারের শিষ্য নই, হেলভেতিয়াস আমাদের মধ্যে এগোতে পারেননি। নাস্তিকরা আমাদের ধর্মোপদেষ্টা নন, পাগলরা আমাদের আইন প্রণেতা নন। আমরা জানি আমরা কোনো আবিষ্কার করিনি, এবং মনে করি নৈতিকতার ক্ষেত্রে কোনো আবিষ্কারের প্রয়োজন নেই," ইত্যাদি ইত্যাদি। "রুশো", ডঃ জনসনও একবার বলেছিলেন, "খুব খারাপ লোক"। বসওয়েল জিজ্ঞেস করেন, "স্যার আপনি কি তাঁকে ভলত্যারের মতো খারাপ মনে করেন?" জনসন বলেন, "দেখুন, স্যার, ওঁদের মধ্যেকার অধার্মিকতার মাত্রাভেদ স্থির করা কঠিন"। ধর্মের নামে যারা উপনিবেশ গেড়ে বসে, মানুষকে জীবন্ত দহন করে, লোককে ঠকায়—সে ধর্মের বিরুদ্ধে ভলত্যার দিদেরো সকলেই সোচ্চার ছিলেন। ইনকুইজিশনের বিরুদ্ধে রুশো ভলত্যারের জেহাদ, ক্যালভিনিস্টদের গোঁড়ামি সম্পর্কে তাঁর তির্যক মন্তব্য, সর্বোপরি তাঁর প্রিয় কথা—Ecrasons l'infame—এসো জঘন্যকে চূর্ণ করি—মূলত পরিচালিত হয়েছে ধর্মীয় কুসংস্কার, অসহিষ্ণুতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে। আজকের দিনে অসহিষ্ণুতার আকার বদলেছে, প্রকার বদলায়নি। ধর্মের জায়গায় শুধু এসেছে রাজনীতি—আর রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা, কুযুক্তি ও কুসংস্কারের জয়যাত্রা দেখে ভলত্যারের মতো কলমের উপযোগিতা আরও বেশি করে অনুভব করা যায়।

ফরাসী না-জেনে, শুধু ইংরেজি অনুবাদে ভলত্যারের কিছু লেখা পড়ে পুস্তক-পরিচয় লেখা খুবই লজ্জার ব্যাপার। কিন্তু ভলত্যার তো ভাষার বেড়ায় আটকে থাকার লোক নন, এবং এ-অনুবাদের ব্যাপারে অরুণবাবুর যোগ্যতাও প্রশ্নাতীত। এর আগে অশোক গুহ, সম্ভবত ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বনে, কাঁদিদের তর্জমা করেছিলেন। দেবীপদ ভট্টাচার্য মূল ফরাসী থেকে আর একটি অনুবাদ করেছিলেন, 'পথিকৃৎ' পত্রিকায় ১৯৬৩ সাল থেকে তা ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল (তবে শেষ অধ্যায়টি শেষ পর্যন্ত আর বেরোয়

নি)। অরুণবাবু অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় বিষয়ে কিছু টীকা যোগ করেছেন, তা অত্যন্ত সুষ্ঠু হয়েছে। তবে আরও কিছু টীকা থাকলে অ-খ্রীস্টান বাঙালি পাঠকের বোধহয় সুবিধা হয়। যেমন খ্রীষ্টবিরোধী বা Anti-Christ প্রসঙ্গে (পৃষ্ঠা ৮)। ভূমিকাটিও যথেষ্ট তথ্যবহুল।

এভ্রিম্যান লাইব্রেরী সংস্করণের মতো ভূমিকার শেষে লেখকের একটি কালানুক্রমিক গ্রন্থপঞ্জি থাকলে সাহিত্য অকাদেমী সংস্করণগুলির মূল্য আরও বাড়ে। কর্তৃপক্ষ যদি এই বিষয়টি চিন্তা করেন তো ভালো হয়। আশা করব, রুশো ভলত্যারের পর দিদেরোর রচনা অনুবাদের দিকে সাহিত্য অকাদেমী নজর দেবেন।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

British Foreign Policy, During world war II: ভি. ট্রুখানোভস্কি। প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো।

খোদ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী তথা সমরনায়ক উইনস্টন চার্চিলের লেখা বারো খণ্ডে অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে পেপারব্যাকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্পর্কিত বৃহৎ পুস্তকে কিছু বিতর্কমূলক প্রশ্নাদি তোলা হয়েছিল, যার একটা অন্য চিত্র এবং খানিকটা জবাব সম্প্রতি প্রকাশিত British Foreign Policy during World War II পুস্তকে পাওয়া যাবে।

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালপর্যায় (period) ভাগ নিয়েই তর্ক উঠেছে। চার্চিলের মতে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালটিকে (১৯১৮-১৯৩৯) বলা যায় একটা যুদ্ধবিরতির যুগ; তারপর ১৯৪০-৪১-এ ব্রিটেন একা লড়ছে; তৃতীয় পর্যায়, ডিসেম্বর ১৯৪১ থেকে ১৯৪২এর শেষ পর্যন্ত। এই তৃতীয় পর্যায়েই 'Grand Alliance' বা মিত্রশক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একজোটে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায় এবং সর্বশেষ, ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৫-এ একধারে যুদ্ধে জয় অন্যদিকে ট্র্যাজেডি।

আলোচ্য লেখক এই কালপর্যায় ভাগ স্বীকার করেন না,—তাঁর মতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তিনটি স্তর বা বিভাগ রয়েছে। প্রথম, সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে এপ্রিল ১৯৪০, যাকে phoney war (ভাঁওতার যুদ্ধ) বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ নামে

ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মান ফ্যাশিস্ত শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেও আসলে পূর্বতন মিউনিকের আপোষনীতিরই জের টেনে জার্মান সমরশক্তিকে তারা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করতে চেষ্টিত ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে, যে ১৯৪০ থেকে ১৯৪২-এর শেষ অবধি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আত্মরক্ষায় নিযুক্ত ; ১৯৪২-এর শেষদিকে, নভেম্বরে স্টালিনগ্রাদে জার্মান ফ্যাশিস্ত বাহিনী প্রথম সোভিয়েত লাল ফৌজের হাতে চরম আঘাত ও পরাস্ত হওয়ার পর থেকে যুদ্ধের যেমন ভাগ্য পরিবর্তন হলো, বোঝা গেল যতো দেরীতেই হোক, সোভিয়েত একাই জার্মান ফ্যাশিস্ত শক্তিকে পরাস্ত করতে সক্ষম, তেমনি আবার নতুন করে, কিছুটা চেখে-চেখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত হয়, অর্থাৎ পুরানো মিউনিক আপোষনীতিতে নতুন অবস্থা চালু করতে শুরু করে।

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা স্টালিনগ্রাদে সোভিয়েতের জয়ে। উইনস্টন চার্চিলের বিশেষ কৃতিত্ব যে, এটা বুঝতে তাঁর এক মুহূর্তও দেরী হয়নি। হিটলারের হাতে পরাজয় থেকে ব্রিটেন বেঁচে গেল। তাতে অবশ্য আনন্দ করার কথা।" কিন্তু তা হয়নি। এ-জয় ব্রিটেনের শাসক শ্রেণীর পক্ষে বিষাদের কথা, কারণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীর ভিত্তিতে যে জয়ের সম্ভাবনা, তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই আখেরে ক্ষতি হবার কথা (হলোও তাই)।

কমরেড রজনী পাম দত্ত তাঁর পত্রিকা 'লেবার মান্থলি'র বিখ্যাত মাসিক নোট্‌সে লিখছেন :

"১৯৪৩ সালে (অর্থাৎ, স্টালিনগ্রাদে যুদ্ধে জয়ের পর পশ্চিমী শাসকবর্গ একেবারে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন…। সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে পশ্চিমী ফ্রন্ট গড়ে তোলা, কুয়িবেক চুক্তি অনুসারে এ্যাটম বোমা তৈরি করবার পরিকল্পনাও এই সময়েই নেওয়া হয়।) এই যুদ্ধাস্ত্র (এ্যাটম বোমা) যে ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত না হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে, সেটাও তখন পশ্চিমী শাসকবর্গের কাছে পরিষ্কার ছিল।" (লেবার মান্থলি, ১৯৬৩)

প্রসঙ্গত, এ্যাটম বোমার রিসার্চ প্রজেক্টের ('ম্যানহাটান প্রোজেক্ট') ডিরেক্টার জেনারেল গ্রোভস বৈজ্ঞানিক ওপেনহাইমারের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে, "ম্যানহাটান প্রোজেক্টের

পরিকল্পনার সময়ই আমার কাছে পরিষ্কার ছিল যে এ্যাটম বোমা তৈরি হলে সেটা হয়তো একদিন ব্যবহৃত হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে।" (প্রফেসার ব্ল্যাকেটর 'Atomic Energy in East West Relations' নামক ছোট পুস্তকটি দ্রষ্টব্য)।

আজ অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণ করা যায় যে, জার্মান নাৎসীদের ও ইতালিয়ান ফ্যাশিস্তদের গোড়া থেকেই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী ব্যক্তিরা তোষণ করে চলেছিল, দুধ-কলা দিয়ে সাপ পুষছিল এই আশায় যে, জার্মান নাৎসী বা ইতালির ফ্যাশিস্তরা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে লড়ে যাবে, আর তাহলে 'যা শত্রু পরে-পরে' এই নীতি অনুসারে ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের দুই শত্রু, প্রথম সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত, দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মান সাম্রাজ্যবাদ পরস্পরকে ধ্বংস করে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বজোড়া আধিপত্যের পথ খুলে দেবে। অবশ্যই এই হিসাবের মধ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব ছিল ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে, অন্যদিকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চীনের জাতীয় মুক্তি-স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে আগ্রাসী নীতি চালিয়ে যাচ্ছিল।

এই বিশ্ব-পরিস্থিতিতে মিউনিকে ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির (চেম্বারলিন ও দালাদিয়ে) যখন হিটলার-মুসোলিনীর হাতে চেকোস্লোভাকিয়া তুলে দিল এবং বোঝা গেল যে, ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিবর্গ কিছুতেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফ্যাশিজমকে ধ্বংস করতে রাজি নয়, কারণ তাঁদের আশা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ লাগবে, ঠিক তখনই ১৯৩৯ সালের ২৩এ আগস্ট 'সোভিয়েত জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। চেম্বারলিনের তোষণ-নীতির (জার্মানি ফ্যাসিজমকে) সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটল। বলা বাহুল্য, আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেই কমরেড স্টালিনের পক্ষে এই অপূর্ব কূটনৈতিক চালের দ্বারা চেম্বারলিনের তোষণ-নীতির সম্পূর্ণ পরাজয় করা সম্ভব হয়েছিল।

এরপরে ইউরোপে দ্রুত পটপরিবর্তন। ১লা সেপ্টেম্বর পোলাণ্ডের ওপর হিটলারের বর্বর আক্রমণ শুরু হলো, ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ পোলাণ্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকলেও দুইদিন সময় নিল। ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯-এ যুদ্ধ ঘোষণা করল। কার্যত তারা পোলাণ্ডকে আসল সাহায্য কিছুই করল না! ১৯৪০এর মার্চ মাস অবধি এই ভাঁওতার যুদ্ধ বা phoney war চলল, ইঙ্গ-ফরাসীদের আশা পূর্ব-ইউরোপে দ্রুতবেগে (ব্লিৎস্-ক্রিগ) অগ্রসর হতে হতে শেষ অবধি

জার্মান ফ্যাশিজমের সঙ্গে সোভিয়েতের যুদ্ধ লেগে যাবে।

এই যুদ্ধ লাগানোর বহু চেষ্টা হয়েছে, ফিনল্যাণ্ডকে প্ররোচিত করে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওদিকে বাকু তৈলখনিতে বোমা বর্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আলোচ্য পুস্তকে এই প্রত্যেকটি ঘটনা সম্পর্কে প্রচুর প্রামাণিক তথ্য ও দলিল এবং পরে প্রকাশিত গুপ্ত রিপোর্ট ইত্যাদি উদ্ধৃত করে প্রমাণ হাজির করা হয়েছে, স্থানাভাবে যার উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া সম্ভব হলো না।

'ভাঁওতা যুদ্ধে' আগেকার মিউনিক তোষণ-নীতিরই সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে হিটলার প্রথমে ডেনমার্ক নরওয়ে, পরে ফ্রান্স দখল করলেন। ব্রিটেনের আত্মরক্ষার প্রশ্ন বড়ো হয়ে দেখা দিল, ডানকার্ক (ফরাসী উপকূল) থেকে কোনো রকমে ব্রিটিশ ও কিছু ফরাসী সৈন্যকে হটিয়ে আনার পরে শুরু হলো ব্রিটেনের ওপর বিশেষ করে লণ্ডন ও দক্ষিণ ইংলণ্ডের ওপর জার্মানীর বোমা বর্ষণ, ইতিহাসে যেটা 'Battle of Britain' বলে আখ্যাত। ব্রিটিশ বিমানবাহিনী (R. A. F.) অমিত তেজে আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করলেও (লেখক যার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন), ধ্বংস এতো বেশি হতে থাকল যে সেপ্টেম্বর ১৯৪০ সালে খোদ ইংলণ্ড আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত হয়ে দেখা দিল। এমনকি ব্রিটেন অধিকৃত হলে ব্রিটিশ জাতকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেবার (সবল মানুষদের ধরে জার্মানীতে জোর করে চালান করে দেওয়া হবে) এবং ব্রিটেনের প্রখ্যাত প্রতিটি বুদ্ধিজীবীদেরই খতম করবার লিস্ট জার্মানী তৈরি করল। এই লিস্টে একদিকে বার্ট্রাণ্ড রাসেল,এইচ. জি. ওয়েলস থেকে শুরু করে প্রফেসার হলডেন, রজনী পাম দত্ত প্রমুখ সকল কমিউনিস্ট নেতারই নাম ছিল।

কিন্তু হিটলার শেষ মুহূর্তে ব্রিটেনের আক্রমণের প্ল্যান স্থগিত রাখলেন। কেন? লেখক বলছেন:

"তিনি (হিটলার) ব্রিটেনের বিরুদ্ধে পুরো সৈন্য নিয়োগ করে আক্রমণ করার ঝুঁকি নিতে সাহস করলেন না, কারণ তাঁর পশ্চাদভাগে (rear) রয়েছে অমিতশক্তিশালী সোভিয়েত ইউনিয়ন।" (পৃষ্ঠা ১১১) বুর্জোয়া ঐতিহাসিক, আমেরিকান ওয়াল্টার এন্‌সেলের উদ্ধৃতি দিয়েও লেখক উক্ত বক্তব্য প্রমাণ করেছেন।

এরপরে একদিকে হিটলার যেমন পূর্ব-ইউরোপে বল্কান অঞ্চলে অগ্রসর হতে লাগলেন, ওদিকে তখন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল বিশেষ করে আমেরিকাকে

তোয়াজ করে যুদ্ধে নামাবার প্রয়াসী হলেন। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে আমেরিকার সঙ্গে ব্রিটেনের Lend-lease চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো।

২

২২শে জুন, ১৯৪১এ জার্মানী সোভিয়েতকে আক্রমণ করার পূর্বে হিটলারের ডেপুটি হেসকে পাঠিয়ে ব্রিটেনকে সোভিয়েত-বিরোধী যুদ্ধে দলে টানবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ততদিনে জার্মানীর হাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্বই বিপন্ন প্রায়। জার্মান-ব্রিটিশ আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব এমন চরমতম অবস্থায় পৌঁছেছে যে, তখনকার মতো মিউনিক তোষণ-নীতিকে বর্জন করে, সোভিয়েত আক্রান্ত হবার পরে ব্রিটেনকে সোভিয়েতের সঙ্গে একজোটে হিটলারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলো।

১২ই জুলাই ১৯৪১-এ এ্যাংলো-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও, পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলে সোভিয়েতকে আসল সাহায্য দিয়ে যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ করতে ব্রিটেন গড়িমসি করতে লাগল। এর সম্পর্কে ভূরি ভূরি প্রমাণ আলোচ্য পুস্তকে ও স্বয়ং চার্চিলের ১২ খণ্ডের 'স্মৃতিকথা'তে প্রচুর পাওয়া যাবে।

পার্ল বন্দরে জাপান আক্রমণ-যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পরে আমেরিকাও যুদ্ধে নামল, একদিকে তিন মিত্রশক্তি—ব্রিটেন আমেরিকা ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতইউনিয়ন, অন্যদিকে ফ্যাশিস্ত জার্মানী, ইতালী ও জাপান বা অক্ষশক্তি। এবারে সত্যই প্রায় সারা দুনিয়া জুড়ে, অতলান্তিক, প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগর, এশিয়া ও ইউরোপের ভূখণ্ড ব্যেপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হলো।

আমরা প্রবন্ধের গোড়াতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্তরভাগ বা কালপর্যায় আলোচনা করতে গিয়ে বলেছি—স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধে হিটলার বাহিনী পর্যুদস্ত ও পরাজিত হওয়ার পরে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যখন বুঝল যে, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন একাই সারা ইউরোপকে ফ্যাশিজমের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে সক্ষম, এবং তাহলে সারা ইউরোপে সমাজতন্ত্র বা কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হবে; বিশেষ করে ফ্যাশিস্ত পদানত ইউরোপের দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তিফ্রণ্ট গড়ে উঠছে এবং তারা অস্ত্র হাতে গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে লড়ে চলছে (ফ্রান্স, মুসোলিনীর খোদ ইতালীতেই দ্রুত ও সংগঠিত পার্টিজান-বাহিনী গড়ে উঠছিল); তখনই ৬ই জুন, ১৯৪৪-এ পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হলো।

নিছক সামরিক দিক থেকে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় এবং স্টালিনও সেকথা বারবার চার্চিলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন। অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত লাল ফৌজও তখন সোভিয়েত ভূমিকে ফ্যাশিস্ত শৃঙ্খলমুক্ত করে অমিততেজে পূর্ব-ইউরোপকে মুক্ত করতে করতে বার্লিনের দিকে ধাবমান।

মনে রাখা দরকার লাল ফৌজের দ্রুত অগ্রগতিতে গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল যে খুসী হতে পারেন না, সেকথা বলাই বাহুল্য। প্রথমত, পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে টালবাহানা করে তিনি দক্ষিণ ইতালী ও বল্কানে ঢুকতে চেয়েছিলেন, গ্রীসের মুক্তি আন্দোলনকে রক্তবন্যায় দমন করে দিয়েছিলেন; তথাপি একদিকে জনগণের চাপে অন্যদিকে বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মত ছিল স্টালিনের দিকে, অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের পক্ষে, ফলে বৃটেনকে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার ব্যবস্থা করতে হলো। চার্চিল, রুজভেল্ট ও স্টালিনের ১৯৪৩-এ তেহরান কন্‌ফারেন্সের যে বিবরণ আলোচ্য পুস্তকে ও স্বয়ং চার্চিলের স্মৃতিকথাতে পাওয়া যায়, তাতে উপরোক্ত বক্তব্যের পুরো প্রমাণ দেওয়া সম্ভব। এজন্য দীর্ঘ উদ্ধৃতি প্রয়োজন এবং স্থানাভাবে সেটা সম্ভব নয়।

তেহরানে মিত্রশক্তি ঘোষণা করেছিল, যুদ্ধান্তেও তাদের মৈত্রী অটুট থাকবে এবং তাতেই পৃথিবীতে শান্তি রক্ষিত হবে। কার্যক্ষেত্রে যুদ্ধান্তের 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' বা মিত্রশক্তির মৈত্রীর মধ্যে ফাটল দেখা দিল এ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ থেকেই। একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। সে আর এক ইতিহাস, যার কথাও অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে (লেখকের সমালোচিত Flemingএর 'History of the Cold War') 'পরিচয়'-এ কয়েক বছর পূর্বে।

আলোচ্য পুস্তকের অন্তে লেখক বলছেন যে, যুদ্ধোত্তর ইউরোপে ব্রিটেন ক্রমশই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের উপর বেশি বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়তে লাগল। চার্চিলের আশা ছিল, যুদ্ধোত্তর দুনিয়াতে আধিপত্য করবে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। কার্যক্ষেত্রে ১৯৪৫-এ যুদ্ধান্তের পরে গত ২৫ বছরে একদিকে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা কায়েম হয়েছে, অন্য তৃতীয়াংশ জুড়ে জাতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠছে (ভারতবর্ষ প্রমুখ এশিয়া ভূখণ্ডের প্রায় সবটাই এবং আফ্রিকার কিছু অংশ)। বাকি তৃতীয়াংশেও স্বাধীনতা, বিশ্বশান্তি ও অনেক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম

দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে। হিটলারের দম্ভ, চেম্বারলিনের মিউনিক-তোষণ, যুদ্ধোত্তর যুগে ১৯৪৬-এ ফুলটনে চার্চিলের ঠাণ্ডাযুদ্ধ ঘোষণা—ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত। সত্তরের দশকে নতুন সমস্যা, কিন্তু পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত জয় ইতিমধ্যেই ঘোষিত। সাম্রাজ্যবাদ পরাস্ত নয় এখনও, তবে পূর্বাপেক্ষা অনেক দুর্বল—প্রমাণ ক্ষুদ্র ভিয়েতনামের হাতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দানবের পরাজয়।

দিলীপ বসু

পদ্মা আমার গঙ্গা আমার : দক্ষিণারঞ্জন বসু। প্রকাশক : মধুরেণ সিণ্ডিকেট, কলিকাতা-৩৫। তিন টাকা

কবি-সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'পদ্মা আমার গঙ্গা আমার' কাব্যগ্রন্থে বিধৃত হয়েছে ফেলে-আসা আরেক বাঙলার মধুমাখা স্মৃতি-চিত্র। বাঙালির আত্মিকচেতনার আবেগমথিত এই কণ্ঠস্বরে আধুনিক বাঙলা-কাব্যের জটিল-কুটিল আঙ্গিকচর্চা হয়তো নেই, কিন্তু জননী-জন্মভূমিকে কেন্দ্র করে এমন কিছু শুদ্ধ, সহজ-সরল আর্তি আছে যার সম্মুখে বিনম্র হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না।

সত্যিই তো কোনো কবি যদি তাঁর 'মাতৃভাষা মাতৃভূমি'কে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসার কথা বলেন, গ্রাম-বাঙলার নিসর্গ-শোভার প্রতি মুগ্ধ বিস্ময়ে দৃষ্টি ফেরান, নদ-নদী-জনপদ, মানুষ আর তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি হৃদয়ের টান অনুভব করেন এবং জন্মসূত্রে পাওয়া এইসব কিছুকে হারাবার বেদনায় কাতর হয়ে পূর্ববাঙলার কোনো গ্রাম্য-সজ্জনের মর্মবেদনাকে সহজ ভাষায় ব্যক্ত করে বলে ওঠেন : 'ও মুনসী ও মৌলভী/খবর কিছু রাখনি/এই ত্যাশ ছাইড়া গেছে যারা/আবার ফিরা আইব নি'/কিংবা, 'মাঝে মাঝেই বজ্রে যেন ডাকছে শুনি/সেই যোগিনী আমার গাঁয়ের সিদ্ধা নারী/হৃদয় কাঁদে সেই মা-মাটির কোলে যেতে/কি যে হলো, কি যে হলো কি যে হলো!'—তখন কাব্যপাঠকের মনেও তার কিছু অনুরণন পৌঁছে যায়।

কবি-সাংবাদিক দক্ষিণারঞ্জনও তাঁর কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় উপর্যুক্ত কাব্য-ভাবনাকেই মূলতঃ তুলে ধরতে চেয়েছেন। 'মাতৃভাষা মাতৃভূমি'কে

বন্দনা করেই তাঁর এই গ্রন্থের স্থচনা। তিনি অনায়াসে উচ্চারণ করেন: 'মাতৃভাষা মাতৃভূমি/এ দুই মায়ের চরণ চুমি/মাটির দেহে জীবন যতদিন।' ভাঙা বাঙলার কথা স্মরণ করে তাঁর মনে হয়: 'দিনে সূর্য, রাতে চাঁদ সহযোগী তারাদের নিয়ে/এখনো তেমনি রয় পাহারায় বঙ্গজননীর'/কিংবা, 'আমরা আবার বন্ধু হবো দু'বাঙলায়'/অথবা, 'মরবো না আমরা মরবো না/টুকরো করার তলোয়ার আর ধরবো না/হলাহলে আর প্রাণ-সমুদ্র ভরবো না/মরবো না আমরা মরবো না।' প্রকৃতপক্ষে একজন বয়স্ক বাঙালির শুদ্ধ আবেগ থেকেই এই কবিতার জন্ম। তাই এর প্রকরণ-পদ্ধতির সরলীকরণের কথা উত্থাপনকরা অবান্তর প্রশ্ন মাত্র।

আমরা জানি, আমাদের বঙ্গভূমি 'গঙ্গা-হৃদি' হয়েও প্রমত্ত পদ্মারও লীলাভূমি। তাই প্রত্যেক বাঙালি কবি বাঙলার এই দুই স্রোতধারায় অবগাহন করতে চেয়েছেন বারংবার। কবি দক্ষিণারঞ্জনও এর ব্যতিক্রম নন। এই গ্রন্থের নামকরণেই তাঁর মানসিকতা স্বয়ং প্রকাশিত। এবং তিনি যখন বলেন: 'পদ্মা আমার প্রাণ, গঙ্গা আমার হৃদযন্ত্র' তখন আমাদের মনের কথাই এর মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। কবির 'পদ্মাপারের মেয়ে'-র 'কাজল কালো চোখের মায়া'য় আমরা যেমন স্বপ্নাতুর হয়ে উঠি তেমনি যখন তিনি বলেন: 'ঢাকা আমায় ডাকছে কেবল/ডাকছে এসো এইখানে/কুয়াশা তো গেছেই সরে/তাইতো এমন প্রাণ টানে!'—তখন এই মুহূর্তে, এই পংক্তি-চতুষ্টয় অন্য তাৎপর্যে এ-পারের বাঙালি-মনে তোলপাড় তোলে।

আজ যখন "স্বাধীন বাঙলাদেশ" তার সমগ্র বাঙালি সত্তা নিয়ে পাকিস্তানের বর্বর সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয় সংগ্রামে রত, তখন কবি দক্ষিণারঞ্জন বসুর এই কাব্যগ্রন্থ দুই সংগ্রামী বাঙলার মৈত্রীর সেতুপথ রচনায় সাহায্য করবে বলে আমার বিশ্বাস। এই গ্রন্থের সর্বশেষ কবিতা 'জয়হিন্দ, জয় বাঙলা'-র প্রতিধ্বনি করে পাঠকও মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করবেন:

'বক্ষে বক্ষে ঢেউ, যেই শুনি
মধু-নাম বাঙলা
রক্তে জোয়ার খেলে যেই শুনি
সুধা-নাম বাঙলা।'

সুমুদ্রিত এবং সুঅলঙ্কৃত এই কাব্যগ্রন্থখানির আমরা সমাদর কামনা করি।

ধনঞ্জয় দাশ

চন্দ্র-অভিযান

এই নিয়ে তিনবার মানুষ চাঁদে পদার্পণ করল। আর মানুষের প্রেরিত স্বয়ং-চালিত যন্ত্র পূর্বেই চাঁদের বুকে ধীরে অবতরণ করে সেখানকার কিছু খবর বেতার তরঙ্গ মারফৎ আমাদের কাছে পাঠিয়েছে; সম্প্রতি স্বয়ংচালিত একটি ছোটো ট্র্যাকটরের মতো গাড়ি চাঁদের বুকে ঘুরে বেড়িয়ে সেখানকার কিছু তথ্য আমাদের কাছে পাঠাচ্ছে।

চাঁদে মানুষ পাঠানোর কৃতিত্ব আমেরিকান বিজ্ঞানের বা বিজ্ঞানীদের। স্বয়ং চালিত যন্ত্রগুলি পাঠিয়ে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সোভিয়েতের বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীরা।

তর্ক উঠতে পারে, কোনটি ভালো বা কৃতিত্ব কার বেশি ইত্যাদি। সেটা একেবারেই নিরর্থক। "দুয়ো হেরে গেল" এ-মনোভাব নিয়ে মানুষ সশরীরে বা যন্ত্রের সাহায্যে মহাকাশে পাড়ি জমাচ্ছে না। কাল্পনিক বৈজ্ঞানিক কাহিনীতে মাঝে মাঝে যাই লেখা হোক না কেন, এবং সে-গল্প যতোই সরস হোক না কেন, উপস্থিত মহাকাশে রাজ্য জয়ের বাসনা মানুষের নেই। মহাকাশ ভ্রমণটা এখনও এতই বিপদসঙ্কুল, মানুষের জৈবিক দেহ এর জন্য এতই ভঙ্গুর এবং আমাদের এই গ্রহ পৃথিবীতেই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ বা চক্রান্ত চালাবার এখনও এত সুযোগ বাকি রয়েছে যে, সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ লিপ্সাটা উপস্থিত মহাকাশে না নিয়ে গেলেও চলবে। আর মহাকাশ ভ্রমণ যখন কলকাতা-লণ্ডন এরোপ্লেন যাত্রার মতো সাধারণ হয়ে যাবে, হয়তো একশ বছর পরে যখন সাধারণ যাত্রীবাহী ব্যোমযান পৃথিবী চাঁদ বা গ্রহান্তরে পাড়ি জমাবে, তার মধ্যে মানুষের ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অবসান হয়ে মানুষে মানুষে সাম্য মৈত্রী সহযোগিতার ভিত্তিতে বিশ্বসমাজবাদী অবস্থাই রচিত হবে। পঞ্চাশ দশকের গোড়ার দিকে যখন হলিউড্ 'ডেস্‌টিনেশান মুন্' (চন্দ্রভ্রমণ) সম্পর্কে ছবি তোলে তখন তাতে দেখানো হয়েছে, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র চাঁদকে নিজের জমি বলে দাবি করছে, আর দেখছি ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে চাঁদের জলহীন শুষ্ক পাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে আমেরিকার আরমস্ট্রঙ ও কলিনস্ প্রথম অবতরণ করেই ফলক রেখে আসেন, যাতে লেখা আছে, "জুলাই ১৯৬৯ সালে আমরা পৃথিবী

গ্রহের মানুষ সর্বমানুষের কাছ থেকে শান্তির বাণী নিয়ে চাঁদে এসেছিলুম।" আর চাঁদের বুকে আছে ছজন মহাকাশচারীর নাম—তুজন সোভিয়েত ও চারজন আমেরিকান, যাঁদের মহাকাশের শহীদ বলা যেতে পারে। ছুনিয়া জুড়ে শান্তির স্বপক্ষে শক্তির জোর কতো বেড়েছে, সেটার প্রমাণ এটি।

উদ্দেশ্য কি ?

স্বল্প পরিসরে চাঁদে অভিযানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উপস্থিত কী সে সম্পর্কে আলোচনা করেই ক্ষান্ত হবো। চাঁদে অভিযানের অন্যান্য বহু দিক আছে, পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধে বারান্তরে আলোচনা করা যাবে।

চাঁদের ভর (mass) পৃথিবীর ৮১ ভাগের এক ভাগ, ব্যাস ২,১৬০ মাইল অর্থাৎ চারভাগের এক ভাগ। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে বাঁধা চাঁদ যেমন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে প্রায় ২৯ দিনে একবার, তেমনি আবার চাঁদের মাধ্যাকর্ষণে পৃথিবীর সমুদ্রে জোয়ার ভাঁটা খেলছে।

সৌরজগতের আর কোনো গ্রহেরই এতো বড়ো উপগ্রহ নেই, এমনকি বৃহস্পতি গ্রহের বারোটি চাঁদের ভরকে একত্র করলেও আনুপাতিকভাবে পৃথিবীর চাঁদের মতো এতো বড়ো উপগ্রহ দাঁড়াবে না। আসলে পৃথিবী-চাঁদ ব্যবস্থাটা গ্রহ-উপগ্রহ নয়, যুগ্ম গ্রহ। এর তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। এই যুগ্ম গ্রহের জন্ম হয়েছে একই লগ্নে, অথবা পৃথিবী থেকে চাঁদের জন্ম (প্রশান্ত মহা-সাগরের অঞ্চলটা ছিটকে বেরিয়ে চাঁদ হয়েছে) আর না-হয় পৃথিবী চাঁদকে কব্জা (বা capture) করেছে। অর্থাৎ পূর্বে চাঁদ ছিল না, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের আওতায় এসে উপগ্রহরূপে এখন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। এই তিনটি সম্ভাবনা নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে তর্কের ঝড় উঠেছে।

চাঁদে নেমে প্রথমেই তার শিলা সংগ্রহ করা হয়েছে—প্রথম এপোলো-১১ তার 'নিস্তরঙ্গ সমুদ্র' অঞ্চল (চাঁদে অবশ্য কোনো 'সমুদ্র' নেই) থেকে শিলা এনেছিল ২১.১৫ কিলোগ্রাম, তারপর এপোলো-১২ এনেছে ৩৩.৭৫ কিলোগ্রাম তার 'ঝটিকা সমুদ্র' থেকে—আর লেখার সময়ে অন্য আর এক অঞ্চলে এপোলো-১৪ শিলা আনছে। তাছাড়া সোভিয়েতের স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানের সাহায্যে বেশ খানিকটা শিলাও পাওয়া গেছে।

এপোলো১৪-এর তুজন চন্দ্র-অভিযাত্রী বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন, চাঁদের

'ফ্রাই মেরিয়া' অঞ্চলের একটা ছোটো নিবন্ত 'আগ্নেয়গিরির' জ্বালামুখ (crater)-শীর্ষে আরোহণ করে সেখানকার শিলা আনতে—নানারকম শারীরিক অসুবিধার জন্য তাঁদের হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে ৮০ থেকে ১৫০ হবার পরে, পৃথিবী থেকে নির্দেশ পাঠিয়ে তাঁদের নিরস্ত করা হয়। সেটা আনা সম্ভব হয়নি।

যাইহোক, এ-পর্যন্ত প্রায় দেড় মণ, এপোলো-১৪ নিয়ে দুই মণ, চাঁদের শিলার বিশ্লেষণ চলেছে। একটা ব্যাপারে প্রায় সবাই একমত—চাঁদের শিলা বহু অতীতের—৩০০।৩৫০ কোটি বছরের পুরানো, অর্থাৎ পৃথিবীর কৈশোরের শিলা যেরকম হতে পারে বলে আমরা আন্দাজ করি সেইরকম।

ব্যাপারটা আর একটু বিশদ আলোচনা করে শেষ করি। পৃথিবীর জন্ম আজ থেকে প্রায় ৪৫০ কোটি বছর অতীতে, চাঁদেরও তাই। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও জলরাশির প্রভাবে পৃথিবীর জন্মলগ্নের সমস্ত লক্ষণ ও চেহারাই আজ লুপ্ত, কাজেই একমাত্র আমাদের আন্দাজে নির্ভর করে এগোতে হয়। চাঁদে বায়ুমণ্ডল সুদূর অতীতে থাকলেও সেটা ছিল অত্যন্ত সামান্য এবং ছোট দেহের স্বল্প মাধ্যাকর্ষণের জন্য অতি অল্পদিনেই সে বায়ুমণ্ডল একেবারে চাঁদ ছেড়ে মহাকাশে হারিয়ে গেছে। জলরাশি কোনোদিনই ছিল না। তাহলে চাঁদের জন্মলগ্নের শৈশবের চেহারাটি আজো বর্তমান।

চাঁদ ও পৃথিবীর জন্ম একই সময়ে হয়ে থাকলে, এবং উপাদানও মোটামুটি একই, চাঁদের শিলা বিশ্লেষণ করে আমরা পৃথিবীর শৈশবের অবস্থাকে ধরতে পারব। তা থেকে পৃথিবীর তথা সৌরজগতের উৎপত্তি কী করে হলো তার প্রাথমিক চেহারা কী ধরনের, কী উপাদানে তৈরি ইত্যাদি সব রহস্যেরই হদিশ মিলবে ঐ চাঁদে।

কাজেই চাঁদে আমাদের অভিযান চালানোর উপস্থিত উদ্দেশ্য আমাদের পৃথিবীকেই আরো ভালো করে জানা। অবশ্যই আজ থেকে ১০০ বছর ভবিষ্যতে মানুষ চাদে স্থায়ী বসবাসের উপযোগী ছোট বৈজ্ঞানিক কলোনী গড়ে তুলবে, আরো অন্যান্য নানারকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য তার পরিকল্পনার কাজও খানিকটা এগিয়েছে ইতিমধ্যেই।

দিলীপ বসু

রোজা লুকসেমবুর্গ

সাধারণ মানুষের চাঁদা নিয়ে বানানো কামানগুলি হস্তগত করতে এসেছিল, পুঁজিবাদী ও ভূস্বামীদের সরকারের অধিনায়ক থায়র্স-এর হুকুমে ফ্রান্সের সরকারি সৈন্যদল। তারিখ ১৮ই মার্চ, ১৮৭১। সে-জবরদখল আর সম্ভব হলো না। পারীর জনগণ আর শ্রমিক শ্রেণীর প্রবল প্রতিরোধের সামনে সৈন্যবাহিনী হটে গেল। প্রাশীয় আক্রমণকারীদের পায়ের কাছে নতজানু স্বদেশী মানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী বড় লোকদের সরকারের সঙ্গে প্রকাশ্য যুদ্ধ বাধলো পারীর শ্রমজীবী মানুষের। জন্ম নিল পারী কমিউন। সেই একই মার্চ মাসের পাঁচ-তারিখে পোলাণ্ডের জামোস্ক শহরে সম্ভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী এক ইহুদি পরিবারে জন্ম-নিলেন রোজা লুকসেমবুর্গ—পরবর্তী জীবনে প্রাশীয় সামরিক দম্ভ, জার্মান পুঁজি-পতি ও ভূম্যধিপতিদের বিরুদ্ধে যিনি হয়েছিলেন অন্যতম প্রধান সারথী, আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির পতাকাকে যিনি প্রাণ দিয়ে ঊর্ধে তুলে ধরেছিলেন, পারী কমিউনের মহৎ আদর্শ যিনি আমৃত্যু বহন করেছিলেন।

যে-পোলাণ্ডে তিনি জন্মেছিলেন, যে-দেশ ছিল রুশদেশের নিরঙ্কুশ জারতন্ত্রের অন্তর্গত একটি পদানত অঞ্চল। পোলাণ্ডের জাতি বৈশিষ্ট্য মুছে দেবার জন্য জারতন্ত্রের চক্রান্তের অন্ত ছিলনা। এমন-কি পোলদের মুখের ভাষাও তারা কেড়ে নিতে চেয়েছিল। বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ে পোল ভাষা পড়ানো ছিল বে-আইনী। জার্মান যুঙ্কার জমিদাররা ছিল জারতন্ত্রের এ-কাজে প্রধান পৃষ্ঠপোষক। রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া ও জার্মানী—তিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মধ্যবর্তী এই দেশটিকে শোষণের মৃগয়াক্ষেত্র বলেই মনে করত। পোলদের মধ্যে ইহুদিদের অবস্থা ছিল আরও ভয়াবহ। ইওরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পোলাণ্ডেই ছিল আবার তারা অধিক সংখ্যায়। ইহুদি ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি ছিল সরকারের বিষ নজর। রোজা ছিলেন ছাত্রী হিসাবে খুবই ভালো। ইহুদিদের মধ্যে বাছাই করা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। শিক্ষিত, সংস্কৃতিশীল ও বুদ্ধিজীবী পরিবারের মেধাবী সন্তান রোজা ওয়ার্শ-এর এক বিখ্যাত বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেলেন। ছাত্র আন্দোলনের হাতেখড়ি হলো তাঁর সেখানেই। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের অধিকার অর্জনের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে

একদা লেনিন বহিষ্কৃত হয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। রোজা তাঁর স্বদেশে মাতৃভাষাকে বাহন করে শিক্ষা পাবার অধিকার অর্জনের দাবিকে তুলে ধরবার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে হারালেন মেধার স্বীকৃতি নিদর্শনস্বরূপ প্রাপ্য স্বর্ণপদকটি। ১৮৮৭ সালে তিনি যোগ দিলেন পোলিশ সোসালিস্ট ওয়ার্কারস পার্টিতে। পার্টি তখন আত্মগোপন করে আছে। সপ্তদশী রোজা মার্কসবাদ অধ্যয়ন শুরু করলেন। রোজার যখন আঠারো বছর বয়স পোল্যাণ্ডে জারতন্ত্রের সর্বেসর্বা গুপ্ত পুলিশ তখন তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। গ্রেপ্তার এড়াতে রোজা এলেন সুইটজারল্যাণ্ডের জুরিখে। মে ১৮৭৯।

১৮৯৩ থেকে ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন করলেন। পশ্চিম ইওরোপে, বিশেষভাবে ইংলণ্ডে তখন মার্কসবাদী অর্থনীতিকে নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বুর্জোয়াদের বশংবদ অ্যাকাডেমিক অর্থনীতি-বিদরা। শ্রমভিত্তিক মূল্যতত্ত্বের বদলে সেখানে আলোচিত হচ্ছে উপযোগভিত্তিক মূল্যতত্ত্ব। বলা হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ সামাজিক-আর্থনীতিক ব্যবস্থা। ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়েও মার্কসবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ চলেছে। সুইটজারল্যাণ্ডের লুসানা, জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন চলেছে দোটানা। রোজা জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা-চালালেন 'পোলাণ্ডের শিল্প বিকাশ' নিয়ে। গবেষণা চালাবার সময় তিনি দেখালেন পোল্যাণ্ডে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ—বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির শোষণের সঙ্গে দেশী সামন্ততন্ত্র কেমন গাঁট ছড়ায় বাঁধা আছে। অর্থাৎ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের দাপটে কেমন শিল্পবিকাশ হয় অবহেলিত, শুধু তাই নয়, কেবল মাত্র কাঁচামাল তৈরির শিল্পই কথঞ্চিৎ সুযোগ পায় পরাধীন দেশে। তাঁর গবেষণার জন্য রোজা ডকটর হলেন ১৮৯৭ সালে।

এই জুরিখেই তাঁকে একবার মে-দিবসের ইশ্‌তেহার লিখতে দেওয়া হয়। ইশ্‌তেহারটি লিখলেন কবিতায়। রোজার আজীবন সাহিত্যপ্রেম ছিল অম্লান। ১৮৯৮ সালে রোজা এলেন জার্মানীতে। সদস্য হলেন জার্মান সোস্যাল ডেমো-ক্রেটিক পার্টির। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা বেরোতে লাগল। পার্টির কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা, বিবিধ রাজনীতিক কার্যকলাপ, বইলেখা, সংগঠন করা, আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসগুলিতে যোগ দেওয়া—নিরন্তর নানা কাজে ডুবে রইলেন তিনি। জার্মান নাগরিককে বিবাহ করলে জার্মান নাগরিকত্ব পাওয়া যায় বলে রোজা তাঁর জনৈক পার্টিনিষ্ঠ সহকর্মীর সঙ্গে নামমাত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং ফলে ১৮৯৮ সালে তিনি জার্মান নাগরিকত্বও পান।

রোজার বিপ্লবী দায়িত্ববোধ ছিল অসীম। জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি তখন শোধনবাদ-সুবিধাবাদের দিকে ঝুঁকেছে। বার্নস্টাইন বলছেন, মার্কস-এর বহু বক্তব্যই ছিল ভ্রান্ত। মার্কস একেবারে সেকেলে হয়ে গেছেন। এমনকি যে মূল্যতত্ত্বের উপরে ভিত্তি করে উদ্বৃত্তমূল্যের তত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছে, সেই মূল্যতত্ত্ব বার্নস্টাইনের ব্যাখ্যায় বিনিময়-অনুপাতের যথাযোগ্য তত্ত্ব হতে পারে না। বার্নস্টাইন বলছিলেন মূল্যের শ্রমভিত্তিক অবজেকটিভ দিক মুখ্য নয়, বরং উপযোগভিত্তিক সাবজেকটিভ দিকটিই মুখ্য। তাঁর মতে তাই প্রান্তিক উপযোগ-তত্ত্ব পুরোটাই নিতে হবে অথবা মার্কসের মূল্যতত্ত্বকে তা দিয়ে পরিপূরণ করতে হবে। কিন্তু মাথায় হেঁটে দেখিয়ে দিলেই উদ্বৃত্ত শ্রমের তত্ত্বতো আর মিথ্যা হয়ে যায় না, অভিজ্ঞতাই বলে কেমন করে একদল পরগাছা মানুষ শ্রমজীবীদের উৎপাদনের ভাগ বসায়। লেনিন তাই চমৎকার ভাবে বলেছিলেন যে সংশোধনবাদীরা "apart from hints and sighs. exceedingly vague" ছাড়া মার্কসীয় মূল্যতত্ত্বে কিছুই যোগ করতে পারেন নি। ঢের পরে যোশেফ স্যুমপিটারও বলেছিলেন, "Most of the creations of the intellect or fancy pass away for good after a time that varies between an after dinner hour and a generation. Some, however, do not. They suffer eclipses but they come back again···These we may call the great ones—it is no dis-advantage of this definition that it links greatness to vitality. Taken in this sense, this undoubtedly the word to apply to the message of Marx."

বার্নস্টাইন সমাজবাদী আন্দোলনকে কেবলমাত্র মজুরি আন্দোলনে এবং এখানে ওখানে কিছু সংস্কারের মধ্যে নিমগ্ন রাখার তত্ত্ব দিলেন। উদ্বৃত্তমূল্য তত্ত্বই যদি না রইল তবে আর শ্রেণী সংগ্রামের ভিত্তি থাকে কেমন করে? নিতান্ত অল্পসময়ে মালিকশ্রেণী অকটু আধটু উৎপাত যদি করেও-বা, ন্যায্য যৌথ দর কষাকষি আর পার্লামেন্ট প্রতিনিধি পাঠিয়ে সে উৎপাতের সংস্কার করতে পারা যায়। রোজা ও কার্ল লাইবনেখ্ট এ-মতের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। মার্কসীয় মূল্যতত্ত্বের অভ্রান্ততার প্রমাণে রোজা রচনা করলেন 'মূলধনের সঞ্চয়' গ্রন্থটি। অগাস্ট বেবেলের মতো রোজাও মনে করতেন শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ ও শোষকশ্রেণীর স্বার্থ সমঝোতা হবার নয়। এতে শ্রমিকশ্রেণীর

ক্ষতি বাড়ে, অন্যদিকে মালিকশ্রেণীর লাভ ও প্রতিপত্তি সে সমঝোতার ফলে বেড়ে চলে। কেবল তত্ত্বের লড়াই নয়, ১৯০৫ সালে রুশ বিপ্লবে রোজা সক্রিয়-ভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

১৯০৭এ স্টুটগার্ট-এ আন্তর্জাতিক সমাজবাদী কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। ঐ কংগ্রেসের বৃটেন ও ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের ঝানু 'সমাজতন্ত্রী' প্রতিনিধিরা 'সমাজতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক নীতি'র প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। লেনিন, রোজা লুকসেমবুর্গ প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ সমাজতন্ত্রী আলখাল্লার আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী নেকড়ের এই ভোলবদলানো রূপ চিনে ফেলে 'ঔপনিবেশিক নীতি' প্রসঙ্গটির বিরুদ্ধেই তীব্র মত প্রকাশ করলেন। সমাজতন্ত্রী দেশের আবার উপনিবেশ কি? যার উপনিবেশই নেই, তার আবার 'ঔপনিবেশিক নীতি' কী?

ঐ কংগ্রেসে রোজা—লেনিন ও মার্তভের সঙ্গে অগাষ্ট বেবেলের বিখ্যাত প্রস্তাবকে বিশেষিত রূপ দিলেন। সেই প্রস্তাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতিবাদে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর জবাব রচনা করা হলো। প্রস্তাবে বলা হলো, মহাযুদ্ধকে ঠেকাতে হবে; যদি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থান্বেষীরা মহাযুদ্ধ বাধায়, তাহলে তার আশু সমাপ্তির জন্য দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক লড়বে; আর ঐ মহাযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে সমাজতন্ত্রী দলগুলি অভূতপূর্ব জনজাগরণ ঘটিয়ে পুঁজিবাদকে চিরকালের মত খতম করে দেবে। ১৯১২ সালে ব্যাসল কংগ্রেসে এই একই প্রস্তাবের মোটামুটি প্রতিধ্বনি হলো।

অবশ্য জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে রোজার দৃষ্টিভঙ্গি খুব স্পষ্ট ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে কেবল সমাজবাদী বিপ্লব নয়, পরাধীন দেশগুলি থেকেও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিকে আঘাত করতে হবে। রোজা লুকসেমবুর্গের সংশয় ছিল যে জাতীয় মুক্তির অর্থ জাতীয় পুঁজিপতিদেরই রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ, সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের জয় নয়। লেনিন ১৯১৪ সালে 'জাতিসমূহের আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার' পুস্তিকায় রোজার এ-দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেন। লেনিন দেখিয়ে দেন যে, পরাধীন দেশগুলির জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ বা পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ বিকাশকেই ধ্বসিয়ে দেয়। রোজাকে লেনিন বহুবার সমালোচনা করেছেন বটে কিন্তু তাঁর মার্কসবাদী নিষ্ঠার প্রতি কখনও সন্দেহ প্রকাশ করেননি।

১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধ শুরু হলো। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বাঘা বাঘা নেতারা জার্মানীতে সমর্থন করলেন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ-ঋণ। ধ্বনি তুললেন 'পিতৃভূমিকে

বাঁচাও'। সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দলের বামপন্থী নেতৃবৃন্দ পার্লামেন্টের ভেতরে ও বাইরে, যথাক্রমে কার্ল লাইবনেখট্ ও রোজা লুকসেমবুর্গ, ঐ দক্ষিণপন্থীদের স্টুটগার্ট সম্মেলনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বেইমানী করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে প্রতিবাদ জানালেন। ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে রোজা গ্রেপ্তার হলেন। ১৯১৫ সালে জেলখানায় বসে রোজা লিখলেন তাঁর 'জুনিয়াস' প্যাম্ফ্লেট, 'সোশ্যাল ডেমোক্রাসির সঙ্কট' নাম দিয়ে, লেনিনের এ বইখানি খুবই ভালো লেগেছিল। "লেনিনের প্রোলেটরিয়েট রেভলুশন এ্যাণ্ড রেনিগেড কাউট্স্কি' এবং 'কোলাপ্স অব দি সেকেণ্ড ইণ্টারন্যাশনাল" এর সঙ্গে সমসূত্রে গ্রথিত এ বইখানি। বইখানিতে তিনি দক্ষিণপন্থী 'সমাজতন্ত্রী'দের শোষকশ্রেণীর পদলেহন করার দিকটি যেমন দেখিয়ে দেন, সঙ্গে সঙ্গে সাচ্চা সমাজতন্ত্রীদল কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কথাও বলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা তিনি স্পষ্টভাবে এ-পুস্তিকাটিতে দেখিয়ে দিলেন। লিখলেন যুদ্ধই নানা রঙ-বেরঙের পোষাকে মোড়া বুর্জোয়া-সমাজের আসল রূপটি দেখিয়ে দেয়। আজ যেমন চোখে পড়ছে ভিয়েতনামে, 'বাঙলা দেশে'। "ravished, dishonoured, wading through blood, soaked in filth···Not when dressed up and respectably parading as the custodian of culture, philosophy, ethics, law and order, peace and constitutional rights, but as a marauding beast, a witches' sabbath of anarchy, as pestilential stench for all culture and humanity, does it reveal itself in its true nakedness"

১৯১৭ সালে রুশ দেশে মহান অক্টোবর বিপ্লব বিজয়ী হলো। ১৯১৮-এর নভেম্বরে হলো জার্মানীতে বিপ্লব। বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণী রোজাকে কারামুক্ত করে আনেন। ঐ সময়ে তিনি কার্ল লাইবনেখ্ট-এর সঙ্গে গড়ে তুললেন জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি এবং রোটে ফানে (লাল ঝাণ্ডা) দৈনিক পত্রিকাটি প্রকাশ শুরু করেন। পার্টি গঠনের সম্মেলনে রোজা বললেন, "Well comrades, now we are witnessing the moment where we may say : we are again with Marx, under his banner. When today we declare in our programme that the foremost aim of the proletariat cannot be anything other···than making socialism a reality and rooting out capitalism, then we take up the position on

which Marx and Engels stood in 1848 and from which they never fundamentally deviated."

প্রথম মহাযুদ্ধের আয়ুষ্কাল ছিল একান্ন মাস। তার মধ্যে চল্লিশ মাস ধরে রোজা ছিলেন জেলখানায় এক নির্জন প্রকোষ্ঠে বন্দিনী। জেলখানাতেই তাঁর কানে আসে ভাঙাভাঙা ভাবে সোভিয়েত বিপ্লবের খবর। জেলখানা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি আট সপ্তাহ মাত্র জীবিত ছিলেন। ১৯১৯ সালের ১৫ই জানুয়ারি তিনি ও কার্ল লাইবনেখ্‌ট সরকারি খুনীবাহিনীর হাতে নিহত হন। ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে মাটিতে টলে পড়ার সময় রোজার হাত-ব্যাগের মধ্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ল একখানি বই। গ্যেটের মহানাট্যকাব্য ফাউস্ট। যার প্রথম পংক্তিটি জ্বল জ্বল করছিল, "At the beginning there was action."

তরুণ সান্যাল

লোককৃতি ও বাঙলাদেশ

প্রাকৃতিক শক্তিকে যেদিন থেকে মনুষ্যসমাজের কল্যাণকর্মে মানুষ নিয়োজিত করতে সক্ষম হলো সেদিন থেকেই মানুষের-কৃতি বা 'কালচার' সৃষ্টি হলো। সমাজজাত মনুষ্য-কৃতি হলো প্রকৃতপক্ষে বস্তুবিশ্বের মানবায়িত প্রতিভাস, তার সমষ্টিগত শ্রম, বুদ্ধি এবং কল্পনাজাত সৃষ্টির ইতিহাস।

মনুষ্যকৃতির প্রাগৈতিহাসিক স্তরের মধ্যে বন্যাবস্থার যুগ ছিল। বন্যাবস্থার পর বর্বরতার যুগ আসে। বর্বরতার যুগ থেকে পর্যায়ক্রমে সভ্যতার যুগের উৎক্রমণের কৃতিকেই লোক-কৃতি বলা উচিত। এই যুগে সমষ্টিগত শ্রমশক্তি, বুদ্ধি ও কল্পনার সহায়তায় প্রকৃতিকে আয়ত্ব করে তাকে সর্বজনের কল্যাণ ও সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য নিয়োজিত করবার সচেতন ও যৌথ প্রয়াস সূচিত হয়। জীবনধারণের ও জীবনীশক্তিকে বরণের এই প্রয়াসের উপসৌধে সহজ, সরল, স্বাভাবিক এবং বলিষ্ঠভাবে ও সংহতরূপে যা প্রকাশ পেয়েছিল তাকেই লোক-কৃতি বলা চলতে পারে।

লোক-কৃতির মধ্যে জীবন ও প্রকৃতির কয়েকটি মৌলিক উপাদান বিদ্যমান—জীবনধারণ এবং তার সম্প্রসারণ, বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রামের সরল বাসনা, মানবিক শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবার বলিষ্ঠ কামনা ইত্যাদি। এই উপাদান সচল ও কালজয়ী। তা সভ্যতার অগ্রগতির বহু বিচিত্র কর্মযজ্ঞের প্রতিভাসরূপে

মনুষ্য-কৃতির রত্নভাণ্ডারে সঞ্চিত রয়েছে। তাই লোক-কৃতির মধ্যে সেই যুগের পশুপালন, প্রজনন, কৃষিকাজ, রাখালিয়া জীবন, শিকারী জীবন, মৃৎশিল্প, গৃহকাজ, কাঠের কাজ, নৌকার ব্যবহার, স্থাপত্য, শিল্প ইত্যাদি রয়েছে। এরই প্রতিভাস ফুটে উঠেছে নৃত্য-সঙ্গীতে, গল্পে ইত্যাদিতে। লোক-কৃতি যৌথ জীবন নির্ভর। লোক-কৃতির মৌলিক উপাদান সমূহ জীবনপ্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে উত্তরাধিকার সূত্রেই সভ্যতার যুগে চলে এসেছে। ঐতিহ্য মৌলিক উপাদানে সমৃদ্ধ। মৌলিক উপাদানের বিনাশ নেই, রূপান্তর আছে। সচেতন, সক্রিয়, সর্বদেশদর্শী এবং সংগ্রামী।

সভ্যতার যুগে প্রকৃতির সম্পদকে আয়ত্বে এনে মানুষ উন্নত প্রক্রিয়ার সূচনা করেছে, শ্রমশিল্প সৃষ্টি হয়েছে, শ্রম-বিভাগ আবির্ভূত হয়েছে, শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টি করেছে। কৃতির মধ্যেও বিভক্তি হয়েছে। কিন্তু লোক-কৃতির সম্ভারসমূহ প্রধানত শ্রমনির্ভরতা দ্বারা জীবন-অতিবাহিত মানুষেরাই বহন করে চলেছেন। তাঁদের জীবনের কথা লোক-কৃতির মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। তাই লোক-কৃতির মূল্যায়ন প্রধানত কৃষিনির্ভর শ্রমজীবী মানুষের শ্রমজাত কর্মের উপসৌধেরই প্রধানত মূল্যায়নরূপেই বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন।

মানুষের শ্রম, বুদ্ধি এবং কল্পনাকে প্রধানত রূপায়িত করেছে মানুষের হাত। মুক্ত হাত শ্রমের বাহন। এই শ্রমকে বাদ দিয়ে মনুষ্যকৃতির কোনো মূল্যায়ন সম্ভব নয়। শ্রমকে মর্যাদা দিলেই শ্রমজীবী মানুষের গৌরব যথার্থভাবে এসে পড়ে। কোনো অংশের প্রতি এটা কোনো অনুকম্পা নয়, কোনো দয়া নয়; এটাই পরমসত্য—সে সত্য অলঙ্ঘনীয়। মানুষের শ্রমের উপর সমাজ দাঁড়িয়ে আছে, শ্রমের টানেই সমাজ চলেছে। এই শ্রম যাঁরা দান করে বিশ্বকর্মা হয়েছেন তাঁদের মধ্যেই আজও লোক-কৃতির ধারা কোনো না কোনো ভাবে টিকে আছে। লোক-কৃতির চর্চা অর্থেই শ্রমশীল মানুষের জীবনচর্চার অনুশীলন। এটা কোনো বিলাসিতা নয়, বা রোমান্টিক কৌতূহলও নয়। সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা এবং স্রষ্টার প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা থাকা প্রয়োজন।

'ফোকলোর' নিয়ে পশ্চিমের কয়েকটি ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক দেশ-গুলিতে একটা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। বাঙলাদেশে 'ফোকলোর'-এর প্রতিশব্দ নিয়ে বিতর্ক চলছে। ইতিমধ্যে প্রতিশব্দ হিসাব 'লোকযান' (ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়) 'লোক-বিজ্ঞান' (ডঃ শহীদুল্লাহ), 'লোকশ্রুতি' (ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য), 'ফোকলোর' (ঢাকা একাডেমী), 'লোক-বিদ্যা'

(রমাপ্রসাদ চন্দ), লোকচর্যা (ডঃ সুকুমার সেন), 'জন সাহিত্য' (ডঃ প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী), লোক-সংস্কৃতি (ডঃ বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া, শ্রীকৃষ্ণ দেব উপাধ্যায়), লোক বাঙময় (কেশরী নারায়ণ শুক্ল), লোক-বৃত্ত (শ্রী শঙ্কর সেনগুপ্ত), লোকায়ন (শ্রী অরুণকুমার রায়) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

উপযুক্ত প্রতিশব্দ বের করার বিষয়ে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু প্রতিশব্দের ধাঁধার মধ্যে পড়ে গিয়ে মূল বিষয় থেকে সরে আসার মধ্যে কোনো সার্থকতা নেই। ঝগড়াটা প্রতিশব্দ নিয়ে নয়, সংজ্ঞা ও রূপ-রেখা নিয়ে। প্রতিদেশের মনুষ্য সমাজের অগ্রগতির যাত্রাপথে একটি স্তরে লোক-কৃতির একটি পর্ব ছিল। সমগ্র মনুষ্য-কৃতির মধ্যেই তার অবস্থান। বর্বরতার যুগ থেকে পর্যায়ক্রমে সভ্যতার যুগে উৎক্রমণে লোক-কৃতির আবির্ভাব ঘটে।

'লোক' অর্থে একটি নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে বসবাসকারী সমভাবাপন্ন একটি সামাজিক ও প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক পরিবেশে গড়ে ওঠা এবং মোটামুটিভাবে একই ধরনের জীবন চারণে অবিভাজ্য সমগ্র জনগণকে বোঝায়। এই জনগণের জীবনপ্রক্রিয়ার উপসৌধে শ্রমলব্ধ যে-কৃতি তাই-ই মূলত লোক-কৃতি। লোক-কৃতি সমস্ত সমাজ কর্তৃক রক্ষিত হয়েছিল। লোক-পরম্পরায় এই কৃতি সঞ্চারিত হয়েছিল। ঐতিহ্যের সূত্র ধরে সাঙ্গীকরণের বৈশিষ্ট্য মেনে চলে তা আজও সমাজে কোনো না কোনো ভাবে চলে আসছে। লোক-কৃতিতে অতীতের কাহিনীর স্মৃতি এবং বর্তমানের সমাজজাত মানুষের চিন্তা-ভাবনা সহজভাবেই স্থান পায়।

'ফোক্-লোর' নিয়ে বিশ্ব জোড়া এই আন্দোলনে দুটি ধারা বিদ্যমান। একটি ধারায় নিষ্ক্রিয় রোমান্টিকতা আর একটি ধারায় বস্তুতান্ত্রিক বাস্তবতাবোধ সুস্পষ্ট। প্রথম ধারাটিতে লোক-কৃতির সংগ্রহ, সংরক্ষণ আছে, আছে তার ভাববাদী মূল্যায়ন অর্থাৎ বস্তুনিরপেক্ষ মূল্যায়ন। মূলত এঁরা ফুলকে দেখেন; কিন্তু ফুলের নিচে যে-বৃক্ষ আছে, শিকড় আছে, মাটি আছে, আছে আলো বাতাস, তার কোনো খোঁজ নিতে প্রগাঢ় উৎসাহবোধ করেন না। তাই এঁরা অনেক সময় মাঝপথে থেমে যান, মনগড়া ব্যাখ্যা উপস্থিত করেন।

দ্বিতীয় ধারা প্রথম ধারা অপেক্ষা বয়সে নবীন হলেও সজীব, সচল দৃষ্টিভঙ্গিতে সঞ্জীবিত। সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুনির্ভর মূল্যায়নের এঁরা পক্ষপাতী। এঁরা মনে করেন মাটির উপরে গাছ, গাছের শাখায় ফুল। তাই লোক-কৃতির মূল্যায়নেও এঁদের কাছে মানুষের স্থান প্রধান

হয়ে ওঠে। এঁদের ধ্যান ধারণার পরিধি ক্রমপ্রসারিত হচ্ছে, এঁদের মূল্যায়ন ব্যাপকতর ভিত্তিতে স্থান গ্রহণ করছে। মনুষ্য-কৃতির পূর্ণাঙ্গতার সমাজনির্ভর সাধনা এঁদের কর্মযজ্ঞে রয়েছে।

বাঙলা দেশের লোক-কৃতি চর্চ্চায় এ দুটি ধারা অস্পষ্ট হলেও একেবারে অজ্ঞাত নয়। সংগ্রহ এবং সংরক্ষণে উভয় ধারার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই ; বিরোধ মূল্যায়নের গভীরে। অবশ্য বাঙলা দেশে সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের প্রাথমিক কাজের সম্পূর্ণতা আসেনি। আজও লোক-কৃতির একটি জাতীয় মিউজিয়াম গড়ে ওঠেনি। অথচ ভারতবর্ষ লোক-কৃতিতে সমৃদ্ধশালী একটি দেশ, এ বিষয়ে বাঙলা দেশও সমৃদ্ধ।

বাঙালি মনীষীদের সাধনায়, ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টায় বাঙলা দেশে লোক-কৃতির চর্চ্চা প্রসারিত হয়েছে। এই চর্চ্চা কেরালা, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যেও শুরু হয়েছে। এ সবই চলেছে প্রধানতঃ ব্যক্তি-উদ্যোগে। সমবেত কাজ যে কিছুই হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় কম ; এক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পীড়াদায়ক বিরোধ আছে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ রাজ্যস্তরে বাঙলা লোক-কৃতির একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করেছিলেন। ব্যাপক ধরনের লোক-কৃতির আলোচনা-চক্র বাঙলা দেশে এই প্রথম হলো, সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের মধ্যেও প্রথম। বাঙলা লোক-কৃতির উনিশটি শাখার উপর উনিশটি প্রবন্ধ এখানে পেশ করা হয় ; তার উপর আলোচনাও হয়।

বাঙলা লোক-কৃতির একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো তুলে ধরবার এই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। লোক-সাহিত্য, লোক-কৃতি, লোক-দেবদেবী, লোক-ধর্ম, লোক উৎসব-লোক-শিল্প, লোক-ভাষ্য, লোক-বিশ্বাস, লোক-সঙ্গীত, লোক-নৃত্য, লোক-নাট্য, লোক-সাহিত্য ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য ইত্যাদি লোক-কৃতির বিভিন্ন শাখা বাঙলা দেশে কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, পরিপুষ্ট হয়েছে এবং বর্তমান সমাজ-জীবনে কিভাবে অবস্থান করছে তার উপর এই প্রথম সমবেত আলোচনা ও মূল্যায়নের সূচনা হলো। এই প্রয়াস ও সূচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

বাঙলা লোক-কৃতির পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নে বাধা আছে। যে ভূমিখণ্ডে, যে জনজীবনকে ও সামাজিক পরিবেশকে আশ্রয় করে বাঙলার লোক-কৃতি আবির্ভূত ও বিকশিত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় কারণে তা এখন বহু খণ্ডিত। বৃহৎ

বাঙলা আজ নেই। বাঙলা লোক-কৃতির চর্চা করতে হলে বৃহৎ বাঙলায় এবং সেই বাঙলায় বসবাসকারী জনসাধারণের মধ্যে বিচরণ করতে হয়। কিন্তু তা কি এখন সম্ভব? শ্রী রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'বিশাল বাঙলা' পুস্তিকায় সেই বাঙলার একটি চিত্র তুলে ধরেছিলেন "দক্ষিণ পশ্চিমে ছোটনাগপুরের লোহিত, বন্ধুর উপত্যকা ও তালীবনবেষ্টিত সাগরকূলের বালেশ্বর, উত্তর পশ্চিমে হিমালয়ের সানুদেশে ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া এবং পূর্বদিকে আসামের সুরমা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের বিপুল বারিধারা প্লাবিত সমতল উদ্যান ও স্নিগ্ধ বনানী বাঙলার সীমানা। বাঙলার ইহাই প্রাকৃতিক পূর্ণাবয়ব।"

তবু ষষ্ঠ অধিবেশনে রাজ্যসরকারের এই প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রী গোপাল হালদার মহাশয় অভিনন্দন জানিয়ে কয়েকটি সুপারিশ আলোচনা-চক্রে পেশ করেন। তার মধ্যে ছিল (১) প্রতিটি শাখার উপর আরও গভীর অনুশীলন; (২) এই আলোচনা চক্রের প্রবন্ধ এবং আলোচনাগুলি সুলভ মূল্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশ, (৩) আঞ্চলিক ভিত্তিতে আলোচনা চক্রের আয়োজন, (৪) লোক-কৃতির সংরক্ষণ ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তা জনপ্রিয় করবার আয়োজন এবং (৫) লোক-কৃতি চর্চায় কর্মরত কর্মীদের সরকারি অনুদান ইত্যাদি।

তথ্য ও জনসংযোগ অধিকর্তা শ্রী প্রকাশ স্বরূপ মাথুর মহাশয় সমাপ্তি ভাষণে প্রায় অধিকাংশ সুপারিশ গ্রহণ করে বলেন, লোক-সংস্কৃতি আলোচনা চক্রের সমাপ্তি আমাদের নতুন করে যাত্রার সূচনা করছে। তিনি বিশেষজ্ঞদের সাহায্য কামনা করেন।

বাঙলা লোক-কৃতি চর্চার পূর্ণাঙ্গ রূপরেখার এই সূচনা সমবেত উদ্যোগ ও কর্মের মধ্যে দিয়েই সার্থক হতে পারে এবং এই কাজে লোক-কৃতি চর্চায় যাঁরা নিযুক্ত আছেন তাঁদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন।

মানিক সরকার

ভেরা নভিকোভা

এ-বছর রবীন্দ্রপুরস্কার পেলেন প্রখ্যাত রুশ গবেষক শ্রীযুক্তা ভেরা নভিকোভা। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি কলকাতায় এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে তিনি রাজ্যপাল শ্রীশান্তিস্বরূপ ধাওয়ানের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করলেন। শ্রীযুক্তা

নভিকোভাকে এ-পুরস্কার দেওয়া হলো বঙ্কিমচন্দ্রের উপর তার গবেষণাগ্রন্থ "বঙ্কিমচন্দ্র—জীবন ও সৃষ্টির" জন্য।

এই প্রথম একজন রবীন্দ্রপুরস্কার পেলেন যিনি জন্মসূত্রে ভারতীয় নন। সেদিক দিয়ে তো বটেই, তাছাড়া ভারত-সোভিয়েত সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ভিত্তি দৃঢ়তর করবার ব্যাপারেও এ-পুরস্কার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য।

খুব অল্প বয়স থেকেই শ্রীযুক্তা নভিকোভার বাঙলা ভাষার উপর অনুরাগ জন্মায়। তিনি যখন খুবই ছোট, তখন তাঁর শহর লেনিনগ্রাদে একজন বাঙালি ভদ্রলোক তাঁকে কিছু বাঙলা শব্দ শেখান। ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল নিতান্তই শখ হিসেবে। কিন্তু এই শখই পরবর্তীকালে গভীর অনুরক্তিতে পরিবর্তিত হয়। ফলতঃ তিনি এখন লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাসমূহের বিভাগীয় প্রধান।

বিপ্লবের কিছুদিন পরে সোভিয়েত জনগণের সঙ্গে পৃথিবীর ঐশ্বর্যময় সংস্কৃতিগুলির পরিচয় ঘটিয়ে দেবার প্রয়াসে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষা বিভাগের পত্তন হয়। দায়িত্ব নেন সেকালের বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত ও বৌদ্ধ দর্শনে বিশারদ একাদেমিশিয়ান শ্চেরবিৎস্কি। আর নভিকোভা ছিলেন তাঁর প্রথম দলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অন্যতম। আরো পরে, ১৯৩৫ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের শিক্ষাদান শুরু হলে তিনি বাঙলাকেই তাঁর শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে বেছে নেন।

বাঙলাভাষায় অধ্যাপিকার প্রথম গুরত্বপূর্ণ কাজ হলো ১৯শ শতকের বাঙলা গদ্যের সংকলন, যাতে প্রত্যেক লেখক সম্পর্কে পরিচয় দিয়ে ছোটখাট নোটও ছিল। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনার্থে তিনি নির্বাচিত বাঙলা শব্দের একটি অভিধানও রচনা করেন। অবশ্য, তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ "বঙ্কিমচন্দ্র—জীবন ও সৃষ্টি'ই তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।

স্বভাবতই শ্রীযুক্তা নভিকোভা বাঙলাদেশকে ভালোবাসেন। এটি তাঁর তৃতীয়বার বাঙলায় আসা। এর আগে, ১৯৬১ সালে এসেছিলেন দিন-দশেকের জন্য। কিন্তু ১৯৫৪ সালে যখন তিনি এখানে আসেন তখন প্রায় বছরখানেক ছিলেন। সে-সময়ই তিনি তাঁর গবেষণাগ্রন্থের জন্য উপাদান সংগ্রহের কাজ করেন।

বহুকাল ধরেই ভারতবর্ষের তথা বাঙলার সংস্কৃতি ভারতপ্রেমিক বিদেশীদের দানের কাছে বিভিন্নভাবে ঋণী। উইলিয়ম জোনস,ম্যাক্সমুলার, এমনকি রবীন্দ্র-

সন্নিধানে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ থেকে শুরু করে অনেক মনীষীই তাঁদের ভালোবাসার দানে সমৃদ্ধ করে গেছেন ভারতের ভাষা ও সংস্কৃতিকে। এইতো কিছুদিন আগেও দুশাল জবাভিতেল ময়মনসিংহ গীতিকার মতো গ্রন্থের গবেষণার জন্য সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে রইলেন।

নভিকোভাকে পুরস্কৃত করে সে ঋণস্বীকারের দায়িত্ব গ্রহণ করায় পুরস্কার কর্তৃপক্ষ আমাদের ধন্যবাদার্হ। আর এই সূত্রে অন্বয়ের আলোয় আমরা যদি আমাদের সংকীর্ণ অস্তিত্বের দুরপণেয় দুস্থতাকে কিছু পরিমাণে কাটাতে পারি তবে তা হবে আমাদের উপরিপাওনা।

শুভ বসু

মৃত্যুহীন কমিউন

এ-বছর ১৮ই মার্চ তারিখে বিশ্বের দেশে দেশে 'পারী কমিউন-এর শতবার্ষিকী স্মরণদিবস পালিত হয়েছে। একশো বছর আগে, ফ্রান্সের রাজধানী পারীতে শ্রমজীবী মানুষ যে মুক্ত ও স্বাধীন রাষ্ট্রব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, আজও তা দেশে দেশে নির্বিত্ত শ্রেণীর কাছে আদর্শ হয়ে আছে। পারীর নির্বিত্ত-শ্রেণীর পরীক্ষিত সত্যগুলি বৈজ্ঞানিক ভাবে নানা সমাজতান্ত্রিক দেশে কার্যকরী হয়েছে। আজকের সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া এক অর্থে পারী কমিউনের উজ্জ্বল দিকগুলিরই বিশিষ্ট বিকাশ।

ফ্রান্সের আধুনিক ইতিহাসে, বিশেষভাবে প্রথম ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে, শ্রমজীবী মানুষের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে তো অবধারিতভাবে নতুন আর্থনীতিক ও রাজনীতিক পরিপ্রেক্ষিতের দাক্ষিণ্যে কোনো বিপ্লবই ফরাসী দেশে নির্বিত্ত বা প্রোলেটারিয়ান চরিত্র না দিয়ে পারেনি। অর্থাৎ প্রতিটি বিপ্লবেই নির্বিত্তশ্রেণী যেমন প্রচুর রক্ত দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের বিজয়ের অব্যবহিত পরেই শ্রমজীবী মানুষ তাদের দাবিগুলিকে অগ্রাধিকার দেবার জন্য সংগ্রাম চালিয়েছেন। সব সময় যে দাবিগুলি খুব পরিষ্কার ছিল, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু পুঁজিপতি ও শ্রমজীবী শ্রেণীর পরস্পর বৈরিতার নিরাকরণের দিকে সেগুলির স্পষ্টত বৈপ্লবিক ঝোঁক ছিল। ফলে পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধেই আসলে ছিল সেই প্রতিবাদ ও দাবিগুলির লক্ষ্য। আর সে দাবি জানাত সশস্ত্র শ্রমিকশ্রেণী।

বিপ্লবের অব্যবহিত পরে যেমন নির্বিত্তদের অধিকার সম্প্রসারণের দাবি উঠত, সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের অধিপতি শ্রেণী অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণী বারবার তাদের নিরস্ত্র করার প্রচেষ্টা চালাত। বিপ্লবের বিজয়ে যারা সবচেয়ে সক্রিয় অংশ নিত, বিপ্লবের বিজয়ের পর পুঁজিপতিদের আক্রমণে পুনর্বার বহু রক্তদান করে সেই নির্বিত্তদের পরাজয় বরণ করে নিতে হতো। এই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসীদেশে বিপ্লবগুলির গুরুত্বপূর্ণ দিক।

এঙ্গেলস দেখিয়েছেন, এমন ব্যাপার প্রথম ঘটে ১৮৪৮ সালে। পার্লামেন্টের উদারপন্থী বুর্জোয়ারা তখন বিরোধী দলে ছিল। ভোটাধিকার সংস্কারের জন্য তারা লড়ছিল। দলকে সর্বেসর্বা করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ক্রমশ তাদের সংগে যোগ দিল বামপন্থী ও লোকতন্ত্রী স্তরের বুর্জোয়ারা এবং পেটি বুর্জোয়ারা। এদের পেছনে ছিল শ্রমিকশ্রেণী। ১৮৩০ সাল থেকে শ্রমিক শ্রেণী অনেক বেশি সংগঠন ও উদ্দেশ্য বিষয়ে সচেতনও ছিল। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে যখন সঙ্কট তীব্র হলো, শ্রমিকশ্রেণী রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে তুলল। চলল লড়াই। লুই ফিলিপ্পির রাজত্ব শেষ হলো, ভোটাধিকারের সংস্কার হলো, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠীত হলো, শ্রমিকশ্রেণী খুশি হয়ে এ-প্রজাতন্ত্রের নাম দিল 'সমাজ' প্রজাতন্ত্র! কিন্তু 'সমাজ' প্রজাতন্ত্র যে কি জিনিষ শ্রমিকরাই কি তা জানতেন? বরং তাদের মধ্যে ধারণা জন্মেছিল, বড় বড় গালভরা গণতান্ত্রিক বুলি যারা বলছিলেন, সেই বামপন্থী বুর্জোয়ারা বোধহয় শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষাই করবেন। কিন্তু ফ্রান্সে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল তখন বুর্জোয়ারা ও শ্রমিকেরা। সামন্ততন্ত্র মৃতপ্রায়, পুঁজিবাদ রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং স্বাধীন বুর্জোয়ারাষ্ট্রে বুর্জোয়াদের গণতান্ত্রিক ভূমিকা তখন শেষ হয়ে গেছে। ফলে যে শ্রমিকদের সাহায্যে প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখল করল, নিজেদের প্রশাসনিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা যখন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, তারা আক্রমণ চালাল সশস্ত্র শ্রমিকদের উপরে। শ্রমিকদের আত্মসমর্পণ করতে হবে বলে তারা দাবি জানাল। শ্রমিকশ্রেণীর উপরে সশস্ত্র আক্রমণ শেষ পর্যন্ত তাদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিকে ঠেলে দেয়। সরকার ঢের দিন ধরে প্রস্তুতি করেছে এই আক্রমণের জন্য। ফলে পাঁচদিন ধরে পারীর রাস্তায় রাস্তায় চলল শ্রমিক-খুন! শ্রমিকরা পরাস্ত হলেন। তারপর নিরস্ত্র বন্দীদের বধ করা হলো। পারীর রাস্তা শ্রমিকের রক্তে কর্দমাক্ত হলো। ক্ষমতা লোলুপ বুর্জোয়ারা যে কত নিষ্ঠুর হতে পারে, তা প্রমাণ হলো প্রথম। তবে এঙ্গেলস বলছেন, ১৮৭১এর

পারী কমিউনের প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষক শ্রমজীবী মানুষকে বুর্জোয়ারা যেমনভাবে হত্যা করে, তার কাছে ১৮৪৮ সালের হত্যাকাণ্ডকে শিশু বলা চলে।

যাইহোক বুর্জোয়ারা ক্ষমতা দখলের জন্য যে শক্তির মদমদত্তা দেখাল তার ফল ফলতে দেরি হলো না। গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তখনও বর্তমান। কে ফ্রান্সকে শাসন করবে? অন্তত ঐ সময়ে নির্বিত্তরাও শাসন করার মতো ক্ষমতাধারী নয়, বুর্জোয়ারাও নয়। তার উপরে বুর্জোয়াদের হরেক দলের মতামত হরেক রকম। বুর্জোয়াদের অধিকাংশ তখনো মনে-প্রাণে রাজতন্ত্রী। তিনটি রাজতন্ত্রী পার্টিতে তারা বিভক্ত। চতুর্থটি প্রজাতন্ত্রী ঘরানার। রাজতন্ত্রীদের সাধ, প্রথম নেপোলিয়নের মতো জবরদস্ত কেউ সম্রাট হোন। তাঁর একনায়কতার ছত্রছায়ায় বসে শোষণের মুনাফা কুড়ানো যাবে। সঙ্গে সঙ্গে উগ্র জাতীয়তাবাদী রণবাদ্যের আওয়াজে শ্রমজীবী মানুষদেরও বিভ্রান্ত করা যাবে। বুর্জোয়াদের কোনো কোনো অংশ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের স্বপ্নও দেখছিল। বুর্জোয়াদের সেই আত্মকলহের মধ্য দিয়ে 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' ধ্বনের এক উচ্চাভিলাসী ব্যক্তি প্রথমে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি (১৮৪৮) এবং পরে সম্রাট হয়ে বসলেন। নাম লুই বোনাপার্ট। এই উচ্চাভিলাসী ব্যক্তিটির গুণের ঘাটতি ছিল না। ১৮৪০ সালে দু-দুবার ফ্রান্সে বোনাপার্টিস্ট অভ্যুত্থান করার চেষ্টা করেছিলেন, লুই ফিলিপ্পির জুলাই রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। ১৮৪৮এর এপ্রিল মাসে ইংলণ্ডে চার্টিস্টদের শোভাযাত্রা আক্রমণ করার জন্য যে ঠেঙাড়ে বাহিনী গড়া হয়, লুই নেপোলিয়ন বোনাপার্ট তাতে স্পেশাল কনস্টেবল হয়েছিলেন। ১৮৪৮ সালে ফ্রান্সের বিপ্লবকে রক্তগঙ্গায় ভাসিয়ে শ্রমিকদের ঠেঙাবার জন্য বুর্জোয়ারা লুই-এর চেয়ে এমন ধুরন্ধর আর কাকে পাবে? লুই বোনাপার্ট সামরিক বাহিনী, পুলিশ, প্রশাসনিক যন্ত্র আগেই হাত করেছিলেন, তারপর তাদের যুগপৎ সহায়তায়, ২রা ডিসেম্বর ১৮৫১ ক্যু দে তার মধ্য দিয়ে সম্রাটের ক্ষমতায় আসীন হলেন। নেপোলিয়ন উপাধী ধারণ করে সম্রাট হলেন তিনি। শুরু হলো 'দ্বিতীয় সাম্রাজ্য'। একঝাঁক রাজনীতিক ও অর্থগত উচ্চাভিলাসীর মৃগয়াক্ষেত্র হলো ফ্রান্সে। লুই বোনাপার্ট ক্ষমতা দখল করেছিলেন করার ভেলকিতে। বলেছিলেন, তিনি বুর্জোয়াদের রক্ষা করবেন শ্রমিকদের হাত থেকে, শ্রমিকদের বুঝিয়েছিলেন বুর্জোয়াদের হাত থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্য তিনিই একমাত্র পরিত্রাতা। যাই হোক বৃহৎ পুঁজিপতিদের রবরবা হলো। ফাটকাবাজি ও শিল্পবিকাশ বেড়ে চলল। পুরো বুর্জোয়াশ্রেণীই লাভবান হলো।

তাতে। দেশময় রাজকীয় মাপের জাল-জুয়াচ্চুরি বেড়ে চলল রাজসভার ভেতর-বাইরে।

ওদিকে ১৮৬৬ সালে অষ্ট্রিয়া আর প্রাসিয়ার মধ্যে লড়াইয়ে প্রাসিয়া জিতল। জার্মানীর একীকরণ শুরু হলো। বিসমার্ক জার্মানীর বুর্জোয়া ও বৃহৎ ভূম্যাধিকারীদের পরিত্রাতা হিসাবে দেখা দিলেন।

ফ্রান্সে চলেছে তখন ফরাসী সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের জিগির।

ফরাসী রাজতন্ত্রী বুর্জোয়ারা সীমান্তের বিস্তার চায়। চায় প্রথম নেপোলিয়নের আমলের ফরাসী সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখতে। চায় বিকশিত বাজার, বিস্তৃত কাঁচামালের উৎস-অঞ্চল এবং ব্যাপ্ত শোষণের সাম্রাজ্য। ইতিমধ্যে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে লুই বৃটেনকে সাহায্য করে পারীর শান্তি কংগ্রেস এর (১৮৫৬) নায়ক হয়েছেন। মেক্সিকোয় ফরাসী প্রভাবাধীন 'সাম্রাজ্য' প্রয়াসী হয়েছেন সেখানকার বিস্তারে প্রজাতন্ত্রকে অস্বীকার করে। রাইন নদীর পূর্বতীরও তাঁর দরকার। চাইলেই তো আর পাওয়া যায় না। ওপারে মুখিয়ে আছে প্রাসিয়ার সৈন্য। তাদের প্রভুদের লক্ষ্যও তো একই। ১৮৬৬ সালের প্রাসিয়া-অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধের ফলাফলের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন লুই। প্রাসিয়া তখনও তাঁর বন্ধু। কিন্তু যুদ্ধের ফলস্বরূপ অর্জিত অঞ্চল প্রাসিয়া নিজেই গ্রাস করল। এবার আর হতাশ ফরাসী বুর্জোয়াদের ঠেকান গেল না। ১৮৭০ সালে ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ার যুদ্ধ বাধল। সেপ্টেম্বর ২, ১৮৭০ সেডানের যুদ্ধে ফরাসী সৈন্য পরাস্ত হলো। বন্দী হলেন লুই। ১৮৭০এর সেপ্টেম্বরের পাঁচ তারিখ থেকে ১৯শে মার্চ, ১৮৭১ পর্যন্ত বেচারা বন্দী রইলেন কামেল-এর কাছে ভিলহেলম শোহে-এর প্রাসিয়ান রাজদুর্গে।

২রা সেপ্টেম্বর সেডানের যুদ্ধ শেষ। সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল যেন তাসের ঘর। পারীতে বিপ্লব দেখা দিল ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৭০। আবার প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হলো। কিন্তু পারীর দেউড়িতে তখন প্রাসিয়ার বাহিনী। 'সাম্রাজ্যের বাহিনী' বিধ্বস্ত, পলায়নপর, মেৎস-এ হয় তারা চতুর্দিকে ঘেরা, অথবা জার্মানীতে বন্দী। তখন সেই সঙ্কটের যুগে পারীর প্রতিরক্ষার জন্য আগেকার বিধানসভার পারীর প্রতিনিধিদের নিয়ে 'জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার' গঠন করার সুযোগ দিল জনগণ। যারাই অস্ত্রধারণ করতে সক্ষম, সবাইকেই 'ন্যাশনাল গার্ড' বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। আর সেখানে সংখ্যাধিক্য হলো স্বাভাবিক-ভাবেই শ্রমজীবীদের।

কিন্তু বেশিদিন গেল না। হোটেল দ্য ভিল-এ (টাউনহল) অবস্থিত বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সরকার আর অধিক সংখ্যায় শ্রমজীবীদের নিয়ে গঠিত সশস্ত্র ন্যাশনাল গার্ডের মধ্যে শান্তি বজায় রইল না। আসলে যারা 'জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকারে'র কর্ণধার হলেন, তাঁদের সবাই ছিলেন সুযোগসন্ধানী। ঝানু ব্যারিস্টার থায়ার্স হলেন তাঁদের নেতা, ত্রচু তাঁদের সেনানায়ক, ফাভরে তাঁদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী। অথচ যে শ্রমজীবী মানুষকে তাঁরা আহ্বান জানালেন পারীর রক্ষায়, সেই শ্রমিকদের নেতারা তখনও জেলখানায়। সরকারের নায়কেরা জানতেন, শ্রমিকদের সশস্ত্র করা ছাড়া পারীর প্রতিরক্ষা অসম্ভব। অথচ ছিল দোটানা। তাঁরা জানতেন, সশস্ত্র পারী মানেই সশস্ত্র বিপ্লব। আর সেই বিপ্লবী বাহিনীর হাতে প্রাসিয়ান সৈন্যদের পরাজয়ের অর্থই হলো ফ্রান্সের বুর্জোয়াদেরও পরাজয়, তাদের পরগাছা রাষ্ট্রের পরাজয়। এই দোটানায় পড়ে মার্কসের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় 'Government of National Defence, এক মুহূর্তও দেরী না করে একেবারে 'Government of National Defection' হয়ে পড়ল। জাতীয় কর্তব্য ও শ্রেণীস্বার্থ এ-দুটির মূল্যায়নে বুর্জোয়ারা শ্রেণীস্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিল।

ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সুযোগসন্ধানী ও বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি এই সরকারের কর্ণধাররা যতটুকু পারে ততটুকু গুছিয়ে নিতে চাইল।—থায়ার্সকে প্রথমে ইউরোপের রাজসভাগুলিতে ঘোরানো হলো, "There to beg mediation by offering the barter of the Republic for a king." চারমাস অবরোধের পর, তাঁরা সুযোগ বুঝে প্রাসিয়ানদের পায়ে আত্মসমর্পণের কথা ভাবলেন। পারীর পৌরপিতাদের সামনে জুলে ফাভরের উপস্থিতিতে ত্রচু বললেন, "the attempt of Paris to hold out a siege by the Prussian army would be a folly"—এ-কথা তিনি চৌঠা সেপ্টেম্বরই তাঁর সহকর্মীদের কাছে বলেছিলেন। হায় এই ত্রচুই ছিলেন 'জাতীয় প্রতিরক্ষা' সরকারের সেনাপতি!

তাহলে থায়ার্স, ত্রচু, ফাভরে এঁরা কি করছিলেন? যদি তাঁরা প্রথম থেকেই জানতেন পারীর প্রতিরক্ষা সম্ভব নয়, তবে ৫ই সেপ্টেম্বরই তাঁরা পদত্যাগ করলেন না কেন? ২৮-এ জানুয়ারি ১৮৭১, মুখোস খসে পড়ল। বিসমার্কের বাহিনীর পায়ের ধূলোয় মাথা নুইয়ে বিসমার্কের 'বন্দী ফ্রান্সের সরকার' রূপে চিহ্নিত হলেন তারা। এ-সব কিছুর গন্ধ পেয়েই ৩১-এ অক্টোবর

১৮৭০, শ্রমিকদের বাহিনী টাউন হল আক্রমণ করে। এবং সরকারের কয়েকজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। সরকারের ভুয়া প্রতিশ্রুতি এবং 'বাবু'দের নিয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনীর চাপ ঐ সদস্যদের মুক্ত করে। আর অবরুদ্ধ নগরে এ-মুহূর্তেই গৃহযুদ্ধ অবাঞ্ছিত মনে করে শ্রমিকেরা ঐ সরকারকেই কাজ চালাবার সুযোগ দিয়ে ফিরে আসে।

২৮এ জানুয়ারি অনাহারে জর্জরিত পারী আত্মসমর্পণ করল। কিন্তু যুদ্ধের ইতিহাস এক অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটাল। দুর্গগুলি হস্তান্তরিত হলো, নগরের প্রাচীর থেকে কামানগুলি খুলে নেওয়া হলো, মোবাইল গার্ড আত্মসমর্পণ করল, তারা নিজেদের যুদ্ধবন্দী বলে মনে করল। কিন্তু পারীর শ্রমিকবাহিনী? না, তারা অস্ত্রসমর্পণ করল না। তারা আলাদাভাবে প্রাসিয়ানদের সঙ্গে 'সন্ধি' করল। ন্যাশনাল গার্ড-এর হাতে রইল তার কামান, বন্দুক, অস্ত্রশস্ত্র। বিজয়ী প্রাসিয়ান সৈন্যরা পারীতে প্রবেশ করতে সাহস পেল না। পারীর একাংশে, যেখানে বড়লোকদের বাড়ি ঘর, সে অঞ্চলে কয়েকটি সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহার্য পার্কে তারা শিবির গেড়ে রইল। তাও মাত্র কদিনের জন্য। তারা অবরোধ করতে এসেছিল পারী। তাদের ঘিরে সশস্ত্রভাবে তৈরি রইল ন্যাশনাল গার্ড। ফ্রান্সের রাজকীয়বাহিনীকে হারিয়ে এসেছে যে প্রাসিয়ান সৈন্যরা, জমিদার-যুঙ্কারদের বাহিনী হিসাবে যারা বিপ্লবের সূতিকাগৃহে প্রতিবিপ্লবী হিসাবে প্রতিশোধ নিতে এসেছিল, তারাও সশ্রদ্ধভাবে বিপ্লবী ফ্রান্সের সন্তানদের সম্ভ্রম দেখাল।

ক্ষুধার্ত পারীতে শান্তি নামল। কিন্তু থায়ার্সদের চোখে ঘুম নেই। যতদিন সশস্ত্র শ্রমিক টহল দিচ্ছে, ততদিন বুর্জোয়ারা ঘুমায় কি করে? ১৮ই মার্চ তিনি ন্যাশনাল গার্ডদের হাত থেকে মমারত্রের কামান ছিনিয়ে আনতে সৈন্য পাঠালেন। কামানগুলি পারী অবরোধের সময় বানানো হয়েছিল। দরিদ্র পারীবাসীদের চাঁদায় তৈরি সে কামান। পারীবাসীরা তাদের সে কামান ছিনিয়ে নিতে দিল না। শুরু হলো প্রতিরোধের লড়াই। পারীর জনগণ আর ভের্সাই প্রাসাদে অবস্থিত বুর্জোয়া ও ভূ-স্বামীদের সরকারের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষিত হলো। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে ২৬এ মার্চ পারী কমিউন গঠিত হলো। পারী কমিউনের নেতৃত্বে ছিলেন মুখ্যত ব্ল্যাঙ্কিপন্থী ও প্রুঁধপন্থীরা। মার্কসবাদীদের কমিউনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। এবং ২৮এ মার্চ পারী কমিউনের শাসন প্রবর্তিত হলো। এতদিন

পর্যন্ত ন্যাশনাল গার্ড-এর কেন্দ্রীয় কমিটিই সরকারের কাজ চালাচ্ছিলেন। তাঁরা পারী কমিউনের নেতৃত্বের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করলেন। ইতিমধ্যে কমিউন পারীর কুখ্যাত 'নৈতিকতা-রক্ষী পুলিশ' বাহিনী তুলে দিয়েছেন।

পারীর কমিউন এরপর যেসব ঘোষণা ও কর্মসূচি গ্রহণ করে, তা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। ৩০এ মার্চ কমিউন বাধ্যতামূলক-ভাবে সৈন্যদলে যোগদান বা কনসক্রিপসন বাতিল করে। সদা সসজ্জ সামরিক বাহিনীকে ভেঙে দেওয়া হল। ঘোষণা করা হয় অস্ত্রবহনযোগ্য প্রতিটি নাগরিকই ন্যাশনাল গার্ডে যোগ দিতে পারবে। সশস্ত্র জনগণের বাহিনী ন্যাশনাল গার্ড একমাত্র সামরিক বাহিনী বলে ঘোষিত হলো। রাষ্ট্রের পীড়নমূলক শক্তি বলতে আমরা যে পুলিশ ও হুকুমপ্রত্যাশী সদাসসজ্জ সেনাবাহিনী বুঝে থাকি, কমিউন তাকে একেবারে বাতিল করে দিল। শ্রমিকশ্রেণীই যে-রাষ্ট্রের নায়ক, সে রাষ্ট্রশক্তির শত্রুশ্রেণীকে দমন করার শক্তি হলো সশস্ত্র জনগণ। এমনকি ঐ কমিউন আন্তর্জাতিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাল বিদেশীদেরও কমিউনের নায়কতায় নির্বাচিত করে। বলা হলো কমিউনের পতাকা বিশ্বপ্রজাতন্ত্রের পতাকা। অক্টোবর ১৮৭০ থেকে এপ্রিল ১৮৭১ পর্যন্ত বাড়িভাড়া দেওয়া বাতিল করে দেওয়া হলো। ঐ ক-মাসের অধিকাংশ সময়ই ছিল অবরুদ্ধ পারীর দুর্ভিক্ষখিন্ন সময়। আর, যদি কেউ ঐ সময়ে বাড়িভাড়া দিয়েও থাকে, তাহলে ভবিষ্যতের ভাড়া মেটাবার খাতে সে টাকা জমা থাকবে ঠিক হলো। পৌরসভার ঋণ-দাতা বিভাগে বন্ধকী জিনিসপত্র ঋণ অপরিশোধের দায়ে বিক্রি করা বাতিল করা হলো।

প্রশাসনগত ব্যাপারে নতুন নিয়ম হলো। ১লা এপ্রিল ঘোষণা করা হলো, কমিউনের সবচেয়ে উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বেতন কোনোক্রমেই ৬০০০ ফ্রাঁর চেয়ে বেশি হবে না। ৬০০০ ফ্রাঁ ছিল শ্রমিকদের সাধারণ মজুরির হার। তারপর দিনই কমিউন ঘোষণা করে ধর্ম (গীর্জা) ও রাষ্ট্রের মধ্যেকার সম্পর্ক ছিন্ন করা হলো। গীর্জার ধর্মমূলক কাজের জন্য সরকারী ব্যয়বরাদ্দ বন্ধ করা হলো। ফলে ৮ই এপ্রিল থেকে বিদ্যালয়গুলি থেকে ধর্মীয় চিহ্ন ইত্যাদিও অপসারিত হলো।

দিনের পর দিন ভার্সাই সরকার কমিউনের সৈন্যদের গ্রেপ্তার করে খুন করছিল। ৫ই এপ্রিল, ঘোষণা করা হলো, এরপর এ-ব্যাপার ঘটলে বিরুদ্ধ-পক্ষের লোকজনকে বন্দী করে জামিন হিসাবে রাখা হবে। কিন্তু এ ঘোষণা কার্যকর করা হয়নি। ৬ই এপ্রিল। গিলোটিন পুড়িয়ে দেওয়া হলো। ১২ই এপ্রিল

কমিউন ঘোষণা করে, ১৮০৯ সালে নেপোলিয়ন নানা দেশ দখল করে কামান এনে সেগুলি দিয়ে যে বিজয় স্তম্ভ তৈরি করেছিলেন তা গুঁড়িয়ে দেওয়া হোক। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার স্মরণ ও দম্ভচিহ্ন ঐ স্তম্ভ। ১৬ই মে তা কার্যকর হলো। মালিকরা যে-সব কলকারখানা বন্ধ রেখেছে সেগুলির সংখ্যা হিসাব করে, পুরনো শ্রমিকদের দিয়ে সমবায়মূলকভাবে চালানোর ব্যবস্থা করার জন্য ১৬ই এপ্রিল হুকুম বেরোল। ঠিক হলো, ঐ সমবায়মূলক কারখানাগুলিকে একটি কেন্দ্রীয় বৃহৎ সংগঠনে পরিণত করা। ২০এ এপ্রিল রুটি শ্রমিকদের রাতের কাজ রদ করা হয়। পুলিশকর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানকেন্দ্রগুলির তত্ত্বাবধান থেকে সরিয়ে নিয়ে পারীর পৌরসভার কুড়িটি আঞ্চলিক পৌরপ্রতিষ্ঠানের হাতে সেগুলি ন্যস্ত করা হলো। ৩০এ এপ্রিল বন্ধকী দোকানপত্র বন্ধ করে দেওয়া হলো। বলা হলো, বাঁধা দেওয়ার নিয়ম শ্রমিকের উপরে ব্যক্তিগত শোষণকেই চালু করে, শ্রমিকের উৎপাদনের যন্ত্রপাতির অধিকার ও ঋণ পাবার অধিকার তা খর্ব করে। ফরাসী বিপ্লবকালে ষোড়শ লুই-এর শিরচ্ছেদের 'প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ' যে গীর্জা তৈরি হয়েছিল ৫ই মে তা মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার হুকুম হলো।

ওপরের যে হুকুমগুলির কথা উল্লেখ করা আছে, তার সবগুলিই লক্ষ্য করার মতো। পুরনো সমাজব্যবস্থার তা গোড়া ধরে নাড়া দেয়। কমিউনের এসব ডিক্রি নিয়ে ভালোমন্দের দিকগুলি চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিন।

লেনিন বলেছেন যে শ্রমিকশ্রেণী পুরনো শাসনের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়ে পালন করছিল দুটি দায়িত্ব, প্রথমটি জাতীয়, অপরটি তাদের নিজেদের শ্রেণীর। বুর্জোয়াদের তথাকথিত 'দেশপ্রেমিক' শ্লোগানে সমাজতন্ত্রীরাও ধুয়া ধরেছিলেন। ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের পর বুর্জোয়া ও শ্রমিকের এক শ্লোগানে মেলা অসম্ভব ছিল। ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুদ্ধের ঐ স্তরে, বুর্জোয়া শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহটাই একমাত্র ও অনন্যপথ খোলা ছিল। কিন্তু পারীর শ্রমজীবী মানুষ 'জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার' গড়ার সুযোগ দেয় বুর্জোয়াদের।

তবু যখন নির্বিত্তরা ক্ষমতা দখল করল। তারা দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল করে। এক, তারা বিপ্লবের মাঝপথেই থেমে যায়, "অপহারকদের নিকট থেকে অপহরণ" না করে, উচ্চতর ন্যায়ের আদর্শ দেখাবার জন্য তারা ব্যাঙ্ক অব ফ্রান্স অধিকার করেনি। প্রুঁধপন্থীদের 'ন্যায়ানুগ বিনিময়' ভিত্তিক মনোভাব তখনও চালু ছিল। তাই পুঁজিপতিদের মূল হৃদযন্ত্র রয়েছে যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, সেখানে

হাত না দিয়ে কমিউন ভ্রান্তির পরাকাষ্ঠা দেখায়। দ্বিতীয় ভুল ছিল, শত্রুদের ধ্বংস না করে তাদের হৃদয় জয় করার মনোভাব। অর্থাৎ যখন ভার্সাই সরকারকে ধুলোয় লুটিয়ে দেওয়া যেত, তখন অনাবশ্যকভাবে কমিউন কালহরণ করেছে। গৃহযুদ্ধের সময়কার সামরিক তৎপরতাকে অনেকখানি খাটো করে দেখেছিল কমিউন।

কমিউন অনেকটা প্রায় স্বতস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিল। প্রথম দিকে বহু ব্যক্তি একে সমর্থন করেন। তথাকথিত দেশপ্রেমিকরা ভেবেছিলেন যে, কমিউন জার্মানদের যুদ্ধে হারিয়ে দেবে। ছোট দোকানদাররা ঋণমুক্তির জন্য সাহায্য পেতে কমিউনকে সমর্থন করে। এমনকি প্রজাতন্ত্রী বুর্জোয়ারাও অনেকে কমিউনকে সমর্থন করে, তাদের ভয় ছিল পাছে রাজতন্ত্র পুনপ্রতিষ্ঠিত হয়। বুর্জোয়া রিপাব্লিকানরা শ্রমিক রাষ্ট্রের প্রোলেটারিয়ান চরিত্র দেখে সরে যায়। পেটি বুর্জোয়ারা কমিউনের পরাজয় সুনিশ্চিত দেখে ভেগে যায়, শুধু রইল শ্রমজীবীরা। কেন? কমিউন যে তাদেরই সরকার। শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিই যে কমিউনের লক্ষ্য ছিল। শ্রমিকশ্রেণী-যে নিজেদের মুক্তির সংগ্রামে অন্যান্য শোষিত শ্রেণীকেও মুক্ত করে।

পুরোনো বন্ধুদের দ্বারা পরিত্যক্ত পারীর শ্রমিকশ্রেণীর সরকার কমিউনের তখন অনেক শত্রু। ফ্রান্সের সমস্ত বুর্জোয়া, ভূ-স্বামী, ফাটকাবাজ, কারখানার মালিক, ছোটবড় সব ডাকাত-গুণ্ডা-বদমাস শোষকেরা সবাই তখন এক জোট। এই বুর্জোয়া কোয়ালিশনকে সাহায্য দেন বিসমার্ক। বন্দী একলক্ষ রাজকীয় সৈন্যকে তিনি মুক্তি দিলেন। এই প্রতিক্রিয়াশীল চমূ গ্রামে গ্রামে অশিক্ষিত চাষীদের ও মফঃস্বলের পেটি বুর্জোয়াদের কমিউনের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। মার্সাই, লিওঁ, সাঁ এতিয়েন, দিয়োঁ প্রভৃতি নগরের শ্রমিকেরা অবশ্য কমিউন গঠন করে, কিন্তু সেগুলি অচিরেই ধ্বংস হয়ে যায়। পারীর চতুর্দিকে ঘিরে এলো প্রতিক্রিয়ার লৌহবেষ্টনী। এক অর্ধবৃত্তে প্রাসীয় বাহিনী, আরেক অর্ধবৃত্তে ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল কোয়ালিশন।

লেনিন ব্যাখ্যা করেছেন, কেন পারী কমিউন পরাস্ত হলো। তাঁর মতে সমাজবিপ্লবে জয়ী হতে হলে দুটি পূর্বশর্ত প্রয়োজন। উচ্চতর উৎপাদন শক্তি এবং তার যোগ্য নির্বিত্ত শ্রেণী। ১৮৭১ সালে, এ-দুটিই ছিল ফ্রান্সে অনুপস্থিত। ফ্রান্সের পুঁজিবাদ তখনও ছিল অনগ্রসর। দেশটায় ছিল মূলত পেটি বুর্জোয়া আধিপত্য (কারিগর, চাষী, দোকানদার ··ইত্যাকার)। এ

যেমন এক দিকের ছবি, অন্যদিকে ছিল যথাযোগ্য শ্রমিক পার্টির অভাব। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ফ্রান্সের শ্রমিকশ্রেণী তখনও উত্তীর্ণ হয়নি। তাঁরা প্রস্তুতও ততখানি ছিলেন না। নির্বিত্তদের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগঠন, বা শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন কিংবা সমবায় প্রতিষ্ঠান তখন তেমন ফ্রান্সে ছিল না। এমনকি কি-কাজ তাঁরা করতে চলেছেন, কেমনভাবেই-বা কর্মসূচি রূপায়ন করবেন—সেসব বিষয় শ্রমিকদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

অবশ্য লেনিন বলছেন, এ-সব দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও, এক কথায় বলা যায়, কমিউন সময় পায়নি তার কর্মসূচি কার্যকর করতে। কেননা, প্রথমাবধি তাকে সমস্ত সময়ই আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করতে হয়েছে। কমিউনের শেষদিন পর্যন্ত, সেই ২১-২৮ মে, কমিউনকে একটা ভাবনাকেই গুরুত্ব দিতে হয়েছে সবচেয়ে বেশি। তা হলো আত্মরক্ষা। অথচ এরই মধ্যে, শোষণহীন স্বাধীন শ্রমজীবী মানুষের রাষ্ট্রের নক্শাটিও তাঁরা করে দিয়ে গেছেন। এক, শোষক শ্রেণীর দমন-পীড়নের অন্ধ হাতিয়ার সদা সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিয়ে কমিউন সমগ্র জনগণকে অস্ত্র সজ্জিত করে। দুই রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানে ও শিক্ষাকে ধর্মনিরপেক্ষ করে। তিন, বন্ধ কারখানাগুলি শ্রমজীবীদের প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালনার ব্যবস্থা করে এবং কেন্দ্রীয়ভাবে আর্থনীতিক সংস্কার মনোভাব ব্যক্ত করে। চতুর্থত, যে কোনো পদাধিকারী সরকারী কর্মচারীদের বেতন কোনো অবস্থাতেই শ্রমিকদের স্বাভাবিক মজুরির চেয়ে বেশি ধার্য না করার নীতি গ্রহণ করে। সামাজিক কাজকর্ম কমিউন খুব বেশি করে উঠতে পারেনি, কিন্তু তার সে বিষয়ে ডিক্রিগুলিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। এঙ্গেলস এই ক্ষমতাকেই বলেছেন, 'নির্বিত্ত শ্রেণীর একনায়কত্ব"।

কমিউনার্ডদের উপর অত্যাচারের কাহিনী বলা এ নিবন্ধের লক্ষ্য নয়। কিন্তু ক্ষমতালোলুপ, শ্রেণীস্বার্থসজ্ঞান পুঁজিপতিরা কমিউনের পরাজয়ে যে প্রতিহিংসা নেয়, সে বড় ভয়াবহ। মৃত্যু ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কমিউন শেষ হলো। পারীর রাস্তায় মৃতদেহের স্তূপ জমল। শেষ লড়াই হলো পেরে লাগাইজ গোরস্থানে। শ্রমজীবী মানুষের রক্তের পাঁকে পা ডুবিয়ে পুঁজিপতিরা ক্ষমতায় আসীন হলো আবার। কিন্তু কমিউনের আদর্শের মৃত্যু নেই। তার আদর্শে এখন উজ্জীবিত এক তৃতীয়াংশ দুনিয়া। বাকি দুনিয়ায় চলেছে কমিউনের আদর্শকে কার্যকর করার সংগ্রাম।

তরুণ সান্যাল

'বাঙলাদেশে'র পাশে দাঁড়ান

'বাঙলাদেশে'র জনগণের ন্যায্য সংগ্রামের সমর্থনে, 'বাঙলাদেশ'কে অবিলম্বে স্বীকৃতি ও সর্বাধিক সহায়তা দানের দাবিতে এবং পাকিস্তানের জঙ্গী চক্রের অমানুষতা ও আক্রমণের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাবার জন্য তিরিশে মার্চ স্টুডেন্ট্‌স্‌ হলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের একটি সভা হয়। আহ্বায়ক ছিলেন, পশ্চিম বঙ্গের শান্তি সংসদ, আফ্রো-এশিয় সংহতি সমিতি, 'পরিচয়' ও 'আন্তর্জাতিক' পত্রিকা। শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অসুস্থতার জন্য সভায় উপস্থিত হতে না পারায় লিখিতভাবে তাঁর বক্তব্য প্রেরণ করেন। সভাপতি কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তা পাঠ করে শোনান। ঐ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সমর্থনে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক বাসব সরকার ও তরুণ সান্যাল। প্রখ্যাত কথাশিল্পী মনোজ বসু ভাষণ দেন। কবিতা আবৃত্তি ও পাঠ করেন দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাদ্রি-শেখর বসু, অমিতাভ দাশগুপ্ত ও সুধীর বসু। ঐ সভায় একটি সহায়তা সমিতি প্রস্তাবিত হয়। নিচে আমরা সভার প্রস্তাব, শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র, এবং সহায়তা সমিতির বিবৃতি প্রকাশ করলাম। সম্পাদক

প্রস্তাব

পৃথিবীর মানচিত্রে আরও একটি নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটল। সীমান্তের ওপারে 'বাঙলাদেশ' জন্ম নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের এই সভা ইতিহাসের নবজাতককে আজ স্বাগত জানাচ্ছে।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানে মানুষ অচির কালে মাতৃভাষা, জাতীয় সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিক অধিকার ও সমৃদ্ধ জীবনের জন্য ধর্মনিরপেক্ষভাবে আন্দোলন শুরু করে। আর, সে-সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল রক্তাক্ত। কারণ, কেন্দ্রীয় পাক সরকার তথা পশ্চিমী একচেটিয়া পুঁজি এই রাষ্ট্রের বৃহত্তম ভূখণ্ড ও জনসংখ্যার প্রতিটি মানবিক আবেগ ও আন্দোলনকে পাশব অত্যাচারের রথচক্রে চূর্ণ করতে চায়।

আমরা ভুলিনি ১৯৫২ সালের ২১-এ ফেব্রুয়ারির কথা। আমরা ভুলিনি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয় ও জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা গঠন, তারপর গণতন্ত্রের পতাকাকে

ধুলোয় লুটিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ ও পূর্ব-পাকিস্তানে তাদের অন্ধকার বে-আইনী শাসন প্রতিষ্ঠা। আমরা ভুলিনি তারপর গোটা পাকিস্তানেই সাংবিধানিক গণতন্ত্রকে পদদলিত করে মিলিটারি দুঃশাসন কায়েম করার ইতিহাস।

তারপর অনেকগুলি বছর কেটেছে। পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ সমগ্র পাকিস্তানের ঐক্যকে অক্ষুণ্ণ রেখেই তার জাতীয় স্বাধিকার ও বিকাশ চেয়েছিল। সে জানত পশ্চিম পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিও তার দায়িত্ব কম নয়। আগেই বিচ্ছিন্ন হতে চাইলে পূর্ব-বাঙলার মানুষদের সংগ্রাম অনেক সোজা আর সরল হতে পারত। দীর্ঘকাল ধরে রক্ত আর অশ্রুর এত মূল্য তাকে হয়তো দিতে হতো না। কিন্তু পাকিস্তানের ঐক্যকে রক্ষা করাই ছিল পূর্ব-বাঙলার মরণপণ সংগ্রামের অন্যতম প্রধান শর্ত।

বছরের পর বছর তারা সেই দুঃসাধ্য পথেই এগিয়েছে। অবশেষে অভীষ্টও প্রায় করায়ত্ত হয়েছিল। মাত্র সেদিন আওয়ামী লীগ পূর্ব-বাঙলার শতকরা আটানব্বইটি আসনে জনগণের ভোট পেয়ে পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হলো। 'বঙ্গবন্ধু' মুজিবর রহমান এগিয়ে এলেন গোটা পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করতে।

কিন্তু পশ্চিমী একচেটিয়া পুঁজি ও মিলিটারি জুন্টা পৃথিবীতে নীতিহীনতা ও বিশ্বাসঘাতকতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। ঢাকা শহরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে এগারো দিন ধরে রাজনৈতিক আলোচনা চালাবার অবসরে তারা পূর্ব-পাকিস্তানে সামরিক শক্তিকে নতুনভাবে প্রস্তুত করল। তারপর রাত্রির অন্ধকারে শুরু হলো অতর্কিত আক্রমণ।

সমস্ত পৃথিবী দেখল ষড়যন্ত্র ও আকস্মিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যারা একটা রাষ্ট্রের শাসনভার দখল করেছে, সঙ্গীনের ডগার ওপর যাদের সিংহাসন—সেই তারা বলছে : মুজিবর দেশদ্রোহী, বলছে : আওয়ামা লীগকে বেআইনী করা হলো।

সমস্ত পৃথিবী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে লক্ষ্য করল কিভাবে বর্বর সামরিক শক্তি গণতন্ত্রের রায়কে উপেক্ষা করে, মিলিটারি লেলিয়ে আর সন্ত্রাসের বন্যা বইয়ে পূর্ব-পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে আপাতত বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য করল।

পশ্চিম পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক কি হবে—তা 'বাঙলাদেশ'এর মানুষ স্থির করবে। হয়তো আবার

ফেডারেশনের প্রশ্ন উঠবে। হয়তো পাকিস্তানে সামরিক একনায়কত্বের অবসানে 'বাঙলাদেশ'ই অমোঘ ভূমিকা পালন করবে।

কিন্তু পৃথিবী দেখছে এখন, এই মুহূর্তে, অনেক রক্ত অনেক অশ্রুর মধ্য দিয়ে, এইভাবে 'বাঙলাদেশ' জন্ম নিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজির কদাচিৎ দেখা যায়। জন্মমুহূর্ত থেকে এই ভূখণ্ড ও তার সাড়ে সাত কোটি মানুষ যেন একটিই অস্তিত্ব। সে লড়ছে।

লড়ছে সমরবাদের বিরুদ্ধে। লড়ছে পশ্চিমী বণিকস্বার্থের বিরুদ্ধে। লড়ছে গণতন্ত্র ও স্বাধিকারের জন্য। আর সে-সংগ্রামও কম রক্তাক্ত নয়। প্রতিদিন শত-সহস্র মানুষ মরছেন। মাটিতে ট্যাঙ্ক নেমেছে। আকাশ থেকে বোমারু বিমান মৃত্যুবর্ষণ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, উপাসনা গৃহ—কিছুই দানবদের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পাচ্ছে না।

কিন্তু বাঙলাদেশের মানুষ অপরাজেয়। সে তার শক্ত মুঠিতে গণতন্ত্র ও স্বাধিকারের পতাকাকে উড্ডীন রেখেছে। সে প্রতিরোধ করছে পশুশক্তিকে।

আমরা আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে বাঙলাদেশের এই মৃত্যুঞ্জয়ী সংগ্রামকে সমর্থন করছি। স্পেন বা ভিয়েতনামের ইতিহাস আমরা ভুলিনি। ভারতবর্ষ এবং রবীন্দ্রনাথের মহান ঐতিহ্য আমরা বিস্মৃত হইনি।

পৃথিবীর যে-কোনো দেশেই মানুষ যখন গণতন্ত্র ও মানবিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করে, আমরা তখন তার সমর্থনে এগিয়ে আসি। বাঙলাদেশের ক্ষেত্রে আরও একটু আত্মীয়তার আবেগ আমরা বোধ করি। ওপারের মানুষও রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ই কথা বলেন—কি উৎসবে কি সংগ্রামক্ষেত্রে। আমরা পৃথক রাষ্ট্রের অধিবাসী, তথাপি এ-কথা আমরা ভুলতে চাই না।

বাঙলাদেশের সংগ্রাম পৃথিবীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষের সংগ্রাম। শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে এই মৃত্যুঞ্জয় সংগ্রামের সহায়তা করার জন্য আমরা সর্বতোভাবে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

নতুন তারার আবির্ভাব হয়েছে। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমরাও তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। 'বাঙলাদেশ'এর সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি জানানো হোক। তার সমর্থনে পৃথিবীর গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শক্তি প্রত্যক্ষভাবে এগিয়ে আসুন—এই সভা দৃঢ়ভাবে এই মত ঘোষণা করছে।

আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি

এই সভায় কোনো বাক্য উচ্চারণের পূর্বে, সর্বাগ্রে প্রণাম নিবেদন করি আমাদের সেই ভ্রাতাদের যাঁরা ওপার বাঙলায় তাঁদের ন্যায়সঙ্গত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় রক্তদান করেছেন, জীবনদান করেছেন, মহামহিম বীরের মতো প্রায় শূন্য হাতে অস্ত্র-আয়ুধ-ধারী, অত্যাচারী পরদেশী শাসকের বিরুদ্ধে অকুতোভয় সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের পরিপূর্ণ জয় কামনা করি, তাঁদের জয়োচ্চারণ করি।

যে জননী এপার বাঙলা ওপার বাঙলায় ভাষা ও সংস্কৃতির মূর্তিতে, প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনের মূর্তিতে, উভয় বাঙলার মানুষের হৃদয়ে চিন্ময়ী মূর্তিতে অবস্থিত আমরা আজ সেই জননী, সেই মায়ের ডাকে এখানে সমবেত হয়েছি।

আজ যে মন নিয়ে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তেমন মনোভাবের অভিজ্ঞতা আমাদের ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। অন্তত আমার সত্তর বৎসরের অধিককাল দীর্ঘ জীবনে কখনও অনুভব করিনি। একদিকে চিত্ত স্বজনের সহোদরের অতি বৃহৎ ও ব্যাপক অকল্যাণ, ক্ষতি ও বিনষ্টির আশঙ্কায় মারাত্মকরূপে শঙ্কিত, অন্যদিকে অত্যাচারী, নীতিজ্ঞানহীন, মিথ্যাচারী, দম্ভী শাসকের মূঢ় ও পাশব অত্যাচারে মর্মান্তিকভাবে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ। আবার সেই সঙ্গে প্রায় নিরস্ত্র সমগ্র জাতির একযোগে শঙ্কাহীন অটুট প্রতিরোধের মহিমময় বীর্যে চিত্ত একান্তভাবে স্ফীত।

অসুস্থ অবস্থায় গৃহের প্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ থেকে এই বার্তা পাঠাচ্ছি। সভায় উপস্থিত না হতে পারার জন্য সভাস্থ সকলের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করি। তা সত্ত্বেও মনে করি, আজ সভায় উপস্থিত থাকাটাই বড় কথা নয়। আজকের সবচেয়ে প্রথম ও প্রধান কথা হলো এই সঙ্কল্প সোচ্চারে ঘোষণা করা যে—আমাদের ওপার বাঙলার, 'বাঙলাদেশে'র ভ্রাতা ও ভগ্নীগণ, আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি, এবং যে-কোনো পরিণামে আমরা তোমাদের সঙ্গে থাকব। গৃহের অভ্যন্তরে থাকি কি গৃহের বাইরে থাকি, আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। পথে-প্রান্তরে, হাটে-ঘাটে-মাঠে, আমরা যে যেখানে আছি আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি। স্কুলে-কলেজে, অফিসে-আদালতে, ক্ষেতে খামারে, কলে-কারখানায় আমরা যে যেখানে আছি, আমরা তোমাদের সঙ্গে

আছি। আমরা সাড়ে চার কোটি তোমাদের সাড়ে সাত কোটির পাশে আছি। তোমাদের বিপদে আছি, তোমাদের সম্পদে আছি। তোমরা তোমাদের মহিমময় বীর্যের দ্বারা তোমাদের অবস্থিতির যে দীর্ঘছায়া প্রক্ষেপ করেছ, আমরা সেই কায়ার অনুগামিনী ছায়ার সঙ্গে মিশে তোমাদের সঙ্গে এক হয়ে আছি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

২৯শে মার্চ, ১৯৭১

বাংলাদেশ-সহায়ক [illegible]-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতির আবেদন

ইয়াহিয়া খাঁ ও তার বর্বর সামরিক চক্র বাঙলাদেশের গণতান্ত্রিক চেতনা, স্বাধিকার বোধ ও মানবিক মর্যাদার পবিত্র অনুভবকে ট্যাঙ্কের চাকায় পিষে ফেলতে চাইছে; প্রকৃতির আশীর্বাদ, কবির স্বপ্ন, নদী-মেখলা-শোভিতা এই শ্যামল ভূখণ্ড ও তার সাড়ে সাত কোটি মানবসন্তানকে আধুনিকতম মারণাস্ত্রের সাহায্যে একদল নরপিশাচ ঝলসে মারতে চায়।

নাপাম বোমার আগুনে তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীন নিদর্শনগুলি, বহু স্মৃতিঘেরা জনবসতি অঞ্চল, এমনকি গাঁয়ের সবুজ মাটিকে পর্যন্ত পুড়িয়ে দিচ্ছে। গোটা জাতির স্বপ্ন শ্রম আর সম্পদে নির্মিত সেতু, বাঁধ ও প্রকল্প-গুলিকে তারা বেছে বেছে ধ্বংস করছে। সারস্বত-সাধনার পীঠস্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এই জঙ্গীচক্র কামান দেগে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রঙপুরের বিখ্যাত কারমাইকেল কলেজ এবং বিভিন্ন অঞ্চলের অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থাগার ও গবেষণাগার ঘাতকরা ধ্বংস করেছে। সংবাদপত্রের কার্যালয়কে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। বোমা ফেলে মর্টার ছুঁড়ে তারা হাসপাতাল-ভবনে জ্বেলেছে নরকের ভয়াবহ আগুন। মন্দির-মসজিদ-চার্চের পবিত্রতাটুকুও ঐ যুদ্ধোন্মাদ রাক্ষসদের নখ এবং দাঁতের কামড় থেকে রক্ষা পায়নি।

হত্যা ও রক্তের নেশায় জঙ্গী ইয়াহিয়া চক্র উন্মাদ হয়ে গেছে। খবর এসেছে কয়েক লক্ষ লোক মারা গিয়েছে—নিজের দেশে মানুষের অধিকারে মায়ের ভাষায় কথা ব'লে যারা শান্তিতে বাঁচতে চেয়েছিল। অতর্কিত আক্রমণের শিকার, কামানের খোরাক, কয়েক লক্ষ অমৃতের সন্তান পচা গলা

শবদেহ হয়ে শহরে বন্দরে গ্রামে শকুনির খাদ্য হচ্ছে। তাদের কবর দেবার, দাহ করবার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। ইয়াহিয়ার উদ্যত সঙীন কয়েক লক্ষ শবদেহকে নিয়ত পাহারা দিচ্ছে—দেশবাসী যাতে শহীদদের প্রাপ্য মর্যাদাটুকু দিতে না পারে।

নর-নারী শিশু-বৃদ্ধ···কে মরেনি? শ্রমিক-কৃষক বুদ্ধিজীবী-চাকুরে-ব্যবসায়ী ···কে মরেনি? শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক অধ্যাপক···কে মরেনি?

মায়ের দুই স্তন কর্তন ক'রে দানবরা রক্তের উচ্ছ্বসিত ফোয়ারার মধ্যে অবোধ শিশুর মুখ চেপে ধরেছে। আড়াই বছরের বাচ্চাকে কামানের সামনে দাঁড় করিয়ে গোলা ছুঁড়েছে। ইজ্জত লুঠ ক'রে তারপর বাঙলাদেশের মা ও বোনদের সঙীন দিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান আচার্যদের সারিবন্দী দাঁড় করিয়ে গুলি ছুঁড়েছে। হাসপাতালের প্রত্যেকটি রোগীকে গুনে গুনে খুন করেছে।

কিন্তু নতুন মর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ সত্য ও সুন্দরের উপাসক বাঙলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ মৃত্যুঞ্জয় প্রতিরোধে রুখে দাঁড়িয়েছে। বীর রোশেনারা বেগম বুকে মাইন বেঁধে জল্লাদদের ট্যাঙ্কের ওপর ঝাপিয়ে প'ড়ে নিজের কিশোরী দেহের সঙ্গে একটা আস্ত প্যাটন ট্যাঙ্ককেই ছিন্ন ভিন্ন ক'রে দিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা ফৌজীদের হাত থেকে একের পর এক ঘাঁটি কেড়ে নিচ্ছে। গোটা বাঙলাদেশ আজ একটিই অস্তিত্ব হয়ে মুক্তিযুদ্ধ করছে। বাঙলাদেশ জিতছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী আমরা, রবীন্দ্রনাথের উত্তরপুরুষ আমরা,এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে নীরব বা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারি না। আমরা ভুলিনি স্পেনের গৃহযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতবর্ষের ভূমিকা। আমাদের মহান ঐতিহ্যকে আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না।

তাই আমরা 'বাঙলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি' গঠন করেছি।

আমাদের নিজ নিজ ক্ষেত্র ও নিজ নিজ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমরা এক ভাবগত আন্দোলন গ'ড়ে তুলতে চাই। আমরা চাই শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, শুধু ভারতবর্ষ নয়, গোটা পৃথিবীর গণতান্ত্রিক চেতনা ও মানবিক শুভবুদ্ধি বাঙলা-দেশের নবজাত সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য এবং সর্ববিধ সাহায্য নিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ানোর উদ্দেশ্যে এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম শুরু করুক।

সেই সঙ্গে আমরা বিপন্ন মানবতার পক্ষে বাস্তব আর প্রত্যক্ষ সাহায্যও

সংগ্রহ করতে চাই। সীমান্তের ওপারে এই মুহূর্তে দরকার ওষুধ, চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, গুঁড়ো দুধ ও বিস্কুটজাতীয় শুকনো খাদ্য। আর তা কেনার জন্য টাকাপয়সা।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। রাজপথ, বস্তি, কুটির অথবা অট্টালিকা—যেখানেই আপনি বাস করুন, অবিলম্বে আপনার যতখানি সামর্থ তার থেকেও বেশি সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসুন। ১৪৪ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ (টেলিফোন : ২৪-৩৯৩০)—এই ঠিকানায় সমিতির কার্যালয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত উপযুক্ত রসিদের বিনিময়ে আপনার সাহায্য ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে।

সীমান্তের ওপারে এই মুহূর্তে দরকার রক্ত। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ! রাজপথ বস্তি, কুটির অথবা অট্টালিকা—যেখানেই আপনি বাস করুন, অবিলম্বে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ে (৬৭ লেনিন সরণি, কলকাতা ১৩। সময় : বেলা ২টো থেকে সন্ধ্যে ৬টা) গিয়ে রক্তদান করুন। আপনার এই ভালোবাসা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হবে।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ—বাঙলাদেশের আহ্বানে সাড়া দিন। সেই শিশুটিকে স্মরণ করুন—মায়ের বুকের রক্তের ফোয়ারায় যার মুখ গুঁজে ধরা হয়েছিল। ওর খাদ্য দরকার। সেই জননীকে স্মরণ করুন—পশুরা যার অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়েছে মা-র চিকিৎসা দরকার। সেই কিশোরটির কথা স্মরণ করুন—ফ্রণ্টে আহত যে-বীর দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ক্যাম্পে শুয়ে আছে, দুই চোখে অধীর প্রত্যাশা নিয়ে যে তাকিয়ে আছে আপনার দিকে, পশ্চিমবঙ্গের দিকে। ওর রক্ত দরকার। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ! আপনি যে-ই হোন, যেখানেই থাকুন, একবার বিপন্ন বাঙলাদেশের কথা ভাবুন। তার দরকার টাকা। কারণ ওষুধ আর খাদ্য কিনতে হবে। মনুষ্যত্ব জাগ্রত হোক : আমাদের বিবেক শুভবুদ্ধির আহ্বানে সাড়া দিক। যেন ভুলে না যাই ইতিহাসের অগ্নিপরীক্ষায় আমাদেরও উত্তীর্ণ হতে হবে।

নিবেদক

বাঙলাদেশ-সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি

সভাপতি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়